রবীন্দ্রায়ণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রায়ণ

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্র পুলিনবিহারী সেন
সম্পাদিত
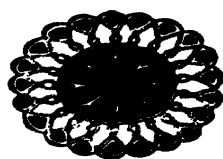
বাক্-সাহিত্য কলিকাতা ৯

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি-উৎসবে রচনার্ঘ্য
২২ শ্রাবণ ১৩৬৮

প্রকাশক
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

মুদ্রক
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্ক্‌স্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

চিত্রাবলী-মুদ্রক
বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানি
২১৩ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

পূরবীর পাণ্ডুলিপিচিত্র-মুদ্রক
প্রবাসী প্রেস
১২০।২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯

পুস্তক-গ্রন্থক
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওআর্ক্‌স্
৬১-১ মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা ৯

মূল্য দ্বিতীয় খণ্ড দশ টাকা

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের পরে
দিয়েছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব, সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে; তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে। ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে; যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে; যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুরুদেবের আঁকা ছবি

শ্রীনন্দলাল বসু

গুরুদেবের আঁকা ছবির মর্মে প্রবেশ করতে হলে মনে রাখা দরকার— চিত্রকলাচর্চার পূর্বেই তিনি সাহিত্যজগতের একজন দিক্‌পালরূপে গণ্য, ধর্মতত্ত্ব রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তার বিশিষ্টতায় সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট, গানে গানে তিনি দেশবাসীর হৃদয়হরণ করেছেন আর শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁর গভীর-ভাবনা-প্রসূত নূতন পদ্ধতি আর নানা সাহসিক পরীক্ষাদি সারা জগতের সহৃদয়চিত্তে ঔৎসুক্য ও আনুকূল্য জাগিয়ে তুলেছে। এসবই হয়েছে রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর রঙ 'তূলি' হাতে তুলে লওয়ার আগেই।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে শিল্পই আত্মসংস্কৃতি, শিল্পই ছন্দোময় করে আত্মাকে। সপ্ততি বর্ষের জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য ও সংগীত -সাধনায় গুরুদেব সেই অবস্থাই লাভ করেছিলেন, সত্তার সেই ছন্দোময়তা— এ যুগে এমন আর কেউ করেন নি।

কাব্যে অথবা ছন্দোবদ্ধ পদরাজিতে যা অপূর্ব আকর্ষিণী শক্তি ও সৌন্দর্যের কারণ, চিত্রে রেখারঙকেও সেই দেয় প্রাণ। পূর্বেই বলেছি সত্তর বৎসর বয়সে গুরুদেব খেলাচ্ছলে চিত্ররচনায় প্রবৃত্ত হন, তার পূর্বে জীবনব্যাপী দুশ্চর সাধনায় তিনি সাহিত্যে ও সংগীতে বিশেষ সিদ্ধি অর্জন করেছেন। মান-প্রমাণ, গ্রহণ-বর্জন, গতি ও যতির অন্যোন্যনির্ভর সুষ্ঠু প্রয়োগ, এসবের রহস্য তাঁর আয়ত্তে এসেছিল। এগুলির সহজ স্বাভাবিক ধারণার অভাবে শিল্পীরও কাজ চলে না। যে-কোনো রূপ-রচনার এগুলি অপরিহার্য উপায় ও উপলক্ষণ। আরও বিশেষভাবে প্রয়োজন প্রত্যক্ষ দর্শন ও অপরোক্ষ অনুভব, একজন ইংরেজ মনীষী যাকে বলেছেন 'direct and absolute vision'— তারই ফলে বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিষয়ী তার চারিত্র বা বিশেষত্বটি অব্যর্থভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। একাধারে নট এবং নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় এই

তাদাত্ম্যগুণ ছিল প্রচুর। তবেই দেখতে পাচ্ছি গুরুদেব 'তুলি' হাতে তুলে লওয়ার পূর্বেই, রূপ-রচনায় অপরিহার্য তিনটি মৌলিক গুণের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছিল তাঁর প্রতিভায়; সে তিনটি হল— ছন্দোবোধ, মান-পরিমাণের জ্ঞান এবং তন্ময়তা।

ছড়া কাব্যের প্রবেশক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন কিভাবে অলসমনে 'এলোমেলো ছিন্নচেতন' টুকরো ভাবনাচিন্তা ও 'কথার ঝাঁক' ঘুরে বেড়ায়, কারও সঙ্গে যেন কারও সম্পর্ক নেই, অথচ কখন্ বিশেষ একটা আইডিয়ার সূত্রে বা কল্পনার আকর্ষণে পর পর গাঁথা হয়ে সবটা একটা কোনো ছড়ার রূপ পায়— এলোমেলো ভাবনাই বটে আল্‌গাভাবে জোট-বাঁধা আর হাল্কা চালের দ্রুত ছন্দে ধাবিত। এলোমেলো ভাবনার বিচ্ছিন্নতা থেকে এই পরিচ্ছিন্ন রূপের ক্রমপরিণতি, এর নিগূঢ় প্রক্রিয়াটি আমাদের প্রণিধানের বিষয়। একটা কোনো বিশেষ আইডিয়া বা বিশেষ কল্পনার ছুতো না পেলে সবই অর্থহীন শব্দঘটা, গালবাদ্য বা গলাবাদ্য হয়ে থাকত— 'ছড়া' হত না। আমার মনে হয় গুরুদেবের 'ছড়া' আর 'ছবি' কতকটা একই প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত, একই প্রকার প্রেরণায় ভাব থেকে রূপে তাদের পরিণতি।

রূপের 'কী' ও 'কেন'র খোঁজ, ধরাবাঁধা অর্থ হাৎড়ে বেড়ানো— ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়ে পারে না। তাজমহলের অর্থ কী? মর্মরে সে এক রূপসৃষ্টি, সৌন্দর্যসৃষ্টি। সচেতন এক মানব-সত্তা, শিল্পীসত্তা, তার রূপ তার কল্পনার পিছনে ছিল, আজও আছে— এতেই তাজমহলের প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত। রবীন্দ্র-চিত্রকলার ধ্যান-ধারণা-কালেও এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এই চাবিকাঠিতে তার রহস্যের উদ্‌ঘাটন।

গুরুদেবের ছবি আঁকার তথ্যসন্ধানে দেখতে পাই— তরুণ বয়স থেকেই এ দিকে তাঁর আগ্রহ এবং কৌতূহল ছিল— সেই প্রথম দিকের কাজও হয়তো কোথাও সঞ্চিত আছে— কিন্তু, প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে এ দিকে তাঁর একাগ্র চেষ্টার সূচনা হল, আর হল এইভাবে। আমাদের জানা আছে কবিতার খাতায় বর্জিত ছত্র বা স্তবকগুলি নানারূপ আঁকিবুঁকি রেখায় নানাভাবে কালী বুলিয়ে বিলুপ্ত বা অবগুণ্ঠিত করে দেওয়ার অভ্যাস তাঁর ছিল। এক সময় তাঁর খেয়াল হল— খাতার পাতায় এই রকম বর্জিত অংশগুলি স্বতন্ত্র কিম্বা সংযুক্ত-ভাবে এক-একটা ছাঁদ নিয়ে গড়ে উঠছে। এখানে সেখানে আর-একটু কারিকুরি করলেই কোনোটি ফুল কোনোটা পাখি কোনোটা বা অপরিচিত অদ্ভুত প্রাণী-হেন সাকার শরীরী হয়ে উঠছে— ঠিকটি না হয়ে ওঠা পর্যন্ত লেখক হিসাবে, লেখশিল্পী হিসাবে তাঁরও কিছুতে রেহাই নেই। ভাবের বাঙ্ময় প্রকাশ তাঁর সারা জীবনের সাধনা ও সিদ্ধি, এ ক্ষেত্রেও অপরিচ্ছন্ন অসম্পূর্ণতা তাঁর পক্ষে সহ্য করা

গঠিন। ফলে স্বতউদ্ভূত রূপের নিরূপণে ক্রমেই রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হলেন ; রঙ নিয়ে, 'তুলি' নিয়ে রীতিমত ছবি আঁকাও শুরু হয়ে গেল।

ছন্দ শুধু কবিতার নয়। রূপেরও আছে ছন্দ। ছন্দ বিহনে কোনো রূপ না পায় আকার না পায় অর্থ— যে অর্থ তার বিশেষ ভাবলাবণ্য, বিশেষ চারিত্রব্যঞ্জনা। কোনো ছবিতে যে সৌন্দর্যসুষমা ফুটে ওঠে সেটি বিচিত্র ছন্দের সমাবেশ ও সমন্বয় -জনিত। বিচিত্র ছন্দ কতটা মিলেছে মিশেছে তাঁর চিত্রক্ষেত্রে তাতেই শিল্পীর সাফল্যের পরিমাণ। স্ফুটনোন্মুখ ফুলের এক ছন্দ, ভ্রষ্ট নিষ্পিষ্ট পাপড়ির আর। প্রেরণা-অনুযায়ী দুটি ছন্দে দ্বিবিধ ছবি হতে পারে, আর দুটিকে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিয়ে নিয়েও প্রয়োগ করতে পারেন চিত্রকর।

অব্যর্থ ছন্দের নিজস্ব প্রাণবত্তা থাকে। রবীন্দ্রনাথ যা-কিছু এঁকেছেন তার ছন্দে এই প্রাণস্পন্দন এই প্রাণশক্তি এমনি প্রবল এবং প্রচুর, যে, এ যুগের খ্যাতিমান শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের রূপকৃতিও তার পাশে কতকটা নিষ্প্রভ নিষ্প্রাণ মনে হয়। রবীন্দ্র-চিত্রকলায় আর কোনো গুণ না'ও যদি থাকত, শুধু এই প্রাণশক্তির দ্যোতনায় তার থেকে চোখ ফেরানো অসম্ভব।

প্রাণের প্রথম জাগরণ, প্রাণশক্তির অব্যর্থ স্ফুরণ —এ ছবির আসল বিষয়বস্তু। রূপকল্পনায় বা রঙে অবসাদের ভাব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই 'প্রাণবন্ত' 'জীবন্ত' ভাবই রবীন্দ্র-চিত্রকলার নিজস্ব বস্তু আর ভারতীয় রূপকলার ঐতিহ্যেও এটিই গুরুদেবের বিশেষ দান। আমাদের এ যুগের শিল্পীরা এ থেকে লাভবান হতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন নিবিষ্টভাবে স্বভাব পর্যবেক্ষণ করেছেন, তার সব ভাবে, সকল রূপে ও রূপান্তরে। রূপের আড়ালে আড়ালে ভাবসত্তার ধ্যানধারণাও তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছিল। যখনই তিনি ছবি আঁকতে বসেছেন, বিমূর্ত ভাবের অনুভূতি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে জেগেছে এবং লেখনীযোগে স্বতই প্রসৃত হয়েছে সেটি কাগজের বুকে। ('লেখনী' বলতে হচ্ছে, তুলি তো ব্যবহার করেন নি বলা চলে— কলমের নিব আর উল্টে নিয়ে কলমের বাঁট শুধু, কখনো বা রঙে-ভেজানো জোব্বার প্রান্ত, ছবিতে রঙ দেবার যথেচ্ছ খেয়ালে এগুলিই কাজ দিয়েছে।) প্রত্যক্ষ রূপ আর রূপাতীত ভাবের সংযোগে বহুবিধ ছন্দের উদ্ভব— তারই প্রচুর সাক্ষ্য দেখি রবীন্দ্র-চিত্রকলায় ; তার সর্বত্রই লিপিহীন 'স্বাক্ষর' দেখা যায় অসামান্য শিল্পীসত্তার।

রবীন্দ্র-চিত্ররূপরচনার আর এক বিশেষত্ব তার অংশ-প্রত্যংশের সুষ্ঠু প্রমাণ বা পরিমাণ। বিভিন্ন রূপের সন্নিবেশ সর্বদাই অভ্রান্ত এবং যথোচিত। হাতী আর ছাগলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রমাণবৈচিত্র্য এক নজরেই ধরা পড়ে। একই চিত্রক্ষেত্রে উভয়েরই স্থান হলে শিল্পী এদের আকার আয়তন তুলনা করে দেখান প্রচলিত প্রথার অনুবর্তনে। অথচ আলংকারিক চিত্রে পরিমিত স্থানে আর নির্দিষ্ট ঘের বা বেষ্টনীর মধ্যে এই আকার-আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে অলংকরণের

বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের বশে আর পরম্পরাগত রীতিতে। আবার, 'অদ্ভুত যদ্‌ভূত' কিছু সৃষ্টি করতে হলে উক্ত মান-পরিমাণেরও অন্যথা করতেই হয়, নয়তো ঈপ্সিত রসসৃষ্টি করা যায় না। মনে করা যাক্ দৈত্যসদৃশ মানুষ আঁকা হল ক্ষুদ্রাকার সিংহের পাশে ; কিম্ভূতকিমাকারের অনুভূতি উদ্রেক করতে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীই হয়তো পূর্বাপর চলে আসছে। তাই, অসংগত বলা যায় না।

ছোপ্‌লাগা শ্যাওলাধরা চুনবালিখসা পুরোনো দেয়ালে কত কী অনৈসর্গিক বিসদৃশ রূপ দেখা যায়, জানা-চেনা নানা স্বাভাবিক রূপের যেন বিরূপ অনুকৃতি বা বিকৃতি। এ তো গুরুদেবের চোখেও ধরা পড়েছে আর কখনো বা এরই অনুকরণে রঙে রেখায় তিনি চিত্ররচনা করেছেন— দেয়ালের আবছা ছবির থেকে তফাৎ এই যে, সেগুলি সুস্পষ্ট বৈরূপ্যে আর মণ্ডনগুণে আরও বহুগুণ বিস্ময়কর।

রবীন্দ্রচিত্রের সর্বত্রই যে বিশেষ গুণাবলী দেদীপ্যমান সে হল— ওজঃ, প্রাণছন্দ এবং আলেখ্যোচিত প্রমাণ বা পরিমাণ।

পূর্বাগত ভারতীয় চিত্ররীতির সঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্ররীতির এই মিল আছে যে, ছবিতে তাঁর ব্যঞ্জনা বেশি, খুঁটিনাটির অঙ্কন অল্প। এদেশীয় কাব্যমীমাংসায় 'ধ্বনি'কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, শব্দ অথবা অর্থকে নয়। এদেশীয় চিত্ররীতিতে তেমনি রঙ এবং রেখাই সব নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য হল এগুলির যোগে প্রাণস্পন্দিত ছন্দের বেগে রসের ব্যঞ্জনা। প্রতীচ্যে শিল্পদৃষ্টিও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুগামী— রূপের মান-প্রমাণে গাণিতিক যাথাতথ্য রাখা চাই। আকারকে ত্রিমাত্রিক ক'রে দেখানোই সেখানকার পূর্বাগত রীতি, এজন্য উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বলের সন্নিবেশও স্বাভাবিক হবে। আর, আমাদের দেশের প্রাচীন চিত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থ ছাড়া রূপের তৃতীয় মাত্রাটির প্রয়োগ নেই বললেই চলে ; যে দেয়ালে বা কাগজে ছবি আঁকা তার সমতলতা, অর্থাৎ 'দেয়ালত্ব' বা 'কাগজত্ব' ঘুচিয়ে দেওয়া হয় নি। রবীন্দ্রনাথেরও এই রীতি।

রবীন্দ্রনাথের ছবির গোত্রনির্ণয়ে এক সময় বলেছি মনে পড়ে— বস্তু-অনুকৃতি না হয়েও বাস্তব। Real without being realistic। এ নিয়ে আর একটু খুলে বলার প্রয়োজন হতে পারে।

বাস্তব অনুকৃতিতে পাশ্চাত্য রূপকলা সীমা ছাড়িয়ে চলে গেছে। বাস্তববাদী শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য হল নিখুঁত প্রকরণে ছবিতে বস্তুবিভ্রম উপস্থিত করা। তার ফলে কায়াটি নজরবন্দী ক'রেও কায়ার অন্তর্লীন সত্তা বা সত্যের আভাস না দেওয়া যায় যদি, তবে তো শিল্পসৃষ্টি হল না। শারীরস্থানের নিখুঁত মান-পরিমাণে সিংহ নাহয় আঁকা হল, সে ছবিতে সিংহত্ব যদি না থাকে— সিংহের নিঃশঙ্ক বীর্য ও গাম্ভীর্য— তবে তো সিংহের যথাযথ আকৃতি সত্ত্বেও সিংহপ্রকৃতি ফুটে উঠল

আত্মপ্রতিকৃতি রবীন্দ্রনাথ

না আর সার্থক রসসৃষ্টিও করা গেল না। এ ক্ষেত্রে প্রাচ্য শিল্পীর একান্ত অভিনিবেশ সিংহত্ব ফোটানোর দিকেই। শারীর মান-প্রমাণের সমস্ত খুঁটিনাটি নাহয় না'ই রইল। ফলে সিংহের চিত্র বা মূর্তি সত্যকার সিংহ হল— অশিক্ষিত আনাড়ি লোকের চোখেও অন্য-কিছু মনে হবে না। ভাবব্যঞ্জনার রহস্যময় এই রীতি গুরুদেবের ছবিতে।

অবশ্য, 'শিক্ষিত' সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হতেই পারে— শারীরিক মান-প্রমাণের যথাযথ প্রয়োগে সিংহ হল না আর তার উল্টো প্রক্রিয়ায় হল কার্যসিদ্ধি, এ বড়ো গোলমেলে কথা। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্যটি পরিস্ফুট করতে হলে এঁকে দেখানোই প্রশস্ত—

প্রথম চিত্রে বস্তুনিষ্ঠ রীতিতে সিংহ আঁকা হয়েছে। আঁকা হয়েছে ভালোই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অন্যোন্যনির্ভর প্রমাণও নিখুঁত। দ্বিতীয় চিত্র সুপ্রাচীন আসীরীয় অর্ধমূর্তির অনুসরণে। শারীর-স্থানের হিসাবে ত্রুটিবিচ্যুতি আর অন্যথাচরণ আছে, অথচ দৃষ্টিপাত-মাত্রে চিত্তকে সবলে আকর্ষণ করে এমন কী আছে এই রূপসৃষ্টিতে। উপলব্ধি হয়— এই তো সত্যকার সিংহ— শক্তি সাহস এবং গরিমার শিলীভূত বিগ্রহ— সিংহের সত্তা, সিংহের আকার মাত্র নয়। এই রূপকল্পনায় পশুরাজের মৌল প্রাণছন্দ বিধৃত, কাজেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি মান প্রমাণ উপেক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। তৃতীয় চিত্রে এঁকে দেখানো হয়েছে সিংহের প্রাণছন্দটি। কেশরীরূপের মুখ্য 'কথাটি'— বিশেষ বিশেষ সিংহের বিশেষ রূপ থেকে বিশ্লিষ্ট প্রায়বিমূর্ত ভাবসত্য অথবা ভঙ্গীটি এই চিত্রে পরিস্ফুট। জগতের তাবৎ রূপের এজাতীয় ভাবসত্য আর প্রাণছন্দ যে-কোনো শিল্পীকে বহু বৎসরের সাধনায় আবিষ্কার ও আয়ত্ত করতে হয়। বাহ্যতঃ রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি, অথচ পূর্বেই বলেছি কাব্য ও সংগীতের সাধনায় ছন্দোময় হয়েছে তাঁর সত্তা, তাঁর রূপকৃতিও তাই নিজস্ব ছন্দ খুঁজে পেয়েছে স্বভাবতই আর সব সময়। এই অর্থেই বলা যায় সর্বদা বস্তুসাদৃশ্য না থাকলেও, সব ছবিই তাঁর হয়ে উঠেছে বাস্তব।

পাঁচটি উপায়-উপলক্ষণের যোগে ছবি হয়ে থাকে। প্রথম হল বিষয়বস্তুর ভাবরূপ বা আইডিয়া, ছবি আঁকার মূল প্রেরণা। দ্বিতীয়— প্রকরণ বা কর্মকৌশল। তৃতীয়— চিত্রের অংশ-প্রত্যংশের সংযোজনা, ভারসাম্য। চতুর্থ— চিত্রতলের বৈশিষ্ট্য-উদ্ভূত বিশেষ সুষমা। পঞ্চম—

প্রাণছন্দ। ছবিতে এই প্রাণছন্দই হল মুখ্যবস্তু, যদিও কোনো সংজ্ঞার্থ দিয়ে এটি বুঝিয়ে বলা যায় না।

বিচার-বিশ্লেষণের সুবিধার জন্যই এক এক ক'রে পাঁচটির উল্লেখ হল, অথচ সার্থক চিত্রে এই 'পঞ্চভূত' এভাবে অঙ্গীকৃত হয় যে বলা যায় না কোথায় একটির শেষ আর অন্যটির সূচনা।

সচরাচর আইডিয়া থেকেই রূপকৃতির সূচনা হয়ে থাকে। শিল্পী পরে মনোনিবেশ করেন রূপের নিরূপণে। কী প্রাচ্যে কী প্রতীচ্যে এই হল রীতি। গুরুদেবের কাজের বৈশিষ্ট্য হল —মনঃক্ষেত্রে আইডিয়া ভূমিষ্ঠ না হতেই কাগজে তার রূপরচনা শুরু হয়। মনে হতে পারে— শিল্পী খেলাচ্ছলে বুঝি কী-যেন স্থাপত্যকল্পনায় বিভোর, নয়তো রঙ নিয়েই শুধু খেলা করছেন। অথচ এই খেলা বা কাজ যখন সমাধা হল, দেখা গেল— পূর্বোক্ত পাঁচটি উপায় উপাদান সবই তাঁর চিত্রে অঙ্গীকৃত, সমন্বিত, আর আদ্যন্ত চিত্ররূপই অদ্ভুতভাবে প্রাণস্পন্দিত। এমন স্বতঃ-সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের মতো লোকোত্তর-প্রতিভার ক্ষেত্রেই সম্ভবপর।

লোকপ্রিয় আর বস্তুনিষ্ঠ অঙ্কনপদ্ধতির সব বিধিনিষেধ কবি হেলায় লঙ্ঘন করতেন, কোনো রীতিপদ্ধতির সযত্ন অনুশীলন কখনো করেন নি, অথচ চিত্র তাঁর অবস্তুক হ'ত এ কথা কিছুতে বলা চলে না। তাদের বাস্তবতা স্বতন্ত্র এক স্তরে। সাধারণ মানুষ এই রূপকল্পনার মহত্ত্ব সম্পর্কে স্বভাবতই সন্দিহান। তাতে এইমাত্র প্রমাণ হয় যে, কোন্ বস্তুর ছবি সে দিকেই তার যা-কিছু আগ্রহ অথবা কৌতূহল, সামগ্রিকভাবে ছবিটা কী সে তার বুদ্ধির, বিশেষতঃ বোধের অগোচর।

ছবি আঁকতে শুরু ক'রে ক্রমে ক্রমে মূল প্রেরণাটি, আইডিয়াটি, বদ্‌লে গেল— তাকে আগের পরিচয়ে চেনাই মুশকিল হল —এ অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকের আছে। সুসম্পন্ন চিত্রের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অ-পূর্ব নূতন আইডিয়ার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে অপ্রত্যাশিত রসের সৃষ্টি করল। গুরুদেবের ক্ষেত্রে এরূপ অভিজ্ঞতা অবিরল। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকে তিনি উপেক্ষা করতেন এমন নয়, তবে মাত্রাতিরিক্ত মর্যাদাও দিতেন না, এটিও তাঁর চিত্ররূপের বৈশিষ্ট্যের কারণ।

এক সময় গুরুদেব আমায় বলেছিলেন, সত্য সম্পর্কে মোট কথাটা এই যে, সত্তাকে আকর্ষণ করতে পারে। তোমার প্রাণের প্রাণকে আকৃষ্ট করবে; এমন হবে যে, যত দিন যাবে, যত তার কাছে ধরা দেবে, তত তার প্রভাব তোমায় আবিষ্ট করে তুলবে। এক প্রকার অভিনবত্বের গুণে অস্বাভাবিকও যে আকৃষ্ট করে না তা নয়, কিন্তু সত্যের ঘাটতি থাকলে সে আকর্ষণ স্থায়ী হবার নয়। গুরুদেবের সৃষ্ট নানা 'বিরূপ' 'বিকৃতি' যে আমাদের চিত্তকে বিমুখ করে না, বরং উত্তরোত্তর বেশি ক'রে আকর্ষণ করে, এ যেমন তার শক্তির তেমনি সত্যেরও প্রমাণ।

পূর্বে এ দেশের শিল্পীরা বাস্তবরীতির অনুশীলন করেন নি। বস্তুরূপের বিজ্ঞানসম্মত নিরূপণ তাঁদের জানা ছিল না। তবু তাঁরা ছিলেন অপূর্ব রূপের স্রষ্টা। মনে করা যাক— একটি গৃহের সামনে একজন লোক, এরই ছবি হবে। বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঐ গৃহ আর ঐ মানুষ একটা কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে যতটা যেভাবে দেখা যায় তারই যথাযথ রূপায়ণ হবে। ভারতীয় চিত্রকর কিন্তু পুরো বাড়িটা আর পুরো মানুষ সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে যতটা তাঁর দেখা আছে, মনে আছে, চিত্ররূপের সঙ্গে মানিয়ে যতটা হয় তার ব্যবহার করবেন। নির্দিষ্ট একটাই দৃষ্টিকোণে তিনি আবদ্ধ নন। ফলে এক নজরে দেখা বস্তুঘেঁষা ছবি না হলেও সজীব ছবি হতে পারবে। বলাই বাহুল্য গুরুদেবের ছবিও ছিল শেষোক্ত শ্রেণীর।

জর্মনিতে প্রস্তুত বিচিত্র রঙের জৌলুষদার কালী ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রিয়। এ দেশের প্রাচীন চিত্রেও রঙের ঐশ্বর্য ছিল প্রচুর। আজ পর্যন্ত সেগুলির ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয় নি। এ দেশে উজ্জ্বল রঙের রুচি তেমনি স্বাভাবিক পাশ্চাত্যে যেমন রঙের অনৌজ্জ্বল্য। দেশের আবহাওয়া, রৌদ্রের উজ্জ্বলতা বা অনুজ্জ্বলতা এজন্য দায়ী। য়ুরোপে প্রথম যখন রবীন্দ্র-চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় এই বিচিত্র এবং উজ্জ্বল বর্ণের ব্যবহার বিমুগ্ধ বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল। প্রাচ্য শিল্পীর কাজে এটাই প্রত্যাশিত ছিল। তদুপরি রবীন্দ্রনাথের বর্ণরুচি এমন অভ্রান্ত আর এত বেশি পরিশীলিত যে, বর্ণসংগতিতে তাঁর কোথাও কোনো দুর্বলতা দেখা যায় না। বিভিন্ন পর্দায় দুটি ঘোর রঙও তিনি গায়ে গায়ে ব্যবহার করেছেন— গাঢ় নীল রঙের পাশে গাঢ়তর কালিমা। অথচ প্রয়োগনৈপুণ্যের গুণে প্রত্যেকটিতে চিত্ররূপের স্তরবিন্যাসকে স্পষ্ট করে তুলেছে বৈ একশা করে নি।

রূপকল্পনার অসংস্কৃত রূঢ় রুক্ষ বেশে আর ভাবব্যক্তির দুর্দমনীয় ওজঃশক্তিতে রবীন্দ্রচিত্রের কিছুটা সাদৃশ্য আছে মনে হয় গুহাবাসী আদিম চিত্রকরের কাজের সঙ্গে। অথচ আন্তরিক কোনো মিল নেই। এতে কোনো ভুল নেই যে, এগুলি বুদ্ধিদীপ্ত চিত্তবৃত্তির অপূর্ব প্রকাশ। এই চিত্রচর্চার পশ্চাৎভূমিতে আছে জীবনব্যাপী শিক্ষা সংস্কৃতি ও রুচির সাধনা— ধীশক্তির অদ্ভুত বিকাশ। আসলে বুদ্ধিদীপ্ত হলেও, প্রতীয়মান আদিমতা থেকে এসেছে তার জোর বা বলিষ্ঠতা।

চিত্রলিপির ভূমিকায় গুরুদেব যা বলেছেন তারই কিয়দংশ এখানে সংকলন করে দিলে, তাঁর চিত্র বুঝবার সুবিধা হবে সন্দেহ নেই। তিনি বলছেন—

People often ask me about the meaning of my pictures. I remain silent even as my pictures are. It is for them to *express* and not to *explain*. They

have nothing ulterior behind their own appearance for the thoughts to explore and words to describe and if that appearance carries its ultimate worth then they remain, otherwise they are rejected and forgotten even though they may have some scientific truth or ethical justification.

সারার্থ: আমার আঁকা ছবির অর্থ কী লোকে প্রায়ই আমায় জিজ্ঞাসা করে। আমার ছবিও যেমন নীরব, আমিও তাই। ব্যক্ত করাই তো ওদের কাজ, ব্যাখ্যা করা নয়। অভিব্যক্ত রূপের পিছনে কী আছে যে, চিন্তা দিয়ে খুঁজতে হবে, ভাষা দিয়ে বলতে হবে। রূপের সার্থকতা যদি রূপে ফুটে উঠে থাকে তবেই তো ওরা রইল; না হলে বিজ্ঞানের কোনো তথ্য বা সত্য নিহিত, নৈতিক কোনো যুক্তিযুক্ততা, এরূপ কোনো কারণেই ওরা স্থায়ী হবার নয়।

রবীন্দ্র-চিত্রের ভিত্তি

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

শিল্পের জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা যতই বেড়েছে ততই তাঁর প্রথম দিকের রচনার আলোচনা কমেছে। বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য তাঁর প্রথম দিকের ছবিগুলি। নিজের ছবি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এবং তাঁর প্রথম দিকের নকশা ও কাটাকুটির মধ্যে আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। শিল্পীর উক্তি এবং প্রথম দিকের ছবি এই দুইয়ের সংযোগে রবীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার মৌলিকতা স্পষ্টতর হবে।

আলোচনা শুরু করবার পূর্বে কিঞ্চিৎ ভূমিকা করে নেওয়া দরকার।

ছবির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পরম্পরাকে স্বীকার করেন নি। এ কথাও ঠিক যে শিল্পীরা যেভাবে ছবি করে থাকেন ঠিক সেইভাবে রবীন্দ্রনাথের ছবি রচিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ পরম্পরা অনুসরণ না করে থাকলেও সমালোচকেরা তাঁর ছবির বিচার করবার সময় কোনো-না-কোনো পরম্পরার সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। তুলনার ভাষা দ্বারা যেমন বুঝতে সুবিধা হয় তেমনি আরোপিত তুলনার দ্বারা বিচারের অসুবিধেও অনেক সময় ঘটে থাকে। এই অসুবিধে সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠা হয়তো বর্তমান লেখকের পক্ষে সম্ভব হবে না।

রবীন্দ্রনাথের ছবি পরম্পরাগত এবং প্রথানুগত না হলেও ক্রমে তিনি একটি নির্দিষ্ট প্রথা বা সংস্কারের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। তবে এই সংস্কারটি তাঁর নিজেরই অর্জিত। এই বিবর্তনটি কিভাবে ঘটেছে তারই পরিচয় প্রথম দেওয়া যাক। কাগজের উপর কলম দিয়ে অন্যমনস্কভাবে হিজিবিজি কাটার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। এইভাবে কলম চালাতে গিয়ে কলমের মুখে কতকগুলি আকার অনায়াসে আত্মপ্রকাশ করে। এইসব আকারের সঙ্গে অচেতন মনের সম্বন্ধ মনোবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। মনোবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা বাদ দিয়েও এই রকম কাটাকুটির আরও একটি দিক সম্বন্ধে প্রশ্ন হতে পারে— এই সব আকার আমরা পেলাম কোথা থেকে? উত্তরে বলা যেতে পারে, সহজাত সংস্কার। যেমনভাবে পাখি বাসা বাঁধে, মৌমাছির চাক তৈরি হয় সেই রকমই একটা সংস্কারের ধারা সভ্য মানুষের মধ্যে রয়ে গেছে। প্রকৃতির মধ্যে কতকগুলি আকার গড়ন গতি বারবার লক্ষ্য করা যায়। এগুলিকেই বলা হয় অবচ্ছিন্ন রূপের জগৎ।

আমরা যখন কাগজের উপর কলম চালাই তখন এই অবচ্ছিন্ন রূপের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বা সঞ্চিত সংস্কার কলমের মুখে ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ লেখার খাতার পাতায় যে ভাবে কাটাকুটি করেছিলেন তা থেকে এইরকম গতি ও আকার আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই

কাটাকুটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন ছিল না। এজন্য প্রয়োজনের তাগিদ যথেষ্ট ছিল। পাণ্ডুলিপিতে যে যথেচ্ছ কলম চালানো সম্ভব নয় তা বলাই বাহুল্য। কাটাছাঁটা করা বা সেই কাটাছাঁটার থেকে একটা আকারের সন্ধান পাওয়ার মধ্যে কোনো বিস্ময়ের কারণ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে কাটাকুটি করতে গিয়ে যে একটি তথ্য আবিষ্কার করলেন সেটি সত্যই বিস্ময়ের বস্তু। তাঁর লেখাতেই তিনি সে কথা বলেছেন, তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই।

কাটাকুটি করতে গিয়ে যে জগতে তিনি প্রবেশ করলেন তার প্রসার কতটা তা রবীন্দ্রনাথের রচনায় যেমন করে পাওয়া যাবে তার তুলনা বিরল। অভিজ্ঞ শিল্পীর পক্ষে এই ভাবে দীর্ঘকাল কলম চালানো প্রায় সম্ভব হয় না। কিছু-না-কিছু সাদৃশ্য আরোপিত হয়ে থাকে। অপর দিকে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দীর্ঘকাল এই কাজে সময় অতিবাহিত করতে দেখা যায় না। তাই কাটা-কুটির জগতের গভীরতা বা বিস্তৃতি সম্বন্ধে আমরা সচরাচর সচেতন নই। রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে এই জগতের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তারই কিছু বিবরণ দেওয়া যাক।

পাণ্ডুলিপিতে লেখার চার দিক ঘিরে লতার পাকের মতো যে নকশা সেগুলির কোনো পরম্পরা নেই। অপর দিকে অনুরূপ ভাবের নকশা যে আর কোথাও দেখা যায় না এমনও নয়। আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মানুষের গায়ের উলকির (tattoo) নকশার সঙ্গে এগুলির আকারগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে। এ যেন লেখাকে ঘিরে উলকি তৈরি হয়েছে। ক্রমে এই নকশা আরো জটিল ও ভারী আকার নিয়েছে।

লেখার পাতার আশ্রয় ছেড়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপসৃষ্টির চেষ্টা আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের চিত্র-রচনার দ্বিতীয় পর্বে। প্রথম পর্বের কাটাকুটির মধ্যে যে সমস্ত আকার দেখা দিয়েছিল তারই অনুরূপ আকারে দ্বিতীয় পর্বের রচনা। বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর উপলব্ধির একটি চূড়ান্ত মীমাংসা এইসব রচনার মধ্যে পেলেন। রেখার সঙ্গে রেখার সম্বন্ধ, বিশুদ্ধ আকার এবং আকারের ভঙ্গি নিয়ে একটি জগতের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর এই দ্বিতীয় পর্বের রচনাতে। রবীন্দ্রনাথের রচিত এইসব রূপগুলি কোনো বাস্তব পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না, গড়িয়ে-যাওয়া পাথরের নুড়ি যেমন নিষ্ক্রিয় আকার নিয়েও সক্রিয় তেমনি রবীন্দ্রনাথের রচিত মূর্তিতে পাই গতি ও স্থিতির সমন্বয়। স্পর্শের দ্বারা যেমন কঠিনের অভিজ্ঞতা হয় তেমনি অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে এইসব রচনাতে। ধাতুর পাতের মতো এগুলির ধার এবং তেমনি দৃঢ়। কোনো মানবীয় ভাব এই সব রচনাতে প্রকাশিত না হলেও এগুলি প্রাণহীন নয়। শিল্পের জগতে এই সব মূর্তির অস্তিত্ব বাস্তবের মতোই সত্য। পরম্পরার বন্ধনমুক্ত রবীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনার এগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং রবীন্দ্রচিত্রের বনিয়াদরূপে এগুলি স্মরণীয়।

পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটির নকশা এবং ঠিক পরের যুগের রচনা, এই দুইয়ের সংযোগে রবীন্দ্রনাথের চিত্রের নিজস্ব পরম্পরা তৈরি হয়েছে। পাণ্ডুলিপির নকশাগুলি যদি কেউ বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে অনুসরণ করেন তবে তাঁরা স্পষ্টই বুঝবেন, পরবর্তী কালের রচনার আকার-

প্রকার ও ভঙ্গির সঙ্গে পাণ্ডুলিপির নকশাগুলির সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ। উভয়ের সম্বন্ধ থেকে আরও প্রমাণ হবে যে রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের রূপসৃষ্টি বুদ্ধিমার্গী নয় বা জোড়াতাড়া দিয়ে তৈরি হয় নি; এগুলি অনায়াসলব্ধ। কলমের অনায়াস গতির টানে এসব আকার বা রূপের আবির্ভাব।

রবীন্দ্রনাথ রীতিমত ছবি আঁকা না শিখলেও কলমের গতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রেখে চালনা করবার অভ্যাস তাঁর নিশ্চয়ই ছিল। তাঁর হাতের লেখা থেকেই বোঝা যাবে যে রেখার গতি তাঁর কতটা আয়ত্তের মধ্যে। তাই ফসকে-যাওয়া কোনো আকার বা রেখা বা গতি তাঁর রচনার মধ্যে প্রায় কখনোই পাওয়া যায় না। বিশেষ করে দ্বিতীয় পর্বের রচনাতে এরকম দুর্বলতার সামান্য ইঙ্গিতমাত্র নেই। এই রেখাই রবীন্দ্রনাথের রচনার আঙ্গিককে পূর্ণতা দিয়েছে। তাঁর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ রেখার সঙ্গে রেখার সম্বন্ধ অনুসরণ করে ক্রমে আকার, আকার থেকে রূপের জগতে এসে পৌঁছেছিলেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় অবচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে বাস্তবের অভিজ্ঞতা ও উদ্দীপনার দিকে তিনি এগিয়ে আসছেন। কাজেই বাস্তব অভিজ্ঞতা কতকটা স্বীকার না করে অধিককাল তিনি [illegible] বন্দনা করতে পারেন নি। এই অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে দুই ভাবে। এক দিকে অবচ্ছিন্ন রূপের অভিজ্ঞতাকে তিনি বাস্তবের আচ্ছাদনে সৃষ্টি করেছেন; অপর দিকে ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনাকে বাস্তবের জগৎ থেকে অবাস্তব বা অবচ্ছিন্ন রূপের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। এই দোটানার প্রথম সূচনা তৃতীয় পর্বে অতিকায় অদ্ভুত জীবজন্তুর কল্পনায়। অবচ্ছিন্ন থেকে উদ্ভূত এইসব রূপ বা আকারের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এই সময়ের রচনাগুলিকে বিবর্তনের ইতিহাসরূপে আমরা স্মরণ রাখব।

এর পরে এক দিকে অসংখ্য প্রতিকৃতিমূলক ছবি নাটকীয় ভাবের অভিব্যক্তি, অপর দিকে নিছক রূপ বা আকার -প্রধান, সাদৃশ্যের ইঙ্গিতযুক্ত রূপসৃষ্টি— কালিকলমে আঁকা পূর্ণাঙ্গ নারীমূর্তি, মুখোসধর্মী প্রতিকৃতি, কিছু দৃশ্যচিত্র এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের শেষ দিকের রচনা 'সে' পুস্তকের ছবিগুলি। 'সে' বইখানিতে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলি তাঁর মৌলিকতার সার্থক পরিচয়। এগুলি কাটাকুটি-হিজিবিজির মতোই সহজ অনায়াসপ্রসূত অথচ বস্তুধর্মী। এ যেন অবচ্ছিন্ন জীবন্ত প্রকৃতি। পাণ্ডুলিপির নকশা থেকে শুরু করে এই রচনা পর্যন্ত আরও বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত ছবি জার্মান সমালোচকেরা সমকালীন জার্মান এক্স্‌প্রেশনিস্ট শিল্পীদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-চিত্রের যে অংশ নিয়ে আলোচনা করেছি তা এই পর্যায়ভুক্ত নয়। সেগুলিকে য়ুরোপের নূতন আদর্শ অনুযায়ী অন্য কোনো নামে অভিহিত করা যেতে পারে। Non-objective, Constructivist ইত্যাদি কোনো-এক আদর্শের সঙ্গে যে রবীন্দ্রনাথের এইসব রচনাকে মিলিয়ে দেওয়া যায় না তা নয়, তবে তার কোনো প্রয়োজন

দেখি না। এক্‌স্‌প্রেশনিস্ট শিল্পীরূপে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ জনপ্রিয়তা। অদ্ভুত ভয়ংকর কিম্ভুত মূর্তিরচনায়, সংক্ষেপে অভিব্যক্তির উগ্র প্রকাশে, তাঁকে জার্মান এক্‌স্‌প্রেশনিস্ট শিল্পী নোল্ড (Nolde) প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; সেই তুলনা আংশিক ভাবেই সত্য। য়ুরোপের এক্‌স্‌প্রেশনিস্ট শিল্পীদের রচনায় যেসব রূপ তা মূলতঃ বাস্তবধর্মী— স্বাভাবিক (natural) রূপকে ভেঙেচুরে বাস্তবতার আবেদনকে অবাস্তব জগতের দিকে চালিত করার চেষ্টা পাওয়া যাবে এইসকল শিল্পীর রচনাতে। অপর দিকে রবীন্দ্রনাথের রচনাতে বাস্তব অপেক্ষা আকারের আবেদন প্রধান। এ যেন কোনো-একটা আকারকে তুবড়ে ভেঙে মানবীয় বা বাস্তবের সগোত্র করে তোলার চেষ্টা। য়ুরোপীয় শিল্পীদের ও রবীন্দ্রনাথের এক্‌স্‌প্রেশনিজ্‌মের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে মিল যতই মনে হোক-না কেন, একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য সর্বদাই লক্ষ্য করা যাবে।

উগ্রভাবের অভিব্যক্তি প্রবল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার বর্ণপ্রয়োগের আগ্রহ দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত অবচ্ছিন্ন আকার বা রূপগুলিতে যেমন অভিব্যক্তির প্রচণ্ডতা নেই, পরিবর্তে একটি মার্জিত সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ মনের পরিচয় পাই। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের বর্ণের রুচি উগ্র। এই উগ্রতার কারণ যে শিল্পীর অপটুতা তা সব সময় বলা চলে না, কারণ রবীন্দ্রনাথ চিত্রের অসম্পূর্ণতা বা অপটুতাকে প্রায় সকল সময় পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। স্বাভাবিকতার দিকে লক্ষ্য থাকার কারণেই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের রচনা বর্ণময় হয়ে উঠেছে। তাই রবীন্দ্র-চিত্রের বর্ণ প্রতিফলিত আলোর মতো। বর্ণের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবি যে বিশেষ উদ্দীপনা দর্শকের মনে জাগাতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু কেবল বর্ণসর্বস্ব ছবি রবীন্দ্র-রচনাতে অল্পই পাওয়া যায়। বর্ণের আবেদন যেমনই হোক-না কেন তাঁর চিত্রের ভাবভঙ্গি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বের অর্জিত আকার বা রূপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেসব আকার এক সময় রবীন্দ্ররচনাতে প্রকাশ পেয়েছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে সেইগুলি পরবর্তীকালে নূতন আয়তনে নানা ভাবভঙ্গি নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

প্রদর্শনীগৃহের দেয়ালে সাজানো উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত বৃহৎ আয়তনের ছবি রসিকের মনে যে তীব্র উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তারই ফলে রবীন্দ্রনাথের রঙিন ছবিগুলি আজ বিশেষ জনপ্রিয়। কিন্তু মনে রাখা ভালো যে এই উদ্দীপনা, এবং রবীন্দ্রনাথের চিত্রে অসাধারণত্ব ও মৌলিকতা দুটি স্বতন্ত্র দিক।

রবীন্দ্রনাথের রচনার আর-একটি দিকের কিছু উল্লেখের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের রচিত রূপের আকারপ্রকার এবং ভাবের ভীষণতা বা বিকৃতির কারণ অন্বেষণ করবার চেষ্টা অনেকেই করেছেন। কারণ অনুসন্ধানকালে রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যে একটি বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবচেতন মন, যৌন আবেগ ইত্যাদির উল্লেখ রবীন্দ্রশিল্পপ্রসঙ্গে কিছু হয়েছে এবং আরও অধিক পরিমাণে হওয়াও আশ্চর্য নয়। নানা কারণে এ আলোচনা অত্যন্ত জটিল। বিশেষভাবে মনোবিজ্ঞানের মীমাংসা আজও অসম্পূর্ণ। জনৈক মনোবিজ্ঞানীর মতে
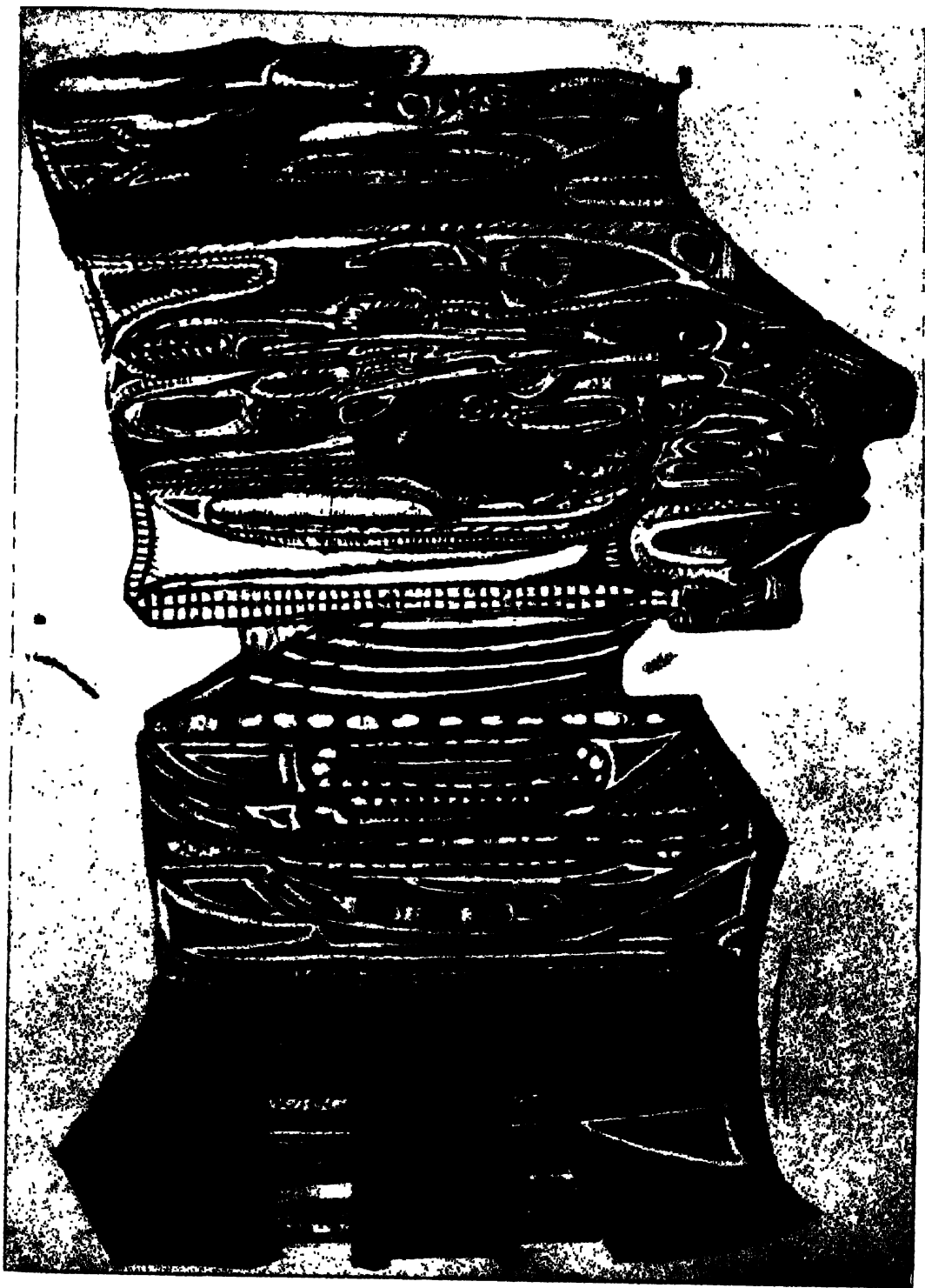
কবি-কর্তৃক বিচিত্রিত পূরবীর পাণ্ডুলিপি

কবি-কর্তৃক বিচিত্রিত পূরবীর পাণ্ডুলিপি

মানুষের শিল্পজগতের সবকিছু রূপ রং রেখা যৌন প্রতীকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শিল্প-আলোচনার আনুষঙ্গিক রূপে এই-জাতীয় তথ্যের মূল্য থাকতে পারে। কিন্তু শিল্পবিচারে এই তথ্য চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া চলে না ; বহু মনোবিজ্ঞানীও শিল্পসৃষ্টির মূল্য ও সার্থকতা যৌন প্রতীকের আবেদন দিয়ে বিচার করেন না। কতকগুলি আকার বা বিশেষ রকমের ভঙ্গি অনায়াসে আমাদের কলমের মুখে কি ভাবে দেখা দেয় সে কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। মনের কোনো গভীর স্থান থেকে এগুলির আবির্ভাব এ বিষয়ে সংশয় নেই। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এই ভাবের আকার-ভঙ্গি নানা ভাবে শিল্পের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। এগুলি যে প্রতীকধর্মী সে বিষয়েও সংশয় নেই। শিল্পের ইতিহাসে আমরা দেখি এইসব প্রতীকের তাৎপর্য পরিবর্তন বা বিবর্তন বারংবার ঘটেছে। রবীন্দ্রশিল্পেও একই আকারের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য বারংবার লক্ষ্য করা যাবে। আগুনের শিখার গুণ অবচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে ভয়ংকরও নয় স্নিগ্ধও নয় ; কিন্তু আগুনের শিখা অতি ভয়ংকর বা মনোরম ভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। ঠিক এই ভাবেই অবচ্ছিন্ন জগতের আকারপ্রকার বিচার করাই সংগত। মনোবিজ্ঞানীর মতামত পুরোপুরি মেনে চলতে হলে আমাদের স্বীকার করতে হয় দুনিয়ার সব কিছুই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যৌন প্রতীকের [illegible]। এ অবস্থায় শিল্পে বা সাহিত্যে যৌন প্রতীকের সাক্ষাৎ পাওয়া আশ্চর্যের নয়। শিল্পা[illegible] ক্ষেত্রে দেখবার বিষয় যে স্থূলভাবে বা বস্তুগত আবেদন যেমনই হোক শিল্পের জগতে তা নবজীবন লাভ করেছে কি না। রবীন্দ্র-চিত্র সম্বন্ধে এইভাবে আলোচনা আজও শুরু হয় নি।

ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক রবীন্দ্রনাথের চিত্ররচনায় ভারতীয় ভাবের কোনো প্রকাশ পেয়েছে কি ? য়ুরোপের সমালোচকরা এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কোনো পরম্পরাকে অনুসরণ করেন নি, এই বিশেষত্বকে সকলেই মেনে নিয়েছেন, কাজেই কোনো শিল্পের কোনো পরম্পরা তাঁর রচনাতে পাবার সম্ভাবনা নেই বলেই ধরে নিতে হবে। তাঁর রচনা ব্যক্তিত্বের দ্বারা চালিত এবং সেই দিক দিয়ে তিনি একক। বন্ধনমুক্ত অবস্থা থেকে তার চিত্ররচনা শুরু ; দীর্ঘকালের রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি একটি পরম্পরা তৈরি করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দিকের প্রাচীন ও নবীন সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে আকার পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশরূপে তাঁর চিত্রের প্রধান মূল্য। রবীন্দ্রনাথের রচনা পরম্পরা থেকে মুক্ত এ কথা যেমন সত্য, তা যে নিজের সৃষ্ট পরম্পরার দ্বারা আবদ্ধ এ কথাও তেমনই সত্য।

রবীন্দ্রশিল্পের আলোচনার শেষে আর-একটি প্রশ্নের মীমাংসা হলে ভালো হ'ত। আধুনিক ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্থান আজ স্বীকৃত। তাঁর ছবিতে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত অনেকেই অনুভব করেন। তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মতামত অনেক সময়েই নিরাপদ নয়। বিশেষভাবে শিল্পের জগতে যখন ভাঙাগড়া চলেছে বিপুল বেগে, সে সময় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার চেষ্টা আরো বিপজ্জনক। চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন একস্‌প্রেশনিজ্‌মের যুগে।

তার পর য়ুরোপে তাঁর সম্বন্ধে কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নি ; এ দেশের রবীন্দ্র-চিত্র-সমালোচকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে য়ুরোপের মতামতকে অনুসরণ করেছেন।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে চিত্ররচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এক নূতন আয়তন (dimension) পেয়েছে। একমাত্র কবি উইলিয়াম ব্লেক ছাড়া অন্য কোনো পাশ্চাত্য সাহিত্যিক নিজের সাহিত্যপ্রতিভাকে চিত্রশিল্পের মধ্য দিয়ে এমন সার্থক ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হন নি। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সে বিষয়ে ভালো ভাবে আলোচনা আজও হয় নি। এই-জাতীয় আলোচনার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সাহিত্য ও শিল্পের সম্বন্ধ যতই স্পষ্ট হয়ে উঠবে ততই তাঁর চিত্রের মূল্য বাড়বে।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার মৌলিকতা সম্বন্ধেই আমি এ পর্যন্ত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। যদি সে আলোচনা স্পষ্ট হয়ে থাকে তা হলে রসিকজন সহজেই বুঝবেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের রচনা এবং তারই অনুরূপ রচনা যা তাঁর শিল্পবিবর্তনের নানা স্তরে ছড়িয়ে আছে সেগুলি শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় দান। এইসব রচনার আবেদন যে রসিকসমাজে বিশেষ ভাবে শিল্পীর কাছে নূতন প্রেরণার সন্ধান দেবে এ বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। রেখা, আকার, রূপ— এই তিনের স্বাধীন সত্তা রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে ভা[illegible] পাওয়া যায় তার তুলনা আধুনিক য়ুরোপীয় শিল্পের ক্ষেত্রেও বিরল।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প

শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগী

সর্ববন্ধনবিমুক্ত একটি ভাস্বর আদর্শায়িত প্রাণশক্তির বন্দনা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কাব্যে নিবিড়ভাবে দেখা দিয়েছিল। প্রচলিত কোনো ধ্যানধারণায় তিনি অবরুদ্ধ হন নি, এ কথা সত্য। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, অপরিণত শৈশবকৈশোরে শিল্পী হিসাবে প্রারব্ধ যে পরিসীমা তিনি পেয়েছিলেন তাকে তিনি মুহূর্তের জন্যও কখনো অগ্রাহ্য করেন নি, উপেক্ষা করেন নি। যা-কিছু পূর্ব থেকে সীমাবদ্ধ এবং আঞ্চলিক ছিল, কবির একাগ্র এবং গতিরূপময় সৃজনকর্মে তা উত্তরোত্তর সমকালীন এবং সর্বজাগতিক প্রকাশব্যাপারে রূপান্তরিত হয়েছিল। মূলতঃ সাহিত্যসাধক এই প্রতিভাবান মানুষটির বিচিত্র অজস্র প্রকৃতিদত্ত গুণগুলি সহজেই স্বজাতি এবং সারা বিশ্বের সাংস্কৃতিক জীবনধারাকে স্বীকরণ করে নিয়েছিল। মানবীয় অনুভূতি, চিন্তা বা কর্মের যে-কোনো ভূভাগই তিনি স্পর্শ করুন-না কেন, তাঁর প্রাচুর্যপ্রসূ সৃষ্টির ভাব এবং রূপ দুয়েরই ক্রমবিকাশের মধ্যে বেশ একটি সংগতি পাওয়া যায়। এ অনুমান বুঝি অসংগত নয় যে সুসমঞ্জস একটি কবিপ্রকৃতিরই নন্দনদৃষ্টি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিটি বিন্যাসের মধ্যেই রূপ নিয়েছে। তাঁর অধ্যাত্ম মূল্যবোধ, বিশ্ববীক্ষা, জাতীয় শিক্ষানুশীলন, ঘনীভূত একটি গীতিকবিতা, কাব্যমূল্যে উজ্জ্বল একটি গান, এমন-কি তাঁর সাজ-পোশাক কিংবা কথা বলার ধরণটির মধ্যেও ঐ শান্ত সমাহিত মহীয়ান নন্দনচেতনার দীপ্তিটি সমানভাবে বিতরিত হয়ে গিয়েছিল।

ইউরোপে প্রথম ১৯৩০ সালে এবং ভারতবর্ষে ১৯৩১ সালে যখন কবির অঙ্কিত রেখালেখ্য এবং চিত্রগুলি প্রদর্শিত হয়, বলা বাহুল্য দর্শকদের মনে তা একটি অস্বস্তিকর বিস্ময় এনে দিয়েছিল। অনতিপরিচিত medium বা উপায় সংযোগে সাধিত এই চিত্রকর্মে দেখা গেল অদ্ভুত, অসংলগ্ন রেখাছন্দ এবং বলিষ্ঠ, স্বস্তিহর, কিম্ভূতকিমাকার চিত্রকল্প। এই ঘটনাটি এত আকস্মিক, আপাত-দৃষ্টিতে অগ্ন্যুৎপাতের মতো বৈপ্লবিক যে তা কবির জীবনের বিগত সার্ধশতাব্দীকালের সৃষ্টিকর্মে নিরন্তর প্রযত্নলালিত, মহিমান্বিত এবং প্রজ্ঞা-পরিমিত যাবতীয় মূল্যবোধ থেকে আমূল স্বতন্ত্র।

এর অনেক আগে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিত্রবিদ্যার সিদ্ধিদায়িনী দেবীর প্রসন্নতালাভে তাঁর অক্ষমতার কথা কবি সখেদে জ্ঞাপন করেছিলেন। সেই পর্বের যে সব বিক্ষিপ্ত স্কেচ এবং ছবি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অদীক্ষিত হাতের ছাপ আছে। যদি সেই পথেই তিনি অগ্রসর হতেন তবে তাঁকে হয়তো প্রচলিত ভিক্টোরীয়-ঔপনিবেশিক পটভূমিতেই অঙ্কন অভ্যাসে রত থাকতে হত, এবং ভারত-পারসিক সংস্কৃতিধারা, পশ্চিমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং এশিয়ায় জাতীয়তাবাদের জাগরণের প্রথম অধ্যায়ের অভিজ্ঞতায়। কিন্তু, চিত্রাঙ্কন-প্রশিক্ষার জন্য যে

শ্রমচর্যার প্রয়োজন, তার মধ্য দিয়ে যাবার সময় তিনি পান নি— আধুনিক বাংলা ভাষার ভিত্তিরচনায়, এক শিল্পরূপ থেকে অপর শিল্পরূপে উপনীত হবার সুতীব্র আগ্রহে তাঁকে নিজের বিশেষ সাহিত্যাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিরন্তর ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পুনরুজ্জীবনের একজন পৃষ্ঠপোষক এবং এশিয়াব্যাপী সাংস্কৃতিক সংহতির ভাষ্যকার হওয়া সত্ত্বেও এই ধরণের শ্রেণীবিভাগের আপেক্ষিক সীমা সম্বন্ধে তিনি গোড়া থেকেই অবহিত ছিলেন, এ কথা স্বীকার করতে হবে— মানুষকে তিনি এক ও অবিভাজ্য ব'লে জানতেন, কেননা, বিশ্বসংস্কৃতিই ছিল তাঁর অনিবারণীয় উত্তরাধিকার।

তবুও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং গতিপ্রকৃতির মধ্যস্থতায় তাঁকে একটি দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে হল : অপীড়িত, নিরাপদ, পূর্বধার্য প্রথানুগ স্থাবর ধারণার জগতের সঙ্গে পরীক্ষামূলক অনিশ্চিত ভাগ্য অনুসন্ধান, জীবনের নতুন-নতুন বোধপুঞ্জের সম্বন্ধে শিল্পীর উদ্বেগ, প্রত্যেক সনাতন মূল্যবোধ সম্বন্ধে সংশয় এবং বিংশ শতাব্দীর অমীমাংসিত প্রশ্নসমূহের দ্বন্দ্ব। দ্বিধা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের শেষে তিনি বর্তমান শতাব্দীর মনোভূমিতেই প্রত্যাবৃত্ত হলেন।

১৯২৪ থেকে তাঁর জীবনের এই ক্রান্তিকালের অভিজ্ঞতা সাবলীলভাবে প্রকাশ পেল পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় তাঁর মননসমাচ্ছন্ন, অশ্রান্ত রেখাবিন্যাসের মধ্যে। কখনো-বা এই সব রেখাবিন্যাসে মূল খসড়াটা একেবারেই মুছে যেত। জটিল আঁকাবাঁকা গতির লীলা সমাহৃত, ঋজুরৈখিক, অন্তর্মুখীন কোণগুলি তাদের মুছে-ফেলার প্রাথমিক কর্তব্যটি অত্যন্ত সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করেও অন্যনিরপেক্ষ ছন্দোময় আকৃতি-মূর্তনের দিকেও আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ বিদেশভ্রমণের সঙ্গে একটি বিরতি এল যার ফলে খসড়া-উৎসাদনের এই আগ্রহ সম্পূর্ণ ই পরিত্যক্ত হল। আত্মসংবৃত, ব্যঞ্জনাহীন আকৃতিগুলি শূন্য বহিঃপৃষ্ঠের উপরে জঙ্গম একটি স্পন্দমানতায় বিধৃত হতে লাগল। তীক্ষ্ণাগ্র সমাবৃত্তগুলি (convolutes) সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম নামাক্ষরচিত্রে বিবর্তিত হয়ে ক্রমশই অনির্ণেয়, রসায়নজটিল অথচ বিনিঃশেষ শুদ্ধ রূপরেখাগুলির আবাহনে উন্মুখ হয়ে উঠল। খেয়ালপর একরকম কৌণিক জ্যামিতিক অলংকরণ এই সময়েই দেখা দিল। উদ্‌ভাবনক্ষম আকৃতির প্রতিশ্রুত পরমতা এবং বিশদ নমনীয়তার ছন্দে উপস্থাপিত নঙর্থক পরিসরের বদলে ব্যক্তিগত কল্পক্রীড়ার উত্তুঙ্গ নিরীক্ষাপ্রিয়তার খেয়াল তীব্রভাবে চোখে পড়ল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের এই সব আদি একবর্ণাত্মক চিত্রগুলি প্রায়শই ফাউন্টেন পেনে অঙ্কিত হত। দুই বর্ণ বা তিন বর্ণের চিত্রগুলি আমরা এর পরেই দেখতে পেলাম। এই সময় একপেশে ভঙ্গিতে প্রায়শই pen-point-এর ব্যবহার ঘটেছে, আঙুল আর বস্ত্রখণ্ড কালি ছড়াবার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। একেবারে সবশেষে এল তুলি। বর্ণের প্রচ্ছায়া ও স্বল্পত্ব আকৃতির মধ্যে একটি তীক্ষ্ণ বিশেষত্ব নিয়ে এল। কিন্তু মৌল, শুদ্ধ, তরল ক্যালিগ্রাফির আবেদনই সব ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠল।

যদি মণ্ডনসর্বস্ব ভিক্টোরীয় প্রতিলিপির সঙ্গে আপতিক এবং সুদূর সাদৃশ্যের কথা ওঠেও বা,

ছায়াছবি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Art Noveau নব্যশিল্প আন্দোলনের আদর্শের সঙ্গে আলোচ্য চিত্রকলার মিলের কথাটা নিতান্তই ভাসা-ভাসা, অর্থহীন। সজোর, সাবলীল, নৈসর্গিক ছন্দের স্পন্দিত এই সব চিত্রে যে চৈতন্যময় প্রাণশক্তির সাক্ষাৎ লাভ করি, Art Noveau-র অলংকরণধর্মিতাকে তা অনেক পিছনে রেখে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ প্রদত্ত প্রস্তুতিভূমিতে নির্মাণ করেছেন। তাঁর শতকসন্ধিক্ষণের ইউরোপ, ভারতের দেশাত্মবোধক চিত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গ ও মনোভঙ্গিতে তাঁর সহায়তামূলক উপস্থিতি, আধুনিক শিল্পে শিল্পীর নমনীয় স্বাধীনতাব্যাপারে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি— এই সবই তাঁকে চিত্রশিল্পের মধ্য দিয়ে নির্বাধ আত্মপ্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রথানুগ প্রকরণ ও পাঠ্যনির্দেশিত বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী অনুশীলনের স্থলে রবীন্দ্রনাথ আনলেন ছন্দের বোধ, সূক্ষ্মাগ্র সুমিতি-চেতনা, নির্ভুল দৃশ্যান্বয়, নির্ভার নিয়মনিষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি।

যদিও তাঁর এই সময়ের সাহিত্যকর্মে এই নূতন এষণার হুবহু কোনো প্রতিতুলনা মিলবে না, তবু তদানীন্তন নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় একটি ঝোঁক-বদল সহজেই লক্ষ্য করা যায়। প্রথানুগত, নীতিনির্ভর নন্দনতত্ত্ব থেকে সরে এসে ঐতিহ্যের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে এই নূতন পথটি অগ্রসর হতে থাকল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিকে, ব্যক্তিবিশ্বের দিকে। ১৯৩০ নাগাদ এই পরিবর্তিত প্রবণতাটিকে সম্পূর্ণভাবে দেখা গেল— আগে যা ছিল সত্যের সঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে যুক্ত সুন্দরের ধারণা তা এখন ছন্দোময় বাস্তবতাকেই স্বীকৃতি জানাল।

তারুণ্যময় অভিজ্ঞতা ও পৌনঃপুনিক ছন্দোময়তার অভিঘাতে স্পন্দযুক্ত প্রথম পর্যায়ের অঙ্কনগুলির সার্থকতা নিশ্চয় কবির সংকল্পকে সুদৃঢ় করে থাকবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল সত্তা কখনো তাঁর স্বরচিত থিয়োরির জালে বাঁধা হয়ে পড়ে নি। কিন্তু সুস্পষ্ট ছন্দোময়তা তাঁর কাছে চূড়ান্ত ও পরম একটি মূল্যবোধরূপে নির্ধারিত হয়ে যাবার আগে, ১৯২৯-এর কোনো এক সময়ে দেখা গেল জমিনের উপর সলীল রেখা ও রূপময়তাকে হঠাৎ এসে আচ্ছন্ন করে দিল এই সাড়ম্বর বর্ণৈশ্বর্য। আকারের সঙ্গে সংযুক্ত হল ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনা। স্মৃতির প্রাধান্য সূচিত হবার নিশ্চিত পূর্বাভাস দেখা দিল।

ছন্দোময় প্রাণবেগ ক্রমশই স্মৃতিলব্ধ চিত্রকল্পের সঙ্গে মিলতে লাগল প্রচুর ক্ষিপ্র আগ্রহে। যাকে ঠিক সুন্দর বলি, তা নয়— একরকম অদ্ভুত কল্পনার একান্ত ব্যক্তিগত জগৎ আমাদের সামনে ক্রমেই সত্তা ও রূপ নিয়ে উদ্ঘাটিত হতে লাগল।

আদি-এক্সপ্রেশনিস্টদের মধ্যে যে উচ্চারিতরূপ ফর্মের আবেগসাপেক্ষ পুনর্বিন্যাস দেখতে পাই, এই পর্যায়ের চিত্রে তা প্রকট। বহিঃপৃষ্ঠের টানটান ভাবটি যেন অস্পষ্ট গহনে ফিরে গেল। এর মধ্য থেকে জন্ম নিল আশ্চর্য বুনুনিসম্পন্ন, নাটকীয়তায় সন্দীপ্ত, দ্রুতপরিবর্তমান রূপের অভিযাত্রা। সর্বব্যাপী, অন্তর্দীপ্ত বর্ণগ্রামের মধ্যে রঙের ভাবহীন, বিশ্লিষ্ট প্রয়োগ লুপ্তপ্রচল হয়ে এল।

শুধু কোনো কোনো বিরল মুহূর্তে, যখন দৃশ্য-মূর্তনের আবেগ স্তিমিত হয়েছে, স্বাভাবিক

একটি অ-শিক্ষিত কারুকৃতি এবং অ-শিল্পীসুলভ মৌলিক চিত্রকর্ম উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বরং কতকটা পরা-বাস্তবপন্থী বা সুর্‌-রিয়ালিস্ট চিত্রকরদের স্থিরীকরণের (fixation) মতোই আয়ত্ত চিত্রকল্পের আচ্ছন্নকর তীক্ষ্ণতা দেখা দিল যা অতিরিক্ত শিল্পীসুলভ বর্ণসৌকুমার্য বা সুদৃশ্য বর্ণবিন্যাসের থেকে অনেক বেশি অর্থময়।

পাণ্ডুলিপির সহজব্যবহার্য আকৃতি থেকে আরম্ভ ক'রে, তার আঁকা নকশা ও চিত্রগুলি অচিরেই পর্যাপ্ত একটি সামঞ্জস্যগুণ অর্জন করল এবং সঙ্গে-সঙ্গে লিখিত পৃষ্ঠার লম্বভাবাপন্ন বৈশিষ্ট্যও বজায় রইল। কাগজ সেই নির্ভরভূমি সেই বহিঃপৃষ্ঠই রইল যার উপর উপচে-পড়া সত্বর-শোষিত স্বচ্ছ রঙিন কালি এবং অস্বচ্ছ জলরঙের ইমেজগুলি এঁটে বসতে পারে, সরে যাবার সময় পায় না।

মগ্নচেতন, অনির্ণেয় অস্তিত্বের সংকেতবহ হওয়া সত্ত্বেও অভিক্ষেপকালে এই ইমেজগুলি স্বয়ং-দীপ্ত দেখাত। স্বপ্নচারীর আশঙ্কাশূন্যতা, যুগপৎ কলম ও তুলির প্রবল, প্রচুর আক্রমণে মূল সেই ইমেজটি অক্ষুণ্ণই থাকত— আর সেই উদ্দেশ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই থাকত অক্ষত সরু কাগজের বহিঃপ্রান্তরেখার বেড়া।

১৯৩২ থেকে দেখা গেল, অমসৃণ বুনট রচনা। আর খর আলো রচনার উদ্দেশ্যে অস্বচ্ছ রঙের ব্যবহার ঘটছে। পেনসিল, কালি, উদ্ভিজ্জ রঙ, এবং বিভিন্ন রকম বার্নিশ হাতের কাছে পাওয়া যে-কোনো কাগজে খেলাচ্ছলে প্রযুক্ত হত, উপকরণের স্থায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। কয়েকটি এচিং বা ড্রাইপয়েণ্টে কলমে-আঁকা নকশার মতো কেটে-বসে-যাওয়ার ভাবটি দেখা গেল। এদিকে একটিমাত্র উদাহরণে ক্যানভাসে তেলরঙের প্রয়োগের প্রয়াস অর্ধপথেই পরিত্যক্ত হল সম্ভবতঃ এই কারণে যে তেলরঙের কাজ শুকোতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। কবিতারচনায় কারুকর্মের জন্য কবির শ্রমস্বীকারের যে দৃষ্টান্ত পাই, কারুসাধনের সেই সাক্ষ্য তাঁর চিত্রশিল্পে অনুপস্থিত। প্রধানত ১৯২৮ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যেই আঁকা তাঁর দু-হাজারেরও বেশি চিত্রকর্মও কবি-অভিক্ষিপ্ত অপ্রতিহত বিচিত্রিত ইমেজপ্রবাহের পর্যাপ্ত আশ্রয় নয়। পাখি-ফুলের যুগ্ম নকশা, নামহীন আদিম পশু, দুর্বোধ বিদ্রূপমূর্তি, বহুবক্র আদ্যযুগীয় সরীসৃপ, বিকট আকারের পাত্র, অবান্তর আসবাবপত্রে উৎকটরূপে ঐন্দ্রিয়িক নগ্নমূর্তি, রহস্যময় অতিনাট্যের অবিশ্বাস্য সূত্রধার, অনির্দেশ্য অনন্তের অভিমুখে প্রতিহত কৌণিক তীর্থযাত্রী, রোমান্টিক স্বপ্নভবন, হারানো কাহিনীর চিত্রকথা, প্রেমিক ছায়াচ্ছন্ন, আভাময় সান্ধ্য নিসর্গদৃশ্য, হত্যাকর্ম, শান্তিময় পদচারণবীথি, পরিচিত চরিত্র ও প্রতিকৃতি, তিক্ত ও ভয়াবহ মুখচ্ছদ, শক্তিশালীর মুখাবয়ব, পেলব, ডিম্বাকার, চন্দ্রোপম মুখাবয়বে নীরব ওষ্ঠ— এই সব চিত্রকল্প। সতেজ, প্রচুর, ইন্দ্রধনুসঞ্চারী।

প্রাক্‌-নির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ লুপ্ত হল, অন্তর্জগতে আত্মজননশীল সত্তায় আকীর্ণ হয়ে উঠতে লাগল, স্বপ্ন ও জাগরণের সন্ধিক্ষণে।

এটাই অবশ্য পরিণতির শেষ স্তর নয়। এমন কি প্রত্যেকটি পৌনঃপুনিক বিষয়বস্তুও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে এবং প্রতিটি ইমেজকে একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব দান করেছে। এই বিকাশধারা, বলা বাহুল্য, অবচ্ছিন্নতা (abstraction) থেকে সর্বৈব মুক্ত।

সামগ্রিক কম্পোজিশনের চেয়ে বিষয়গুরুত্বের দাবি বেড়ে চলল। মানবমুখ একটি অন্যতম সমস্যা হয়ে উঠেছিল এবং মুখের আংশিক অঙ্কন একটা মুদ্রাদোষে পরিণত হল। একটি উজ্জ্বল কমলাদ্যুতি, প্রভাময় নীল, অথবা একরকম দ্রাবক সবুজ প্রাধান্য পেল, যদিও অলব্ধপূর্ব রঙের মিশ্রণকে এখানেও কোনো সচেতন ভাবনা-চিন্তার ফল বলে মনে করবার কারণ নেই।

আশ্চর্য সান্ধ্য নিসর্গদৃশ্য ফিরে ফিরে আসতে লাগল। বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে মস্তকের স্টাডিগুলিতে মানবস্বভাবের শিলীভূত স্তরপরম্পরা। নারীর বিষণ্ন, ডিম্বাকার মুখাবয়বে স্থাপিত আত্মলীন চক্ষুর্দ্বয়ের চিত্র আঁকা কবিকে এই সময় সর্বাপেক্ষা পেয়ে বসেছে। ১৯৩০ সালে প্রদর্শিত একটি চিত্রে প্রথম এই প্রবণতার উদাহরণ দেখা যায় এবং তারপর থেকে অসংখ্য চিত্রে একই মুডের অনিঃশেষ চিত্রকল্প। প্রথম দিকে এই এষণার চিত্রগুলি সূক্ষ্মভাবে রচিত, ভিতর থেকে ঠিকরে-পড়া নম্র দ্যুতিতে ব্যঞ্জনাময়। পরবর্তীকালের দৃষ্টান্তগুলিতে দেখতে পাই নাটকীয়তায় উদ্বেল তীক্ষ্ণালোকিত ললাটভাগ, অতিশয়োক্ত নাকের খাঁজ, কড়া রঙে অঙ্কিত এবং মৌল কোন্ তমিস্রা থেকে ছেনে তোলা, ছেঁকে তোলা। এমন কি শেষের দিকের সত্তাময়তায় রেখায়িত প্রকৃতিগুলিতেও সংহত প্রাণবেগ এবং তীব্র রঙের ঘোষণা লক্ষণীয়। পক্ষান্তরে, পরবর্তীকালীন নিসর্গদৃশ্যগুলিতে দেখা গেল আর্দ্র আবহের বিকীর্ণ পেলব একপ্রকার বিভা। স্নায়ব বোধবৃত্তিতে বেপথুমান তাঁর শেষের দিকের চিত্রগুলি।

অমিতব্যয়ী সৃষ্টির উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮-৩০— এই সংক্ষিপ্ত অথচ অমোঘ অধ্যায়ে একটি নতুন জগৎ আবিষ্কার করলেন— 'ভাবাকুলতা নয়, চিন্তা নয়, মুখর বক্তব্য নয়— আলোর মধ্য থেকে গড়ে তোলা বিশুদ্ধ রূপের জগৎ'। কিন্তু উত্তরকালে, কয়েকটিমাত্র ব্যতিক্রম ছেড়ে দিলে, দেখা যায় অ-বাঙ্ময় আকৃতিগুলিকে ছাপিয়ে উঠেছে স্থান ও পাত্রের আবেগ-জাগানো প্রতিমূর্তন। সাহিত্যিক উপাদানে পূর্ণ এই শিল্পৈষণা যে সব সময়ে দৃষ্টান্তপ্রসূ হয়েছে, সে কথা বলা চলে না। বিশুদ্ধ অন্যনিরপেক্ষ রূপের জগৎকে নিরন্তর মৌখিক স্বীকৃতি জানানো সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সাহিত্যই জয়ী হল। এই পরিণতিতে অবশ্য শৈল্পিক ফলশ্রুতির ব্যত্যয় ঘটে নি। চিত্রশিল্পের বহিরিন্দ্রিয়-জাগর আবিষ্ক্রিয়ার রহস্য তাঁকে গভীর ভাবেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, এ কথা সত্য। কিন্তু বয়োভারান্বিত কবির দ্রুতধাবমান অঙ্কনের অভিজ্ঞতা তাঁর রচনার সর্বান্ত্য পর্যায়ের সাহিত্যের কাজে এল, বিগত শতকের সাহিত্যকে অভিজাত, বহিরঙ্গ প্রথানুগত বিবেক ও গোপনতা থেকে মুক্ত ক'রে দিতে সহায়তা করল। রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণভাবে তাঁর শতাব্দীর আধুনিক পৃথিবীর অধিবাসী হয়ে উঠলেন।

কবির আঁকা চিত্রগুলিতে জটিল ব্যক্তিস্বভাবের অন্তর্মুখী যাত্রার অত্যাশ্চর্য একটি অগ্রস্মৃতির

মানচিত্র, অস্তিত্বের নিবিড় স্বীকৃতি ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা ও ভাবানুষঙ্গের নাটকোচিত চরিত্রায়ণ ও চিত্রণ, আত্মপ্রসঙ্গে জঙ্গম ছন্দঃস্পন্দ ও চিত্রকল্পে ব্যক্তিস্বাশ্রয়ী আবেগের একটি সমগ্র পৃথিবী উন্মোচিত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় ঐতিহ্য

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

ঐতিহ্যের সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ সৃষ্টিগর্ভ মনন ও কর্মের অন্যতম প্রধান লক্ষণ ও উপাদান। প্রত্যেক কালের কিছু কিছু বিশেষ প্রশ্ন, বিশেষ সমস্যা বিশেষ দৃষ্টি বিশেষ চিন্তা থাকে; দেশকালধৃত মানুষ তাদের নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি দৃষ্টি ও সংস্কার অনুযায়ী সেই সব প্রশ্ন ও সমস্যার উত্তর অন্বেষণ করে, তাদের বিশেষ দৃষ্টি ও চিন্তার সহায়তায়। এই অন্বেষণক্রিয়া বড় জটিল, বড় গভীর শ্রম ও বুদ্ধি -সাধ্য। তবু কিছু কিছু মানুষ প্রাণশক্তির দুর্বার তাড়নায়, সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণায় এই কাজে প্রবৃত্ত হয়। সাম্প্রতিক কালের প্রশ্ন ও সমস্যাগুলিকে তাদের ব্যাপকতায় ও গভীরতায় ভালো করে জানা ও বোঝা যেমন এই ক্রিয়ার অন্তর্গত, নিজের দেশের অতীত চিন্তা, কর্ম ও ধ্যানধারণার ধারাগুলিকেও তাদের সমগ্রতায় জানা ও বোঝা তেমনই এই ক্রিয়ার অন্যতম অন্বিষ্ট। এই দ্বিমুখী ক্রিয়ার ফলেই কোনো বিশেষ কালের মনন ও কর্মের আদর্শ ও ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে। যিনি যে পরিমাণে এই দ্বিমুখী ক্রিয়ার সমন্বয় ঘটাতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে তাঁর দেশ ও কালের একটি সমন্বিত ও স্বাঙ্গীকৃত জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে সমর্থ হন, এবং তদনুযায়ী তাঁর দেশ ও কালের আদর্শগত নেতৃত্ব লাভ করেন। জাতির জীবনে এমন এক-একটা সময় আসে যখন সাম্প্রতিক আদর্শ-সংকটের ভিতর থেকে জাতির মন নূতন পথের নিশানা খোঁজে, এমন পথ যা দেশের মানুষকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, পথ চলবার প্রেরণা জোগাবে। জাতীয় জীবনের তেমন তেমন সময়ে পূর্বোক্ত সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়।

ইতিহাসের এই প্রক্রিয়ার অন্যতম বিশেষ উদাহরণ বাংলাদেশের উনিশ শতকের, ও বিশ শতকের প্রথম পাদের সংস্কৃতি-সংকটের এবং সে সংকট-মোচনের ইতিহাস। কিঞ্চিদধিক এই এক শ বছরের ভিতর বাংলাদেশের অনেক কর্ম ও চিন্তা -নায়ক সচেতনভাবে চেষ্টা করেছিলেন একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক আদর্শ গড়ে তুলতে। রাজা রামমোহন রায় থেকে এই প্রক্রিয়ার শুরু, এবং নানা সংঘাত বিভ্রম বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথে এসে এই প্রক্রিয়ার পরিণতি। যে চেষ্টা রামমোহন শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ যেন তাকে পরিণত সার্থকতায় পৌঁছে দিয়ে গেছেন। সার্থকতা বলছি এই জন্য যে, তিনি এমন একটি সামগ্রিক সাংস্কৃতিক আদর্শ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন যার ভিতর নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি ও বিস্তারের সম্ভাবনা আজও নিহিত, যা আজও আমাদের চিত্তে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করে।

স্বদেশ ও স্বাজাত্য -বোধের দৃষ্টি দ্বিমুখী। একটি মুখ বার বার দেশ ও জাতির পশ্চাৎ-

ইতিহাসের দিকে ফিরে ফিরে তাকায় এবং প্রবল উৎসাহে সেই ইতিহাসের ভিতর থেকে জাতির নর্ম কর্ম ও জীবনের আদর্শ অনুসন্ধান করে, সেই আদর্শ থেকে বুদ্ধি ও প্রেরণা সংগ্রহ করে, তদনুযায়ী জাতির ভবিষ্যৎ ও পথের লক্ষ্য সম্বন্ধে একটি সুগভীর বিশ্বাস গড়ে তোলে। যেহেতু এই দৃষ্টি পশ্চাৎ-মুখী সেই হেতু এই ক্রিয়া কতকটা রক্ষণশীল, কতকটা প্রথাগত হতে বাধ্য। আর-একটি দৃষ্টি অগ্রমুখী; সে মুখ একই সঙ্গে নিজের দেশ ও বাইরের বৃহৎ পৃথিবীর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে, অন্য দেশ ও অন্য সংস্কৃতির ইতিহাসের ভিতর থেকে মানবসভ্যতার অগ্রগতির পাঠ গ্রহণ করে, তার ইঙ্গিত ও নির্দেশ আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করে। এই দৃষ্টির ক্রিয়া স্বভাবতই গতিশীল, প্রথাবিরোধী এবং সেই হেতু কতকটা বৈপ্লবিক। এই দুই দৃষ্টির কোনোটিই স্বসম্পূর্ণ নয়, এবং কোনো-একটি থেকে সুস্থ বলিষ্ঠ সৃষ্টিগর্ভ স্বাজাত্যবোধ জন্মলাভ করতে পারে না। বস্তুত স্বাজাত্যবোধ হোক, নূতন কোনো সাংস্কৃতিক জীবনাদর্শ হোক, তার জন্ম, বিকাশ ও বৃদ্ধি উপরোক্ত দ্বিমুখী ও আপাতবিপরীত দৃষ্টির যুগ্ম প্রক্রিয়ার এবং দুই প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপর নির্ভর করে। বিশেষ দেশে ও কালে জাতির জীবনাদর্শ যাঁরা গড়ে তোলেন তাঁরা এমন বিষয় এমন কর্মপন্থা এমন আঙ্গিক ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন যা অতীত ও বর্তমান, ঘর ও বাহিরকে এক সমন্বয়সূত্রে গাঁথে, যার ভিতর একটি স্বাঙ্গীকৃত সমগ্রতা সহজেই ধরা পড়ে। উনিশ ও বিশ শতকে বাংলাদেশে রামমোহন ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকে, ভারতবর্ষে দয়ানন্দ সরস্বতী গোখেল তিলক গান্ধী এবং আরো অনেকে ইতিহাসের এই প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। আমাদের সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক জীবনাদর্শের বিচিত্র ধারা-উপধারা প্রধানতঃ এঁদেরই বিচিত্র মননকর্ম ও কল্পনার সৃষ্টি; এঁরাই বিভিন্ন পথের রেখা এঁকে দিয়ে গেছেন।

একটু গভীর অভিনিবেশে এই সব ধারা-উপধারা, রাজপথ-গলিপথের রেখাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী, এক পথ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বা আর-এক পথের সমান্তরালে চলেছে অথবা আর-এক পথকে কেটে চলে গেছে তির্যক গতিতে। এর তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে, কারণও আছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, একটু দূরে দাঁড়িয়ে গভীরতর দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, সমস্ত বিতর্ক বিরোধ ও বৈপরীত্য সত্ত্বেও এই সব বিচিত্র প্রচেষ্টার সামগ্রিক পরিবেশ জাতির প্রাণে এমন একটি দুর্বার বেগের আবেগ সৃষ্টি করেছিল যার ফলে দেশের মানুষ শুধু পথ খুঁজে পেয়েছিল তাই নয়, সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলবার একটা প্রেরণাও পেয়েছিল। এই আবেগ ও প্রেরণাই জাতীয় জাগরণের মূলে।

ইতিহাসের যে-প্রক্রিয়ার কথা একটু আগে বলেছি তার অন্তর্নিহিত যুক্তির বশেই উপরোক্ত প্রত্যেকটি চিন্তা ও কর্ম -নায়ককেই দেশের অতীত ইতিহাসে অল্পবিস্তর অবগাহন করতে হয়েছিল, এবং তার ফলে নিজ নিজ পরিবেশ, শিক্ষাদীক্ষা, রুচি ও দৃষ্টি অনুযায়ী ফলশ্রুতি লাভও ঘটেছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই সজ্ঞান সচেতনতায় উপলব্ধি করেছিলেন, দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজের চিন্তা ও

কর্মের সৃষ্টিগর্ভ সমন্বয় ঘটাতে না পারলে ঐতিহ্যের স্বাঙ্গীকরণ করতে না পারলে দেশের ও কালের মুখপাত্র হওয়া যায় না, জাতির ভবিষ্যৎ পথরেখার নির্দেশ দেওয়া যায় না।

দ্বারকানাথ-দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ কৈশোরেই এই জ্ঞানের আভাস লাভ করেছিলেন। তাঁর সমগ্র উত্তরজীবন ইতিহাসের উপরোক্ত প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

২

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-অবগাহন ও ভারত-ঐতিহ্যসন্ধানের গতিপ্রকৃতির একটু পরিচয় লওয়া এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। সন-তারিখের সূত্র ধরে, সমসাময়িক কালের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্ররচনার ক্রম অনুসরণ করে এ কাজ করা যেতে পারে। অন্যত্র সে চেষ্টা আমি করেছি। এ নিবন্ধে একটু সমগ্র দৃষ্টিতে আমি শুধু রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য-ফলশ্রুতির প্রকৃতিটুকু ধরতে চেষ্টা করব।

যৌবনোন্মেষে রবীন্দ্রনাথ যেসব বাঙালী মনীষী ঐতিহাসিক-প্রত্নতাত্ত্বিকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁদের অন্যতম। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে সে কথার উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা তার আগে থেকেই শুরু হয়েছিল এবং যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই দেশ-বিদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা পাঠ ও রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এ তথ্য হয়তো অনেকের অজ্ঞাত যে, রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপাঠপ্রবৃত্তি ছিল অত্যন্ত প্রবল এবং দেশবিদেশের ইতিহাস সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর বই তিনি পড়েছিলেন। সেসব গ্রন্থের কিছু কিছু বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে আজও রক্ষিত আছে। বিভিন্ন বয়সের রচনাতেও তার প্রমাণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে রবীন্দ্রনাথের পড়া যেসব বই আজও আছে তার পৃষ্ঠাগুলোর অমুদ্রিত জায়গাগুলো জুড়ে নিজের হাতের লেখায় এত টীকা-টিপ্পনী আছে, ভেবে বিস্ময় লাগে গভীর মনোযোগী ছাত্র ও গবেষকের চেয়েও কি গভীরতর অভিনিবেশে সেসব গ্রন্থ তিনি পড়েছিলেন এবং অধীত বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। তাঁর পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়স পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব নরতত্ত্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় যত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বেরিয়েছিল তার প্রায় সবই তিনি মোটামুটি পড়েছিলেন, প্রধান প্রধান প্রায় সব তথ্য ও তত্ত্বই তাঁর জানা ছিল। এবং এই পড়া ও জানা শুধু ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই নয়; মিশর-মেসোপোটেমিয়ার ইতিহাস থেকে শুরু করে চীন-জাপান য়ুরোপ-আফ্রিকার একান্ত সাম্প্রতিক ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধেও তাঁর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধিৎসার বিস্তার ছিল বিস্ময়কর। তাঁর অধিকাংশ ইতিহাসগর্ভ কবিতা প্রবন্ধ বা অন্যান্য রচনার পশ্চাতে এই সুগভীর অধ্যয়ন ও অনুধ্যানের ইতিহাস নিহিত। কোনো বিশেষ প্রসঙ্গে কোন্ কোন্ বিশেষ গ্রন্থ তিনি পড়েছিলেন তার উল্লেখ কোথাও কোথাও আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নেই; তবে তথ্যাদি এবং কতকটা

চিন্তার ধারা অনুসরণ করে কোন্ কোন্ বা কি-জাতীয় বই তিনি পড়েছিলেন কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে, তা কতকটা অনুমান করা যায়।

কিন্তু শুধু অধ্যয়ন-অনুধ্যানের মধ্যেই তাঁর ইতিহাস-জিজ্ঞাসা আবদ্ধ হয়ে থাকে নি। বারো বছর বয়স থেকে আরম্ভ করে জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি নানা উপলক্ষে ভারতবর্ষের, এশিয়া-য়ুরোপ-আমেরিকার নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, নানা স্তরের নানা লোকের সঙ্গে মিশেছেন, চোখ মেলে মানুষ ও প্রকৃতির নানা জীবনদৃশ্য দেখেছেন, কান দিয়ে নানা গান নানা কথা নানা কাহিনী শুনেছেন। কলকাতার বুকের উপরে নিজের দেশ ও জাতির সত্তর বছরের ইতিহাসের বিভিন্ন বিচিত্র অধ্যায় দৃশ্যের পর দৃশ্যে তিনি অভিনীত হতে দেখেছেন; বাংলাদেশের গ্রামে সুদীর্ঘকাল তিনি যাপন করেছেন এবং গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবদের পরিপূর্ণরূপ দু চোখ ভরে তিনি দেখেছেন। এ-সমস্তই তাঁর ইতিহাস-অনুধ্যানের উপাদান রূপে তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর ইতিহাস-চিন্তায় একটি কথা গোড়া থেকেই ধরা পড়েছিল। পরিণত যৌবনের আগেই তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক ও তথাকথিত ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যেই ইতিহাস আবদ্ধ হয়ে নেই, সাম্প্রতিক মানুষের চলমান জীবনের মধ্যেও ইতিহাসের অনপনেয় স্বাক্ষর মুদ্রিত থাকে, থাকে তার দৈনন্দিন জীবনধারায়, তার পূজাপার্বণে, গানে নাচে মেলায়, প্রবাদে ও ছেলেভুলানো ছড়ায়, গল্পগাথা কাহিনী রূপকথায়, এবং আরও অনেক কিছুর মধ্যে। চিরাচরিত ইতিহাস-রচনা ও তথাকথিত ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে যেমন তিনি ইতিহাসকে ধরতে চেয়েছেন, এই সব উপাদানের মধ্যেও তিনি সমান উৎসাহে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্বাক্ষর পড়তে চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য শিক্ষা সমাজ রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য বিচিত্র প্রবন্ধে চিঠিপত্রে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। এই সব উপাদানের ভিতর থেকেও তিনি দেশের ঐতিহ্যের ধারা-উপধারাগুলিকে ধরতে বুঝতে প্রয়াস পেয়েছেন।

পূর্বোক্ত গভীর ও বিস্তৃত অধ্যয়ন বীক্ষণ ও অনুধ্যানের ফলস্বরূপ তিনি যৌবনেই ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির নানা দিক ও নানা পর্ব নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্ট-বৎসরের আগেই এসব প্রবন্ধরচনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। যেসব প্রসঙ্গ বা বিষয় ইতিমধ্যেই তিনি আলোচনা করেছিলেন তার তালিকা দীর্ঘ। আর্যভাষীদের আদি বাসস্থান, আর্য-অনার্য সংঘাত ও সমন্বয়, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের পরস্পর সংঘাত-সমন্বয়, মহাভারতে সমাজবিপ্লবের ইতিহাস, রামায়ণে কৃষিসভ্যতার ইতিহাস, এই দুই মহাকাব্যে ভারতীয় সংস্কৃতির পদরেখা, জাতিভেদপ্রথার ইতিহাস ও সামাজিক তাৎপর্য, ভারতীয় জনতত্ত্ব ও নরগোষ্ঠীর গঠন, ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রকৃতি, ভারতীয় সমাজজীবনে মেলা পূজাপার্বণ উৎসব ইত্যাদির স্থান, তপোবন ও গুরুগৃহের আদর্শ, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম ও সংঘ, অশোক ও তাঁর কাল, মুঘল আমলের ইতিহাসের প্রকৃতি, শিখগুরু ও শিখসম্প্রদায়, শিবাজী ও মারাঠা সম্প্রদায়, অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় সমাজজীবনের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা, ভারতবর্ষে

ইংরাজ শাসনের প্রকৃতি, প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে ভারতীয় কল্পমানস ও সাংস্কৃতিক আদর্শের পরিচয়, ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর ঐতিহাসিক মন আকৃষ্ট হয়েছিল। এই সময়ই তিনি পালি বৌদ্ধগ্রন্থ ধম্মপদের কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন এবং এ বিষয়ে প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন। মধ্যযুগীয় কবি-সাধক কবীরের অনেকগুলি দোঁহাও তিনি প্রায় সমকালেই অনুবাদ করেন। ভারতীয় হিন্দু সাংস্কৃতিক আদর্শের অন্যতম মহাকাব্য গোরা-উপন্যাসও তাঁর পরিণত যৌবনের রচনা। এই যৌবনেই তিনি যে অসংখ্য রাজনৈতিক, ধর্মমূলক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবন্ধাদি রচনা করেছিলেন তার মধ্যেও ভারতীয় জীবনের সামগ্রিক ঐতিহ্য ও আদর্শের নানা উল্লেখ, আলোচনা ও ব্যাখ্যান রবীন্দ্র -চিন্তা ও -কল্পনার সঙ্গে অনুস্যূত হয়ে আছে।

যৌবনেই তিনি মহাভারত, পুরাণ, বৌদ্ধ জাতক ও অবদান, এবং শিখ-মারাঠা-রাজপুত ইতিহাস থেকে কিছু কিছু কাল্পনিক ও ঐতিহাসিক কথা ও কাহিনী আহরণ করে তা নিয়ে অনেকগুলি কবিতা, গাথা ও কাব্যনাটিকা রচনা করেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির কোন্ কোন্ দিক, কি কি আদর্শ, ভারতবর্ষের ইতিহাসের কি প্রকৃতি তাঁর বুদ্ধি ও কল্পনাকে উদ্রিক্ত করেছিল, এই রচনাগুলিতে তার পরিচয় সুস্পষ্ট। কিছু পরবর্তী কালের রচনা নৈবেদ্য এবং খেয়ার অধিকাংশ কবিতারই প্রেরণা এসেছিল ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির ভিতর থেকে, সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ কম। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের যে-রূপ ধরা দিয়েছিল, ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তিনি যে-ভাবে বুঝেছিলেন তার পরিচয় গীতাঞ্জলিতেও আছে—অন্তত দুটি সুবিখ্যাত কবিতায় (হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে; হে মোর দুর্ভাগা দেশ)। ঔপনিষদিক তপোবনাদর্শ এবং প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি তাঁকে কি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তার পরিচয় আছে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিবর্ধনের ইতিহাসের মধ্যে। সেও তার যৌবনেরই রচনা। বস্তুত, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্র-প্রতিভা যখন মধ্যাহ্নচূড়া স্পর্শ করেছে, তখন কবির বুদ্ধি ও কল্পনায় ভারতবর্ষের একটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব ধরা পড়েছে, এবং সেই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ১৯০২ খ্রীষ্ট-বৎসরে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন; দশ বৎসর পর, ১৯১২ খ্রীষ্ট-বৎসরে, তখন কবির বয়স পঞ্চাশ মাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে, তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা নামে দীর্ঘতর আর-একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই, ১৯১৩ সালে, সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের ইতিহাস-গুরু আচার্য যদুনাথ সরকার প্রবন্ধটির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন মডার্ন রিভিউ পত্রিকায়। আরও দশ বছর পর, রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই প্রবন্ধের আর-একটি ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন, A Vision of Indian History নামে। এই একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারত-ইতিহাস -চিন্তা ও -কল্পনার রূপটি তুলে ধরেছেন একটি অখণ্ড সমগ্রতায়। পরবর্তী জীবনে তিনি এ সম্বন্ধে যা-কিছু চিন্তা করেছেন, স্বপ্নকল্পনা গড়েছেন, সৃষ্টি করেছেন রচনায়, তা এই যৌবনের ধ্যানধারণাগুলিকে শুধু প্রসারিত করেছে, তাদের গভীরতা

দান করেছে, নূতনতর যুক্তি ও কল্পনায় দৃঢ়তর করেছে মাত্র। প্রমাণ, ১৩১৪-১৬ বাংলা সনে লেখা গোরা উপন্যাস, ১৩১৫ সনে পূর্ব ও পশ্চিম, পথ ও পাথেয় প্রভৃতি প্রবন্ধ, ১৩১৭-১৮ সালের ভারততীর্থ, হে মোর দুর্ভাগা দেশ, জনগণমন-অধিনায়ক কবিতাত্রয়, এবং আরও পরবর্তী কালের বহু রচনা।

ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যয়ন ও অনুধ্যান করে তিনি যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তার ভিতর থেকে মূল কয়েকটি সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ করা যেতে পারে। তাতে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-দৃষ্টি কিছুটা সুস্পষ্ট ধরা পড়বে বলে আমার বিশ্বাস।

হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসে ভারতবর্ষের মানুষ কখনো কখনো হিংসাবিদ্বেষে বা বৈষয়িক লোভে বা স্বার্থান্ধ অজ্ঞানতার তাড়নায় যুদ্ধ-বিগ্রহ-সংগ্রামে লিপ্ত হয় নি, এমন নয়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও নানা বিরোধ-বৈষম্যের মধ্য দিয়ে তাকে স্বীকার করে নিয়েই সকল বিরোধ ও বৈষম্যকে একটি বৃহত্তর মিলন ও সমন্বয়ের স্তরে উন্নীত করবার একটা সদাজাগ্রত দৃষ্টি ভারতবর্ষের ছিল। ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে যে পার্থক্য, প্রত্যেকের যে বৈশিষ্ট্য, সে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে নিয়েও সমষ্টির মধ্যে যে সূত্র বর্তমান, যে সূত্র পৃথক পৃথক ব্যক্তিমানুষকে ঐক্যের সমষ্টিতে বাঁধে সেই ঐক্যরচনার দিকে ভারতীয় সমাজ-মানসের একটা প্রবণতা ছিল। অধ্যাত্ম-জীবনে আমাদের আদর্শ যেমন বহুর মধ্যে একের সন্ধান, আমাদের সামাজিক-বৈষয়িক জীবনেও ছিল তাই। ভারতবর্ষ বৈষম্য-বিরোধ-বৈপরীত্যকে বড় করে একান্ত করে কখনো দেখে নি; এর পশ্চাতে ও গভীরে যে ন্যূনতম ঐক্য সাধারণ তাকেই সকলের চোখের সম্মুখে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষের সাধনা মিলন, সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণের সাধনা, এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম মূল সিদ্ধান্ত। ভারতীয় জনগোষ্ঠীর গড়ন, হিন্দুধর্মের প্রকৃতি, ভারতীয় আত্মিক সাধনার প্রকৃতি, ভারতীয় সমাজ-ইতিহাসের স্বভাব ইত্যাদি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। শুধু প্রবন্ধাদি রচনায় নয়, গানে কবিতায় উপন্যাসেও তাঁর এই সিদ্ধান্ত নানাভাবে নানারূপে দেখা দিয়েছে। আজ এই সিদ্ধান্ত প্রায় ধরতাই বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ -চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন এ সিদ্ধান্তের কথা প্রথম বলতে আরম্ভ করেছিলেন তখন তাঁকে অনেক বিদ্রূপ অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর স্বদেশ ও স্বাজাত্য -বোধের আদর্শ ও বিশ্ববোধের আদর্শের মূলে ভারত-ইতিহাসের এই সিদ্ধান্ত অনেকখানি ক্রিয়া করেছে, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

তাঁর অন্যতম সিদ্ধান্ত ছিল, যতবার বিদেশীর হাতে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাভব ঘটেছে, বিশেষ ভাবে ইংরাজের হাতে পরাধীনতা, তা আমাদের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত চরিত্রহীনতা, সামাজিক দুর্বলতা

ও দুর্গতির জন্যই ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ব্যক্তিগত ও সামাজিক মনুষ্যত্বহীনতার অনিবার্য পরিণতি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ও গোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, জাতিভেদের নামে মানবতার অবমাননা, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, ধন ও প্রভুত্বের অবিচার, ধর্মান্ধতার মোহ ইত্যাদি সমস্তই ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্রহীনতার লক্ষণ, পরিণামে মানবধর্মের বিরোধী, এবং সেইহেতুই দেশ ও সমাজ-বিরোধী। এই ধরণের চরিত্রহীনতা যখন সমাজদেহে ব্যাপ্তিলাভ করে তখন সে সমাজ ভেতর থেকে ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হতে থাকে। রাষ্ট্রীয় পরাভব তখন অনিবার্য পরিণাম। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে হলে, সার্থক সৃষ্টিগর্ভ স্বাধীনতার অধিকার পেতে হলে দেশের মানুষকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্রহীনতা থেকে মুক্ত হতে হবে, সমস্ত সংকীর্ণতার মোহ থেকে মুক্ত হতে হবে, মানুষ হিসেবে মানুষকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে শিখতে হবে।

তাঁর তৃতীয় প্রধান সিদ্ধান্ত সমান অর্থবহ। ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ হিসেবে যেমন তিনি বৈরাগ্যকে কখনো স্বীকার করেন নি, সামাজিক আদর্শ হিসেবেও তিনি তেমনই বিষয়বিমুখতাকে কখনো প্রশ্রয় দেন নি। ভারতবর্ষের সাধনা ধর্ম ও মোক্ষকে যেমন স্বীকার করেছে, কাম ও অর্থকেও তেমনই মেনে নিয়েছে, চারিটি বর্গকেই সমান মূল্য দিয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজ রক্ষায় ও শাসনে, শান্তিরক্ষা ও বিবর্ধনে সৈন্যসামন্ত রক্ষীপ্রহরী সবকিছুরই প্রয়োজন আছে, আইনকানুনেরও আছে। বিষয়সাধনার প্রয়োজনও তুচ্ছ করবার মত নয়। গ্রাম নগর রাজধানী দুর্গ-সন্নিবেশ, কৃষিকর্ম ব্যবসা বাণিজ্যে ধনসম্বলবৃদ্ধি কিছুই তুচ্ছ নয়। তবু ভারতবর্ষের সাধনায় এইসব বৈষয়িক চিন্তা ও আদর্শ কখনো একান্ত হয়ে ওঠে নি, কিংবা তার ধর্ম ও মোক্ষ -সাধনাকে আবৃত করে দেয় নি। কোনো দেশ বা জাতি শুধু রাষ্ট্রীয়, সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে বলীয়ান হলেই অন্য দেশ ও জাতির সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে পারে না ; সে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে হলে আত্মিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির অধিকারী হতে হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষ তাই সাধারণত আক্রমণাত্মক হিংসাপরায়ণ মনোভাব, পরজাতি পরদেশ পরধর্মবিদ্বেষের মনোভাবকে প্রশ্রয় দেয় নি, বরং তাকে পরিহার করে চলেছে। সুদীর্ঘ ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম কখনো ঘটে নি এমন নয় ; কিন্তু ব্যতিক্রম-বৈপরীত্য সত্ত্বেও সমগ্রভাবে ঐক্য ও শান্তির পথই ছিল ভারতবর্ষের সাধনার পথ। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই ইঙ্গিত।

রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ সিদ্ধান্ত উপরোক্ত দুটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে একই যুক্তিশৃঙ্খলায় আবদ্ধ। দেশকালবদ্ধ কোনো সমাজ যখন নিজের চারপাশে উঁচু দেয়াল তুলে অন্যতর দেশ ও কালের সমাজের স্পর্শ থেকে নিজকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখে, ক্রোধ, ঘৃণা বা হিংসায়, আত্মাভিমানে বা আত্মনিগ্রহে অন্যতর সমাজের সর্বপ্রকার সংস্পর্শ ও প্রভাব পরিহার করে আপন স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মসন্তুষ্টিপরায়ণ জীবন যাপন করে, সে সমাজ কখনো বেশিদিন নিজের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে পারে না। তার জীবনপ্রবাহ ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে স্রোতোবেগহীন শৈবালাকীর্ণ পঙ্কিল

জলাশয়ে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একাধিকবার তা হয়েছে, কিন্তু তৎসত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা নানা বিবর্তন-পরিবর্তন সত্বেও আজও যে তার শক্তি ও প্রবহমানতা রক্ষা করে চলেছে তার প্রধান কারণ, ভারতবর্ষ কখনো পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতির মানুষ ও তাদের বিচিত্র সংস্কৃতির স্পর্শ ও প্রভাব থেকে নিজকে একান্তভাবে দূরে সরিয়ে রাখে নি; কখনো বিরোধ কখনো মিলন, কখনো স্বেচ্ছা কখনো অনিচ্ছার মধ্য দিয়ে নানা দেশ ও জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে তাকে আসতে হয়েছে, এবং তার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির সুপ্রচুর সমৃদ্ধিলাভই ঘটেছে; সাময়িক ক্ষতি যদি বা কখনো কিছু হয়ে থাকে পরিণামে লাভ হয়েছে অনেক বেশি। এই ইতিহাস-বোধ থেকেই রবীন্দ্রনাথ এ বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে, ভিন্ন দেশ ভিন্ন জাতি ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে অসহযোগ নয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, বিরোধ নয়, সহযোগ পারস্পরিক আদানপ্রদানই জাতীয় জীবন-সাধনার আদর্শ। বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েই দেশকে পরিপূর্ণভাবে জানা ও পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসরণ করেই রবীন্দ্রনাথ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের জীবনে কর্মে ও রচনায় তা প্রয়োগ করেছিলেন।

তাঁর পঞ্চম সিদ্ধান্ত এই যে, সকল দেশ ও জাতির ইতিহাস একই জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয় না, এবং একই মানদণ্ডে সকল মানবসংস্কৃতির ইতিহাসের বিচারও হতে পারে না। য়ুরোপের সাধনা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক; রাষ্ট্রের গঠন, তার ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতির আদর্শের মানদণ্ডই য়ুরোপের মানুষের জীবনের নিয়ামক এবং সেই মানদণ্ডেই য়ুরোপীয় ইতিহাসের বিচার কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বদাই 'দিল্লী দূরস্ত', দিল্লী অর্থাৎ রাষ্ট্রকেন্দ্র সর্বদাই অনেক দূর। ভারতবর্ষের সাধনা সমাজ-কেন্দ্রিক; সমাজের গঠন, তার ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতির আদর্শের মানদণ্ড মানুষের জীবনের নিয়ামক এবং সেই মানদণ্ডেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিচার বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ তাই ছিল স্বদেশী রাষ্ট্র তত নয় যত স্বদেশী সমাজ। সেইজন্যই তাঁর মননকল্পনা আবর্তিত হত সামাজিক ঐক্য ও সহযোগিতা, সামাজিক আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভর, সামাজিক সংহতির প্রশ্ন ও সমস্যাকে কেন্দ্র করে। আমাদের চিন্তা ও কর্ম -নায়কেরা এই সামাজিক আদর্শই বার বার আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। যে চিন্তা ও কর্ম এই ঐক্য ও সংহতির আদর্শের বিরোধী, রবীন্দ্রনাথ আজীবন তাকে তিরস্কার করেছেন তীব্র বাক্যকশাঘাতে। তিনি বলছেন—

ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়।...ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্‌স্ নাই সেখানে আবার হিস্ট্রি কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল ক্ষেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ।...ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া...বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।...পরের

বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহা পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি ; এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক ; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক। ...এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি।

—ভারতবর্ষের ইতিহাস, বঙ্গদর্শন, ১৩০৯

উপরে যে কটি মূল সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছি, ভারত-ইতিহাসের অনেক আলোচক-গবেষকই হয়তো রবীন্দ্রনাথের এইসব মূল ও আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে দ্বিধা বোধ করবেন। দেশের সুবিস্তৃত ইতিহাস থেকে তাঁরা এমন অনেক তথ্য উদ্ধার করে দেখাতে পারবেন যা উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির বিরোধী। এ কথাও তাঁরা কেউ কেউ হয়তো বলবেন, ইতিহাসে যা ঘটে তার পশ্চাতে বিশেষ কোনো আদর্শের প্রেরণা থাকে না, মানুষের সমবেত ইচ্ছার কোনো নির্দেশ থাকে না ; ইতিহাস শুধু কতগুলি আকস্মিক ঘটনাপুঞ্জের সমষ্টিমাত্র। এসব তর্কের স্থান এই নিবন্ধ নয়। তবু, একটা কথা বলা চলে যে, যত বিরোধী তত্ত্ব বা তথ্যই এই সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে উত্থাপন করা যাক-না কেন, ভারত-ইতিহাসের সমগ্র গতিপথটিকে দূর থেকে দেখলে, তার চিন্তা ও কর্ম-নায়কেরা সমগ্রভাবে যে স্বপ্নকল্পনাদ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েছেন, যে আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন তার দিকে তাকালে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তগুলিকে অনৈতিহাসিক বলে মনে করবার কোনো কারণ নেই। বাইরের জগতে যা ঘটে শুধু তাই তো ইতিহাস নয়, মনের জগতে যা ঘটে তাও ইতিহাসের তথ্য বলে গণ্য হবার দাবি রাখে।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে এর চেয়েও বড় একটি কথা আছে। এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ইতিহাস আলোচনা ঐতিহাসিক গবেষণা যাঁদের বৃত্তি রবীন্দ্রনাথ সে হিসেবে ঐতিহাসিক ছিলেন না। তিনি ইতিহাসের গ্রন্থরচনার জন্য লেখনী ধারণ করেন নি, বা ইতিহাস-চর্চায় প্রবৃত্ত হন নি। তাঁর প্রধান ও একতম উদ্দেশ্য ছিল, ইতিহাসগ্রন্থ রচনা নয়, ভারতবর্ষের চলমান ইতিহাস রচনা। বর্তমান ও ভবিষ্যতের ইতিহাসসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তাঁকে অতীত ইতিহাস অধ্যয়ন ও অনুধ্যান করতে হয়েছিল। তাঁর পদ্ধতি বিশ্লেষণ ও আলোচনার নয়, সংশ্লেষণ ও সৃষ্টির। বর্তমান দেশ ও কালের ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে তিনি ভারতবর্ষের সুবিস্তৃত অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন সৃষ্টির মন নিয়ে, যে মন নূতন ভারতবর্ষ রচনা করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। দূরে সমতলভূমিতে দাঁড়িয়ে মানুষ হিমালয়ের দিকে তাকায় ; তথ্য হিসেবে সে জানে সেই দুরারোহ পার্বত্য বিস্তারের মধ্যে অনেক গুহাগহ্বর, অনেক তীক্ষ্ণ শৃঙ্গাগ্র, অনেক তুষারস্রোত, কিন্তু সে তার সমগ্র দৃষ্টিতে দেখে নগাধিরাজের সুবিপুল মহিমা, তুষারশুভ্র সূর্যকরোজ্জ্বল কিরীটের অনির্বচনীয় দীপ্তি, তার স্তব্ধ বিরাট সুগম্ভীর রূপ। রবীন্দ্রনাথও এইভাবেই ভারতবর্ষের ইতিহাসকে দেখেছেন, খণ্ড খণ্ড দৃশ্যে নয়, সনতারিখের হিসেব ধরে নয়, একটি অখণ্ড সমগ্র দৃষ্টিতে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিপথে নানা উত্থানপতন, নানা

খানাখন্দ, নানা দোষত্রুটি, ফাঁক ও ফাঁকির বিচিত্র তথ্য তাঁর অজানা ছিল, এ কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই ; কিন্তু সে সবে তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে থাকে নি। যা দুষ্ট ক্ষত, যা মৃত আবর্জনা, যার মধ্যে ধ্বংসের ও মৃত্যুর বীজ ইতিহাসের তেমন তথ্যে ইতিহাস-আলোচক-গবেষকের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন কিছু ছিল না, কারণ তা থেকে নূতন জীবন-সৃষ্টি আর সম্ভব নয়। সেসব তথ্য নেতিবাচক, এবং সেইহেতু তিরস্কারের যোগ্য। এই যুক্তিতেই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে এমন তথ্য ও তত্ত্ব বেছে নিয়েছিলেন যা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মানবসভ্যতার ইতিহাসের কেন্দ্রে স্থান দিয়েছে, সে ইতিহাসকে সমৃদ্ধি ও মর্যাদা দান করেছে, ভারতীয় সংস্কৃতির নিরবচ্ছিন্ন ধারাকে প্রবহমান রেখেছে, এক কথায় যেসব তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে মানবধর্মবোধ বিশ্ববোধ ঐক্যবোধ মিলন-সমন্বয়বোধের আদর্শ নিহিত। আর যেসব তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে মানুষের সংকীর্ণ বুদ্ধির প্রকাশ, যা চলতি বেগ হারিয়েছে, যা শুধু আচারের মরুবালি-রাশির মধ্যে পথ হারিয়েছে, সেসব তিনি সজ্ঞানে পরিহার করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, ভারত-ইতিহাসের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অগণিত মানুষ অসংখ্য বীজ ছড়িয়ে রেখে গেছে ; তার অধিকাংশ আজ বন্ধ্যা, মহাকাল তাদের সৃষ্টিক্ষমতা হরণ করেছে। কিন্তু যেসব বীজ পড়েছিল উর্বরতর ভূমিতে তারা কালের কোলে লালিত বর্ধিত হয়েছে যুগের পর যুগ ধরে ; তাদের সৃষ্টিক্ষমতা আজও অক্ষুণ্ণ। ভারত-ইতিহাসের প্রান্তর থেকে রবীন্দ্রনাথ সেই সব বীজ সংগ্রহ করে তাঁর দেশের ও কালের মানুষের মনোবনভূমিতে ছড়িয়ে গেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সৃষ্টির, তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষ রচনার, পিছনের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথের ইতিবৃত্ত-রচনা নয়।

প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাস-চর্চা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অপ্রত্যক্ষ ঐতিহ্যসাধনার কথাও এ প্রসঙ্গে বলতেই হয়। বরং এই অপ্রত্যক্ষ সাধনার কথা আরও অর্থবহ, তার প্রভাব আরও গভীর, আরও ব্যাপক। অতীত ভারতবর্ষের চিন্তায় ও কর্মে, ধ্যানে ও ধারণায়, স্বপ্নে ও কল্পনায় যেখানে যা কিছু তাঁর কাছে অর্থবহ ও সৃষ্টিগর্ভ বলে মনে হয়েছিল, বেদ-উপনিষদের কাল থেকে আরম্ভ করে তাঁর নিজের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত, তার সমস্ত সূত্রই তিনি আহরণ করেছিলেন একটি একটি করে, পরম যত্নে ও ভালোবাসায়। এবং নিজের চিন্তা ও কর্ম, ধ্যান ও কল্পনার সঙ্গে সেই সব সুতো টানাপোড়েনে জমাট করে বুনে আপন সমগ্র ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছিলেন। রবীন্দ্র -জীবন ও -কর্মে ঐতিহ্যের সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ এইভাবেই সম্ভব হয়েছিল।

উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে রবীন্দ্রনাথের যখন জন্ম বাংলাদেশের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বিদ্বৎসমাজ তখন সাধারণভাবে এক দিকে প্রাচীন ও রক্ষণশীল অন্য দিকে প্রাগ্রসর ও সংস্কারপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত। কিন্তু দুই দলেরই আদর্শগত যুক্তি ও আবেদন গড়ে উঠেছিল মানবধর্ম মানবতাবোধকে

আশ্রয় করেই। বস্তুতঃ রামমোহনানুসারী দ্বারকানাথ-দেবেন্দ্রনাথের ঠাকুর-পরিবারের আদর্শ ও আবহাওয়া ছিল একান্তই এই আদর্শগত, এবং সে আদর্শে স্বদেশ ও স্বাজাত্য -বোধের গভীর স্পর্শ ও প্রভাব সত্ত্বেও পরমত-অসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণ পরজাতি-পরধর্ম-বিদ্বেষের কিছুমাত্র স্থান ছিল না। উপনিষদ্-ধর্মের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের পরম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এই আদর্শকে আরও ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করেছিল। এই উত্তরাধিকার রবীন্দ্রজীবনকে কি অপরিমেয় ঐশ্বর্য দান করেছিল তার হিসেব এখনও আমরা ভালো করে নিই নি। তাঁকে বলা হয়েছে উপনিষদের সন্তান ; এ উক্তি যথার্থ। উপনিষদ্-ধর্মের উদার মানবতাবোধও তার গভীর বিশ্বাস ও জীবনাদর্শ তাঁকে অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক-ভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করেছিল; সেই প্রেরণা ও প্রভাব নানা ভাবে নানা রূপে তিনি তাঁর পাঠকসাধারণের মধ্যে সঞ্চার করে দিতে চেষ্টা করেছেন। নানা সূত্রে নানা প্রসঙ্গে তিনি বার বার উপনিষদের শ্লোক উদ্ধার করে তার নূতন ব্যাখ্যা করে সেই ধর্ম ও সংস্কৃতির উদার মানবিক আবেদনের দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মানুষের ধর্ম নামক প্রস্তাব যা তাঁর জীবনদর্শন তা মূলতঃ উপনিষদের মানবধর্মবোধেরই উপরই প্রতিষ্ঠিত। সমসাময়িক ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনে উপনিষদ্-ধর্মের এই পুনরুজ্জীবন, তার এই নূতন অর্থসন্ধান ও দান, আমাদের জীবনাদর্শে এই মানবতাবোধের সঞ্চার রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সুমহান কীর্তি। যে ঔদার্যবোধে, যে বিশ্বাত্মবোধে, যে সহযোগ ও সহাবস্থানের নীতিতে, যে প্রাগ্রসর চিন্তায় আমাদের জাতীয় আদর্শ আজ তার প্রতিষ্ঠা সন্ধান করছে তা রবীন্দ্রনাথের আজীবন সাধনার পরিপক্ক ফল। উপনিষদ্ ছিল সেই সাধনার বীজ।

বুদ্ধদেবের জীবনসাধনা ও আদর্শ এবং বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের যে-সব দিক সামাজিক মানুষের ব্যক্তিচরিত্রগঠন, সংঘশক্তির বিকাশ, নীতি ও ধর্মবোধ, মানবতাবোধ ও বিশ্বাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই সব দিক রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে স্পর্শ ও অনুপ্রাণিত করেছিল। জাতক ও অবদানের গল্প, বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী, থের ও থেরীগাথা, ধম্মপদ প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল তাঁর খুব প্রিয়। বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্ব ও জীবনাদর্শ নিয়ে জীবনের শেষ অধ্যায়েও তিনি একাধিক গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন ; চিঠিপত্রে ও প্রবন্ধাদি ও নানা জায়গায় বৌদ্ধধর্মের উদারবাণীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি প্রকাশ পেয়েছে। বৌদ্ধধর্মের আবেদন যে পৃথিবীর নানা দেশ ও নানা জাতিকে আকর্ষণ করেছিল তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি অপূর্ব সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের একটি ঐতিহাসিক তথ্য ও তার ইঙ্গিতের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ তথ্য সর্বজনবিদিত যে, উনিশ ও বিশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসে যাঁরা পদচিহ্ন এঁকে রেখে গেছেন, তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর দেশের ঐতিহ্যস্রোত থেকে নিজেদের জীবনরস আহরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও করেছিলেন। বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র ও অরবিন্দ, ভারতবর্ষে তিলক ও গান্ধীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই তথ্য ও তার ইঙ্গিতটি পরিষ্কার হবে। এ তথ্য বিস্ময় উদ্রেক না করে পারে না যে, এঁদের প্রত্যেকের জীবনেরই মনন ও কর্মের প্রধান উৎস

গীতোক্ত জীবনধর্মের উদ্দেশ্য ও আদর্শই এঁদের জীবনসাধনার পথনির্দেশ করেছে। ভারতবর্ষের সুবিস্তৃত জীবনধারা ও আদর্শের নির্যাস তাঁরা দেখেছিলেন গীতায়; কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিধারায় সেই জীবনের বিশ্লেষণ ও সমন্বয়। আশ্চর্যের বিষয় এই, রবীন্দ্ররচনাবলীর বিরাট সমুদ্রে দু-চার জায়গায় গীতার সশ্রদ্ধ উল্লেখ থাকলেও গীতা যে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ আকর্ষণ করে নি, তাঁকে কোনো গভীর প্রেরণা দেয় নি, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। পক্ষান্তরে তিনি গভীর-ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন উপনিষদ্ দ্বারা, বৌদ্ধধর্ম ও বুদ্ধদেবের জীবনাদর্শ দ্বারা, যার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র বা অরবিন্দ, তিলক বা গান্ধী কেউই বিশেষ কোনো অনুরাগ বা আকর্ষণ অনুভব করেন নি। এই হিসেবে সুভাষচন্দ্র বঙ্কিম-অরবিন্দ-তিলক-গান্ধীর অনুগামী, এবং জবাহরলাল রবীন্দ্রনাথের। এই তথ্যটুকুর উল্লেখমাত্র করেই আপাতত ক্ষান্ত থাকা যেতে পারে, কারণ বর্তমান প্রসঙ্গে এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন আর নেই। এই তথ্যের ইঙ্গিত কি, এই দুই দৃষ্টির অর্থ কি, কেন এই দৃষ্টিপার্থক্য ঘটেছে তার বিচার ও বিশ্লেষণ অন্যত্র আমি করেছি; এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

আবার রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকেও রবীন্দ্রনাথ আলোচনা ও প্রেরণালাভের বিষয়ীভূত করেছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রও করেছিলেন। ইতিহাসের যেসব ঘটনায় আদর্শ নিয়ে, স্বার্থ নিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘাত, মানুষ যেখানে আক্রমণাত্মক, সংঘর্ষ-সংগ্রামের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে যেখানে মানুষের চিত্তদ্বন্দ্ব শৌর্যবীর্য ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে, সেসব ঘটনার দিকেই বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। ধর্ম ও আদর্শপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে মানুষ দ্বিধা-শঙ্কালেশহীনচিত্ত নিয়ে মানুষের দুঃখদুর্দশা অপমান মৃত্যুর দিকে না তাকিয়ে উদ্দেশ্যসাধনের দিকে নির্মমভাবে এগিয়ে চলে, সেই মানুষের জীবন থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মতই মোগল-আমলের শেষ অধ্যায় এবং রাজপুত-মারাঠা-শিখ-ইতিহাসের সংগ্রাম-সংঘাতের কিছু কিছু ঘটনার মধ্যে বিহার করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, যে-সব ঘটনার মধ্যে মানুষের আত্মিক ও মানব- মহিমা প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে মানুষ ক্ষমায় ও ত্যাগে উজ্জ্বল, দুঃখ ও মৃত্যুদহনে দীপ্ত, অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কিন্তু বিদ্রোহী হয়েও ক্ষোভহীন ক্রোধহীন হিংসালেশহীন, সেই মানুষই রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করেছে। নির্মম অমানুষিক অত্যাচার-অবিচারের সম্মুখেও যে মানুষ মাথা নত করে না, বরং তার সামনে অকম্পিত বক্ষে দাঁড়িয়ে নিজের প্রাণ বলি দিয়ে মনুষ্যত্বের ও মানবমহিমার জয় ঘোষণা করে, তবু অত্যাচারীর প্রাণ নাশ করে না, যে মানুষ আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করে না, যার শৌর্যবীর্যের প্রকাশ শারীরিক ও সামরিক শক্তিতে নয়, চরিত্রশক্তিতে, সেই মানুষের জীবন থেকেই রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রেরণা লাভ করতে চেয়েছেন, তার জীবনাদর্শই তাঁর কাছে মানবজীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

মধ্যযুগীয় ভারত-ঐতিহ্যের আর-একটি দিকও রবীন্দ্র-মননকল্পনাকে গভীরভাবে স্পর্শ ও উদ্দীপ্ত করেছিল ; সে হচ্ছে নানক-কবীর থেকে শুরু করে দাদূ-রজ্জব, রুইদাস, মীরাবাঈ থেকে শুরু করে একনাথ-জ্ঞানেশ্বর, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে কবিশেখর পর্যন্ত, যত মরমিয়া সাধক-কবি ও কবি-সাধক, এবং বাংলাদেশের আউল-বাউলরা তাদের দোঁহায় ও গানে যে জীবনাদর্শের জয়গান করে গেছেন, মানবচিত্তের গহনে মানুষ ও ভগবানের পারস্পরলীলার যে অপূর্ব কাহিনী তাঁদের জীবন ও রচনায় প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথ নিজকে তার সঙ্গে গভীর আত্মীয়তায় যুক্ত করেছিলেন। এ বিষয়ে ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন তাঁর প্রধান সহায় ও সঙ্গী। মধ্যযুগের এই ধ্যানধারার সঙ্গে প্রাচীন ঔপনিষদিক ধারার গভীর যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, তিনিই বলেছিলেন উপনিষদের উদার মানবধর্মের সঙ্গে এই মধ্যযুগীয় সন্তদের মানব ও দেবতা -প্রীতির একটা নিবিড় সম্বন্ধ সুস্পষ্ট। এই সাংস্কৃতিক ধারার যে দিকটা ব্যাবহারিক ধর্ম ও আচারের, তার মধ্যে নানা জিনিস প্রচ্ছন্ন : আর্যপূর্ব ও অনার্য কৌম ধর্ম, বহিরাগত নানা ধর্ম ও সংস্কার, বৈদিক-ঔপনিষদিক হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধ বজ্রযান-সহজযান ইত্যাদি ধর্ম, ইসলামী সূফীধর্ম, কৃষিনির্ভর গ্রাম্যজীবনের লোকধর্ম ইত্যাদি। এই সব সন্তরা এসেছিলেন হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় থেকে। কিন্তু তাঁরা যে ধর্ম ও জীবনাদর্শ প্রচার করে গেছেন তার মধ্যে সব সম্প্রদায়, সব ধর্মমত বিশ্বাস আচারব্যবহার মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধিকে তাঁরা পরিহার করেছিলেন, আচার ও সংস্কারের শৃঙ্খল থেকে তাঁরা মুক্ত ছিলেন, মানবদেহকেই তাঁরা ভগবানের লীলার আধার বলে জেনেছিলেন, মৈত্রীবন্ধনে তাঁরা সকল মানুষকে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন, ভগবানের কাছে সকল মানুষের সাম্যপ্রতিষ্ঠা ছিল তাঁদের অন্যতম আদর্শ এবং সর্বোচ্চ কামনা ছিল মানুষের দেবত্বমহিমার বিস্তার। এই সাংস্কৃতিক জীবনাদর্শের মধ্যে যে ঔদার্য, যে প্রাগ্রসর বুদ্ধি ও সৃষ্টিগর্ভ মানবমহিমার সঞ্চার সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের অগণিত সাধারণ মানুষের হৃদয়াকর্ষণ করেছে, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথও একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সাম্প্রতিক কালের শিক্ষিত উচ্চকোটির মানসে এই সাংস্কৃতিক ধারার কোনো প্রভাবই প্রায় ছিল না বললেই চলে, যদিও সাধারণ নিম্নকোটির মানুষ কখনো এ ধারা থেকে একেবারে বিচ্যুত হয়ে পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথই আধুনিক ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এই ধারার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে আমাদের সামগ্রিক জীবনের বহতা স্রোতস্বিনীর সঙ্গে এর সংযোগ বিধান করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ এও আবিষ্কার করেছিলেন যে, এই সব সন্ত কবিদের জীবনবেদ, ভারতবর্ষের সূফীধর্ম, বাংলার বৈষ্ণবধর্ম, আউল-বাউলদের জীবনধারা সমস্তই কৃষিনির্ভর গ্রামনির্ভর জীবনের সৃষ্টি। এই সরল জীবনযাত্রার মধ্যে যে সহজ মানবধর্মবোধের ধারা বহমান সহজ সরল মানুষের ভাষায় এঁরা তারই জয়গান করেছেন। তিনি আরও জেনেছিলেন যে, অথর্ববেদ, উপনিষদ, কবীর ও দাদূর দোঁহাবলী, মীরাবাঈর ভজন, হিন্দী ও বাংলা রামায়ণ, চণ্ডীদাস-

জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের পদাবলী, আউল-বাউলদের গীতাবলী প্রভৃতি সমস্তই একই সামগ্রিক ও নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান জীবনধারার সৃষ্টি। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবনের সহজ, উদার, আচারবিচারের সংস্কারমুক্ত মানবাদর্শ এই ধারার মধ্যেই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

আমাদের দেশের গ্রামীণ কৃষিজীবনের মধ্যে, নানা আদিবাসীজনদের জীবনযাত্রার মধ্যে নানা ধরণের লোকায়ত সংস্কৃতির বিচিত্র চলমান ধারার পুনরাবিষ্কার ও শিক্ষিত উচ্চকোটি মানসের সঙ্গে তার পরিচয়সাধন রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যসাধনার অন্য একটি অর্থবহ উদাহরণ। উচ্চকোটির সাংস্কৃতিক জীবনের প্রবলতর স্রোতের আড়ালে এই স্রোত প্রচ্ছন্ন প্রবাহে বয়ে এসেছে ইতিহাসের সূচনা থেকেই। এদের নৃত্যেগীতে পালাগানে নাট্যাভিনয়ে নানা পার্বণোৎসবে মানবজীবনের নানা আকৃতি, নানা চিন্তাভাবনা, নানা স্বপ্নকল্পনা প্রবহমান জীবনকে আশ্রয় করে অপূর্ব রূপে ও ছন্দে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের লোকায়ত সংস্কৃতির এই রূপ রবীন্দ্রনাথই প্রথম আবিষ্কার করেন এবং তার সঙ্গে নিজের মনন-কল্পনার আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে যখনই তিনি কোনো সৃষ্টিসংকটের সম্মুখীন হয়েছেন বার বার তিনি লোকায়ত সংস্কৃতির এই ক্ষীণ অথচ চিরপ্রবহমান ধারার ঘাটে ঘাটে ঘট ভরেছেন নূতন জীবন-প্রেরণা নূতন রূপ নূতন রস আহরণের জন্য। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, এদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা একান্তভাবে নির্ভর করত তাদের সহমর্মিতা সহযোগিতাবোধের উপর, গভীর সাম্য ও আত্মীয়তাবোধের উপর; তিনি বিশ্বাস করতেন, এদের জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল একটি সহজ অথচ গভীর, প্রায় প্রাকৃতিক মানবতাবোধের উপর। কোমে কোমে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে প্রভেদ ছিল বিস্তর, বৈচিত্র্য ছিল অনেক, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সকলের গভীরে একটা পরম ঐক্যও ছিল।

রামমোহন থেকে আরম্ভ করে অনেক ভারতসন্তানই সজ্ঞান সচেতনতায় ঐতিহ্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু ভারত-ঐতিহ্যের সামগ্রিক রূপের সন্ধান সজ্ঞানে কেউ করেন নি। সেই সুবিস্তৃত সুগভীর ঐতিহ্যের কোনো কোনো খণ্ড অংশেই তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল, এবং এক বা একাধিক খণ্ডিত অংশের প্রবাহ-প্রকৃতিকেই তাঁরা ভারতবর্ষের চলমান জনসমাজের সামগ্রিক প্রকৃতি ও আদর্শ বলে মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সেই আর্যপূর্ব অনার্য ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-বৌদ্ধধর্ম-সংস্কৃতসাহিত্য ইত্যাদি থেকে শুরু করে তাঁর নিজের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত ভারত-সংস্কৃতির সকল অর্থগর্ভ পর্বের ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ্রহণ করেছিলেন, এবং জীবনের প্রায় সকল স্তরের। এই সমগ্র পরিচয় থেকেই তিনি ভারত-ঐতিহ্যের একটি সামগ্রিক রূপ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, তারই ধ্যান আমাদের মনে ও হৃদয়ে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও যুগচেতনা

শ্রীগোপাল হালদার

একদিন চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের আখড়া বসত, আলাপ জমত পাড়াপড়শিদের জুটিয়ে, আলোচনার বিষয় ছিল গ্রামের সীমার মধ্যেই বদ্ধ।... এই সংসারের বাইরে মানব-ব্রহ্মাণ্ডের দিক্‌-দিগন্তে বিরাট ইতিহাসের অভিব্যক্তি নিরন্তর চলেছে, তার ঘূর্ণমান নীহারিকা আদ্যোপান্ত সনাতন প্রথায় ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর হয়ে ওঠে নি, তার মধ্যে এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের ঘাত-সংঘাতে নব নব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, ক্রমাগতই তাদের পরস্পরের সীমানার সংকোচন-প্রসারণে পরিবর্তিত হচ্ছে ইতিহাসের রূপ, এ আমাদের গোচর ছিল না।

'কালান্তরে'র এই ভূমিকা (১৯৩৩) রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকদের নিকট সুপরিচিত। সপ্ততি বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তখন দেখে এসেছেন কালান্তরের এক রূপ রাশিয়ায় (১৯৩০); আর তার প্রতিরূপ দেখছিলেন এখন ফাশিজ্‌ম্‌-এর উদ্দাম বর্বরতায়, সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ নির্দয়তায়। ঘাতসংঘাতে পরিবর্তমান ইতিহাসের জীবন্ত বিবর্ধমান রূপ এদিনেই যে কবি প্রথম দেখলেন তা নয়, কিন্তু তার কালকে তিনি নিশ্চয়ই অনেক বেশি স্পষ্ট করে উপলব্ধি করলেন এই ঘাতসংঘাতসংকুল কালান্তরের পটভূমিকায়, আর অনেক দৃঢ়পদেই কবি পদার্পণ করলেন জীবনের শেষ পর্বে—স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের দান ও দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের ধ্যান যেখানে মহামানবের ঐতিহাসিক আবির্ভাবের উদ্দেশে রচনা করেছে ঐকতান। ইতিহাসের বিচারে রবীন্দ্রজীবনের এই চরম অধ্যায়ই মনে হবে তাঁর প্রতিভার পরিণত প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের শেষ পরিচয় তিনি কালান্তরের কবি— জটিল যুগচেতনা কবিচেতনায় সংকেতায়িত।

কালের স্বরূপ

যে কাল রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল আজ তার সমগ্র রূপটা আমাদের নিকট স্পষ্ট, কারণ ইতিমধ্যে পর্বান্তর ঘটেছে, তার পরিবর্তমান রূপ আজ অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে পারে না। ইতিহাসের ভাষায় এ কালের সাধারণ নাম 'সাম্রাজ্যবাদের পর্ব'। যাকে আজ 'আধুনিক যুগ' বলা হয় সমসাময়িক আধুনিক তা নয়, হয়তো তাকে বলা উচিত প্রথম আধুনিক বা 'প্রাধুনিক'। রেনেসাঁসের কালান্তর আশ্রয় করে পাঁচ শত সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্বে এই আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল য়ুরোপখণ্ডে। কিন্তু ইতিহাসে তার জন্মকাল এখন থেকে তিন শত বৎসর আগে, আর তার জন্মভূমি ইংলণ্ড। পরিচিত নামেই তাকে নির্দেশ করা সমীচীন— সে পরিচিত নামটা বুর্জোয়া সমাজের যুগ, বাংলায় যাকে 'ধনিক যুগ' বলেও আমরা বলি। আপনার প্রকৃতিগত

নিয়মেই সে ভারতেও এসে হানা দেয়, সমস্ত পৃথিবীতেই বুর্জোয়া সমাজ প্রাধান্য বিস্তার করে। এ যুগের অগ্রণীরূপে নেতৃত্ব ও অগ্রাধিকার পেয়েছিল ইংরেজ, এবং তার পাশে পাশে য়ুরোপভূমির ফরাসি, ওলন্দাজ, জর্মান প্রভৃতি অন্যান্য জাতি। রবীন্দ্রনাথ যখন জীবনারম্ভ করেন তখন অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার গৃহযুদ্ধ সমাপ্ত করে সে যুগে পদার্পণ করছে, আর জাপানও তার সামন্ত-বিরোধ মিটিয়ে সেই 'মেইজি বিপ্লবে' বা বুর্জোয়া বিন্যাসে উদ্যোগী। এসব দেশে বুর্জোয়াতন্ত্র তখনও নতুন; ভারতে বা উপনিবেশে তো তার প্রকাশ মূলতঃই ব্যাহত। কিন্তু ইতিহাসের সামগ্রিক দৃষ্টিতে বলা যায়— উনিশ শতকের মধ্যভাগ ছিল পৃথিবীতে বুর্জোয়া যুগের প্রাণবন্ত বিকাশের পর্ব, তার পরে তার প্রতাপ বাড়ে কিন্তু প্রাণশক্তির ক্ষয় শুরু হয়। প্রতাপের অন্তরালে সে ক্ষয় তখনও গোপন করা চলত বলেই মনে হয়েছে, বুঝি সেই বুর্জোয়া যুগের বৈভব অফুরন্ত। রবীন্দ্রনাথের জন্মকাল (১৮৬১) না-হোক শৈশবকালেই (আনুমানিক ১৮৭০-৮০র মধ্যে) এই বুর্জোয়া যুগের নতুন পর্বের সূচনা— সে পর্বের নাম ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের পর্ব বা সাম্রাজ্যবাদী পর্ব। আজ আমাদের কাছে নামোচ্চারণেই তার চরিত্র ও রূপ স্পষ্ট, সেদিনে তা হবার কারণ ছিল না। সেদিন 'বুর্জোয়া' পরিচয়ও অখ্যাতির ছিল না, ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ ছিল সম্ভ্রমের পরিচয়। পর্বান্তর ঘটেছে বলেই আজ পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজে ও সাধারণ মানুষের সমাজে দুটি নামই ধিক্‌কৃত। কারণ, উনবিংশ শতকের শেষ পাদে (১৮৭৫-১৯০০) দেখি এক দিকে সাম্রাজ্যের লোভে ইংরেজ, ফরাসি, জর্মান প্রভৃতি প্রত্যেকটি বুর্জোয়া শক্তি প্রত্যেকের প্রতিদ্বন্দ্বী; অন্য দিকে বিশ্বগ্রাসের চেষ্টায়, এশিয়া-আফ্রিকায় শ্বাপদবৃত্তিতে প্রত্যেকেই সমান নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ, অর্থাৎ বুর্জোয়া সভ্যতা স্বার্থরক্ষায় আর ভদ্রতা রক্ষা করতে অক্ষম। এর পরেই অনিবার্য নিয়মে সে শতাব্দীর শেষ মুহূর্তে এল সাম্রাজ্যবাদের সংকটকাল— রবীন্দ্রনাথ যখন সাধনা-ভারতী-বঙ্গদর্শনে রাজনৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত। শতাব্দীর সূর্য রক্তমেঘে অস্ত গেল, এল বিংশ শতাব্দী; সাম্রাজ্যবাদী সংকট পরিণত হল সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামে (১৯১৪-১৯১৮); আর তারই মধ্যে যুগশেষের সূচনা নিয়ে এল শ্রমিক-বিপ্লব (১৯১৭ নবেম্বর), শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, সমাজতন্ত্রের উন্মেষ। এল স্বভাবতঃই কালান্তর— ফাশিজ্‌ম্‌রূপে, সাম্রাজ্যবাদরূপে, বুর্জোয়া যুগের তা আত্মরক্ষার উন্মাদ চেষ্টা— যাতে প্রকটিত হল সভ্যতার সংকট— দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)। এই প্রায় আশি বৎসর কালের মধ্যে— বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদী পর্ব ও পর্বান্তরের কালে (১৮৭০-১৯৪৫) রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রকাশ। মনে রাখা দরকার— শুধু বুর্জোয়া-নেতৃত্বের ক্ষয় ও শ্রমিক-নেতৃত্বের উন্মেষ ও সামাজিক আবর্তনই এই সময়ের মধ্যে ঘটে নি, মানুষের চেতনায় রুচিতে সংস্কৃতিতেও ঘটেছে বিরাট রকমের পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথ এ সকলেরই সাক্ষী; আর শুধু সাক্ষী নন, রবীন্দ্রপ্রতিভা তার সারথিও। কারণ মানব-সত্য তাঁর সমগ্রজীবনের জিজ্ঞাসা, আর মানুষের ভবিষ্যৎ তাঁর আমরণ ধ্যান।

এই ছিল রবীন্দ্রনাথের কালের সার্বভৌমিক রূপ। বুর্জোয়া যুগ প্রথম থেকেই পৃথিবীকে আয়ত্ত করবার জন্য উন্মুখ। পৃথিবীব্যাপী শোষণজাল বিস্তারের সূত্রে বুর্জোয়া শক্তিসমূহ পৃথিবীর

প্রায় সকল জাতিকে শত্রুতায় মিত্রতায় পরস্পরের সঙ্গে বিজড়িত করে ফেলে। কিন্তু পৃথিবীর সকল জাতির বিকাশ সমান হয় নি। বুর্জোয়া যুগের সার্বভৌম রূপও তাই দেশে দেশে বিচিত্র দেশীয় রূপে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষে তার বিশেষ রূপটা আমরা জানি— রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই ভারতবর্ষে জেগেছিল স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতার স্বপ্ন। তাঁর বিদায়কালে (১৯৪১) নিশান্তের অন্ধকারেও জানি সে স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠতে আর বাকী নেই। এ দেশে তাই রবীন্দ্রনাথের কালটার সাধারণ নাম 'স্বাদেশিকতার যুগ', স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগ। কিন্তু এই স্বাদেশিকতার ও স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গেই জড়িত এ দেশে বুর্জোয়া শিল্পায়নের ও সামাজিক আবর্তনের প্রশ্ন, আর তাই একই সঙ্গে জড়িত ভিতরের মধ্যযুগীয় সামন্তসমাজের অবসানের প্রশ্ন ও বাইরের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ অপসারণের প্রশ্ন। এ প্রশ্ন যে জটিলতা সৃষ্টি করতে বাধ্য তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কারণ, স্বাদেশিকতাই যাঁদের একমাত্র ধ্যান অনেকেই তাঁরা জাত্যভিমানের বশে দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বহু সমাজবিধি ও ধ্যানধারণাকে মনে করেছেন 'ভারতীয় ঐতিহ্য'। আবার, বুর্জোয়া আধুনিকতার ভাবধারায় যাঁরা আগ্রহশীল তাঁদের অনেকে ব্রিটিশ শাসনকেই মনে করেছেন আধুনিকতার পরিপোষক। তাই অনেকেই যাঁরা রাজনীতিতে গোঁড়া ন্যাশনালিস্ট ও স্বাধীনতাবাদী ছিলেন, সমাজনীতিতে তাঁরা ফিউডালিজ্‌ম্-অপসারণে ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রসারে তত আগ্রহশীল ছিলেন না। আবার অনেকেই যাঁরা ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য ও ফিউডালিজ্‌ম্-অপসারণে ছিলেন উদ্‌গ্রীব, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁদের আগ্রহ দেখা যেত শিথিল। সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব নয়। ভারতীয় সমাজ যে তাই ভিতরের ও বাইরের এই জটিল ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নানা ব্যাহত ও বিকৃত প্রচেষ্টায় আপনার শক্তি ক্ষয় করতে করতে আপনার আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়েছে, আজ আমাদের কাছে তা আর অবিদিত নেই। তাতে আমাদের জাতীয় সাফল্যও যেমন প্রকট, তেমনি জাতীয় ব্যর্থতাও।

ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন যে-পরিবারপরিবেশে সেখানে ভারতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার আবহাওয়ায় অত ঘূর্ণির সৃষ্টি হয় নি। ফিউডালিজ্‌ম্-রীতির পিছুটান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে কতকটা ছিল— কিন্তু ইতিপূর্বেই তাঁরা নোঙর ফেলেছিলেন সনাতন সমাজের বাইরের ঘাটে। আবার সেই গৃহেই সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির বুর্জোয়া কালের ধ্যানধারণা ও রাজনীতির প্রতি ছিল আগ্রহশীলতা ; কিন্তু স্বাদেশিকতার নোঙর ছিঁড়ে ভেসে বেড়াবার মতো ইচ্ছা তাঁদের কিছুমাত্র ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথ আশৈশব মানুষ এই স্বাদেশিকতার সুস্থ জগতে। আধুনিক কালের এই স্বদেশীয় রূপেরও তিনি সাক্ষী, এবং শুধু সাক্ষী নন, সম্ভবতঃ ভারতীয় সমাজবিবর্তনের ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের তিনিই শ্রেষ্ঠ সাধক— ভারতখণ্ডে কালান্তরের 'গ্রেট সেন্টিনেল'। 'গ্রেট' এজন্য যে, তিনি মানব-মহাসমাজের দেশিক রূপকে একান্ত করে দেখেন নি, মহামানবের বিশ্বরূপদর্শন করে তারই মধ্যে তাঁর স্বদেশ-আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করেছেন ;

এবং মহাকালের অখণ্ড ইতিহাস থেকেও তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি তাঁর স্বদেশের উপস্থিত পর্বকে, কিংবা ভারতের সামগ্রিক সাধনধারাকে। তাঁর দৃষ্টিতে ছিল এই সমগ্রতা, আর তাঁর সৃষ্টিতেও রয়েছে এই ঐক্যের সূত্র।

রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পরাধীন ভারতের বিশিষ্ট সমাজবিবর্তনের সমস্যা বিশেষ করে আলোচনা করেছেন— জাতীয় ঐক্যের প্রশ্ন, ভারতীয় ঐতিহ্যের ও বৈশিষ্ট্যের প্রশ্ন, শিক্ষা ও সাধনার প্রশ্ন, জাতিগঠনের প্রশ্ন, এমন কি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রশ্ন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের নানা সমস্যার কথা নিয়ে তেরো বৎসর থেকে আশি বৎসর বয়স পর্যন্ত এসব আলোচনায় কখনো তিনি ক্ষান্ত হন নি। নিশ্চয়ই এই সুদীর্ঘকালের আলোচনায় তৎসাময়িক ছিল অনেক কথা, কিন্তু মূল কথাগুলি স্বদেশীয় ভাবনার বিশেষ ঐক্যসূত্রে গ্রথিত— প্রধানতঃ যা 'স্বদেশী সমাজে' তিনি প্রকাশ করেছেন— দেশকে প্রীতির মধ্য দিয়ে সেবার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করতে হবে ; বিরোধের মধ্যে ঐক্য স্থাপনেই হবে সেই সৃষ্টির মূলনীতি ; স্বজাতির সঙ্গে সর্বজাতির প্রীতির হবে সমন্বয়। আবার, কালের দিক থেকে বিচার করলে দেখব— এই কালের বোধ বা যুগচেতনা থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি স্বদেশসমস্যা বা তার বিশিষ্ট সমস্যারও সমাধান সন্ধান করেন নি, সেরূপ সমাধান সম্ভব বলেও মনে করতেন না। এইখানেই তাঁর ও গান্ধীজির দৃষ্টির বড় পার্থক্য। যুগচেতনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যতটা মুক্ত, গান্ধীজির মধ্যে ততটা নয়।

সাম্রাজ্যবাদী পর্বের চরিত্র, এমন কি, সমগ্র বুর্জোয়া সমাজের স্বরূপও আজ আমাদের নিকট দুর্বোধ্য নয়। তার সহজ কারণ— আমরা পরে জন্মেছি ; পূর্বজদের তপস্যার ফলভাগী হই আজ আমরা অবলীলাক্রমে। তাঁদের পক্ষে কিন্তু এ সত্য আবিষ্কারে কম তপস্যার প্রয়োজন হয় নি। ঘাতপ্রতিঘাতসংকুল ইতিহাসের মধ্য থেকে তাদের বুঝতে হয়েছে তার গুণাবলী, যা নিয়ে বুর্জোয়া যুগচরিত্র, আবিষ্কার করতে হয়েছে কি তার তৎকালীন লক্ষণ, কি তার ঐতিহাসিক ভূমিকা। বুর্জোয়া-যুগচরিত্র মার্কস-এঙ্গেলসই প্রণিধান করতে পেরেছিলেন উনিশ শতকের মধ্যভাগে (১৮৪৮ সালের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো নিঃসন্দেহ তার ঠিকুজিপত্র) ; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পর্বের বিশেষত্ব তাঁরাও ব্যাখ্যা করে যান নি— তা লেনিনের মনীষার দান। বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে এখন আমাদের মত সাধারণ মানুষেরও পক্ষে তার স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ সম্ভব হয়ে গেছে। লেনিনের সেই 'ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্'-এর সম্পূর্ণ তত্ত্ব প্রকাশিত হয় কিন্তু বিংশ শতকে (১৯১৬)— প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে (১৯১৪) 'সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রাম'রূপে অভিহিত করা, সাম্রাজ্যবাদের সেই স্বরূপ সর্বসমাজে প্রতিষ্ঠা করা লেনিনের অসামান্য মনীষারই কীর্তি। তুলনা না করে স্মরণ করতে পারি প্রায় এ সময়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লড়াইয়ের মূল' (সবুজপত্র, ১৩২১ পৌষ) রচনা করেন ও বিদেশে 'ন্যাশনালিজ্‌ম্'-বক্তৃতাবলী (১৯১৬) প্রদান করেন। ইতিহাসের একই ব্যাধির স্বরূপ লেনিন উদ্‌ঘাটন করেন বৈজ্ঞানিকের কঠিন দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে, রবীন্দ্রনাথ মানবিকতার দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে।

কিন্তু তার স্বরূপ সম্বন্ধে দুজনাই কৃতনিশ্চয়। অথচ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ দৃষ্টিক্ষেত্রে পৌঁছানো সহজসাধ্য ছিল না। স্বাদেশিকতার ক্ষেত্র থেকে পরাধীন জাতির মানুষের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জন্ম থেকেই পরিচয় ঘটা অনিবার্য, কিন্তু জাতীয়তারই যে অসংযত পরিণতি সাম্রাজ্যবাদে, এ সত্য উপলব্ধি করতে সেজন্যই স্বাদেশিকতাবাদীদের আপত্তি হয়। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের বিশেষ পরিবেশে সাম্রাজ্যবাদ তো সহজে একটা দুরপনেয় অভিশাপ বলে অনুভূত হয় নি— ব্রিটিশ বুর্জোয়া-ব্যবস্থার অনেকখানি মোহাবরণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কুৎসিত রূপকে অনেকদিন পর্যন্ত আচ্ছাদন করা গিয়েছিল। তাই রবীন্দ্রচেতনায় যে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ এবং শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া কালেরও রূপ যে ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ ধরা পড়ল, তা কম বিস্ময়কর ব্যাপার নয় — চারিদিকের প্রতিবেশে এই উপলব্ধির অনুকূল হাওয়া বেশি বইত না। রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য থেকেও আমরা তা জানতে পারি। স্বকীয় চেতনাকে সেই যুগচেতনার দিকে প্রসারিত করা, আর যুগচেতনাকে সেই স্বকীয় চেতনার স্বকীয়তার মধ্যেও স্বীকার করা— রবীন্দ্রপ্রতিভার এ এক বিস্ময়কর সাধনা।

প্রথম পরিচয়

তাঁর শৈশবকালীন পরিবেশের প্রচলিত ধারণার কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলেছেন— বলেছেন কালান্তরেও—

যুরোপের যে অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, সেই ইংলণ্ড তখন ঐশ্বর্যের ও রাষ্ট্রীয় প্রতাপের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। অনন্তকালে কোনো ছিদ্র দিয়ে তার অন্নভাণ্ডারে যে অলক্ষ্মী প্রবেশ করতে পারে, এ কথা কেউ সেদিন মনেও করে নি। প্রাচীন ইতিহাসে যাই ঘটে থাকুক, আধুনিক ইতিহাসে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্ণধার তাদের সৌভাগ্য যে কোনোদিন পিছু হটতে পারে, বাতাস বইতে পারে উল্‌টো দিকে, তার কোনো আশঙ্কা ও লক্ষণ কোথাও ছিল না।

শুধু 'প্রতাপ' ও শুধু 'সৌভাগ্যে'ই এ সম্ভ্রমের উদ্রেক হয় নি। হয়েছিল তা আরও বড় ব্যাপারে—

রিফর্মেশন যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন যুগে য়ুরোপ যে মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যে লড়েছিল, সে দিন তার সে আদর্শে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয় নি।··· আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে এক দিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর-এক দিকে ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা। কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে ভারতের শাসনকর্তৃত্বে ইংরেজের শরিক হতেও পারি এমন কথা মনে করা যে সম্ভব হয়েছিল, সেই জোর কোথা থেকে পেয়েছিলেম? কোন্ যুগ থেকে সহসা কোন্ যুগান্তরে এসেছি? মানুষের মূল্য, মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এত আশ্চর্য বড়ো হয়ে দেখা দিল কোন্ শিক্ষায়? অথচ আমাদের নিজের পরিবারে প্রতিবেশে, পাড়ায় সমাজে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা সম্মানের দাবি, শ্রেণীনির্বিচারে ন্যায়সংগত বিচারের সমান অধিকারতত্ত্ব এখনো

সম্পূর্ণরূপে আমাদের চরিত্রে প্রবেশ করতে পারে নি। তা হোক, আচরণে পদে পদে প্রতিবাদ সত্ত্বেও য়ুরোপের প্রভাব অল্পে অল্পে আমাদের মনে কাজ করছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা।...

এই প্রভাব বুর্জোয়া জীবনের ও বুর্জোয়া মতাদর্শের। কিন্তু একটু বিচার করলেই বুঝতে দেরি হয় না, কেন তা আমরা আমাদের জীবনে অঙ্গীভূত করতে পারি নি। কারণ, এই নতুন মূল্য (ভ্যালুজ) এসেছিল বাইরে থেকে ; য়ুরোপ থেকে নিশ্চয়ই, তবে বিশেষ করে ইংরেজের ইতিহাস ও ইংরেজি সাহিত্যের আধার আশ্রয় করে। কিন্তু মুখ্য কথাটা এই— বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা আমাদের জীবন থেকে উদ্ভূত হয় নি। সেরূপে উদ্ভূত হলে আমাদের জীবনও স্বাভাবিক ভাবেই বুর্জোয়া আদর্শে রূপায়িত হত ; দেখা যেত, ব্যক্তি পেয়েছে পরিবারে পরিবেশে মর্যাদা, মানবাধিকার (রাইট্‌স্ অব ম্যান) হয়েছে সমাজে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত ; ন্যায়নীতির সার্বজনীন অধিকার (রুল্ অব ল) হয়েছে স্বীকৃত। কিন্তু ইংরেজের প্রবর্তনায় বুর্জোয়া ব্যবস্থা এল খণ্ডিত আকারে, বিকৃত উদ্দেশ্যে— আমাদের বুর্জোয়া আদর্শে উদ্বর্তন তার কাম্য নয়।

'ইতিহাসের অ-চেতন যন্ত্র'

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে বাংলাদেশে চণ্ডীমণ্ডপের কাল কেন একেবারে যায় নি, তা বোঝা তাই সহজ। কিন্তু সে কাল যে যেতে বসেছে, যাওয়া তার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, এ কথাও তেমনি পরিষ্কার। কারণ, গ্রামের সীমার মধ্যে জীবন তখন আর বদ্ধ নেই ; সেই সীমার মধ্যে আলোচনাও তাই বদ্ধ থাকা অসম্ভব। যাত্রা সংকীর্তন কথকতা রামায়ণপাঠ পাঁচালি কবিগান নিয়ে চিত্তানুশীলনে সেদিন বাঙালি-চিত্তেও জাগছে অসম্পূর্ণতাবোধ। তাই মধুসূদন বঙ্কিম এবং বাংলা নাট্যমঞ্চ তখনই সমাদৃত। বৈষয়িক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া-বিকাশ থেকে বঞ্চিত, সমাজের অভ্যন্তরে বুর্জোয়া-প্রেরণা ব্যাহত হলেও বুর্জোয়া-ভাবাদর্শ আমাদের মানসলোকে তখনই অমিত আবেগ ও প্রেরণা সঞ্চার করছে। সন্দেহমাত্র নেই— 'ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিচিত্র ব্যাপার।'

ব্রিটিশ বুর্জোয়ার মূল রূপটা ভারতের শিক্ষিত শ্রেণীর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের শৈশবকালে (১৮৬১-১৮৭৫) যে গুরুতর ঠেকে নি তার প্রধান কারণ আজ আমরা জানি— তখনও বুর্জোয়া সমাজ একেবার দেউলে হয় নি ; ইংরেজ তখনও আপনার গৃহীত সেই শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া-মূল্যসমূহে বিশ্বাস রাখত, বিশ্বাস রাখতে তার বাধাও হয় নি। ভারতবাসীর পক্ষে আরও কারণ ছিল— তা ইংরেজের ইতিহাস, ইংরেজের সাহিত্য, ইংরেজের জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলনধারার সন্দেহাতীত মহত্ত্ব। 'য়ুরোপের চিত্তদূতরূপেই' সেদিন ভারতবাসী ইংরেজকে জানতেন। আর সত্যই বুঝেছিলেন যে, য়ুরোপ একটা প্রবল উদ্যমের বেগে যেখানে পা বাড়িয়েছে সেখানটাই যে অধিকার করেছে, তা কিসের জোরে ? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

সত্যসন্ধানের সততায়। বুদ্ধির আলস্যে, কল্পনার কুহকে, আপাতপ্রতীয়মান সাদৃশ্যে, প্রাচীন পাণ্ডিত্যের

অনুবর্তনে সে আপনাকে ভোলাতে চায় নি, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যা বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকতে চায় তার প্রলোভনকেও সে নির্মম ভাবে দমন করেছে। নিজের সহজ ইচ্ছার সঙ্গে সংগত করে সত্যকে সে যাচাই করে নি। প্রতিদিন জয় করেছে সে জ্ঞানের জগৎকে, কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্মুক্ত।

—কালান্তর

এ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কথা। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজকে এই অধ্যাত্মসম্পদের বাহক বলেই বলেছেন 'য়ুরোপের চিত্তদূত'। এ কথা একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু আজ আমরা জানি—আসলে ইংরেজ এ হিসাবে ইতিহাসেরই অগ্রদূত, সে অ-চেতন যন্ত্র ইতিহাসের সত্যের, 'অন্‌কন্‌শাস্‌ ইন্‌স্ট্রুমেনট্‌ অব্‌ হিস্ট্রি।' বাস্তবক্ষেত্রে সে ভারতের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রকে ভেঙেছে, শোষিতের মনে জাগিয়েছে তার বিরুদ্ধে বিরূপতা। ইংরেজের সাহিত্য, তার ইতিহাস, তার শিক্ষাদীক্ষা ভারতবাসীর ভাবলোকে ঘটিয়েছে বিপ্লব, শাসিতের মনে জাগিয়েছে স্বাদেশিকতার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা।

ইংরেজের সঙ্গে যোগের এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বিশেষ করে কার্যকর হয়েছিল সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের জন্মকালেই আমরা বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীমণ্ডপের যুগ উত্তীর্ণ হচ্ছিলাম। মধ্যযুগ সাহিত্যে শেষ হচ্ছিল, সাহিত্যাদর্শ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, দেবতার কাহিনীর পরিবর্তে মানুষের কথা সাহিত্যের প্রধান বিষয় হয়ে পড়ছে, স্বর্গের স্থান নিয়েছে মর্ত্যভূমি। সঙ্গে সঙ্গে গতানুগতিকতার স্থান নিয়েছে দুঃসাহসী কল্পনা, আবিষ্কৃত হচ্ছে নূতন বাণীরূপ। বাংলার সেই সাহিত্যবিপ্লব রবীন্দ্রনাথেই লাভ করবে পূর্ণতা। যে বিশেষ ধারা তাতে প্রবল হবে তাও আমরা এই কালের মূল লক্ষণ মনে রাখলেই অনুমান করতে পারি। বুর্জোয়া উদ্যম-আবেগ আমাদের বাস্তব জীবনে নিরুদ্ধগতি; আর্থিক উদ্যোগে রাজনৈতিক কর্তৃত্বে, সামাজিক বিন্যাসে তার পথ নেই। প্রধানতঃ মনের ভাবনায় কল্পনায় তার স্রোত যখন প্রবাহিত হল তখন সে স্রোত ক্ষিপ্রতর হতে বাধ্য; দুকূলপ্লাবী ভাবোন্মাদনায় ও ভাষার উদ্বেলতায়, বস্তুবিমুখী ভাবতন্ময়তায় ও আবর্তসংকুল অন্তর্মুখিতায় তার প্রকাশ ঘটাও সুসম্ভব। তত্ত্ববোধিনীর মধ্য থেকেই তার সূচনা লক্ষ্য করা যায়— অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের বাস্তব বিচারের সঙ্গেই ছিল দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মপিপাসা ও ভাবুকতা। মাইকেলের মহাকাব্যিক উদ্যম অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে গেল; ভাবাবেগ সম্পূর্ণতা লাভ করল বীরাঙ্গনার পত্রমালায়, ব্যক্তিহৃদয়ের বাণীবাহী সনেটসমূহে। তাঁর সমসাময়িক বিহারীলাল বাংলা কবিতায় আত্মতন্ময়তার উৎসমুখ উন্মুক্ত করে দিলেন। তারপর রবিকরস্পর্শে সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ নিশ্চয়ই অসামান্য প্রকাশ। কিন্তু মোটের উপর রবীন্দ্রপ্রতিভা এই অন্তর্মুখী ধারারই শ্রেষ্ঠ বাণীবাহন— ভাষার উদ্বেলতা ও ভাবের প্রবাহ সেই প্রতিভার সুঠাম রূপ-সাধনার সর্বত্র সহায়তা করে নি। 'ইতিহাসের অ-চেতন যন্ত্রের' প্রক্রিয়া এ ভাবেই আবার কার্যকর হয়েছে আমাদের আত্মপ্রকাশের সাধনায়— প্রকাশে তাকে প্রবুদ্ধ করেছে, অথচ বিশেষ করে করেছে ভাবোদ্বেল।

সাম্রাজ্যবাদীর স্বরূপ-উপলব্ধি

যৌবনে পদার্পণ করতে করতেই রবীন্দ্রনাথ দেখলেন কালের এই পূর্বরূপ পরিবর্তিত— বুর্জোয়া সভ্যতার সৃজনপর্ব শেষ হয়ে আসছে, আর দেখা দিচ্ছে তার মারণপর্ব, সাম্রাজ্যবাদী প্রচণ্ডতা। ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে অবশ্য তিনি বুর্জোয়া শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর ও শ্রেষ্ঠ মনস্বীদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হচ্ছিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দেখছিলেন, যেমন পার্লামেণ্টে আইরিশ সভ্যদের প্রতি আচরণ লক্ষ্য করে বুঝেছিলেন, সে শ্রেষ্ঠ সম্পদকে স্বার্থের দায়ে শোষণের প্রয়োজনে বাইরের পৃথিবীতে বাতিল করাই সাম্রাজ্যবাদের নিয়ম। 'সাধনা'র (১২৯৮-১৩০১) পৃষ্ঠায় স্বদেশ ও বিদেশের নানা আলোচনা উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথের এই যুগপরিচয় অগ্রসর হয়ে চলে। পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী যুগসমীক্ষার সূচনা হয় তখন থেকে, 'এবার ফিরাও মোরে' (১৮৯৪) যেন সেই ঘোষণারই কাব্যরূপ। শতাব্দীর আরম্ভেই নৈবেদ্যের সুপ্রসিদ্ধ সনেট দুটিতে রবীন্দ্রনাথ যুগের সর্বনাশী রূপকে মূর্ত করে তোলেন; 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘমাঝে অস্ত গেল'— দক্ষিণ আফ্রিকায় ও চীনে সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের উৎকটতায় এ সনেট রচিত। 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত' বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদেরই স্বরূপবর্ণনা। মিলটন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের কোনো কোনো সনেটের মতোই এ সনেট দুটিতে রবীন্দ্রনাথের গভীর যুগদৃষ্টির সুগম্ভীর স্বাক্ষর স্পষ্ট। রাজনৈতিক আলোচনা থেকে দেখি চীন কঙ্গো এশিয়া আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকার ঔপনিবেশিক অঞ্চলের ভাগ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবহিত— সমগ্রভাবে সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতিও তাঁর নিকট সুস্পষ্ট। স্বাভাবিকভাবে স্বাদেশিকতার ভাবনাতেই প্রায়শঃ এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (১৮৯৩) ও 'রাজনীতির দ্বিধা' থেকে 'সফলতার সদুপায়' (১৯০৪) পর্যন্ত বহু প্রবন্ধে। রেনাঁর অনুসরণ করে 'নেশন কি' (১৯০১) এ প্রশ্ন বিচার করে তিনি দেখালেন সাম্রাজ্যবাদ নেশন-বাদেরই পরিণতি— 'রাষ্ট্রধর্ম' মানবধর্মকেই অস্বীকার করে। 'ন্যাশনালিজ্‌ম্'-বক্তৃতাবলীর (১৯১৬) পনেরো বৎসর পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন— যখন ভারতবর্ষ 'নেশন' হবার চেষ্টায় উদ্যোগী, 'নেশন' না হতে পেরেই দুর্দশাগ্রস্ত। ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তির পরিবর্তিত ভূমিকাও তাঁর নিকট স্পষ্ট। কার্জনি সাম্রাজ্যবাদের ভাষাগত ভেদসৃষ্টির চেষ্টা উপলক্ষ করে 'সফলতার সদুপায়' (১৯০৪) রচিত। প্রারম্ভেই তিনি উল্লেখ করেছেন—

> ভারতবর্ষে একচ্ছত্র ইংরেজ-রাজত্বের প্রধান কল্যাণই এই যে তাহা ভারতবর্ষের নানা জাতিকে এক করিয়া তুলিতেছে। ইংরেজ ইচ্ছা না করিলেও এই ঐক্যসাধনপ্রক্রিয়া আপনা-আপনি কাজ করিতে থাকিবে।
>
> —আত্মশক্তি, সফলতার সদুপায়

'ইচ্ছা না করিলেও'— কারণ ইংরেজ সেখানে 'অন্‌কনশাস্ ইনস্ট্রুমেণ্ট অব হিস্ট্রি'। কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদী স্তরে সেই ইংরেজই ভেদসৃষ্টির প্ররোচক ও প্রবর্তক। সাম্রাজ্যবাদী পর্বে এই তার বিশেষ ভূমিকা।

অধীন দেশকে দুর্বল করা, তাহাকে অনৈক্যের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের কোনো স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া, সমস্ত শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নির্জীব করিয়া রাখা— এ বিশেষভাবে কোন্ সময়কার রাষ্ট্রনীতি, যে সময়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলি কীট্‌স্ টেনিসন ব্রাউনিং অন্তর্হিত এবং কিপলিং হইয়াছেন কবি; যে সময়ে কার্লাইল রাস্কিন ম্যাথু আর্নল্‌ড আর নাই, একমাত্র মর্লি অরণ্যে রোদন করিবার ভার লইয়াছেন; যে সময়ে গ্লাড্‌স্টোনের বজ্রগম্ভীর বাণী নীরব এবং চেম্বারলেনের মুখর চটুলতায় সমস্ত ইংলণ্ড উদ্‌ভ্রান্ত; ···যে সময়ে পীড়িতের জন্য, দুর্বলের জন্য, দুর্ভাগ্যের জন্য দেশের করুণা উচ্ছ্বসিত হয় না, ক্ষুধিত ইম্পীরিয়ালিজম্ স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে; যে সময়ে বীর্যের স্থান বাণিজ্য অধিকার করিয়াছে এবং ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশিকতা— ইহা সেই সময়কার রাষ্ট্রনীতি।

—আত্মশক্তি, সফলতার সদুপায়। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩, পৃ ৫৫৯-৬০

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' অবশ্য ১৯০১ সালের লেখা— নৈবেদ্যের সময়কার প্রবন্ধ (ভারতবর্ষ, রবীন্দ্ররচনাবলী ৪)। গিজোর সভ্যতার সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ নিপুণ গবেষকের মতোই বুঝেছেন—

জগতে সভ্যতা এই প্রথম নিজের বিশেষ মূর্তি বর্জন করিয়া দেখা দিয়াছে। এই প্রথম তাহার ঠিকানা বিশ্বব্যাপারের বিকাশের ন্যায় বহুবিভক্ত, বিপুল ও বহু চেষ্টাগত।

এটা চিরন্তন সত্যের পথ— বিশ্বমানবের ঐক্যের পথ। কিন্তু খণ্ড খণ্ড দেশ নিয়ে যে য়ুরোপ, তার সভ্যতার একটা বিষয়েই ঐক্য দেখতে পাই— তা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ— অবশ্য য়ুরোপীয় সভ্যতা বলতে আধুনিক ইতিহাসের বুর্জোয়া সভ্যতাই বোঝায়— বিশেষ করে তার এই সাম্রাজ্যবাদী স্তর।

পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্ব সূচনা দেখা যাইতেছে।···

রাষ্ট্রতন্ত্রে মিথ্যাচরণ সত্যভঙ্গ প্রবঞ্চনা এখন আর লজ্জাজনক বলিয়া গণ্য হয় না।··· এখন গত শতাব্দীর সাম্য-সৌভ্রাত্রের মন্ত্র য়ুরোপের মুখে পরিহাসবাক্য হইয়া উঠিতেছে।···

জাতিধর্মের অতীত যে 'একটি শ্রেষ্ঠধর্ম আছে, তাহা মানবসাধারণের'; জাতিপ্রেম, রাষ্ট্রধর্ম তাকেই আঘাত করছে।

রবীন্দ্রনাথের এই সাধনা যুগের ও স্বদেশী যুগের ধারণাগুলি যে নিতান্ত ভাসা-ভাসা ধারণা নয়, রাষ্ট্র সমাজ সংস্কৃতি সকল দিক থেকে অনুধাবন করেই তা গঠিত, তার বহু সাক্ষ্য রয়েছে এসব লেখায়। এসব প্রবন্ধ ও আলোচনার বিশেষ গুরুত্ব এই যে, তা থেকে বুঝতে পারি এই বিংশ শতকের প্রাক্‌ক্ষণে ও প্রত্যূষেই রবীন্দ্রনাথের এই কালচরিত্র সম্বন্ধে চেতনার উন্মেষ হয়েছে; দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী না হয়েও তিনি বুঝেছেন— প্রথমতঃ স্বার্থে স্বার্থেই সংঘাত বেধেছে; দ্বিতীয়তঃ জাতিপ্রেম বা সংকীর্ণ ন্যাশনালিজ্‌মৃই পরিণত হয়েছে সর্বগ্রাসী পরজাতিবৈরিতায় বা সাম্রাজ্যবাদে, তাই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধও সমাসন্ন; তৃতীয়তঃ, সমগ্রভাবে বুর্জোয়া সমাজের অভ্যন্তরে তাই রয়েছে দ্বন্দ্ব; চতুর্থতঃ, অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে প্রত্যেক দেশের বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে। কারণ একদিন শ্রেয়ই ছিল তার প্রেয়, এখন হয়েছে স্বার্থ; কিন্তু শ্রেয়োবোধ একেবারে বিসর্জন দেওয়াও তার পক্ষে দুঃসাধ্য—

এই তার রাজনীতির দ্বিধা। এই শেষ ধারণার জন্যই রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পর্যন্ত মনে করতেন— এই শ্রেয়োবোধের মুখপাত্ররাই, সমাজের মানবতাবাদী নেতারাই, একদিন সমাজকে এই স্বার্থের অপঘাত থেকে বাঁচাতে বিদ্রোহ করবেন, অচলায়তন ভাঙবেন মহাপঞ্চক; যক্ষপুরী ধ্বংসের কাজেও রাজাই হবেন নেতা; আর তাই সেই ভাঙনের শক্তি এই শ্রেয়োবোধের নেতৃত্বে পরিণত হবে সৃষ্টির শক্তিতে, দ্বন্দ্ব এসে পৌঁছবে সৃজনশীল সুষমায়। বলা বাহুল্য, এই বিদ্রোহ-নেতৃত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রদৃষ্টির বিবর্তন বিংশ শতকের এই পর্বের আলোচ্য নয়— এ পর্বে বিশেষ করে তাঁর আলোচ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের কবলিত জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা, অর্থাৎ ভারতীয় স্বাদেশিকতার বিশেষ সমস্যা।

যে মূলনীতি তিনি স্বদেশের ক্ষেত্রে আবিষ্কার করেন তা হচ্ছে প্রথমতঃ আত্মশক্তির নীতি, দ্বিতীয়তঃ সাম্রাজ্যবাদীর ভেদনীতির বিরুদ্ধে আত্মগঠনের নীতি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের নীতি; তৃতীয়তঃ নেশনবাদের বিরুদ্ধে স্বাদেশিকতার পাদপীঠ হিসাবে ভারতীয় সমাজসমন্বয়ের নীতি। আর যা তিনি মূলসাধনা রূপে গ্রহণ করেন তা হচ্ছে সৃজন-সাধনা— সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশকে আপনার করা--- 'স্বদেশী সমাজে' (১৯০৪) যা ব্যাখ্যাত হয়। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-তত্ত্বও এ প্রবন্ধে আমাদের বিশেষ আলোচ্য নয়, কিন্তু তার গুরুত্ব বোঝা প্রয়োজন। কারণ, যুগধর্মের যে বিশেষ রূপ স্বদেশেই প্রত্যক্ষ, সেই বিশেষ রূপকে সম্পূর্ণ স্বীকার করেই তিনি সমগ্রভাবে যুগের সার্বভৌমিক স্বরূপও উপলব্ধি করেছেন। এই দৈশিক সত্যের স্বীকৃতি যদি না থাকত তা হলে রবীন্দ্রনাথের সাম্রাজ্যবাদ-সম্বন্ধীয় ধারণা অবাস্তব হয়ে উঠত; আর স্বদেশীয় ক্ষেত্রেও যদি সেই স্বাদেশিকতার যুগে তিনি নেশন-বাদে আচ্ছন্ন হতেন, তা হলেও তাঁর যুগচেতনা সংকুচিত ও অলীক বলেই প্রমাণিত হত।

শিল্পচেতনায় যুগরূপ

যেই যুগচেতনার প্রথম আভাসে রবীন্দ্রনাথ 'এবার ফিরাও মোরে' লিখেছিলেন, তারই উন্মেষে তিনি কর্মক্ষেত্রেও অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগেও স্থান গ্রহণ করেছিলেন। সেই যুগচেতনার প্রবর্তনাতেই তিনি স্বদেশী আন্দোলনের শূন্যময় উত্তেজনার পরিমণ্ডল ত্যাগ করেও, গ্রহণ করেন নিজের মতো করে 'স্বদেশী সমাজ' গঠনের কাজ তাঁর জমিদারিতে। কিন্তু এই রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ড অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অনেক বেশি গুরুতর, আর প্রকৃতপক্ষে সেখানেই তো তাঁর কবিচেতনার পরীক্ষা। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাপনার বাইরে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসাধনা, মাতৃভাষায় শিক্ষা-প্রবর্তনের চেষ্টা, স্বদেশী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন, লোকগীতি ও রূপকথা সংগ্রহ, ভারতীয় শিল্পকলার প্রসারের প্রয়াস, এসব যেমন সৃষ্টিমূলক স্বাদেশিকতার অঙ্গ তেমনি সৃষ্টিমূলক যুগচেতনার প্রমাণ। অবশ্য সর্বাধিক প্রধান

কীর্তি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি। ছোটগল্পে দেশের মাটি-জল-আকাশে ফোটা মানুষের রূপ তিনি আবিষ্কার করে ধরলেন। 'কড়ি ও কোমল' (১২৯৩) থেকে 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা' ছাড়িয়ে 'খেয়া' (১৩১৩) পর্যন্ত যে রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ এদিক থেকে তাও বিশেষ স্মরণীয়। মধুসূদন-বিহারীলালের ভাবলোক ছাড়িয়ে আমরা গীতিকবিতার যে পর্বে প্রবেশ করেছি তাতে ভাবে-ভাষায় সেই মধ্যযুগের বাষ্পও আর নেই— অন্তর্মুখী হলেও আধুনিক মানুষের বিচিত্র জীবনগানে, সুন্দর ভুবনের প্রতি মমতায়, মানুষের প্রতি সপ্রেম আন্তরিকতায়, জীবনের অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতে— তাঁর ছোটগল্প ও কবিতা এক বিপ্লবী আয়োজন। কারণ, সাহিত্যই রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম, কবির সৃষ্টিচেতনায় যখন যুগচেতনা সম্পূর্ণ রূপসম্মত প্রকাশ লাভ করে তখনই বলা যায় কবির যুগবোধ সত্য হয়েছে— ভাবনা ও কর্মে তাঁর সার্থকতা সে তুলনায় গৌণ বলে গৃহীত হতে পারে। যদিও সেখান থেকেই আমরা প্রায়ই তার পরিমাপ করি, সেরূপ পরিমাপ সহজসাধ্য বলে।

এর পরের পর্বে (১৯০৮-১৯১৪) পর্যন্ত কালকে আমরা সাধারণতঃ গীতাঞ্জলির কাল বলেই জানি। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে অধ্যাত্মচেতনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন বলে বলা হয়— তা মিথ্যা নয়। কিন্তু সে আশ্রয় যে পলায়ন নয়, তা গোরা প্রায়শ্চিত্ত অচলায়তন প্রভৃতি স্মরণ রাখলে সহজেই বোঝা যায়। বিশেষ করে এ সময়টা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভারতীয় স্বাদেশিকতার সম্পূর্ণতার কাল। পূর্বেকার 'হিন্দুত্ব' ছাড়িয়ে তিনি গোরার মধ্য দিয়ে 'ভারততীর্থে'র স্তরে এসে পৌঁছেছেন—'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'তেও তাঁর সে ব্যাখ্যান পাওয়া যায়। আর অন্য দিকে রয়েছে মধ্যযুগীয় শাস্ত্র আচার ধ্যান নিয়মের অচলায়তনের বিরুদ্ধে তাঁর উদ্বুদ্ধ চেতনা— সামাজিক বিকাশ ব্যতীত যে রাজনৈতিক বিকাশও অসম্ভব, এ বোধ তাঁর সুদৃঢ়, আর সামাজিক বিকাশের অর্থ শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া মূল্যসমূহের অঙ্গীকরণ— সংকীর্ণ বুর্জোয়া নিয়মে নয়, সর্বাঙ্গীণ মানবতার আদর্শে। এ বোধ যে সীমাবদ্ধ ও বস্তুবিমুখ অধ্যাত্মচেতনা নয় তার প্রমাণ বলাকার কবিতা— কবিচেতনায় যুগরূপ প্রথম কাব্যাকারে প্রতিফলিত হল, তার পর তা আবার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবনারূপে ব্যাখ্যাত হল ন্যাশনালিজ্‌ম্‌-বক্তৃতামালায় (১৯১৬)।

মহাযুদ্ধ ও সমস্যার স্বরূপ

প্রথম মহাযুদ্ধ বিঘোষিত হবার পূর্বেই যুগের প্রত্যাসন্ন সংকট রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে নিদারুণ অস্বস্তির ছায়া বিস্তার করে। কবিচেতনায় যুগচেতনাই আত্মপ্রকাশ করল—

> সে সময় পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল।...আমার মনে হচ্ছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসান-প্রায়। মৃত্যু দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন।...

এই ছিল 'বলাকা'র প্রেরণা— গতির ও যৌবনের আহ্বানে যা উদ্বুদ্ধ।

দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন…
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।

কিংবা

ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি ? মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।

অথবা

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।…
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?

প্রভৃতি কবিবাণী এক দিকে, অন্য দিকে দেশের যৌবনের নিকট কবির উদাত্ত আহ্বান—

আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

এসব হচ্ছে রবীন্দ্রপ্রতিভার অতুলনীয় দান— তাঁর যুগচেতনারও প্রদীপ্ত শিখা। নিতান্ত যুক্তিবদ্ধ চিন্তা ও সুতীক্ষ্ণ বাস্তবদৃষ্টির আধারেই তা প্রজ্বলিত—

আজ ক্ষুধিত জর্মনির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে— যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।…

কিন্তু জর্মন পণ্ডিত যে তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মতো জর্মনিকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জর্মন পণ্ডিতদের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।

—কালান্তর, লড়াইয়ের মূল

এ দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করল ন্যাশনালিজ্‌মের বিরুদ্ধে জাপানে আমেরিকায় বক্তৃতা-অভিযানে ১৯১৬। এই বক্তৃতার মূল্য আজ আর কারও অস্বীকৃত নয়। দেখেছি— মানবতাবাদের দিক থেকে তিনি সেই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেন যে সিদ্ধান্তে সামাজিক-রাষ্ট্রীয় বিশ্লেষণের সূত্রে পৌঁছেছিলেন ঠিক এ সময়ে লেনিন। আশ্চর্য নয় যে সেদিন রবীন্দ্রনাথকে এই বক্তৃতাবলীর জন্য জাপানে ও আমেরিকায় বহু গঞ্জনা সইতে হয়েছে। অথচ সেই যুদ্ধকালেই তাঁকে স্বদেশে একই কালে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' 'বাতায়নিকের পত্র' প্রভৃতিতে তীব্র ভাষায় ফিউডাল ভাবধারার অবসানের জন্য, মানবাধিকার ও শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া মূল্যবোধের সপক্ষে প্রতিবাদ করতে হয়েছে ; এবং 'ছোট

ও বড়' প্রভৃতি প্রবন্ধের মারফত, শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নাইট্-হুড্ ত্যাগের ঐতিহাসিক পত্র প্রচার করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে করতে হয়েছে ভারতীয় স্বাদেশিকতার সংগ্রাম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুই ক্ষেত্রেই তাঁর কালবোধ সমান সুদৃঢ়।

দুই ক্ষেত্রে এই সমসতর্কতা সেদিন খুব সহজসাধ্য ছিল না। অচিরকাল পরেই অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ তখনও সুনিশ্চিত রূপেই অনুভব করছেন যে, বুর্জোয়া সভ্যতা পররাজ্যগ্রাসে ও আত্মদ্বন্দ্বে রক্তপিপাসু হলেও তার শ্রেষ্ঠ মূল্যসমূহ মিথ্যা নয়— সেই শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের সাধনায় প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের ভেদ নেই; সেখানে সকল মানুষের অবারিত অধিকার, সমান দায়িত্ব, সতীর্থতা। গান্ধীজীর নীতি কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নয়। বুর্জোয়া রাজনৈতিক অধিকার ও জাতীয় আত্মপ্রকাশের প্রেরণায় পরিচালিত হলেও, গান্ধীজী বুর্জোয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের, যন্ত্রোন্নত উৎপাদনের, শিল্পোন্নত জীবনযাত্রার বিরোধী। অথচ, আত্মশক্তির অনুশীলন ও সত্যাগ্রহপদ্ধতির প্রবর্তক হিসাবে গান্ধীজী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মহাত্মা, রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তাঁর শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর মতাদর্শের সংকীর্ণতায় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন— 'শিক্ষার মিলনে', 'সত্যের আহ্বানে', 'চরকা' ও 'স্বরাজ-সাধনে' তিনি এক যুগ ধরে এই অন্ধ স্বরাজ-সাধনার বিরুদ্ধে বারবার প্রতিবাদ করেন—

> পশ্চিমের লোক যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা, বিদ্যা যে সত্য।
>
> —শিক্ষার মিলন

> ভারতের আজকের এই উদ্বোধন সমস্ত পৃথিবীর উদ্বোধনের অঙ্গ। একটি মহাযুদ্ধের তূর্যধ্বনিতে আজ যুগারম্ভের দ্বার খুলেছে।...মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আর-এক মহাদেশে ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘটবে ততক্ষণ এই কারণের নিবৃত্তি হবে না। এখন থেকে যে-কোনো জাত নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র করে দেখবে, বর্তমান যুগের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে, সে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্যে যে চিন্তা করতে হবে সে চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা।
>
> —সত্যের আহ্বান, কালান্তর

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূলও এই উপলব্ধি। এ কালের উপলব্ধির অন্য দিক রক্তকরবীতে প্রকাশিত। ১৯১৭ সালের সমাজবিপ্লবের অর্থ তখনও তাঁর পক্ষে পরিষ্কার নয়, কিন্তু সেই বিপ্লব একটা দুর্নিবার্য জিজ্ঞাসা— ইতিহাসে তো তা অবান্তর নয়, রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে সচেতন।

কালান্তরের কবি

কালান্তর যে সূচিত হবে বলাকার যুগেও কবি সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। কিন্তু কি হবে তার রূপ, কি হবে তার প্রকরণ, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে সচেতন হলেন রাশিয়া দর্শনের পর (১৯৩১)।

১৯২২ সালে 'সমবায় (২)' আলোচনায় তিনি 'রাশিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতিতে' গায়ের জোরের প্রাধান্য দেখে তাকে ব্যর্থ সমাধান-চেষ্টা বলেই অভিহিত করেছেন। অথচ এই কথাও জানেন ইতিহাসে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির দ্বন্দ্ব আছে, আর আমেরিকার মতো 'যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য, এমনকি লাভের লোভ সাহিত্য কলাবিদ্যা রাষ্ট্রনীতি গার্হস্থ্য সমস্তকেই যে আচ্ছন্ন ও কলুষিত' করেছে, এই সংস্কৃতি-সংকট বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ নেই। সমস্যার সমাধান সম্বন্ধেও তিনি দৃঢ়মত— 'সকলের কর্মশ্রমকে মিলিত করে অর্থশক্তিকে সর্বসাধারণের জন্য লাভ করা'— প্রতিযোগিতার স্থলে চাই সমবায়নীতি, অর্থশক্তিতে সামগ্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা; তবে জবরদস্তি করে একস্‌প্রোপ্‌রিয়েশন নয় (১৯২৮)।

তিন বৎসর পরে রাশিয়া দর্শনের পরে রবীন্দ্রনাথের সে আপত্তি যে বিদূরিত হল তা নয়, কিন্তু তাঁর আপত্তির তীব্রতা আর রইল না। কারণ

> দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।
>
> —রাশিয়ার চিঠি, পত্র ৩

বিপ্লব যেন প্রকৃতিরই ভারসাম্য রক্ষা।

> যা দেখছি তাই আশ্চর্য ঠেক্‌ছে। অন্য কোনো দেশের মতই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।
>
> —রাশিয়ার চিঠি, পত্র ১

এ পত্রাবলী সুপরিচিত। মিস্‌ র‍্যাথবোনকে যখন জীবনের শেষ প্রান্ত থেকে কবি পত্র লিখছেন তখনও তাঁর সম্মুখে রাশিয়ার মানুষের মহাযজ্ঞের নজির বিশেষ প্রামাণিক। রাশিয়ার অভিজ্ঞতা অবশ্য তাঁর চিরদিনের ধ্যানধারণাকে বদলে দেয় নি— বরং তাকেই আরও সুদৃঢ় করেছে, পরিচ্ছন্ন করেছে, অন্তর্মুখী কবি-চেতনাকে আরও জীবননিষ্ঠ, বলিষ্ঠতায় সমৃদ্ধ করেছে— আর তা সেই সুযোগ পেয়েছে আবার যুগসংকটে ফাশিজ্‌মের উৎকট প্রকাশে।

> দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কিরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।

কালান্তরের মূলরূপ তাতে আরও স্পষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথের নিকট ধরা পড়ল। কালান্তরের প্রবন্ধাবলী থেকে সভ্যতার সংকট পর্যন্ত পর্বটি রবীন্দ্রজীবনের চূড়ান্ত অধ্যায়, তাঁর প্রতিভারও পূর্ণ পরিণতির পর্ব— সেখানে রবীন্দ্রনাথই যুগের রিপ্রেজেন্টেটিভ্‌ ম্যান। তাঁর কণ্ঠে বিশ্বাস ঘোষিত হল মানুষের প্রতি— আর শুধু পাশ্চাত্য সভ্যতার বা বুর্জোয়া সমাজের শুভবুদ্ধির প্রতি নয়। বরং

আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।

এই 'মানুষের উপর বিশ্বাস' যুগচেতনারই দান।

আর শুধু এই ঘোষণাই নয়— রবীন্দ্রনাথের এ পর্বের সৃষ্টিতেও রয়েছে যুগচেতনার সেই নূতন স্বাক্ষর। 'পরিশেষে'র "প্রশ্ন"—'তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেসেছ ভালো?'—থেকে রবীন্দ্রকাব্যের ভাবলোকে একটা নূতন সূচনা দেখা যায়। তখনকার কাব্যের ছন্দোমুক্তি, বাণীর বন্ধনমুক্তিও সেই যুগচরিত্রেরই একটা লক্ষণ। সরল তির্যক্ হাস্যে, পরিহাসে, বহুরসের অফুরন্ত সমাবেশে সে পর্বের কবি-কীর্তি ঝলমল করছে। কিন্তু কে ভুলতে পারে তার মধ্যে 'পঁচিশে বৈশাখ', 'আফ্রিকা', 'জন্মদিনে', 'ঐকতান', বা 'ওরা কাজ করে' প্রভৃতি কবিতার অভিনবত্ব, সুগম্ভীর তাৎপর্য? কালান্তরের করাঘাতে তারা মন্দ্রিত। আর কেই বা ভুলতে পারে সেই বেদমন্ত্রের মতো ঘনায়িত বাণী—'রূপনারানের কূলে' বা 'প্রথম দিনের সূর্যে'র মতো কবিতায়?

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।

যুগচেতনারই সিদ্ধি দেখা যায় এসব কবিতায় ও এ সময়কার গানে : এ জীবন স্বপ্ন নয়।

পল্লীর উন্নতি : পিতৃস্মৃতি

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যৌবনের প্রারম্ভেই আমার পিতা মহর্ষিদেবের কাছ থেকে কঠিন দায়িত্বপূর্ণ একটি কার্যভার পেলেন। মহর্ষি আদেশ করলেন তাঁকে জমিদারি চালনা করতে হবে। সে সময় জমিদারি সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল ; সেগুলি অনেক জায়গায় ছড়ানো— বাংলায় ছিল তিনটি পরগনা তিন বিভিন্ন জেলায় ; পাবনায় শাহাজাদপুর, রাজশাহীতে কালিগ্রাম ও নদীয়াতে বিরাহিমপুর। এ ছাড়া উড়িষ্যায় ছিল আরও তিনটি ছোট ছোট জমিদারি।

এই কাজের ভার পেয়ে বাবাকে কলকাতা ছাড়তে হল। তিনি চলে গেলেন শিলাইদহে। শিলাইদহে ছিল বিরাহিমপুর পরগনার সদর কাছারি। কাজের সুবিধার জন্য বাবা শিলাইদহে তাঁর প্রধান কার্যক্ষেত্র করলেন। সেখান থেকে শাহাজাদপুর ও কালিগ্রামে নদীপথে সহজেই যাওয়া যায়।

শিলাইদহ পদ্মানদীর ধারে, সেখানে থাকত 'পদ্মা' বোট। বাবা এই বোটে করে কুষ্টিয়া, কুমারখালি, শাহাজাদপুর, পতিসর ও অন্যান্য যে সব জায়গায় আমাদের কাছারি ছিল যাতায়াত করতেন।

বাংলা দেশে নদীর অভাব নেই, জলপথে প্রায় সব স্থানেই যাওয়া যায়। বোটে করে খাল বিল নদী বেয়ে ঘুরতে বাবা ভালোবাসতেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াতের তাঁর একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল দেশকে ভালো করে জানা, দেশের লোকের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া। জমিদারি দেখার কাজ তাঁর কাছে নিশ্চয়ই পীড়াজনক হয়ে উঠত যদি-না এই সূত্রে গ্রামজীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার সুযোগ তাঁর হত।

গ্রামের ও গ্রামবাসীদের অবস্থা বাবাকে কতখানি বিচলিত করেছিল, সেইসময়কার তাঁর লেখার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের সমস্যা যে সমগ্র দেশের সমস্যা, দেশের উন্নতি নির্ভর করে গ্রামের উন্নতির উপর, দেশসেবা মানেই যে লোকসেবা, এই সব কথা বারবার নানা প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় তিনি দেশবাসীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, গ্রামের দুরবস্থা জানিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সচেষ্ট হবার জন্য বারবার তাদের মনকে নাড়া দেবার প্রভূত প্রয়াস করেছেন।

আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কি শোচনীয় তার বর্ণনা ১৯০৭ সালে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণে তিনি দিয়েছিলেন—

গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্বে ছিল আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে, কেননা

দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই; যে রেষারেষি ছিল তাহা সংস্কারের কোনো শক্তি নাই। যে সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াছে;...পরস্পরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মতো নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই; জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই,...তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কী অবস্থা! ঘি দূষিত, দুধ দুর্মূল্য, মৎস্য দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত;...অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই, আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি।

বহু বছর ধরে গ্রামজীবনের সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তারই যথাযথ বিবরণ পাবনা সম্মিলনীতে দিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি নিজে জেনে এবং সকলকে কেবল জানিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না। জমিদারি পরিচালনার ভার নিয়ে অবধি তাঁর ক্ষমতার মধ্যে তিনি নিজে কি করতে পারেন সে বিষয় অহরহ চিন্তা করেছেন, এক-একটি সমস্যা নিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছেন।

আমার পিতা গ্রামের উন্নতির জন্য কতখানি ভাবছেন, কৃষকদের আর্থিক দুর্গতি ও মানসিক জড়তা দূরীকরণের জন্য কি কি উপায় স্থির করেছেন আমি প্রথম জানলুম ১৯১০ সালে। আমি তখন আমেরিকা থেকে ইউরোপ ঘুরে সবে দেশে ফিরেছি। বাড়ি পৌঁছাবার কয়েকদিন পরেই তিনি আমাকে শিলাইদহে নিয়ে গেলেন। আমাকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিজ্ঞান শেখবার জন্য ১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। সেই আন্দোলনে তিনি কি উৎসাহের সঙ্গে নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন তা সর্বজনবিদিত। তিনি আশা করেছিলেন বাঙালীর মনে যে স্বদেশপ্রেম জেগেছে সেটা দেশসেবার কার্যক্ষেত্রে প্রসারিত হবে।

'স্বদেশী সমাজ', 'সভাপতির অভিভাষণ পাবনা সম্মিলনী' প্রভৃতি নানা বক্তৃতায় তিনি সর্বসাধারণকে, বিশেষতঃ কংগ্রেসের নেতাদের দেশসেবার কাজে প্রবৃত্ত করার জন্য অনুনয় করেন। তিনি বলেন—

দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে, কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব? উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদের কর্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিত গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।

অন্যত্র লিখেছেন—

মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই; এইখানেই প্রাণের নিকেতন; লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।

ভিত্ত গাঁথার কাজ তাঁর সাধ্যমত তিনি সূত্রপাত করেছিলেন নিজেদের জমিদারির অন্তর্গত গ্রামগুলির মধ্যে। যখন দেখলেন দেশবাসী তাঁর কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, বরং তিনি দেশ-সেবার যে কর্মপদ্ধতি তাদের সামনে ধরেছিলেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনাই হতে থাকল, নেতারা কেবল রাজনৈতিক উত্তেজনাতেই মেতে রইলেন, তখন তিনি সংকল্প করলেন গ্রামোন্নতির কাজ যতটা পারেন তাঁর আদর্শমত তিনি নিজেই জমিদারির মধ্যে প্রচলন করবেন।

কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে গেলে কৃষির উন্নতি করা বিশেষ দরকার। পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষির উন্নতি হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞান আমাদের দেশেও প্রবর্তন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও আমাকে ১৯০৬ সালে আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান শেখবার জন্যে পাঠালেন। তার এক বছর পরে আমার ভগিনীপতি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও সেখানে পাঠালেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে আমরা তিনজনে গ্রামোন্নয়নের কাজে তাঁকে করতে পারব তাঁর আশা ছিল। আমি সব-আগে ফিরে এলুম। আসবামাত্রই তিনি আমাকে শিলাইদহে নিয়ে গেলেন কাজে নিযুক্ত করার জন্য।

শিলাইদহে কিছুদিন থেকে সেখানকার কাজকর্ম বোঝানো হয়ে গেলে বোটে করে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন পতিসরে। যাবার পথে রোজ সন্ধেবেলায় বোটের ডেকের উপর বসে নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হত। আমি তাঁকে আমার কলেজের পড়াশুনার কথা বলতুম— বাবা ধৈর্যের সঙ্গে সব শুনতেন। তার পর তিনি বলতেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা— বাংলার গ্রামে গ্রামে লোকদের সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক কি শোচনীয় অবস্থা তিনি দেখেছেন, তাদের জীবন-যাপনের কতরকমের সমস্যা লক্ষ্য করেছেন, এই সব সমস্যার প্রতিকারের তিনি কি চেষ্টা করেছেন ও ভবিষ্যতে আরও কি করতে ইচ্ছা করেন। জমিদারি চালনার ভার নেবার শুরুতেই আমি গ্রামোন্নতিপ্রণালীর শিক্ষা বাবার কাছ থেকে এইভাবে পেলুম।

বাবা বললেন, তিনি যখন জমিদারির কাজ দেখতে আরম্ভ করেন প্রথমেই প্রজাদের মধ্যে সালিশী বিচারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বিরাহিমপুর ও কালিগ্রাম এই দুই পরগনায় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি করে বিচারসভা স্থাপন করেন। প্রজাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো বিবাদ ঘটলেই উভয়পক্ষকে এই বিচারসভায় উপস্থিত হতে হবে এই নিয়ম হল। প্রজারা ফৌজদারি ছাড়া অন্য কোনোরকম মামলা নিয়ে আদালতে যাবে না। কেউ এই নিয়ম অমান্য করলে গ্রামবাসীরা তাকে একঘরে করবে, তার সঙ্গে কোনো সামাজিকতা রাখবে না। এই বিচারসভার বিচারে অসন্তুষ্ট হলে আপীলের সুযোগ দেবারও ব্যবস্থা করা হল। প্রজাদের সম্মতিক্রমে সমস্ত পরগনার জন্য পাঁচজন সভ্য নিয়ে একটি আপীল-সভা নির্বাচিত হল। এই পাঁচজনকে পঞ্চপ্রধান বলা হত। পঞ্চপ্রধানের বিচারে সন্তুষ্ট না হলে শেষ আপীল ছিল স্বয়ং জমিদারের কাছে। বিচারের জন্য বাদী বা বিবাদীর কোনো ব্যয় বহন করতে হত না, কেবল দরখাস্ত করার কাগজ কেনার জন্য সামান্য মূল্য দিতে হত। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল প্রজারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ নিজেরাই মিটিয়ে

রবীন্দ্রনাথ ॥ ১৯১৪ শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকু

ফেলবে— আদালতে যাবে না। বিচারের নথিপত্র রীতিমত রাখা হত, সেগুলি সযত্নে ফাইল করে রাখার সাহায্য করত জমিদারির সেরেস্তা।

আদালতের সাহায্য বিনা, বিনা ব্যয়ে বিনা বিলম্বে মামলার বিচারের এই ব্যবস্থা আরম্ভ হবার শুরু থেকেই প্রজারা এর উপকারিতা অনুভব করেছিল। তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ছিল বলেই দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই ব্যবস্থা এত অনায়াসে চলেছিল। ছোট বড় কোনোরকম বিবাদ নিয়ে আদালতে নালিশ করতে যাওয়া তারা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিল। দেওয়ানি বিচারের ভার প্রজারা নিজেরাই নিয়েছে বলে গবর্নমেণ্ট কখনো আপত্তি তোলে নি বরং উৎসাহ দিয়েছে।

এই বিচার প্রবর্তিত হবার বহু বছর পরে আমাকে যখন পরিদর্শনের জন্য শিলাইদহ বা পতিসরে যেতে হত আমার বেশির ভাগ সময় যেত প্রজাদের আপীল বিচার করতে। তাদের মোকদ্দমা অধিকাংশ জমিজমা-সম্পর্কিত। আমি আশ্চর্য হতুম সামান্য অশিক্ষিত কৃষকদের আইন-জ্ঞান দেখে। তাদের সঙ্গে যুঝতে আমাকে বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্ট ভালো করে আয়ত্ত করতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে একদল উকীলও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এরা অশিক্ষিত গ্রামেরই লোক, স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বাক্‌পটুতার জন্য তাদের খ্যাতি ছিল। নিতান্ত অক্ষমদের বিশেষতঃ মেয়েদের মামলা চালানো তাদের ব্যবসা হয়ে গিয়েছিল।

জমিজমা বা উত্তরাধিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মোকদ্দমার বিচার সব সময়ে যে আমাকে করতে হত তা নয়। মাঝে মাঝে বেশ কৌতুকজনক আরজিও উপস্থিত হত, কিন্তু বিচারকের আসনে বসে হাসা চলে না, গম্ভীরভাবে আমাকে রায় দিতে হত। শাশুড়ি-বৌয়ের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে, তার বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে। সম্পত্তি ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ হবে, একটিমাত্র পুকুর, তাকে দু ভাগ কি করে করা যায়, না করলেও উপায় নেই, একই ঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে জায়েদের মধ্যে রোজই ঝগড়া লাগে, ফলে রান্না হয় না, ভাইদের মধ্যে কেউই খেতে পায় না— বিচিত্র কত-না নালিশ শুনতে হত।

বোটে যেতে যেতে বাবা আমাকে বোঝাতে লাগলেন— তিনি এতদিন পর্যন্ত নিজের চেষ্টায় যেটুকু সম্ভব তাই করছেন, কিন্তু গ্রামসংস্কারের কাজ জমিদারির কর্মচারীদের দ্বারা হয় না। সেই জন্য তিনি ঠিক করেছেন শান্তিনিকেতন থেকে কয়েকজন শিক্ষককে শিলাইদহ ও পতিসরে পাঠিয়ে দেবেন। তাদের উপরেই বিশেষভাবে এই কাজের ভার থাকবে।

শিলাইদহের চারপাশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সদ্‌ভাব নেই। কুষ্টিয়া কুমারখালি প্রভৃতি শহরের সান্নিধ্যে প্রজাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে, তারা স্বাভাবিক সরল মনোভাব হারিয়েছে, নতুন কিছু প্রবর্তন করতে গেলেই সন্দেহ করে। কয়েক বছর চেষ্টা করেও সেখানে বিশেষ কিছু করতে পারা যায় নি। একমাত্র কুষ্টিয়াতে তাঁতের বয়নশিল্প-প্রতিষ্ঠানটি ভালো চলছিল।

এই কারণে কালিগ্রাম পরগনাতেই তিনি বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। সেখানকার প্রজাদের মধ্যে একনিষ্ঠতা আছে। কাজের সুবিধার জন্য এই পরগনাকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা

হয়েছে। পরগনার সমস্ত প্রজারা মিলে একটি সমিতি নির্বাচন করেছে— তার নাম হয়েছে 'কালিগ্রাম হিতৈষী সভা'। তা ছাড়া প্রত্যেক বিভাগের প্রজারা একটি করে 'বিভাগীয় হিতৈষী সভা'ও নির্বাচন করেছে। শান্তিনিকেতন থেকে যে কর্মীরা আসবেন তাঁদের প্রত্যেকের কাজের কেন্দ্র হবে এক-একটি বিভাগে।

প্রজারা হিতৈষী সভার কাজ চালাবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজেরা চাঁদা দিচ্ছে। চাঁদা আদায়ের জন্য তাদের কোনো পৃথক ব্যবস্থা করতে হয় নি, তার জন্য ব্যয়ও কিছু হয় না। খাজনা আদায়ের সময় তারা খাজনার প্রতি টাকার সঙ্গে তিন পয়সা অতিরিক্ত দেয়। অতিরিক্ত এই আয় হিতৈষী সভার নামে পৃথক তহবিলে রাখা হয়। হিতৈষী সভার সমস্ত কিছু কাজ বিভাগ থেকে করা হয় বলে আদায়ী টাকা তিন অংশে ভাগ করে তিনটি বিভাগীয় হিতৈষী সভার হাতে দেওয়া হয়। সভার পক্ষ থেকে সেখানে বেতনভোগী একজন করে কর্মচারী রাখা হয়েছে।

কালিগ্রামে গ্রামসংস্কার-প্রতিষ্ঠানের গঠন এইভাবে করা হয়— প্রত্যেক গ্রামের বাসিন্দারা সেই গ্রামেরই একজন প্রবীণকে প্রধান বলে নির্বাচিত করে। প্রতি বিভাগে যতগুলি প্রধান নির্বাচিত হয় তাদের সকলকে নিয়েই বিভাগীয় হিতৈষী সভা গঠিত। তিন বিভাগের প্রধানরা মিলে পাঁচজনকে কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার সভ্য নির্বাচন করে। তাদের বলা হয় পরগনার পঞ্চপ্রধান। এই পাঁচজন ছাড়াও কেন্দ্রীয় সভায় জমিদারের একজন প্রতিনিধি থাকে। হিতৈষী-সভার সভ্যের সংখ্যা পরে বাড়ানো হয়।

সাধারণতঃ বছরে একবার কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার মিটিং হয়। এত কাজ থাকে যে সমস্ত দিন সভা করেও অনেক কাজ শেষ হয় না। প্রথমতঃ গত বছরের হিসাব পরীক্ষা করা হয়, যে টাকা ব্যয় হয়েছে তাতে কি কাজ কতখানি হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়। তার পর আগামী বছরের জন্য কাজের প্রোগ্রাম স্থির করা ও সেই অনুযায়ী খরচের বজেট প্রস্তুত করা। বার্ষিক সভার এই দুটি হল প্রধান কাজ— আর-একটি কাজ ছিল জমিদারি পরিচালনায় কর্মচারীদের কোনো ত্রুটি বা প্রজাদের প্রতি অত্যাচার ঘটলে জমিদার মহাশয়কে সে বিষয় জানানো।

টাকায় তিন পয়সা চাঁদা থেকে হিতৈষী সভার পাঁচ-ছ হাজার টাকা বার্ষিক আয় ছিল। প্রজাদের উৎসাহ দেবার জন্য, বাবা বললেন, এস্টেট থেকে তিনি আরো দু হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হিতৈষী সভার জন্য যে টাকা উঠত প্রজারা তাকে 'সাধারণ ফণ্ড' বলত। আমার যতটা মনে পড়ে চাঁদার হার পরে বাড়ানো হয়েছিল ইস্কুল ডিস্‌পেনসারি প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে।

গ্রামের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করা দরকার, হিতৈষী সভা আপাতত কেবল কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পেরেছে, তার মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা হল প্রধান। সারা পরগনার মধ্যে শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই পূর্বে ছিল না। অবস্থাপন্ন লোক তাদের ছেলেদের নাটোর আত্রাই বগুড়া প্রভৃতি শহরে পাঠাত ইস্কুলে পড়াবার জন্য। হিতৈষী সভা দু-এক বছরের মধ্যে কয়েকটি

বিভিন্ন গ্রামে পাঠশালা, তিন বিভাগে তিনটি মধ্য-ইংরাজি ও পতিসরে একটি হাই স্কুল স্থাপন করেছে। ইস্কুলবাড়ি ও ছাত্রাবাসের ঘর নির্মাণ করার মত টাকা সাধারণ ফণ্ড থেকে দেওয়া সম্ভব নয় বলে বাবা এস্টেটের খরচে সেগুলি তৈরি করে দিয়েছেন।

শিক্ষার সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন ছিল। ঐ অঞ্চলে কোথাও একটিও পাস-করা ডাক্তার ছিল না। প্রথমে পতিসরে একটি ডাক্তারখানা খোলা হয়— তার পর ক্রমশঃ অন্য দুটি বিভাগেও ডাক্তারসহ ডিস্‌পেনসারি স্থাপিত হল। কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্য এস্টেট থেকেও যথেষ্ট সাহায্য দেওয়া হয়। পতিসরের চিকিৎসালয় বেশ ভালো হয়েছে এবং এখানে বহুসংখ্যক রোগী দৈনিক চিকিৎসার জন্য আসে।

কালিগ্রাম পরগনা চলন বিলের সংলগ্ন। বর্ষাকালে শস্যক্ষেত সমস্তই জলমগ্ন হয়ে যায়, গ্রামগুলি উঁচু জমির উপর, দেখতে এক-একটি দ্বীপের মত। বাবা বললেন, তুই তো দেখেছিস রাস্তা কোথাও নেই— গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে গেলে ধানক্ষেতের আল ধরে হেঁটে যাতায়াত করতে হয়, বর্ষার দিনে নৌকা বেয়ে ধানের উপর দিয়ে সর্বত্র যাওয়া-আসা চলে। সাধারণ ফণ্ড থেকে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি রাস্তা তৈরি করা আরম্ভ হয়ে গেছে। পতিসর থেকে আত্রাই স্টেশন পর্যন্ত সাত মাইল সদর রাস্তা এস্টেট থেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা হচ্ছে। এই রাস্তা প্রস্তুত করতে বহু টাকা খরচ— সাধারণ ফণ্ড থেকে এই ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়।

এই কয়েকটি প্রধান কাজ ছাড়াও, বুজে যাওয়া মজা ডোবা ও পুকুর পুনরুদ্ধার করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, যেখানে পানীয় জলের অভাব সেখানে কূপ খনন করে দেওয়া প্রভৃতি সাধারণের উপকারার্থে নানান কাজে হিতৈষী সভা ক্রমশঃ হাত দিচ্ছে। পতিসরে একটি ধর্মগোলারও ব্যবস্থা হয়েছে।

আমেরিকায় যে তিন-চার বছর কলেজে পড়েছিলাম সেই সময়ে বাবা জমিদারিতে প্রজাদের মধ্যে যে এত রকমের কাজে হাত দিয়েছেন তা কিছুই জানতুম না। বাবা যখন গল্পচ্ছলে এই সব কথা আমাকে বলতেন, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতুম। সব-শেষে বললেন, 'আমি যে সব কাজ করতে চেয়েছিলুম কিন্তু এখনো হাত দিতে পারি নি, তোকে সেগুলি করতে হবে— বিশেষতঃ কৃষির উন্নতির চেষ্টা করতে হবে।'

বাবার নির্দেশ অনুসারে আমি কৃষির উন্নতির নানাবিধ চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগলুম। শিলাইদহ কুঠিবাড়ির সংলগ্ন কতক জমি খাস করে নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করলুম। আমেরিকা থেকে চাষ-আবাদের কয়েকটি যন্ত্রপাতি আনিয়ে সেখানে তার পরীক্ষা চলতে লাগল। চাষীরা ধান ছাড়া অন্য ফসলের চাষ তেমন করে না দেখে ঐ অঞ্চলে rotation করে দু-একটা money crops করা যায় কিনা তার পরীক্ষা হতে থাকল। আমেরিকা থেকে ভালো ভুট্টার বীজ আনালুম। চাষীদের আলু ও টমেটোর চাষ শেখান হল। শিলাইদহের

দোআঁশলা মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় কি কি খাদ্যসামগ্রীর অভাব তা জানবার জন্য ছোট-খাটো একটা রাসায়নিক ল্যাবরেটারি গড়ে তুললুম। চাষীদের মধ্যে ক্রমশঃ উৎসাহও দেখা গেল, আলু আখ টমাটো প্রভৃতির চাষ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। সারের অভাব কি করে ঘোচানো যায় ভাবছি এমন সময় আকস্মিক ভাবে একটি উপায় আবিষ্কার করলুম। শিলাইদহের ধারে পদ্মানদী থেকে বিস্তর ইলিশ মাছ কলকাতায় রপ্তানি হয়। বেড়াজালে এক-এক সময় এত মাছ ওঠে যে অত মাছ শিকারীরা নিতে চায় না। একদিন দেখলুম ডিম বের করে নিয়ে নুন দিয়ে রাখছে আর মাছগুলি নদীর জলে ফেলে দিচ্ছে। নামমাত্র মূল্যে কয়েক নৌকা বোঝাই মাছ কিনে নিয়ে এসে চুন দিয়ে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখলুম। এক বছর পরে মাটি খুঁড়ে দেখি চমৎকার সার হয়েছে। তখন মাছের সার প্রচলনের চেষ্টা করলুম।

শিলাইদহ অঞ্চলে কৃষির উন্নতি করার যথেষ্ট সুযোগ পেলুম। কিন্তু পতিসরে সে সুযোগ নেই, দেশটা নিতান্তই একফসলে; বর্ষার কয়েক মাস জলমগ্ন থাকে আর জল নেমে গেলে মাটি শুকিয়ে এত কঠিন হয়ে যায় যে লাঙল চলে না। সেইজন্য রবিশস্য কিছুই হয় না; এমন কি গাছপালাও জন্মায় না। বাবা কিন্তু এই অসুবিধা সত্ত্বেও কালিগ্রামে আবাদের কি উন্নতি হতে পারে তাই নিয়ে চিন্তা করতে ছাড়েন নি। ১৩১৫ সালে তিনি কোনো কর্মীকে লিখছেন—

> প্রজাদের বাস্তবাড়ি ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস, কলা, খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সূতা বাহির হয়। ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমুল আঙুর গাছ বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া তাহার মূল হইতে কিরূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে।… কাছারিতে যে আমেরিকান ভুট্টার বীজ আছে তাহা পুনর্বার লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

অনেক চেষ্টার ফলেও কালিগ্রামে চাষবাসের বিশেষ উন্নতি করা সম্ভব হয় নি। কয়েক বছর পরে একটা সুযোগ পেলুম। উত্তরবঙ্গ বন্যার সাহায্যার্থে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অনেক টাকা তুলেছিলেন। দুঃস্থদের সাহায্য করার কাজ শেষ হয়ে গেলে এই ফণ্ডে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থেকে গিয়েছিল। সেই টাকা দিয়ে আত্রাইতে স্থায়ীভাবে একটি খাদি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন, কয়েকটি ট্র্যাক্টরও কেনা হয়। ট্র্যাক্টর কেনার উদ্দেশ্য ছিল, বন্যাতে অনেক গোরু মরে যাওয়ায় লাঙল চালাবার উপায় ছিল না, আচার্যদেবের কাছ থেকে পতিসরের জন্য একটা ট্র্যাক্টর চেয়ে নিলুম। আমাদের দেশে তখনো ট্র্যাক্টরের চলন হয় নি। ট্র্যাক্টর তো পেলুম কিন্তু চালক পেলুম না। নিজেই চালাতে লাগলুম। আমেরিকায় আমার অভ্যাস ছিল এ কাজের— ক্রমশঃ কয়েক-দিনের মধ্যে গ্রামের একটি ছোকরাকে চালানো শিখিয়ে দিলুম। আমার আশঙ্কা ছিল ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করলে ধানক্ষেতের আলগুলি নষ্ট হয়ে যাবে, তখন সীমানা নিয়ে চাষীরা গোলমাল করবে। ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করার পরীক্ষা যেদিন হবে সে একটা স্মরণীয় দিন কালিগ্রাম পরগনায়। সকাল থেকে হাজার হাজার লোক জমে গেল এই দানবীয় মেশিনটার কাজ দেখার জন্য। তাদের

কৌতূহল মেটাবার জন্য ট্র্যাক্টর নিয়ে আমি নেমে গেলুম ধানক্ষেতে। কয়েকজন চাষীকে জিজ্ঞাসা করলুম, আলের উপর দিয়ে লাঙল না চালিয়ে তো উপায় নেই— আল বাঁচিয়ে ছোট ছোট ক্ষেত মেশিন দিয়ে চাষ দেওয়া সম্ভব নয়। তারা আমাকে আশ্বাস দিল, 'ভাবনা নেই; আপনি আলের উপর দিয়ে চাষ দিয়ে যান, আমরা কোদাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, সঙ্গে সঙ্গে আল আবার বানিয়ে নেব।' প্রথম দিনের পরীক্ষাতেই কৃষকেরা খুব খুশি। ট্র্যাক্টর পতিসরেই থাকবে স্থির হল। আমি জানালুম, চাষ করে দেবার জন্যে বিঘাপ্রতি এক টাকা মাত্র খরচা হিসাবে নিয়ে ভাড়া দেওয়া হবে। তারপর থেকে ট্র্যাক্টরের চাষ সর্বত্র চলতে লাগল, এবং সেটা ভাড়া নেবার জন্য চাষীদের মধ্যে রেষারেষি পড়ে গেল। পতিসর থেকে চলে আসার আগে প্রজাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হল— আগামী বছরে আরও ট্র্যাক্টর আনিয়ে দেব।

বছরের বেশ কয়েক মাস চাষীদের কোনো কাজ থাকে না। এই সময় হাতের কাজ করে তারা অনায়াসে কিছু রোজগার করতে পারে। বাবা আমাকে প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিতেন কয়েকটি কুটিরশিল্প শেখাবার ব্যবস্থা করতে। কালিগ্রামে ভালো তাঁতি ছিল না, মুসলমানদের মধ্যে কয়েকঘর জোলা ছিল তারা মোটা রকমের গামছা কেবল বুনত। তাদের একজনকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হল তাঁতে কাপড় বোনা শেখবার জন্য। নানান রকমের নকশা তুলে বিবিধ প্রকারের কাপড় বোনা শিখে এসে সে যখন পতিসরে ফিরে এল সাধারণ ফণ্ডের খরচে তাকে শিক্ষক করে একটি বয়নশিক্ষার ইস্কুল খোলা হল। এই সময়ে বাবা আমাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

বোলপুরে একটা ধানভানা কল চলচে— সেইরকম একটা কল এখানে [পতিসরে] আনাতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে। এ দেশ ধানেরই দেশ— বোলপুরের চেয়ে অনেক বেশি ধান এখানে জন্মায়।…এই কলের সন্ধান দেখিস।

তার পরে এখানকার চাষাদের কোন্ industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান্য ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না— এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিষটাকে Cottage Industry রূপে গণ্য করা চলে কিনা। একবার খবর নিয়ে দেখিস— অর্থাৎ ছোটখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কিনা।…আর একটা জিনিষ আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে। নগেন্দ্র বলছিল খোলা তৈরি করতে পারে এমন কুমোর এখানে আনতে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাদ দিতে চায় পেরে ওঠে না— খোলা পেলে সুবিধা হয়।

যাই হোক ধানভানা কল, Potteryর চাক ও ছাতা তৈরির শিক্ষকের খবর নিস— ভুলিস নে।

বাবার আমলেই কালিগ্রাম পরগনায় কয়েকটি ইস্কুল স্থাপিত হয়েছিল। শিক্ষাবিস্তারের জন্য বাবাকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয় নি। প্রজাদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ অত্যন্ত বেশি। তারা যে-শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের ছেলেরা যাতে সেই শিক্ষা পাবার যথেষ্ট

সুযোগ পায় তাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা। পাঠশালা ইস্কুল তাড়াতাড়ি খোলবার জন্য রেষারেষি পড়ে যেত। প্রজাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকলে সাধারণ ফণ্ডের সমস্ত টাকাই বোধ হয় তারা শিক্ষাবিস্তারের জন্য খরচ করে ফেলত। বাবাকে এই বিষয়ে প্রজাদের উৎসাহ অনেক সময় সংযত করতে হত। পাঠশালা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল, কয়েক বছরের মধ্যে পরগনার প্রত্যেক গ্রামেই একটি করে পাঠশালা স্থাপিত হল। এই সঙ্গে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পতিসরে একটি হাই স্কুল খোলা হল। বর্ষাকালে চারদিক জলে ডুবে যায়, পতিসরে গেলে দেখতুম নৌকা বোঝাই করে ছাত্ররা আশেপাশের গ্রাম থেকে ইস্কুলে পড়তে আসছে। কলকাতার ইস্কুল-কলেজের যেমন নিজেদের বাস্ রাখতে হয়, কালিগ্রামের ইস্কুলগুলির তেমনি কয়েকখানা করে নৌকা থাকত।

গ্রামের অভাব দূর করার জন্য হিতৈষী সভা নানান দিকে চেষ্টা করেছে— শিক্ষাবিস্তার, তাঁতে কাপড় বোনা প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্প প্রচলন, চাষের উন্নতি, মাছের ব্যবসা, রাস্তাঘাট প্রস্তুত, সালিশের বিচার, জলকষ্ট নিবারণ, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা স্থাপন ইত্যাদি— কিন্তু একটি অভাব দূর করতে পারে নি, দূর করার ক্ষমতা ছিল না বলে।

জমিদারির সঙ্গে পরিচয় হবার পরই বাবা লক্ষ্য করেছিলেন প্রজাদের মধ্যে সকলেরই ঋণ আছে। গ্রামে অবস্থাপন্ন লোক খুব কম, অধিকাংশ গ্রামবাসী ঋণে ডুবে রয়েছে, দেনা থেকে সারা জীবনেও তারা মুক্তি পায় না। তখনকার দিনে এইটাই ছিল পল্লীসমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই সমস্যা বাবাকে সর্বদাই পীড়া দিত, তাঁকে চিন্তিত করত, এর প্রতিবিধানের কোনো উপায় অনেকদিন পর্যন্ত তিনি খুঁজে পান নি। প্রজারা মহাজনকে টাকা শোধ দেবার চেষ্টা করত না তা নয়— কিন্তু সুদের হার এত বেশি আর সুদের সুদ আদায় হত বলে আসল কোনোদিন শোধ হত না। এই অবস্থায় তাদের দুঃখনিবারণের একমাত্র উপায় যুক্তিসংগত কম সুদে প্রয়োজনমত কর্জ দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু সে ব্যবস্থা করতে অনেক টাকা লাগে, বাবার পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না।

সে সময়ে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জন্য তাঁকে যথেষ্ট দেনা করতে হয়েছে, তবু প্রজাদের দুঃখনিবারণের জন্য কিছু চেষ্টা না করে তিনি থাকতে পারলেন না। বন্ধুবান্ধব ও দুএকজন ধনী মহাজনের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়ে পতিসরে একটি কৃষি-ব্যাঙ্ক খুলে বসলেন। এই ব্যাঙ্ক যে মূলধন নিয়ে কাজ আরম্ভ করল সবই ধার-করা টাকা— ধার করতে বাবাকে শতকরা ৮৲ সুদ দিতে হচ্ছিল। বাবা নিয়ম করলেন প্রজাদের কাছ থেকে ১২৲ টাকা সুদ নেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক চালাবার খরচা দিয়ে ও অনাদায়ী টাকার হিসাব করলে ব্যাঙ্কের কোনো লাভই থাকে না। তবু ব্যাঙ্কের কাজ এইভাবে চলতে থাকল। মূলধন সামান্য তাতে প্রজাদের চাহিদা সংকুলান করা সম্ভব হল না। এর জন্য বাবা যখন খুবই চিন্তিত তখন আকস্মিক ভাবে একটি সুযোগ উপস্থিত হল। নোবেল প্রাইজের ১,০৮,০০০ টাকা তাঁর হাতে এসে পড়ল। টাকাটা শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে

দেবার তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা, অথচ প্রজাদের হিতার্থে কাজে লাগাতে পারলেও তিনি খুশি হন। এই দোটানার মধ্যে তিনি স্থির করতে পারছিলেন না কি করবেন। সুরেনদাদা [সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর] ও আমি তাঁর কাছে তখন প্রস্তাব করি যে প্রাইজের টাকাটা পতিসর কৃষি-ব্যাঙ্কে ডিপজিট রাখা হোক শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের নামে। এতে দুদিকেই উপকার হবে। তাই করা হল। যতদিন কৃষি-ব্যাঙ্ক ছিল বহু বছর ধরে বিদ্যালয়ের ও পরে বিশ্বভারতীর বছরে আট হাজার টাকা করে একটি স্থায়ী আয় ছিল। ব্যাঙ্কেরও সুবিধা হল এই মূলধন পেয়ে। কৃষি-ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ নেবার চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। কালিগ্রাম পরগনার মধ্যে বাইরের মহাজনরা তাদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। এমন-কি কয়েকজন কৃষি-ব্যাঙ্কে ডিপজিট রাখতে আরম্ভ করেছিল। ব্যাঙ্ক খোলার পর বহু গরিব প্রজা প্রথম সুযোগ পেল ঋণমুক্ত হবার। কৃষি-ব্যাঙ্কের কাজ কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল যখন Rural Indebtednessএর আইন প্রবর্তন হল। প্রজাদের ধার দেওয়া টাকা আদায় হবার উপায় রইল না— নোবেল প্রাইজের আসল টাকা সেইজন্য কৃষি-ব্যাঙ্ক বিশ্বভারতীকে শেষ পর্যন্ত ফেরত দিতে পারে নি।

হিতৈষী সভার কাজ কিন্তু বছরের পর বছর চলতে থাকল। মাঝে অনেকদিন পতিসরে যেতে পারিনি— বিশ্বভারতীর কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম। এমন সময় মহাযুদ্ধের প্রকোপ ঘরের কাছে এসে পড়ল। জাপানীদের ভয়ে বাংলার নদীগুলোতে যতরকমের জলবাহন ছিল গভর্মেণ্ট সেগুলি সব ডুবিয়ে দিতে লাগল। পদ্মাবোটে আমি তখন উত্তরপাড়ায় থাকতুম। ভয় হল কোন্‌দিন বোটটা কেড়ে নিয়ে যায়। বোটটি বাঁচাবার জন্য গঙ্গা বয়ে আগাগোড়া নদীপথে পতিসরে যাবার জন্য রওনা হলুম। সেখানে পৌঁছে নিশ্চিন্ত বোধ হল। তখনকার মত পদ্মা বোট রক্ষা হল— কিন্তু বাবা ও মহর্ষির বিশেষ প্রিয় এই বজরা বোটটিকে শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়ে রাখতে পারলুম না। যুদ্ধের সময় কাঠ ও লোহার অভাবে সময়মত মেরামত করা গেল না, একটু একটু করে ভাঙতে ভাঙতে নিঃশেষ হয়ে গেল। শিলাইদহ, শাহাজাদপুর বা পতিসরে যখনই বাবা থাকতেন পদ্মা বোট না হলে তাঁর চলত না।

সেবার পতিসরে পৌঁছে গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি দেখে মন পুলকিত হয়ে উঠল। পতিসরের হাই স্কুলে ছাত্র আর ধরছে না দেখলুম— নৌকার পর নৌকা নাবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ছেলের দল ইস্কুলের ঘাটে। এমন-কি আট-দশ মাইল দূরের গ্রাম থেকেও ছাত্র আসছে। পড়াশুনার ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণীর কোনো ইস্কুলের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। পাঠশালা, মাইনর স্কুল সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। তিনটি হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারির কাজ ভালো চলছে। মামলা-মোকদ্দমা খুবই কম, যে অল্পস্বল্প বিবাদ উপস্থিত হয় তখনই প্রধানরা মিটিয়ে দেন। যে সব জোলারা আগে কেবল গামছা বুনত তারা এখন ধুতি শাড়ি বিছানার চাদর বুনে আমাকে দেখাতে আনল। ঐ অঞ্চলে যত রকম মাছ ধরার জাল বা খাঁচা ব্যবহার হয় একটি জেলে তার এক সেট মডেল আমাকে উপহার দিল। কুমোরেরাও নানারকমের মাটির বাসন এনে দেখাল। গভর্ণমেণ্টের নতুন আইনের সাহায্যে ঋণমুক্ত হয়ে গ্রামের

লোকদের চিরন্তন আর্থিক দুরবস্থা আর নেই। আমাকে চাষীরা কেবল অনুযোগ জানাল, 'বাবু-মশায়, আমাদের আরও ট্র্যাক্টর এনে দিলেন না?'

১৩১৫ সালে বাবা যে লিখেছিলেন তাঁর এক চিঠিতে—

যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে— পথঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, সালিশের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়— তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে।

তাঁর দীর্ঘকালের সেই চেষ্টা যে এমন সুফল দিয়েছে তা দেখে আনন্দে আমার মন ভরে গেল।

বাবার আর-একটি লেখার কথা তখন মনে পড়ে গেল—

তার পরে মাটির কথা— যে মাটিতে আমরা জন্মেছি। এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করছে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দূরে দূরে ভাবের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে— বর্ষণের যোগের দ্বারা তবে এই মাটির সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক হবে। যদি কেবল হাওয়ায় এবং বাষ্পে সমস্ত আয়োজন ঘুরে বেড়ায় তবে নূতন যুগের নববর্ষা বৃথা এল। বর্ষণ যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু মাটিতে চাষ দেওয়া হয় নি। ভাবের রসধারা যেখানে গ্রহণ করতে পারলে ফসল ফলবে সেদিকে এখনো কারো দৃষ্টি পড়ছে না। সমস্ত দেশের ধূসর মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে বলছে, তোমাদের ঐ যা-কিছু ভাবের সমারোহ, ঐ যা-কিছু জ্ঞানের সঞ্চয় ও তো আমারই জন্যে— আমাকে দাও, আমাকে দাও। সমস্ত নেবার জন্যে আমাকে প্রস্তুত কর। আমাকে যা দেবে তার শতগুণ ফল পাবে। এই আমাদের মাটির উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস আজ আকাশে গিয়ে পৌচেছে, এবার সুবৃষ্টির দিন এল বলে, কিন্তু সেই সঙ্গে চাষের ব্যবস্থা চাই যে।

পায়ে-চলার পথ

১

এই ত পায়ে-চলার পথ।

এসেছে বনের মধ্য দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্য দিয়ে নদীর ধারে, খেয়াঘাটের পাশে বটগাছতলায়; তার পরে ওপারের ভাঙা ঘাট থেকে বেঁকে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে; তার পরে তিসির খেতের ধার দিয়ে, আমবাগানের ছায়া দিয়ে, পদ্মদীঘির পাড় দিয়ে, রথতলার পাশ দিয়ে কোন্ গাঁয়ে গিয়ে পৌঁচেছে জানিনে।

এই পথে কত মানুষ কেউবা আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে, কেউবা সঙ্গ নিয়েছে, কাউকে বা দূর থেকে দেখা গেল; কারো বা ঘোমটা আছে, কারো বা নেই; কেউবা জল ভরতে চলেছে, কেউ বা জল নিয়ে ফিরে আসচে।

২

এখন দিন গিয়েছে, অন্ধকার হয়ে এল।

একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারি পথ, একান্তই আমার; এখন দেখচি কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলবার হুকুম নিয়ে এসেচি, আর নয়।

নেবুতলা উজিয়ে, সেই পুকুরপাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়ালবাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে আর একটিবারও ফিরে গিয়ে বলা হবেনা, "এই যে!" এপথ চলার পথ, ফেরার পথ নয়।

আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম, —দেখলুম, এই পথটি শতবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা।

যত কাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই সংক্ষিপ্ত করে এই পথ আপনার একটিমাত্র ধূলিরেখায় এঁকেছে। সেই একটি রেখা চলেচে সূর্য্যোদয়ের দিক থেকে সূর্য্যাস্তের দিকে, এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আরেক সোনার সিংহদ্বারে।

৩

"ওগো পায়ে চলার পথ, অনেককালের অনেক কথাকে তোমার এই ধূলিবন্ধনে বেঁধে নীরব করে রেখোনা। আমি তোমার ধূলোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে কানে বল।"

পথ নিশীথের কালো পর্দার দিকে তর্জ্জনী বাড়িয়ে চুপ করে থাকে।

"ওগো পায়ে-চলার পথ, এত পথিকের এত ভাবনা এত ইচ্ছা, সে সব গেল কোথায়?"

বোবা পথ কথা কয়না। কেবল সূর্য্যোদয়ের দিক থেকে সূর্য্যাস্তের দিক পর্য্যন্ত ইসারা মেলে রাখে।

"ওগো পায়ে-চলার পথ, তোমার বুকের উপর যে-সমস্ত চলন্ত পদপাত পুষ্পবৃষ্টির মত পড়েছিল আজ তারা কি কোথাও নেই?"

পথ কি নিজের শেষকে জানে? যেখানে সমস্ত লুপ্ত ফুল আর স্তব্ধ গান পৌঁচল, যেখানে তারার আলোয় অনির্ব্বাণ বেদনার দেয়ালি উৎসব হচ্চে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর্থিক উন্নতি ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীভবতোষ দত্ত

আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের দেশের সাম্প্রতিক চিন্তাধারা এবং কর্মপদ্ধতিতে কয়েকটি আলাদা প্রবাহ একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। বিরাট জনবহুল অনগ্রসর দেশের দারিদ্র্য দূর করতে হলে দেশব্যাপী বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আজকাল প্রায় সর্ববাদিসম্মত। এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকৃত যে, শিল্পে নিয়োজিত জনসংখ্যা বাড়ানো তখনই সম্ভব, যখন কৃষিজাত খাদ্য এবং কাঁচামাল উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বাড়ানো যায়। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের শিল্পবিবর্তন অবশ্য আমদানী খাদ্য এবং কাঁচামালের উপরে নির্ভর করে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আজকালকার পৃথিবীতে এটা আর ব্যাপকভাবে সম্ভব নয়। তাই শিল্প-উন্নয়নের জন্য কৃষি-উন্নয়ন অপরিহার্য। অন্য দিকে কৃষির উন্নতি করতে গেলে আবার শিল্পগঠন প্রয়োজন — যাতে কৃষি-ব্যবস্থায় নিয়োজিত জনসংখ্যা কমিয়ে আনা যায় এবং যাতে কৃষিজাত উৎপন্নের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

আমাদের দেশের আথিক উন্নতির বর্তমানকালীন পরিকল্পনায় এই শিল্পগঠন সম্বন্ধীয় কর্ম-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গেই আছে গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধীয় অন্য একপ্রকার কর্মপদ্ধতি— যার প্রকাশ সমবায়-সমিতির প্রসারের চেষ্টায়, গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্পগঠনে এবং কম্যুনিটি প্রজেক্ট জাতীয় ব্যবস্থায়। আমাদের প্রয়োজন যত বড়ই হোক-না কেন, এটা সহজেই বোঝা যায় যে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের কৃষিমূলক আথিক কাঠামোকে শিল্পমূলক করে তোলা অসম্ভব। বাস্তব পক্ষে সম্ভব শিল্প-উন্নয়ন যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে করে আনলেও, অনেক কাজই বাকি থেকে যাবে, বিশেষতঃ দেশের অগণিত গ্রামে গ্রামে। সে কাজের জন্য মূলধনের অভাব হবে, শিক্ষিত শ্রমিক পাওয়া যাবে না, ব্যবস্থার এবং ব্যবস্থাপনার দুরূহতা পদে পদে দেখা দেবে। তাই প্রশ্ন ওঠে, গ্রামের উন্নতির এমন কি কি উপায় আছে, যাতে মূলধন বেশি লাগে না, যার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম এবং ব্যবস্থাপনা গ্রামেই পাওয়া যাবে এবং যার জন্য প্রথম অবস্থার পরে বিশেষ কোনো সরকারী নিয়ন্ত্রণ বা কর্মব্যবস্থার প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়। কুটিরশিল্প, সমবায়পদ্ধতিতে উৎপাদন এবং গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আধুনিক ব্যবস্থা কম্যুনিটি প্রজেক্ট, এ সবেরই মূলনীতি এই প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত।

কৃষির উন্নতি, কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠা ও সমবায়নীতির প্রচলন বিষয়ে আলোচনা আমাদের দেশে বহুদিন ধরে হয়ে আসছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে ভারত-সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ডক্টর ভোয়েলকার এ সম্বন্ধে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ রিপোর্ট দিয়েছিলেন— সত্তর বৎসর পরেও সে রিপোর্টকে অসাধারণভাবে আধুনিক বলে মনে হবে। প্রায় সেই সময়েই মাদ্রাজের সিভিলিয়ান ফ্রেডরিক

নিকলসন তিন বৎসর জার্মানিতে সমবায়প্রথার সংগঠন পর্যবেক্ষণ করে আমাদের দেশে সমবায় ছাড়া গতি নেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। শতাব্দী-প্রান্তে রমেশ দত্ত তাঁর নানা আলোচনাতে কৃষিসমস্যার বহু দিকে শিক্ষিত পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বদেশী আন্দোলন আবার আলোচনার পথ প্রসারিত করে দেয়। এখন পর্যন্ত কৃষির উন্নতি এবং পল্লীজীবনের উন্নয়ন সম্বন্ধে যে কর্মধারা অবলম্বিত হচ্ছে তার অনেকটাই অর্ধশতাব্দীরও আগে একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছিল।

কম্যুনিটি প্রজেক্ট অনেকটা নূতন জিনিস। কিন্তু এই ব্যবস্থার মূলনীতির একটা সুচিন্তিত প্রকাশ ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে পাওয়া যায়। দেশে জলকষ্ট ইত্যাদি প্রাকৃতিক বা অন্য কোনো প্রকার বিপর্যয়ে সব সময়েই সরকারের কাছে ভিক্ষাপ্রার্থী হওয়ার পন্থা রবীন্দ্রনাথ কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে সাধারণ ভারতবাসীর কাছে রাষ্ট্রের চেয়েও বড় তার 'সমাজ' বা কম্যুনিটি। 'সমাজ'কে যদি সংগঠনের বা ঐকত্রিক কার্যপদ্ধতির ধারক বলে মেনে নিই তা হলে আমরা কম্যুনিটি প্রজেক্টের মূলযুক্তিগুলি অনায়াসে পেয়ে যাই।

যে কম্যুনিটি প্রজেক্ট ভারতবর্ষে আজকাল দেখা যাচ্ছে তাতে অবশ্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ঐকত্রিক কর্মপ্রচেষ্টা অনেক সময়েই থাকে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরকারী কর্মচারী উপর থেকে নির্দেশ দিচ্ছেন কি কি করতে হবে, এবং সেই নির্দেশ এবং তৎসংযুক্ত সাহায্য যেখানে না দেওয়া হচ্ছে সেখানে অনেক সময়েই এই সংগঠনগুলি অকৃতকার্য হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া এমনও হচ্ছে যে আসলে ঐকত্রিক কর্মপ্রচেষ্টা কিছুই নেই, যা আছে তা হল সরকারী কর্মচারীদের তৈরি একটা লোক-ভোলানো ব্যবস্থা। প্রথম অবস্থায় যদি এরকম হয় তাহলেই যে একেবারে নিরাশ হতে হবে তা নয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সমাজ-সংগঠনকে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হতেই বলেছিলেন, কিন্তু এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে ১৯০৪-৫ সালের ভারতবর্ষে সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আমাদের যে মনোভাব হতে পারত, ১৯৬১ সালের স্বাধীন ভারতে সেটা হওয়ার কথা নয়। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের নিজের পল্লীসংগঠনের প্রচেষ্টাতেও গ্রামের লোককে উৎসাহিত করবার জন্য এবং পথনির্দেশ দেবার জন্য শহরের শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন স্বীকৃত এবং গৃহীত হয়েছিল।

'স্বদেশী সমাজে'র চিন্তাধারার পরের ধাপই সমবায়। যে সময়ে 'স্বদেশী সমাজ' রচিত হয়েছিল, সে সময়েই আমাদের দেশে সমবায়প্রথার গোড়াপত্তন হচ্ছে। উনিশ শতকের শেষ দিকেই একটি দুটি করে সমবায়সমিতি আমাদের দেশে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু এই প্রথার সুপ্রকট সূচনা হল তখনই, যখন সরকারী সহায়তা এবং আইনের ব্যবস্থা সহজপ্রাপ্য হল। ফ্রেড্‌রিক নিকলসনের রিপোর্টেরই ফলে ১৯০৪ সালে সমবায় প্রথায় গঠিত ঋণদান-সমিতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত এবং সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে প্রথম ভারতীয় সমবায় আইন বিধিবদ্ধ হল। ১৯১২ সালে সর্বপ্রকার সমবায়সমিতি সম্বন্ধে আইন পাশ হয়। এর দু বছর পরে ম্যাক্‌লাগান কমিটি ভারতের সমবায়

আন্দোলনের সুবিধা- অসুবিধা, ভবিষ্যৎ এবং প্রতিবন্ধক সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের অন্য অনেক সমস্যার মধ্যেও সমবায়নীতি ও কর্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের দেশে চলতে থাকে।

ভারতবর্ষের সমবায়-প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিহাসে একটা প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হল যে ঋণদান-সমিতি ছাড়া আর কোনো দিকে এর বিশেষ অগ্রগতি হয় নি। ১৯১৮-১৯ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় সমবায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন তখন বাংলাদেশে সমবায়-ঋণদানসমিতির সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার, কিন্তু কৃষকদের ক্রয়বিক্রয়-সমিতির সংখ্যা ছিল মাত্র আটটি, গ্রামাঞ্চলে দুগ্ধ-উৎপাদনসমিতির সংখ্যা ছিল মাত্র চার এবং অন্যজাতীয় উৎপাদন এবং বিক্রয় -সমিতির সংখ্যা ছিল ৯৫। ১৯১৭ সালে একমাত্র উল্লেখযোগ্য কৃষি-উৎপাদনসমিতি ছিল রাজসাহী-নওগাঁর গাঁজা-চাষীদের সমিতি ; কিন্তু এই সমিতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূলে ছিল একচেটিয়া কারবার ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ।

সমবায়-সংগঠনের প্রয়োজন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে যে যুক্তি দিয়েছিলেন, সেগুলি সহজ এবং সর্বজনগ্রাহ্য। সমবায়ের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি নীতিগত নয়; কার্যকরতার সম্ভাবনা কতটা সে সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায় বা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আশাভঙ্গ হয় বলেই নিরুৎসাহ হবার কারণ ঘটে। তা ছাড়া সমবায়ের মূলসূত্র ধরে অগ্রসর হলে ঋণদানের চেয়েও বড় প্রয়োজন উৎপাদন-সংহতির, এ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ বার বার প্রকাশ করেছিলেন। অনেকটা দুঃখের সঙ্গেই এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন :

> আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায় প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ শোধিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা-উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।
>
> —রাশিয়ার চিঠি, ১৩৬৩ সংস্করণ, পৃ. ১১৭

আর-এক জায়গায় এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ অন্যভাবে বলেছিলেন :

> কো-অপারেটিভের যোগে অন্যদেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় না। কেননা, ধার দেওয়া, তার সুদকষা এবং দেনার টাকা আদায় করা অত্যন্ত ভীরু মনের পক্ষেও সহজ কাজ, এমন কি ভীরু মনের পক্ষেই সহজ ; তাতে যদি নামতার ভুল না ঘটে তাহলে কোনো বিপদ নেই।
>
> —রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ২৩

এটা লক্ষ্য করা উচিত যে এসব কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৯৩০ সালে, তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তে। সমবায়-সম্বন্ধে তাঁর লেখা যে প্রবন্ধগুলি বিশ্বভারতী একত্রিত করে প্রকাশ করেছেন তাতে এই নৈরাশ্যটা ফুটে ওঠে নি। এই শেষোক্ত প্রবন্ধগুলি ১৯১৮ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে লেখা এবং তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মনে প্রধান প্রশ্ন হল কি করে সমবায়ের বাণী কৃষকদের

মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। তাঁর প্রবন্ধের পাঠক বা বক্তৃতার শ্রোতা অবশ্য কৃষকশ্রেণী নয়, কিন্তু শিক্ষিতসমাজকে আগে অবহিত করে না তুললে কোনো দিকেই যে অগ্রসর হওয়া যাবে না এই কথাটা বোধহয় তাঁর মনে তখনকার অবস্থায় বদ্ধমূল ছিল। ১৯৩০ সালের 'রাশিয়ার চিঠি'তে পরিশিষ্টে মুদ্রিত 'গ্রামবাসীদের প্রতি' নামক বক্তৃতা কিন্তু সাধারণ পল্লীবাসীদের কাছে দেওয়া হয়েছিল। এখানে এটাও উল্লেখযোগ্য যে সমবায়-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি যখন রচিত হয়েছিল, সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথের নিজের পল্লী-উন্নয়নপ্রচেষ্টা শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা (১৯২২) হয়। ১৯২২ সালের আদর্শবাদ ১৯৩০ সালে অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

সমবায় সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলিতে চাষীদের প্রত্যেকের আলাদা কাজের চেয়ে একত্রিত কাজ যে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে এই কথাটাই বারবার জোর দিয়ে বলা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে যে কৃষিপদ্ধতির গুণগান করা হয়েছিল সেটা আমাদের দেশের চিরাচরিত পদ্ধতি নয়, সেটা পাশ্চাত্ত্য ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার পদ্ধতি। যেখানে প্রত্যেক চাষীই দরিদ্র সেখানে কোনো আধুনিক কৃষিকর্ম ব্যক্তিগত চাষে হওয়া সম্ভব নয়, সমবায়ই সেখানে উন্নতির একমাত্র পন্থা। সমবায়ের পথে অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকের কথা তখনও তাঁকে বিশেষ চিন্তিত করে নি, সমবায়ের কর্মপদ্ধতিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করাটাই তখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হয়েছে। যে বাণী এই প্রবন্ধগুলিতে বারবার উচ্চারিত হয়েছে সেটা প্রবল আশাবাদীর বাণী। যেমন :

সমবায়প্রণালীতে চাতুরী কিম্বা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড়ো হইতে চাহিবে না। মিলিয়া বড়ো হইবে। এই প্রণালী যখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া যাইবে তখন রোজগারের হাটে আজ মানুষে মানুষে যে একটা ভয়ংকর রেষারেষি আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এখানেও মানুষ পরস্পরের আন্তরিক সুহৃদ হইয়া, সহায় হইয়া, মিলিতে পারিবে।

—সমবায়নীতি, পৃ. ১২

কিংবা

আজ প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের অন্তর ও বাহ্যশক্তির ঐক্যে বিরাট, শক্তি-সম্পন্ন। তাই মানুষ পৃথিবীর জীবলোক জয় করছে। আজ কিছুকাল থেকে মানুষ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই সত্যকে আবিষ্কার করেছে। সেই নূতন আবিষ্কারেরই নাম হচ্ছে সমবায় প্রণালীতে ধন-উপার্জন।

—সমবায়নীতি, পৃ. ২৮

রবীন্দ্রনাথের চোখে সমবায়প্রণালী শুধু ব্যক্তিগত উপার্জনপদ্ধতিকে একত্রিত করে কার্যকর আকারের উৎপাদন-সংস্থা গঠনের পন্থাই নয়; উল্টো দিক থেকে সমবায় বিকেন্দ্রীকরণের সহায়তা করবে এমন বিশ্বাসও তাঁর ছিল :

অতিকায় ধনের শক্তি বহুকায়ায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে অন্তর্ধান করবে, এমন দিন এসেছে।

—সমবায়নীতি, পৃ. ২৮

সমবায় অতিক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-সংস্থা এবং অতিবৃহদায়তন উৎপাদন-সংস্থা, এই দুইয়েরই

অসুবিধা, অন্যায় এবং আতিশয্য পরিহার করে কর্মদক্ষ, অথচ অন্যায়বলহীন উৎপাদনপদ্ধতির সূচনা করবে।

ঐ সময়ে সমবায়প্রথার প্রসারের জন্য তাঁর এই আগ্রহ জন্মেছিল দেশের আর্থিক অবস্থা এবং ব্যবস্থার নানা প্রকারের সমস্যা অবধান ক'রে এবং সঙ্গে সঙ্গে তখনকার রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে কতটা কি আশা করা সম্ভব সেটা বিচার ক'রে। মনে রাখা প্রয়োজন যে ঐ সময়েই ভারতবর্ষ হোমরুল আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং অসহযোগ ইত্যাদির ধাপে ধাপে রাষ্ট্রীয় শক্তির উপরে বিশ্বাস হারিয়েছে। অন্যদিকে ১৯১৮ সালে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিশনের রিপোর্টে মদনমোহন মালবীয় ভারতের আর্থিক উন্নতির ধারা কি রকম হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটা জাতীয়তাপন্থী নির্দেশ দিয়েছেন। এই সব রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আলোচনার সবটাতেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের সম্মতি ছিল না। কিন্তু আবেদনের চেয়ে স্বাবলম্বনে ফল হবে বেশি এটা তাঁর বিশ্বাস ছিল এবং অন্য দিকে এটাও বিশ্বাস ছিল যে উৎপাদনপদ্ধতিতে চিরকালীন প্রথাগুলিকে ত্যাগ করতে হবে।

এর সঙ্গে সঙ্গে ছিল আরও একটা বড় কথা— আর্থিক অসাম্যের অন্যায়। ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনৈতিক নেতারা বা অর্থনীতির পণ্ডিতেরা এ দিকে খুব বেশি জোর দেন নি। রবীন্দ্রনাথের চোখে আর্থিক অসাম্যসঞ্জাত সমস্যাগুলি বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, এবং অর্জিত বা অনর্জিত সঞ্চয়ের অধিকারী এবং শ্রমিকদের মধ্যে যে বিরোধ ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছিল সেটাও তাঁকে পীড়া দিয়েছিল। দুএকটি উক্তি উদ্ধৃত করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে :

যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা, সকল-রকম প্রতাপের প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ-অর্জনে যেখানে ভেদ আছে সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না।

—সমবায়নীতি, পৃ. ১৭-১৮

রাশিয়া-ভ্রমণের ফলে সোভিয়েট আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সে-আকর্ষণের একটা বড় কারণ আর্থিক অসাম্য-সম্বন্ধে সোভিয়েট-নীতি। ভ্রমণের প্রথম দিকেই তিনি লিখছেন :

এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।

—রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ১১

এবং অন্যত্র :

যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার-সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।

—রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ১৩

রাশিয়ার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের আর-একটা বড় কারণ কৃষি-উন্নতি সম্বন্ধীয় তাঁর নিজস্ব ধারণার সঙ্গে রাশিয়ার 'কালেক্টিভ ফার্ম' বা ঐকত্রিক কৃষিব্যবস্থার তুলনীয়তা। কালেক্টিভ ফার্মের পটভূমিকায় যে রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিকাও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল তার সবটা হয়তো ১৯৩০ সালের রাশিয়াতে রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে নি। কিন্তু যেটুকু তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল সেটা সহজ— ব্যক্তিগত কৃষির বদলে সমবেত কৃষি এবং তার ফলে আধুনিকতম প্রণালীর ব্যবহার, যান্ত্রিক কৃষির প্রসার এবং উৎপাদনের হার বৃদ্ধি। রাশিয়ার চিঠি যখন লেখা হয়েছিল তখন সমবায়প্রথা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে বিরাট আশা দশ-পনেরো বছর আগে ছিল সেটা অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। সমবায়ের অগ্রগতি আমাদের দেশে যেটুকু হয়েছিল তার অনেকটাই যে উৎপাদনের দিকে না গিয়ে ঋণদানের দিকে গিয়েছিল সেটা তাঁকে বিশেষ ভাবে পীড়া দিয়েছিল। কতকগুলো আপাত-সহজ সমাধান যে ঠিক সমাধান নয় তাও তখন তিনি বুঝতে পেরেছেন— যেমন :

চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বই কমবে না।

—রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ২২

অর্থাৎ, আমাদের কৃষিব্যবস্থার উন্নতি আনতে হলে একটা বড় রকমের পরিবর্তন দরকার এটা বোধ হয় তিনি তখন বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন।

এই ধরণের একটা বড় পরিবর্তন রাশিয়াতে দেখতে পেয়ে স্বভাবতই তিনি আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রের আকার, কলের লাঙলের সংখ্যা এবং উৎপাদনের পরিমাণ দেখে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অবশ্য এ রকম কৃষিব্যবস্থায় নিজের স্বতন্ত্র সম্পত্তি যৌথ সম্পত্তিতে মিলিয়ে দিতে যে কেউ কেউ আপত্তি করতে পারে এ প্রশ্ন তাঁর মনে জেগেছিল। তাঁর নিজের মনে হয়েছে যে একটা মাঝামাঝি সমাধান করা যেতে পারে :

ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তাহলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতায় প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না ;

এবং এটাও তিনি উপলব্ধি করেছেন যে

সোভিয়েটরা এই সমস্যাকে সমাধান করতে গিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সেজন্যে জবর্দস্তির সীমা নেই।

—রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ৩৪

কিন্তু অন্য দিকে যৌথ চাষে রাশিয়ার কৃষিজ উৎপন্নের প্রভূত বৃদ্ধি উপেক্ষার জিনিস নয়। জবরদস্তি বাদ দিয়ে ঐকত্রিক চাষ যদি সাধারণগ্রাহ্য করে দেওয়া যায় তাহলে যা হয় তারই নাম কো-অপারেটিভ্ ফার্মিং— যার কথা বহুদিন পরে আমাদের দেশে আবার শোনা যাচ্ছে।

ভারতবর্ষের কৃষির এবং পল্লীগ্রামের সমস্যা কেবল আজকালকার সমস্যা নয়, এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে পঁচিশ বা পঞ্চাশ বছর আগে এই সমস্যাগুলি সমাধানের যে পন্থা সবচেয়ে ভালো বলে মনে করা হত, এখনো তার চেয়ে নূতনতর বিশেষ কোনো পন্থা পাওয়া যাবে না। এর কারণ চিন্তার দৈন্য নয়। এর কারণ পাওয়া যাবে আমাদের দেশের বিরাট আর্থিক সমস্যার অপরিবর্তিত স্থায়িত্বে। ভারতবর্ষে শিল্পসংগঠন ইত্যাদির জন্য আধুনিকতম যে ব্যবস্থাই হোক-না কেন, বর্তমানে প্রাপ্তব্য মূলধন, যন্ত্র-কর্মী এবং সংগঠন-ক্ষমতা দিয়ে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করা সম্ভব হবে না, যদি-না অনেকটা কাজই বিনা মূলধনে বা অল্প মূলধনে সমবেত প্রচেষ্টায় না হয়। কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার যদি সরকারী কর্মচারী পাঠিয়ে ভারতবর্ষের সবগুলি গ্রামের উন্নতি একসঙ্গে এবং অল্প সময়ে করতে চান, তাতে শুধু আপিস-খরচাই বাড়বে, কাজ কিছু হবে কিনা সন্দেহ; আর, সেই আপিস-খরচা জোগানোর মত টাকাও সরকারী তহবিলে পাওয়া যাবে না। খাদ্য-সমস্যার সমাধানেও যদি নূতন কোনো সংগঠনের সাহায্যে উন্নত কৃষিপদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টা করা হয়, তাহলে যে মূলধন ও শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিক আমাদের আছে তাতে দেশের মোট কৃষিযোগ্য জমির অনেকটাতেই হাত দেওয়া যাবে না। অতএব, যেখানে আর-কিছু সম্ভব নয় সেখানে যদি আমরা পল্লীগ্রামের অগণিত সাধারণ মানুষের শ্রমকে সম্পদে পরিণত করতে পারি, তাহলেও দেশের কিছু উন্নতি হয়। দরিদ্র দেশের আর্থিক উন্নতিতে দরিদ্র দেশের উপযোগী উপায় অবলম্বন করা ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

কম্যুনিটি প্রজেক্ট ও সমবেত চাষের সপক্ষে যুক্তির মূলভিত্তি এখানেই, এবং রবীন্দ্রনাথ বহুদিন আগেই এটা প্রণিধান করেছিলেন। এই মূলযুক্তিতে ভুল নেই, কিন্তু আসল সমস্যা হল যে বস্তুতঃ দরিদ্র দেশের উপযোগী এই ধরণের পন্থা আমাদের দেশে কার্যকর করে তোলা যাবে কি না। যদি সরকারী নির্দেশে এবং সরকারী ব্যবস্থাপনায় এই সব পন্থা অবলম্বন এবং পরিচালন করতে হয়, তাহলে মূলনীতির অনেকখানিই ত্যাগ করতে হবে, এবং যে ব্যয়াধিক্যের ভয়ে সমবেত প্রচেষ্টার পক্ষে যুক্তি দেখানো হয় সেই ব্যয়াধিক্যই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। অন্য দিকে, এই ব্যবস্থার সবটাই বা অনেকটাই যদি চাষীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে হয়তো কাজ আরম্ভই হবে না, এবং আরম্ভ হলেও শেষ পর্যন্ত সবটাই কয়েকজন স্বার্থান্বেষীর হাতে গিয়ে পড়বে। এই দুইয়ের মাঝামাঝি সমাধান পাওয়া যায় যদি সারা দেশে কাজ করবার জন্য শিক্ষিত আদর্শবাদী নিঃস্বার্থ কর্মী পাওয়া যায়। কিন্তু আদর্শবাদ দেশে আজকাল উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে; আদর্শবাদী যদি কেউ থাকেনও, তাঁর অস্তিত্ব আজকাল সংকটময়। রবীন্দ্রনাথ যে সমাজ এবং যে কর্মপদ্ধতি চেয়েছিলেন তার জন্যে উঁচুদরের মানুষ প্রয়োজন। আজকালকার বিরাটকায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে কি মত পোষণ করতেন সেটা বলা শক্ত, কিন্তু অনেক দিকে তাঁর নৈরাশ্য সম্ভবতঃ ঘনতর হত।

অর্থনীতি বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি

শ্রীবিনয় ঘোষ

যন্ত্রযুগের বাইরের মসৃণতা ও চাকচিক্যের মধ্যে একটা দৃষ্টিকটু বৈকল্য হল তার অন্তরালবর্তী সামাজিক বৈষম্য। মানবসমাজের সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ঊর্ধ্বাধঃ কোনো রেখা টানতে পারলে দেখা যেত, তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নানা স্তরের সমাজ ও সংস্কৃতি পাশাপাশি বিরাজ করছে। সভ্যতার স্তরগুলি দিগন্তবিস্তৃত তরঙ্গায়িত পর্বতমালার শৃঙ্গের মতন, প্রত্যেক শৃঙ্গের উচ্চতার পার্থক্য আছে, এবং তার মধ্যে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টের মতন আমাদের বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতা বিরাজ করছে। এই উচ্চতার অসমতা এত বেশি যে প্রাগৈতিহাসিক জনসমাজ থেকে এ যুগের যন্ত্রসমাজ পর্যন্ত সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রত্যেকটি সোপান অতিক্রম করা যায় তার মধ্যে। এক মেরুতে সেই আদি অকৃত্রিম জনসমাজ, আর-এক মেরুতে আমাদের এই কৃত্রিম যন্ত্রসমাজ। সমাজের এই দুই মেরুর ব্যবধানকে বিজ্ঞানীরা 'folk-sophisticate polarity' বলেছেন, আমরা প্রাকৃতজনসমাজ ও যান্ত্রিকজনসমাজ বলতে পারি। ডার্খহাইম (Durkheim) এই দুই ধরণের সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধতার বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে বলেছেন যে একটির বন্ধন 'জৈবিক', অন্যটির বন্ধন 'যান্ত্রিক', এবং বন্ধনের দৃঢ়তানুসারে টনিজ (Tonnies) একটিকে 'কমিউনিটি', অন্যটিকে 'সোসাইটি' আখ্যা দিয়েছেন। লোকসংস্কৃতি হল এই জৈবিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি— গোষ্ঠীভুক্ত সকলের প্রত্যক্ষ মানবিক সম্পর্ক, আত্মিক সংযোগ ও গভীর আন্তরিকতা থেকে উৎসারিত। তার পরিধি সংকীর্ণ, কিন্তু প্রাণশক্তি প্রাকৃতিক প্রস্রবণের মতন চিরপ্রবহমান।

যান্ত্রিক পরিবহণের যুগে মানুষের সামাজিক ও ভৌগোলিক বসতি-ব্যবধান দূর হওয়ার আগে পর্যন্ত সংস্কৃতির এই প্রাকৃতজনরূপ সর্বত্রই প্রায় অকলঙ্কিত ছিল, আমাদের দেশের আত্মকেন্দ্রিক গ্রাম্যসমাজে তো ছিলই। লোকসংস্কৃতির গড়ন সম্বন্ধে বিখ্যাত মানববিজ্ঞানী ক্রোবার বলেছেন[১]—

The relatively small range of their culture content, the close-knitness of the participation in it, the very limitation of scope, all make for a sharpness of patterns in the culture, which are well characterized, consistent, and inter-related. Narrowness, depth, and intensity are the qualities of folk-cultures.

সংস্কৃতির ভৌগোলিক সম্প্রসারণের ফলে আত্মনির্ভর জনগোষ্ঠীর গাঢ়বদ্ধতা ক্রমে শিথিল

১ A. L. Kroeber, *Anthropology* (London 1948), 281 fn, 282.

হতে থাকে। আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতির অকৃত্রিম রূপ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে প্রধানতঃ দুটি কারণে— প্রথম কারণ, নাগরিক সংস্কৃতি মুখ্যতঃ নগরকেন্দ্রিকই ছিল, তার তরঙ্গ গ্রামে পৌঁছেচে এত মৃদুগতিতে যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারাটিকে কলুষিত করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। ইদানীং পরিবহণের দ্রুত সুব্যবস্থার ফলে নগর-গ্রামের ব্যবধান ঘুচে যাচ্ছে, পরস্পরের সংযোগ ঘটছে, এবং নতুন নতুন শিল্পনগরের চিমনির ধোঁয়ায় পরিপার্শ্বের নির্মল হাওয়া যেমন দূষিত হচ্ছে, তেমনি বিবর্ধমান নগরের বিচিত্রজনগোষ্ঠীর যান্ত্রিক জীবনের নব্য-সংস্কৃতির ছন্দ গ্রাম্য লোকসংস্কৃতির ছন্দপতনের পথ পিচ্ছিল করছে। দ্বিতীয় কারণ, সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিবর্ণধর্মচক্রগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তবন্ধন এত দৃঢ় ছিল যে বাইরের কোনো আঘাতে বা আকর্ষণে সহজে তাকে বিকেন্দ্রিত করা সম্ভব হয় নি। কূপমণ্ডূকতা ও কেন্দ্রাভিমুখিতা তার স্থিতির প্রধান কারণ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালে ও যৌবনে দেখেছেন, কারখানার চিমনির ধোঁয়ায় কলকাতা শহর ও তার আশপাশের আকাশ কালো হয়ে গেছে এবং নতুন বৈদ্যুতিক আলোয় সেকালের ভূতপ্রেত ও ব্রহ্মদৈত্যরা পলায়ন করছে। কিন্তু কলকাতা শহর বা তার উপকণ্ঠের গঙ্গাতীরবর্তী পাটকল অঞ্চলের বাইরে বাংলার 'ছায়াসুনিবিড়' গ্রামাঞ্চলে ভূতের দৌরাত্ম্য তখনও একটুও কমে নি, ভূতপ্রেতের সঙ্গে মিলেমিশে অন্ধকারে পরম নিশ্চিন্তে একসঙ্গে মানুষও বসবাস করত। নবযুগের নগরের ভূত অথবা কারখানার ব্রহ্মদৈত্য তখনও গ্রাম-বাংলার স্কন্ধে ভর করে নি। তাই গ্রামীণ জনসংস্কৃতির উৎস বা প্রবাহ তখনও অব্যাহত ছিল, জীবন্তও ছিল। তার স্বচ্ছন্দ গতিধারা এখানে-সেখানে নানা কারণে শীর্ণ হলেও, স্রোত শুকিয়ে গিয়ে বুকের উপর কোথাও বালুচর ঠেলে ওঠে নি। জোড়াসাঁকোর ইষ্টকাকীর্ণ পরিবেশের বাইরে, শিলাইদহে ও শান্তিনিকেতনে, এবং বাংলার আরও অনেক গ্রামে এই জনসংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শলাভের সুযোগ ঘটেছিল তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে। রুদ্ধশ্বাস শহুরে পরিবেশ থেকে তাঁর মন তাই কাব্যের উৎস সন্ধানে আত্মপ্রকাশের অস্থিরতায় ছুটে যেত পল্লীর মানুষের কাছে, এবং একান্ত নিভৃতে তাদের জীবন-গঙ্গায় অবগাহন করে তিনি পরিতৃপ্ত হতেন, সৃষ্টির শক্তি সঞ্চয় করতেন।

বিচিত্রগামী রবীন্দ্রসাহিত্যের ধারায় কত দিক থেকে বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির কত প্রবাহ এসে যে মিলিত হয়েছে তার ঠিক নেই। সুবিস্তীর্ণ রবীন্দ্রসাহিত্য পরিক্রমান্তে স্থিরভাবে চিন্তা করলে তা কতকটা মাত্র উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রসংগীতে বাংলার লোকসংগীতের প্রভাব যে কত গভীর তা সংগীতজ্ঞের শিক্ষিত কান ছাড়াও সাধারণের অশিক্ষিত কানেও ধরা পড়ে। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'ও আমার দেশের মাটি', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস', 'আমার সোনার বাংলা' প্রভৃতি গানে বাউল সুরের প্রভাব প্রত্যক্ষ। তিনি নিজেই এ কথা স্বীকার করেছেন—

আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেচে।[২]

বাংলার গ্রামাঞ্চলে বাউলের লোকপ্রীতির জন্য স্বদেশীযুগে রবীন্দ্রনাথ বাউলসুরের গানের ভিতর দিয়ে জনচিত্ত উদ্‌বুদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। গোরা উপন্যাসের গোড়াতেই তিনি 'কাজের শহর কঠিনহৃদয়' কলকাতার রাস্তার ধারে আলখাল্লা-পরা একটা বাউলকে এনে দাঁড় করিয়ে গান গাইয়েছেন—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

উপনায়ক বিনয়ের ইচ্ছা করতে লাগল বাউলটিকে ডেকে এনে এই অচিন পাখির গানটা লিখে নেয়, কিন্তু ভোর-রাত্রে যেমন শীত-শীত করে অথচ গায়ের কাপড়টা টেনে নিতে উদ্যম থাকে না, তেমনি একটা আলস্যের ভাবে বাউলকে ডাকা হল না, গান লেখাও হল না, কেবল ওই অচেনা পাখির সুরটা মনের মধ্যে গুন্ গুন্ করতে লাগল। গোরা উপন্যাস রচনা রবীন্দ্রনাথ ১৩১৪ সন থেকে আরম্ভ করেন, কিন্তু বাউলের অচেনা পাখির সুরটি তাঁর মনের মধ্যে আরও অনেক আগে থেকে গুঞ্জন করতে আরম্ভ করেছিল। যৌবনের উন্মেষকাল থেকেই তিনি এই অচিন পাখির পায়ে মনোবেড়ি পরাতে চেয়েছিলেন। কাব্যে ও সংগীতে, গল্পে ও উপন্যাসে, বিচিত্র ভাবতরঙ্গের শীর্ষে বারংবার লোকমানসের প্রতিমূর্তি এই বাউলের আবির্ভাব হয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনায়। এমন-কি, রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রায়শ্চিত্তে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ও ফাল্গুনীতে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় নৃত্য করেছেন, এবং সেই নৃত্যরীতি তাঁর নিজস্ব।[৩]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় দেশীয় লোকসংস্কৃতির এই প্রেরণা ও প্রভাব কোথা থেকে এল, এবং কেনই বা এল? কাব্যরসিকের কাছে এ প্রশ্ন হয়তো অবান্তর, কিন্তু সকলের কাছে তা নয়। বিশেষ করে লোকসংস্কৃতির চর্চা রবীন্দ্রনাথ যদি কেবল বিলাসচরিতার্থতা বলে মনে না করে থাকেন, যদি তা তাঁর সাহিত্যের প্রাণশক্তি জুগিয়ে থাকে, তাহলে পূর্বপ্রশ্নের উত্তর খোঁজারও একটা দায়িত্ব থেকে যায়।

দেশীয় জনকৃতির প্রতি অনুরাগের উৎস হল স্বজাতিপ্রেম। কিন্তু দেশপ্রেম বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি তার সঙ্গে গভীরতা ও প্রসারের দিক থেকে এই স্বজাতিপ্রেমের তফাত অনেক। উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে আমাদের দেশে ইংরেজীশিক্ষিত উদীয়মান মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনে স্বদেশানুরাগের সঞ্চার হতে থাকে, কিন্তু এই মধ্যবিত্তের শ্রেণীসীমানার বাইরে তার বিশেষ প্রসার হয় না। তাঁদের দেশপ্রেম ঠিক ইংরেজী শিক্ষার মতনই বাইরের শোভা বর্ধন করত,

২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, হারামণি. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪২, পৃ।৶০

৩ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২২।

মনটাকে স্পর্শ করত না। তাঁরা অনেকে হয়তো ইংরেজী আহার ও পরিচ্ছদকে বিজাতীয় বলে ঘৃণা করতেন, কিন্তু 'সমস্ত জাতির মনঃশরীরকে বিদেশীয় ভাষার পরিচ্ছদে মণ্ডিত এবং বিজাতীয় সাহিত্যের আহার্যে পরিবর্ধিত' দেখতে তাঁদের আক্ষেপ হত না।[৪] এই ইংরেজী-অভিমানী, মাতৃভাষাদ্বেষী বঙ্গবাসীর দেশপ্রেমের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে এসে বৃহত্তর জনসমাজের মনের অন্দর-মহলে প্রবেশ করার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বজাতিপ্রীতির জন্ম, এবং এই জাতিজনপ্রীতি থেকেই লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ উৎসারিত। দৈবক্রমে এ অনুরাগের সঞ্চার হয় নি। এর একটা ইতিহাস আছে।

এই ইতিহাসের জন্য প্রথমে ঠাকুর-পরিবারের দিকে, তার পর সমাজের দিকে চেয়ে দেখতে হয়। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—[৫]

বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল ও কিশোর বয়সের কথা। সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয় বলে তিনি তার যে 'কারণ' নির্দেশ করেছেন তা লক্ষণীয়। কারণটা হল, শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই তখন দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। 'বাংলার জাতীয় সাহিত্য' ভাষণে এই কথাটাই তিনি আরও জোর দিয়ে বলেছিলেন—

আমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক আছেন বাংলার প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ, রুচি এবং শ্রদ্ধা নাই; তাঁহাদিগকে যেমন করিয়া যেদিকে ফিরানো যায় তাঁহাদের কম্পাসের কাঁটা ইংরাজির দিকেই ঘুরিয়া বসে।... যাঁহারা আপন সন্তানকে তাহার মাতৃভাষা শিখিবার অবসর দেন না, যাঁহারা পরমাত্মীয়দিগকেও ইংরাজিভাষায় পত্র লিখিতে লজ্জা বোধ করেন না, যাঁহারা 'পদ্মবনে মত্তকরীসম' বাংলা ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে পারেন অথচ ভ্রমক্রমে ইংরাজির ফোঁটা অথবা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলেন, যাঁহাদিগকে বাংলায় হস্তীমূর্খ বলিলে অবিচলিত থাকেন কিন্তু ইংরাজিতে ইগ্নোরেন্ট্ বলিলে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে এ-কথা বুঝানো কঠিন যে, তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষার সন্তোষজনক পরিণাম নহেন।

৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, পৃ ১২৯-৩০; ১৩০১ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, বিশেষ সংস্করণ ১৩৬৩; পৃ ৭৭-৮২

পরিষ্কার বোঝা যায়, দেশের ভাব ও দেশের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা-অনুরাগ-বর্জিত, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক স্বার্থজড়িত শ্রেণীপ্রীতির নামান্তর যে দেশপ্রেম, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো আস্থা বা শ্রদ্ধা ছিল না। সাহিত্যজীবনের শৈশবকাল থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কেবল নব্যশিক্ষিতের চোখ দিয়ে দেশের মানুষকে বিচার করলে এবং তার অন্তরের ভাব ও ভাষাকে অবজ্ঞা করলে দেশের মঙ্গল হবে না এবং প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় ভাষারও বিকাশ হবে না।

ইংরেজীবাগীশের হাতেকলমে তৈরি বাংলা সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ 'সুয়োরানী' বলেছেন। কিন্তু এই সুয়োরানী বন্ধ্যা, নিষ্ফলা—

এতকাল এত যত্নে এত সম্মানে সে মহিষী হইয়া আছে কিন্তু তাহার গর্ভে আমাদের একটি সন্তান জন্মিল না। তাহার দ্বারা আমাদের কোনো সজীব ভাব আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। একেবারে বন্ধ্যা যদি বা না হয় তাহাকে মৃতবৎসা বলিতে পারি, কারণ প্রথম প্রথম গোটাকতক কবিতা এবং সম্প্রতি অনেকগুলা প্রবন্ধ জন্মলাভ করিয়াছে কিন্তু সংবাদপত্রশয্যাতেই তাহারা ভূমিষ্ঠ হয় এবং সংবাদপত্ররাশির মধ্যেই তাহাদের সমাধি আর আমাদের দুয়োরানীর ঘরে আমাদের দেশের সাহিত্য, আমাদের দেশের ভাবী আশা ভরসা, আমাদের হতভাগ্য দেশের একমাত্র স্থায়ী গৌরব জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

দুয়োরানীর এই বসনভূষণহীন, সর্বাঙ্গে ধুলোমাটিমাখা শিশুটি হল প্রকৃত দেশজ ভাব ও ভাষায় রচিত বাংলা সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ তাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুরাগী বন্ধুদের আহ্বান করে বলেছিলেন—

আমরা যদি এই অভূষিত ধূলিমলিন শিশুটিকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া অহংকার করি, ভরসা করি কেহ কিছু মনে করিবেন না। যাঁহারা রাজসভায় বসিতেছেন তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা প্রজাসভায় বসিতেছেন তাঁহাদের জয়জয়কার, — আমরা এই উপেক্ষিত অধীন দেশের প্রচলিত ভাষায় অন্তরের সুখ দুঃখ বেদনা প্রকাশ করি, ঘরের কড়ি খরচ করিয়া তাহা ছাপাই এবং ঘরের কড়ি খরচ করিয়া কেহ তাহা কিনিতে চাহেন না— আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া কেবল একটুখানি অহংকার করিতে দিবেন! সেও বর্তমানের অহংকার নহে ভবিষ্যতের অহংকার— আমাদের নিজের অহংকার নহে, ভাবী বঙ্গদেশের, সম্ভবত ভাবী ভারতবর্ষের অহংকার!

রবীন্দ্রনাথের স্বাজাত্যবোধের স্বরূপ এই উক্তির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডল কিশোরবয়স থেকে এই বোধ তাঁর মনে সঞ্চার করেছে। ইতিহাসের এমন একটি সময়ে, এবং এ দেশের এমন একটি পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন যা নতুন সমাজের সমস্ত অগ্রগামী চিন্তা ও চেতনার প্রতিভূ ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। ঠাকুর-পরিবারের সহযোগিতায় বিগত শতকের ষাট-সত্তরে কিভাবে 'হিন্দুমেলা'র সৃষ্টি হয়েছিল, সে কথা তিনি জীবনস্মৃতিতে বলেছেন। ভারতবর্ষকে সর্বপ্রথম স্বদেশ বলে ভক্তির সঙ্গে উপলব্ধির চেষ্টা হিন্দুমেলা থেকেই হয়। মেলায় দেশের স্তবগান দেশানুরাগের কবিতা পাঠ করা হত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হত। গণেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুর-পরিবারের

যুবকেরা হিন্দুমেলার উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রাণমন সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কিশোর-চিত্তকে গভীরভাবে আন্দোলিত করার পক্ষে এই পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ যথেষ্ট প্রভাব-বান্ ছিল বলা চলে। 'মেলা' কথাটার মধ্যেই দেশীয় ভাব ও ভাষার এমন সুন্দর প্রকাশ হয়েছিল, এবং হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানেও সর্বতোভাবে তার সংগতি বজায় রাখার চেষ্টা করা হত এমন নিখুঁত-ভাবে যে, কোনো বিজাতীয় জাতীয়তাবিলাস তাকে স্পর্শই করতে পারে নি। দেশাত্মবোধের এই মাদকতার মধ্যে রবীন্দ্রমানস পরিপুষ্ট হবার সুযোগ পেয়েছিল বলেই তা অত সহজে দেশের মাটির ও জনমনের গভীরে পর্যন্ত শিকড় ছড়াতে পেরেছিল। তা যদি না পারত, এবং প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র হয়ে ঐশ্বর্যবিলাসে অথবা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার দিক্‌শূন্য পশ্চাদনুসরণে যদি তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন, তাহলে অন্তরের সমস্ত আবেগ উজাড় করে দিয়ে বাংলার বিলীয়মান সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জনকৃতির লুপ্তরত্নোদ্ধারে যৌবনকাল থেকেই আত্মনিয়োগ করতে পারতেন না। তা যদি না পারতেন তাহলে রবীন্দ্রকাব্য, রবীন্দ্রসাহিত্য, রবীন্দ্রসংগীত (এবং বোধ হয় রবীন্দ্রচিত্রকলাও, কারণ তার মধ্যে জাত-লোকশিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতা, abstraction ও stylisation-এরই অভিব্যক্তি দেখা যায়) কৃত্রিম কাগজের ফুলের মতন বর্ণসমারোহের জাদুজাল বিস্তার করত শুধু, মোহিত করত, ধাঁধিয়ে দিত, কিন্তু বর্ণগন্ধের রূপরসের স্বাভাবিক সমন্বয়ে প্রাণমন মাতিয়ে তুলতে পারত না, আমাদের ভিতরের সুপ্ত বোধবুদ্ধিও জাগাতে পারত না।

ইয়োরোপীয় লোকসংস্কৃতির পুনরনুশীলনের ধারা লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, স্বদেশানুরাগ ও স্বাজাত্যবোধই তার প্রেরণার প্রধান উৎস। স্বতন্ত্র জাতি ও জাতীয়তাবোধের নবজন্মকালেই মানুষের মন আত্মজনকীর্তিমুখী হয়ে উঠেছে। সামন্তযুগের জনসমষ্টির পিণ্ডাকার পদার্থের মধ্যে স্বজাতিচেতনার প্রাণস্পন্দন জেগেছে যখন, স্বদেশের জনকীর্তিও তখন অতীতের উপেক্ষিত গোরস্থান থেকে নবরূপে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আঠারো শতকের আগে তাই লোকায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতির তাৎপর্য উপলব্ধির চেষ্টা বিচ্ছিন্নাকারে হলেও, সুসংবদ্ধরূপে হয় নি। সুইডিশ সংস্কৃতিবিদ লিনিয়াস (Linnaeus, ১৭০৭-৭৮ খ্রী.) প্রথম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংস্কৃতির লোকায়ত ধারার পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। সুইডেনই এই ধারার পথপ্রদর্শক। সেই পথ অনুসরণ করে হিল্টেন-ক্যাভেল্লিয়াস (Hylten-Cavallius, ১৮১৮-৮৯ খ্রী.) দেশীয় সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহে আত্মোৎসর্গ করেন। উনিশ শতকের রোমান্টিক চিন্তাস্রোতের সঙ্গে লোকসংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের এই প্রয়াস অবাধে মিলিত হয়ে সমগ্র ইয়োরোপে প্রবাহিত হয় এবং এক নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করে। এই উৎসাহের শিখা জ্বালিয়েই হেজেলিয়াস (Hazelius, ১৮৩৩-১৯০১ খ্রী.) সুইডেনের বিখ্যাত লোকসংস্কৃতির মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন, সারা পৃথিবীর folk-museumএর মধ্যে আজও যা অদ্বিতীয়।

লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের এই আগ্রহ ইয়োরোপ থেকে ইংলণ্ডে পৌঁছয় উনিশ শতকের

চতুর্থ পর্বে এবং সেখানে ফোক-লোর সোসাইটি স্থাপিত হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই কালব্যবধানের কারণ মনে হয় ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্পবিপ্লব বা ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল রিভল্যুশন। নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের পদধ্বনিতে ইংলণ্ডের জনচিত্ত এতদূর আচ্ছন্ন ছিল যে নিজেদের কৃতকীর্তির দিকে ফিরে তাকাবার সময় ছিল না তার। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত সোসাইটি স্থাপিত হবার পর ১৮৮৯-৯৩ সালের মধ্যে তারই উদ্‌যোগে তিনবার ইন্‌টারন্যাশনাল্ ফোক-লোর কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ব্র্যাব্রুক (E. W Brabrook) ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর্ দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়ান্স-এর অধিবেশনে 'আঞ্চলিক ভিত্তিতে নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে লোকায়ত সংস্কৃতিচর্চার দিগ্‌দর্শনে সাহায্য করেন। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী একটি কমিটি গঠিত হয়, এবং ১৮৯৩-৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যসহ কয়েকটি রিপোর্ট প্রকাশ করে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কমিটি লোপ পেয়ে যায়। তার পর এ ক্ষেত্রে লোকায়ত সংস্কৃতিভাণ্ডারে ইংলণ্ডের যা কিছু দান তা সিসিল শার্পের মতন (Cecil Sharp, ১৮৫৯-১৯২৪ খ্রী.) দু-একজন অনুরাগীর অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফল। প্রধানত শার্পের উদ্‌যোগেই ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ফোক-সং সোসাইটি এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ফোক-ডান্স্ সোসাইটি স্থাপিত হয়। যন্ত্রশিল্পের নিরবচ্ছিন্ন জয়যাত্রার মধ্যেও যে সিসিল শার্প ইংলণ্ডের জনচিত্তকে লোকায়ত দেশীয় সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন, এটা সে দেশের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়।[৬]

ইয়োরোপ ও ইংলণ্ডের লোকায়ত সংস্কৃতিচর্চার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকেও বোঝা যায়, পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে এই অনুরাগ ও উৎসাহ অন্যান্য অনেক জিনিসের মতন এ দেশে আমদানি হয় নি। শিক্ষাসংস্কৃতির কালধর্মী নব্যচিন্তা যত সহজে এক দেশ থেকে ভিন্ন দেশে বিচ্ছুরিত হতে পারে, মনে হয় না তত সহজে স্বদেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দেশ থেকে দেশান্তরে রপ্তানি করা যেতে পারে। তার জন্য স্বদেশেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে দেশের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোকের মনের ক্ষেত্র। এই মনের ক্ষেত্রে যদি সর্বস্তরের স্বদেশবাসীর প্রতি গভীর মমত্ববোধ না জাগে তাহলে তাদের ম্রিয়মাণ কৃতকীর্তির দিকেও সে-মন ধাবিত হতে পারে না। পারিবারিক প্রতিবেশেই রবীন্দ্রনাথের এই মন তৈরি হয়েছিল এবং কোনো আভিজাত্যই তাঁর স্বাজাত্যবোধের বলিষ্ঠ প্রকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। আর ঠিক যে সময় মনটা তাঁর তৈরি হয়েছিল, সেই সময় বাইরের সমাজে খাঁটি দেশীয় ভাবের একটা বন্যা বয়ে গিয়েছিল হিন্দুমেলার মতন সব অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে। জীবনের ভিত তাঁর স্বদেশের সাতপুরুষের বাস্তুভিটের উপর এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে ভবিষ্যতে কোনো আঘাতে বা দুর্বিপাকে তা টলে ওঠে নি। বরং সাহিত্যসৃষ্টিকর্মের প্রেরণায় সেই দেশীয় ভিতের

৬ *The Study of Society* : Ed. By Bartlett, Ginsberg, Lindgren and Thouless (London 1946), Chapter-XIV, E. J. Lindgren : The Collection and Analysis of Folk-lore, 328-78.

উপর তিনি যখন গগনচুম্বী বিশাল সৌধ নির্মাণ করেছেন, তখন সেই বনেদের সঙ্গে চুড়ার সংযোগ আরও দৃঢ় হয়েছে।

যৌবনের গোড়া থেকেই দেখা যায়, স্বদেশের প্রাকৃতজনের ভাব ও ভাষার, কীর্তি ও কাহিনীর প্রত্যক্ষ স্পর্শলাভের জন্য তাঁর মন উন্মুখ হয়ে উঠেছে। পুরাতাত্ত্বিক ও মানববিজ্ঞানীর মতন তাঁর আগ্রহ কেবল নিদর্শন-সংগ্রহ এবং তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্রত ও ছড়া, গাথা ও গানের ভাব ও ভাষার অনায়াস ব্যঞ্জনা, মাধুর্য ও সারল্য, ছন্দ ও সুরের স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য এবং সবার উপরে তার দেশীয় রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ, কি উপায়ে সম্পুরিত করতে পারলে নবযুগের সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক হয়ে উঠতে পারে, এই ছিল তাঁর প্রধান চিন্তা। অবশ্য এ চিন্তা তখন উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গের মতন তাঁর মনটাকে তোলপাড় করছিল, স্থির ও গভীর হতে পারে নি। বয়স তখন তাঁর একুশ কি বাইশ। এই সময় 'সঙ্গীত সংগ্রহ' নামে বাউল গানের একটি সংকলন তাঁর হাতে আসে সমালোচনার জন্য এবং 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি তার সমালোচনা করেন।[১] বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের মতন এই বাউল গানের সংকলনটি তাঁর জীবনের সামনে এক নতুন রহস্যময় জগতের দ্বার খুলে দেয়। আলাদিনের গুহালোকের চেয়েও আশ্চর্য জগৎ। সাহিত্যের অকূল সমুদ্রে পাড়ি দেবার প্রারম্ভেই মনে হয় যেন তিনি তাঁর সাধনতরীর বৈঠা খুঁজে পেয়েছিলেন। অন্ততঃ তাঁর সমালোচনাটি পড়ে তাই মনে হয়। মানসজমিনে হলকর্ষণ হয়েছিল তার আগেই, 'জ্যোতিদাদা,' 'বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু', 'নবগোপাল মিত্র', মেট্রোপলিটন কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 'ব্রজবাবু' এবং আরও অনেকে সযত্নে সেই হলচালনা করেছিলেন। বাউলের গানগুলি তার উপর সোনার ফসলের বীজ ছড়িয়ে দিল। ভবিষ্যতের বিশ্বকবি তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের দোষগুণ বিচার করে গানগুলির সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখলেন—

চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয় যে, বাঙ্গালী জাতির যথার্থ ভাষাটি যে কি, তাহা আমরা সকলে ঠিক ধরিতে পারি নাই— বাঙ্গালী জাতির প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে, তাহা আমরা ভাল জানি না। এই নিমিত্ত আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। পড়িয়া মনে হয় না, বাঙ্গালীতেই ইহা লিখিয়াছে, বাঙ্গালাতেই ইহা লেখা সম্ভব, এবং ইহা অন্য জাতির ভাষায় অনুবাদ করিলে তাহারা বাঙ্গালীর হৃদয়-জাত একটি নূতন জিনিষ লাভ করিতে পারিবে। ভাল হউক মন্দ হউক আজকাল যে সকল লেখা বাহির হইয়া থাকে, তাহা পড়িয়া মনে হয় যেন এমন লেখা ইংরাজিতে বা অন্যান্য ভাষায় সচরাচর লিখিত হইয়া থাকে বা হইতে পারে। ইহার প্রধান কারণ, এখনো আমরা বাঙ্গালীর ঠিক ভাবটি, ঠিক ভাষাটি ধরিতে পারি নাই। সংস্কৃতবাগীশেরা বলিবেন, ঠিক কথা বলিয়াছ, আজকালকার লেখায় সমাস দেখিতে পাই না, বিশুদ্ধ সংস্কৃত কথার আদর নাই, এ কি বাঙ্গালা! আমরা তাঁহাদের বলি, তোমাদের ভাষাও বাঙ্গালা নহে, আর ইংরাজিওয়ালাদের ভাষাও বাঙ্গালা

ভারতী, বৈশাখ ১২৯০। রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত 'বাউলের গান,' পৃ ১৩১-৭

নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, আর ইংরাজি ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে।

একুশ-বাইশ বছরের যুবকের লেখা হলেও কথাগুলির তাৎপর্য গভীর। উনিশ শতকের চতুর্থ পর্ব থেকে পূর্বেকার বাংলা সাহিত্যের বিকাশ লক্ষ্য করে তিনি বলতে চেয়েছেন যে এতদিন প্রধানতঃ ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীরা অথবা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা যে সাহিত্য রচনা করেছেন তা সাহিত্য বটে, কিন্তু কতখানি বাঙালীর নিজস্ব ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিতে রচিত প্রকৃত বাংলা সাহিত্য তা ভাববার বিষয়। প্রসঙ্গতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে পর্যন্ত এই বৈজাত্যদোষের ইঙ্গিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ, যদিও বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর প্রভৃতি বঙ্কিমের পরবর্তী রচনাগুলি এই দোষ থেকে মুক্ত বলেও স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত শিক্ষানবিশ মাত্র, আর বঙ্কিমচন্দ্র তার মধ্যমণি। কিন্তু তাঁর উক্তির মধ্যে কোনো যৌবনসুলভ চাপল্য নেই, সুচিন্তার পরিচয় আছে। বাংলা ভাষা ও ভাবের বৈবর্ণ্যে ব্যথিত হয়েই যে তিনি এই আন্তরিক উক্তি করেছিলেন, লেখাটি পড়লেই তা বোঝা যায়। সাহিত্যসাধনার স্বর্ণপ্রভাতে এই বাউল গানটি যেন তাঁর সারাজীবনের প্রশ্নটিকে সামনে তুলে ধরেছিল মনে হয়—

আমি কে তাই আমি জানলেম না,
আমি আমি করি কিন্তু, আমি আমার ঠিক হইল না।
কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি,
চার কড়ায় এক গণ্ডা গণি
কোথা হইতে এলাম আমি, তারে কই গণি!

রবীন্দ্রচিন্তার বিশ্বমুখী অভিযানে বাংলার এই বাউল-চিন্তা সকলের অগোচরে নিভৃতে নাবিকের কাজ করেছে। এই 'আমি'র দেশকালগত চেতনালাভের ফলে সাহিত্যশিল্পক্ষেত্রে ছেলে কোলে করে শহরময় তাঁকে ছেলে খুঁজে বেড়াতে হয় নি কোনোদিন। ছেলে যে কোলেই আছে, এবং তা যে দেশীয় ভাব ও ভাষায় মণ্ডিত প্রাকৃত জনসাহিত্য, এ চৈতন্য হারিয়ে ফেলে তাঁকে বেপাড়ার হাটে-মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতে হয় নি। 'আমি কে' তা জানার জন্য তিনি নিজের হৃদয়ে ও স্বদেশের জনচিত্তের অন্তঃস্থলে ডুব দিয়ে সংস্কৃতির যে মণিমাণিক্য কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তাই তাঁর প্রতিভার জাদুস্পর্শে রূপান্তরিত করে স্বদেশবাসী ও বিশ্ববাসীকে তিনি দান করে গেছেন।

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে।

'অন্তরতর যদয়মাত্মা'— উপনিষদের এই বাণী বাউলের মুখে 'মনের মানুষ' বলে শুনে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন।

অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম, তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায়— যাকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা— অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর— তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে।[৮]

অন্ধকারে মাকে দেখতে না পাওয়ার যে কান্নার সুর, এতদিন বিদেশীভাবের ভাবুক ইংরেজী-নবিশের বাংলা সাহিত্যে যেন তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। দেশাত্মবোধের আলোয় এই মাকে যখন প্রথম খুঁজে পাওয়া গেল, তখন দেখা গেল যে তিনি সাধারণ গ্রাম্যনারীর বেশে বাংলার গ্রাম্যসাহিত্যের হৃৎপদ্মে বিরাজ করছেন।

সন্ধান পাওয়ার পর অনুসন্ধানীর উৎসাহ বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। প্রবল উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রকারের গ্রাম্য ছড়া, ব্রতকথা, বাউল ভাটিয়াল প্রভৃতি লোকসংগীত সংগ্রহে মত্ত হয়ে গেলেন। 'সাধনা' পত্রিকায় ছেলেভুলানো ছড়া দিয়ে সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হল ১৩০১ সন থেকে, এবং 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' (১৩০১- ২ সন), 'ভারতী' (১৩০৫ সন), 'প্রবাসী' ('হারামণি' বিভাগ, ১৩২২ সন) প্রভৃতি পত্রিকায় ক্রমেই তার সঞ্চয় বাড়তে থাকল। নিজে সংগ্রহের কাজে নেমে তিনি সে-কাজে আরও কয়েকজন অনুরাগীকে উৎসাহিত করেছিলেন। এ কাজ করতে হলে যে শহরের শৌখিন আরামকেদারায় বসে করা চলে না, গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে গ্রাম্য লোকশিল্পীদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসতে হয়, এমন-কি গৃহকোণের গ্রাম্য মেয়েদের মুখের কথাও শুনতে হয়, তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। তাঁর মন তাই শহর থেকে দূরে শিলাইদহে ও শান্তিনিকেতনে আগে থেকেই বাসা বেঁধেছিল। ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাউল গানের সংগ্রহটি তাঁর হাতে পড়ার পর যখন বাংলা লোকসাহিত্যের গোপন রত্নভাণ্ডারের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, তার দু-তিন বছরের মধ্যেই মনে হয় শিলাইদহে বিখ্যাত বাউল লালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। কুষ্ঠিয়ার গৌরীনদীর তীরে চাপড়া-ভাঁড়ারা গ্রামে কায়স্থকুলে বিখ্যাত কর-বংশে লালন (আ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর শুক্রবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।[৯] শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন লিখেছেন—

নিরক্ষর পল্লীবাসী হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা শুনিয়াছি জ্ঞানবৃদ্ধ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ফকিরের সহিত ধর্মালাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। শিলাইদহে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রথম যেদিন তাঁহার ভাবের বিনিময় হয় তাহা জাহ্নবী-যমুনা-মহামিলনের ন্যায় রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গমতীর্থ রচনা করে।[১০]

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের অবস্থিতির কথা জানা যায়, এবং তারও আগে বাল্যকাল থেকেই যে মধ্যে মধ্যে শিলাইদহে তিনি অগ্রজদের সঙ্গে যাতায়াত

৮ হারামণি, ভূমিকা, পৃ ।৹

৯ শ্রীবসন্তকুমার পাল, মহাত্মা লালন ফকির (শান্তিপুর, ১৩৬১ সন), জীবনকথা পৃ ১-৩

১০ ঐ, প্রকাশকের নিবেদন, পৃ ।৵৹

করতেন, জীবনস্মৃতিতে তার আভাস পাওয়া যায়।[১১] সুতরাং লালনের মৃত্যুর আগে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য সাক্ষাৎ হয়ে থাকলে তার প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পরে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'হারামণি' বিভাগে তিনি লালন ফকিরের গান প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। লালন ফকিরের মাত্র কুড়িটি গান ১৩২২ সনের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়, বাদবাকি গানগুলি দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথ নিজের সংগ্রহেই যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন।[১২]

ছেলেভুলানো ছড়া 'সাধনা' ও 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ১৩০১ সন থেকে প্রকাশ করার আগে সেগুলি নিশ্চয় তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। সংগ্রহের কাজ তার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই তিনি যে আরম্ভ করেছিলেন তা বোঝা যায়। প্রথম সংগ্রহ প্রকাশকালে তিনি লিখেছিলেন—

বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।

সংগ্রহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন—

আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে-একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।[১৩]

ঐ বছর মাঘ মাসে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'মেয়েলি ছড়া'[১৪] নামে প্রকাশিত প্রবন্ধেও তিনি লিখেছিলেন—

আমাদের অলংকারশাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে। সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীতকোমল দেহের যে স্নেহোদ্‌বেলকর গন্ধ তাহাকে পুষ্প চন্দন গোলাপ-জল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা

১১ ছিন্নপত্র, পৃ ৩২ ; জীবনস্মৃতি পৃ ১১০

১২ এই গানগুলি (২৯৮টি) বর্তমানে বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্র-সদনে' সংরক্ষিত আছে। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে লিখেছেন যে সেঁউড়িয়ার (কুষ্টিয়া রেলস্টেশন থেকে প্রায় একমাইল পুবদিকে অবস্থিত সেঁউড়িয়া গ্রামে লালন ফকিরের আখড়া অবস্থিত) লালনের আখড়া থেকে গানের খাতা আনিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এস্টেটের একজন পুরাতন কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়কে দিয়ে নকল করিয়ে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত গানগুলি এবং কুষ্টিয়ার ভূতপূর্ব মুন্সেফ শ্রীমতিলাল দাশ-সংগৃহীত গানগুলির পাঠ মিলিয়ে সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'লালন-গীতিকা' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী কেমনে আসে যায়'— লালনের এই বিখ্যাত গানটি রবীন্দ্রনাথ বা মতিলালবাবুর সংগ্রহে নেই, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত গ্রন্থে আছে এবং সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলনে গৃহীত হয়েছে।

১৩ সাধনা, ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক

১৪ 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে 'ছেলেভুলানো ছড়া ২' নামে সংকলিত

আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে— সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন। শুধুমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। রুচিভেদবশত সে রস সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।

এর পরেই দেখা যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত 'গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবিসঙ্গীত-সংগ্রহ' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বাংলার কবিওয়ালাদের গান সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।[১৫] কবিগানের ক্ষণস্থায়িত্ব, রসের জলীয়তা এবং নিকৃষ্ট কাব্যকলার কথা উল্লেখ করেও তিনি বলেছেন—

তথাপি এই নষ্টপরমায়ু 'কবি'র দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ, এবং ইংরাজ-রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথপ্রদর্শক।

প্রসঙ্গতঃ এখানে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথাও মনে পড়ে। ১২৬১ সনে, রবীন্দ্রনাথের জন্মের সাত বছর আগে, গুপ্ত-কবি এদেশের লুপ্তপ্রায় কবিওয়ালাদের গান সংগ্রহ করার জন্য প্রথম সচেষ্ট হন এবং দেশবাসীর কাছে একটি আবেদন প্রকাশ করেন—

এতদ্দেশীয় যে সকল প্রাচীন কবি মহাশয়েরা বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রণীত পুরাতন কবিতা ও সংগীত সকল এবং সেই সেই পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া যিনি আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা মহোপকার স্বীকার পূর্ব্বক যাবজ্জীবন তাঁহার স্থানে কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ রহিব, এবং তাঁহাকে দেশহিতৈষি দলের প্রধান শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিব।

পরে এ বিষয়ে পুনরায় তিনি তাঁর 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকায় লেখেন—

রাম বসু প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের কৃত কবিতা সকল সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমরা ধন, মন ও জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি। এজন্য সাংসারিক সমুদয় সুখ হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছি। নিয়তই আহার নিদ্রার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি। স্থলপথে ও জলপথে গমন পূর্ব্বক নানাস্থানি হইয়া নানালোকের উপাসনা করিতেছি। অমুক স্থানের অমুক মহাশয় অমুক গীতটী জানেন ইহা শ্রুতিগোচর হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ যে উপায়েই হউক তাহার আশ্রয় লইয়া সেই গীতটি আনয়ন করিতেছি। তাহা না পাইলে জগদীশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক কেবল আক্ষেপ করিতেছি। অধুনা এবিষয়ে আমার মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহা কেবল সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর জানিতেছেন। এই জগতের কোন সুখই সুখ বোধ হয় না— কিছুতেই মন স্থির হয় না— অপর কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মে না, শুদ্ধ পুরাতন গান গান করিয়া মনে মনেই ভাবনা করিতেছি। গীতের মত একটি গীত পাইলে আনন্দের পরিসীমা থাকে না, তৎকালে বোধ হয় যেন ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হইল।[১৬]

১৫ সাধনা, ১৩০২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' নামে মুদ্রিত, লোকসাহিত্য গ্রন্থে 'কবিসংগীত' নামে সংকলিত

১৬ সংবাদ প্রভাকর, ১ শ্রাবণ ১২৬১ ; ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১

গীতের মতন গীত খুঁজে পেলে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়, গুপ্ত-কবির এ স্বীকৃতি একান্ত আন্তরিক, তা না হলে শতাধিক বৎসর পূর্বে অসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় এইভাবে তখনই বিস্মৃতপ্রায় কবিসংগীত সংগ্রহের প্রেরণায় তিনি উদ্‌বুদ্ধ হতেন না। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় এই আন্তরিকতা পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল, যদিও শহরের পৌরজনসভার কবিগান সংগ্রহের মধ্যে তাঁর আগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল না, বিপুল লোকসাহিত্যের রত্নভাণ্ডারের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৩০৩ সনে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 'মেয়েলি ব্রত' প্রকাশিত হয়, এবং রবীন্দ্রনাথ এই সংকলনটির ভূমিকা লিখে দেন। ভূমিকা থেকে জানা যায় যে অঘোরনাথ ছেলেভুলানো ছড়া, মেয়েলি ব্রত ইত্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায় ছিলেন। ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন—

সাধনা পত্রিকা সম্পাদন কালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোর বাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

অনেকের নিকট এই সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান কালে বঙ্গসমাজে অতিশয় সুলভ হইয়াছে।

বালকদিগের এমন একটি বয়স আসে যখন তাহারা বাল্যসম্পর্কীয় সকল প্রকার বিষয়কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, অথচ পরিণত বয়সোচিত কার্য্যসকলও তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয় না। তখন তাহারা সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে কোন সূত্রে কেহ তাহাদিগকে বালক মনে করে। বঙ্গসমাজের গম্ভীর সম্প্রদায়েরও সেই দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গদেশপ্রচলিত সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া আপন প্রকৃতির অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য্য এবং পরিণতির প্রমাণ দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা আপন অভ্রভেদী মহিমার উপযোগী আর যে কিছু মহৎকীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন এমন কোন লক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে না।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই পাছে লোকসাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা জানেন যে, যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিতেছে তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না— দ্বিতীয়তঃ যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্ব্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে— এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

সাধনায় যখন আমি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তখন আমার কোন প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহারই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশতঃ আকৃষ্ট হইয়া আমাদের

মাতা মাতামহী, আমাদের স্ত্রী কন্যা সহোদরাদের কোমলহৃদয়পালিত মধুরকণ্ঠলালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ীভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং অঘোরবাবুকে এই সমস্ত মেয়েলি ব্রত গ্রন্থ আকারে রক্ষা করিতে উৎসাহী করিয়াছি, সেইজন্য গম্ভীরপ্রকৃতি পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং সেই সঙ্গে এ কথাও বলিয়া রাখি যে, এই সকল সংগ্রহের দ্বারা ভবিষ্যতে যে কোন প্রকার গম্ভীর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না এমনও মনে করি না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তিনি বঙ্গদেশের জনসাধারণ প্রচলিত পার্ব্বণগুলির উজ্জ্বল এবং সুন্দর চিত্র সাধনায় প্রকাশ করিয়া সাধনাসম্পাদকের প্রিয় উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছেন। সে চিত্রগুলি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার যোগ্য এবং আশা করি দীনেন্দ্রকুমার বাবু সেগুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।[১১]

এই ভূমিকাটি থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য সংগ্রহের প্রেরণা বাইরের সমাজেও কিছু দূর সঞ্চারিত হয়েছিল, এবং অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও দীনেন্দ্রকুমার রায়ের মতন আরও অনেকে ছড়া, ব্রতকথা, কবিগান, গ্রাম্য পালপার্বণ প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির নিদর্শন আহরণে ব্রতী হয়েছিলেন। রসসাহিত্যের সরল অভিব্যক্তিরূপে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ এগুলির প্রতি আকৃষ্ট হলেও, দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপকরণ হিসেবেও যে এইসব নিদর্শনের যথেষ্ট মূল্য আছে, সে কথা বারংবার তিনি উল্লেখ করেছেন। এই ভূমিকার মধ্যে তিনি যে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের কথা (পাশ্চাত্ত্য folklorist-দের কথা বলেই মনে হয়) উল্লেখ করেছেন তারও গুরুত্ব আছে। ১৮৯৬-৯৭ সালে (যখন এই ভূমিকাটি তিনি লিখেছিলেন) ইংলণ্ডে ও ইউরোপে folkloreএর অনুশীলনের যে উদ্‌যোগ ও প্রস্তুতি চলছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আগে আমরা দিয়েছি। ১৮৮৯-৯৩ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক ফোক্‌লোর কংগ্রেসের তিনটি অধিবেশন হয় ইয়োরোপে, এবং ১৮৯৮ সালে ইংলণ্ডে শার্পের চেষ্টায় প্রথম লোকসংগীত-পরিষদ স্থাপিত হয়। দেশীয় জনকৃতির পুনরুদ্ধার ও পুনরনুশীলনের এই আন্তর্জাতিক চেতনার সমকালেই যে যুবক রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন, সেটাও সমাজবিদ্‌দের কাছে বিশেষ লক্ষণীয় বস্তু বলে মনে হয়। লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, যেসব কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরে চিরকালের মতন অমরত্ব লাভ করেছে, দর্শন বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হয়ে তারা যায় না, আর স্বদেশকে যারা অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসে তারা স্বভাবতই স্বদেশের সঙ্গে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হতে চায়, যে-পরিচয় ছড়া রূপকথা ব্রতকথা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে না হলে কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে না। অতএব সমাজবিদের কাছে লোকায়ত সংস্কৃতির যে গুরুত্ব থাকা সম্ভব এবং দেশপ্রেমিকের কাছে তার যে আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন। তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ও আদরণীয় ছিল, লোকসাহিত্যের সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস,

১১ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত, 'মেয়েলি ব্রত', ১৩০৩, পৃ ৷৹-৷৶৹

তার আদিম সৌকুমার্য, বিচিত্র ছন্দ, এবং বাউল গানের মতন লোকসংগীতের আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদ।

বাউল গানের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ হল, সমস্ত সামাজিক সংস্কার, বিধিনিষেধ ও প্রথা রীতিনীতির বাইরে একান্ত সহজভাবে রূপের মধ্যে অরূপের, সীমার মধ্যে অসীমের জন্য ব্যাকুলতা। বাংলার বাউলের এই ভাবাকুলতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিচিত্তের প্রতিরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। শিলাইদহ থেকে গ্রাম্য গায়কদের মুখে তাই তিনি বাউল গান শুনতে খুব ভালোবাসতেন এবং তার স্বতঃস্ফূর্ত উদাত্ত সুর ও গভীর ইঙ্গিতময়তা তাঁকে মুগ্ধ করত।

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।

প্রভাতের রৌদ্রে পদ্মানদীর ধারে একলা একতারা হাতে বাউল সাধকদের চলার যে দৃশ্য রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, সেটা যেন তাঁর নিজেরই কবিজীবনের পথচলার দৃশ্য। মানুষের জীবনপদ্মার তীরে বাউলের মতন একতারা হাতে, 'মনের মানুষকে সন্ধান করবার গভীর নির্জন পথে,' তিনিও যেন গানের ধারা বেয়ে চলেছেন। বাংলার পল্লীকবির একতারাটিতে তাঁর কবিজীবনের মনের মানুষ খোঁজার ব্যাকুলতা এমন অপূর্ব সুরে যে ঝংকৃত হয়ে উঠবে তা তিনি নিজেও বোধ হয় ভাবতে পারেন নি। যখন বাউলের কণ্ঠে ও একতারায় তার ঝংকার শুনলেন তখন দেখলেন যে এ তাঁর নিজেরই হৃদয়-বীণার ঝংকার। তার ভাষা সুর ও ছন্দের তো বটেই, দার্শনিক তত্ত্বেরও গভীর আবেদন ছিল তাঁর কাছে।

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে
মনের মানুষ যেখানে,
আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি
দিবারাতি নাই সেখানে।

অথবা

এই মানুষে চেয়ে দেখ, সেই মানুষ আছে
কত যোগী ঋষি চারি যুগ ধ'রে
বেড়াচ্ছে খুঁজে।

জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়,
ও চাঁদ ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
অধর মানুষ তেমনি সদাই
আছে আলোকে বসে।

অথবা

সোনার মানুষ ভাসছে রসে
যে জানে সে রসপান্তি
সেই দেখতে পায় অনায়াসে।
তিন শ ষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি
তার মধ্যে রূপ নিরবধি
ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে।

অথবা

মূল হতে হয় ডালের সৃজন,
ডাল ধরলে পায় মূল অন্বেষণ হে!
তেমনি রূপ হতে স্বরূপ,
তারে ভেবে রূপ,
অধীন লালন সদা
নিরূপ ধরতে চায়।"

বাউল গানের এই আধ্যাত্মিক কথা নবীন বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি লিখেছেন—

আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স— শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল,

'কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!...'

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, 'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ'—যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা।[১৮]

রবীন্দ্রদর্শন নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেছেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন, এই বাউল-দর্শনের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা কত ঘনিষ্ঠ। বাউলদের এই মনের মানুষ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন[১৯]—

১৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, হারামণি, 'আশীর্বাদ'

১৯ Rabindranath Tagore, *Creative Unity* (London 1922), Pp. 78-88.

'The man of my Heart', to the Baul, is like a divine instrument prefectly tuned. He gives expression to infinite truth in the music of life. And the longing for the truth which is in us, which we have not yet realised, breaks out in the following Baul song :

Where shall I meet him, the Man of my Heart ?
He is lost to me and I seek him wandering from land to land.
I am listless for that moonrise of beauty,
Which is to light my life,
Which I long to see
in the fullness of vision, in gladness of heart.

...The great distinguished people of the world do not know that these beggars— deprived of education, honour, and wealth— can, in the pride of their souls, look down upon them as the unfortunate ones, who are left on the shore for their worldly uses but whose life ever misses the touch of the Lover's arms...Bauls have no temple or image for their worship, and this utter simplicity is needful for men whose one subject is to realise the innermost nearness of God. The Baul poet expressly says that if we try to approach God through the senses we miss him.

Bring him not into your house as the guest of your eyes ;
but let him come at your heart's invitation.
Opening your doors to that which is seen only,
is to lose it.

১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন-মহাসভার অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে এই বাউল, বাউল-গান ও বাউল-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি বলেছিলেন[২০]—

These people roam about singing their songs, one of which I heard years ago from my roadside window, the first two lines remaining inscribed in my memory :

Nobody can tell whence the bird unknown
Comes into the cage and goes out.
I would feign put round its feet the fetter of my mind,
Could I but capture it.

This village poet evidently agrees with our sage of Upanishad who says that our mind comes back baffled in its attempt to reach the Unknown Being ; and yet this poet like the ancient sage does not give up adventure of the infinite, thus implying that there is a way to its realisation.

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' নামে বিখ্যাত বাউল গানটির কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে উল্লেখ করেছেন। গানটি যে কতখানি তাঁর মনে দাগ কেটেছিল তা এর বারংবার ব্যবহার ও উল্লেখ থেকে বোঝা যায়। সম্পূর্ণ গানটি এই—

২০ Rabindranath Tagore, "The Philosophy of our People", Presidential Address at the Indian Philosophical Congress, 1925.

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়॥
আট কুঠরী নয় দরজা-আঁটা,
মধ্যে মধ্যে ঝলকা-কাটা,
তার উপর আছে সদর-কোঠা—
আয়না-মহল তায়॥
মন, তুই রইলি খাঁচার আশে,
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে,
কোন্‌দিন খাঁচা পড়বে খসে,
লালন কয়, খাঁচা খুলে
সে পাখি কোন্‌খানে পালায়॥

গানটির নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কবি শেলির কথা উল্লেখ করে বলেছেন—

It reminds me of Shelley's poem in which he sings of the mystical spirit of Beauty :

The awful shadow of some unseen power
Floats, though unseen, among us : visiting
This various world with as inconstant wing
As summer winds that creep flower to flower,
Like moonbeams that behind some piny mountain shower.
It visits with inconstant glance
Each human heart and countenance.

That this Unknown is the profoundest reality, though difficult of comprehension, is equally admitted by the English poet as by the nameless village singer of Bengal, in whose music vibrate the wing-beats of the unknown bird,— only Shelley's utterance is for the cultured few, while the Baul Song is for the tillers of the soil, for the simple folk of our village households, who are never bored by its mystic transcendentalism.

১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতায় বাউল গানের অন্তর্নিহিত মর্ম সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

It spoke of an intense yearning of the heart for the divine which is in Man and not in the temple, or scriptures, in images and symbols.[২১]

মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-কোনো ধর্মগত জাতিগত ও বর্ণগত বৈষম্য যে মানুষেরই সংকীর্ণ জাগতিক স্বার্থে রচিত, এবং এই বৈষম্যের অন্তরালে মানবাত্মার যে ঐক্য, এই সত্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পীজীবন ও মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সত্যরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। তার সঙ্গে আরও

২১ Rabindranath Tagore, *The Religion of Man* (London 1931), P. 110.

একটি বৃহত্তর সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি— সেটি হল, মানবাত্মার ভিতর দিয়েই পরমাত্মার স্বরূপ অনুভব করা সম্ভব। দেবতা মন্দিরে মসজিদে গীর্জায় নেই, কাশী মক্কা জেরুজালেমেও নেই। দেবতা আছেন মানুষের মধ্যে, জীবনের সাধনার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের এই জীবনদর্শন বাংলার লোকায়ত সাহিত্যের মর্মস্থল থেকে গৃহীত বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর এই জীবনধর্মই হল মানবধর্ম। হিবার্ট বক্তৃতাতে তিনি বলেছেন—

I felt that I had found my religion at last, the religion of man, in which *the infinite became defined in humanity* and came close to me so as to need my love and co-operation. This idea of mine found at a later date its expression in some of my poems addressed to what I called *Jivan-devata*, the Lord of my life. (emphasis added).[২২]

এই মানবধর্মবোধের উপলব্ধি সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

...the Religion of Man has been growing within my mind as a religious experience and not merely as a philosophical subject. In fact, a very large portion of my writings, beginning from the earlier products of my immature youth down to the present time, carry an almost continuous trace of the history of this growth.[২৩]

কেবল দার্শনিক তত্ত্বরূপে বুদ্ধি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই মানবধর্মের স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করেন নি, জীবনের কঠোর অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে সেই সত্যকে অভিজ্ঞতার মতন প্রত্যক্ষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই মানবধর্মই 'হিউম্যানিজ্‌ম্‌', এবং 'Infinite defined in humanity' তার সংজ্ঞা। কিশোর বয়স থেকে এই জীবনদেবতার সাধনা করেছেন তিনি, বাউলের ইঙ্গিতময় ভাষায় যাকে বলা যায়— রূপ থেকে স্বরূপের এবং স্বরূপ থেকে নিরূপের বা অরূপের সাধনা, সীমার মধ্যে অসীমের সাধনা, বাচ্যের মধ্যে বাচ্যাতিরিক্তের সাধনা, দৃশ্যের মধ্যে অদৃশ্যের সাধনা, জাগতিক সত্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্যের সাধনা, বেদনার মধ্যে আনন্দের সাধনা—

দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিতদ্রাক্ষা-সম।

এই জীবনদেবতার সাধনা, এই মানবধর্মের সাধনার মধ্যেই তিনি অনুভব করেছেন নিজের সুপ্ত শক্তির ক্রমপ্রকাশ— "আশ্চর্য এই যে, আমি হইয়া উঠিতেছি, আমি প্রকাশ পাইতেছি।"[২৪] আরও আশ্চর্য হল, যে 'জীবনদেবতা'র কথা তিনি মানবধর্মের বক্তৃতার মধ্যে বলেছেন এবং

২২ *op. cit*, Pp. 96-7.

২৩ *op. cit*, Preface, P. 7.

২৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মপরিচয় (জুন ১৯৫৭), পৃ ১১

আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তা তাঁর কাব্যে ১৩০২ সনে যৌবন-বয়সেই মূর্ত হয়ে উঠেছিল, এবং সেটা ঠিক সেই সময় যখন তিনি বাংলার ছড়া রূপকথা ব্রতকথা, বাংলার বাউল গান ইত্যাদি আহরণে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই সত্যটা ক্ল্যাসিকাল দর্শন-সাহিত্যের লুপ্ত ভাণ্ডার থেকে পুনরাবিষ্কার করে 'হিউম্যানিস্ট' আখ্যা পেয়েছিলেন। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ কেবল বৈদিক যুগের সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে এ সত্য আবিষ্কার করে তৃপ্তি পান নি, লোকায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতির চিরবহমান ধারায় তার আদি-অকৃত্রিম রূপ দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছেন এবং বিশ্বমানবিক ঐক্যের বাণী সেই ধারা থেকেই তাঁর অন্তরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। বাউলের একতারায় বেজে উঠেছে বিশ্বজনমনের এক অশ্রুতপূর্ব ঐকতান, এবং তারপর বিশ্বকবি তাঁর নিজের বীণার সহস্রতারে সেই ঐকতানের নব নব রূপ রচনা করেছেন।

লোকসাহিত্যের ভাবৈশ্বর্যে যে কেবল রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন তা নয়, তার নিরাভরণ নিরলংকৃত রূপের মাধুর্যেও তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন। ছড়া ও লোকসংগীতের ভাষা, প্রকাশভঙ্গি, সহজ স্বচ্ছন্দ গতি, অনাড়ষ্টতা ইত্যাদি নিয়ে যে বহিরঙ্গ, তা নিয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[২৫] প্রাকৃত বাংলার ছন্দে হসন্তের প্রাচুর্ভাবজনিত যে গুরুধ্বনির সৃষ্টি হয় তার সদ্ব্যবহার করতে পারলে বাংলা ছন্দের সম্পদ বেড়ে যেতে পারে বলে তাঁর মনে হয়েছে। যেমন—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয়্ এল বান্,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন্ কন্যে দান্।
এক কন্যে রাঁধেন্ বাড়েন্ এক কন্যে খান্,
এক কন্যে না পেয়ে বাপের্ বাড়ি যান্।

এই ছড়াটিতে দুটো জিনিস লক্ষ্য করার আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

এক হচ্চে বিসর্গের ঘটকালিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্মিলন— আর এক হচ্চে 'বৃষ্টি' এবং 'কন্যে' কথার যুক্ত বর্ণকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া। এই ছড়া সাধু বাংলায় ছন্দে বাঁধলে পালিশ করা আব্‌লুস কাঠের মতো পিছল হয়ে ওঠে।

বারি ঝরে ঝর ঝর নদিয়ায় বান্
শিবুঠাকুরের বিয়ে তিন মেয়ে দান।
এক মেয়ে রাধিছেন এক মেয়ে খান,
এক মেয়ে ক্ষুধাভরে পিতৃঘরে যান।

২৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ, 'ছন্দের অর্থ' ও 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধ

এতে যুক্তবর্ণের সংযোগ হোলেও ছন্দের উল্লাস তাতে বিশেষ বাড়ে না। যথা—

মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়ে, নবদ্বীপে বান,
শিবুঠাকুরের বিয়া তিন কন্যা দান।
এক কন্যা রান্ধিছেন, এক কন্যা খান,
এক কন্যা উর্ধ্বশ্বাসে পিতৃগৃহে যান।

এই সব যুক্ত বর্ণের যোগে এ ছন্দ বন্ধুর হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু তরঙ্গিত হয়নি— কেননা যুক্তবর্ণ যথেচ্ছ ছড়ানো হয়েছে মাত্র, তাদের মর্যাদা অনুসারে জায়গা দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ হাটের মধ্যে ছোটোয় বড়োয় যেমন গায়ে গায়ে ভিড় করে তেমনি, সভার মধ্যে যেমন তারা যাথাযোগ্য আসন পায় তেমন নয়।

'ছন্দঃকুসুম', বইয়ের লেখক প্রাকৃত বাংলার ছন্দের অনাচার সম্বন্ধে অনুষ্টুভ ছন্দে বিলাপ করে বলেছেন—

পঠনে সে সব চ্ছন্দঃ রাখিতে তাল গৌরব
পঠিছে সর্ব্বদা লোকে উচ্চারণ-বিপর্য্যয়ে।
লঘুকে গুরু সম্ভাষে দীর্ঘবর্ণে কহে লঘু,
হ্রস্বে দীর্ঘে সমজ্ঞানে উচ্চারণ করে সবে।

দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

কবির এই বিলাপের সঙ্গে আমিও যোগ দিচ্চি। কেবল আমি এই বল্‌তে চাই প্রাকৃত বাংলার ছন্দে এমনতরো দুর্ঘটনা ঘটে না, এ সব ঘটে সংস্কৃত বাংলার ছন্দে। প্রাকৃত বাংলার যে স্বকীয় দীর্ঘ-হ্রস্বতা আছে তার ছন্দে তার বিপর্য্যয় দেখিনে কিন্তু সাধু ভাষায় দেখি। এই প্রাকৃত বাংলা মেয়েদের ছড়ায়, বাউলের গানে, রামপ্রসাদের পদে আপন স্বভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সাধু সভায় তার সমাদর হয়নি ব'লে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বলতে পারেনি এবং তার শক্তি যে কত তারও সম্পূর্ণ পরিচয় হোলো না।···আমরা একটা কথা ভুলে যাই প্রাকৃত বাংলার লক্ষ্মীর পেট্‌রায় সংস্কৃত, পারসী, ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষা থেকেই শব্দ সঞ্চয় হচ্ছে— সেই জন্যে শব্দের দৈন্য প্রাকৃত বাংলার স্বভাবগত ব'লে মনে করা উচিত নয়। প্রয়োজন হোলেই আমরা প্রাকৃত ভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দের আমদানি করতে পারব। কাজেই যেখানে অর্থের বা ধ্বনির প্রয়োজনবশত সংস্কৃত শব্দই সংগত সেখানে প্রাকৃত বাংলায় তার বাধা নেই। আবার ফার্সি কথাও তার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একসারে বসিয়ে দিতে পারি। সাধু বাংলায় তার বিঘ্ন আছে— কেননা সেখানে জাতিরক্ষা করাকেই সাধুতারক্ষা করা বলে। প্রাকৃত ভাষার এই ঔদার্য্য গদ্যে পদ্যে আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ এই কথা মনে রাখতে হবে।[২৬]

প্রাকৃত বাংলার প্রকৃতি সমতল না হলেও তার যে একটা নিজস্ব তরঙ্গায়িত গতি আছে, যে-কোনো ভাষার সম্পদ আত্মীকরণের অসাধারণ ক্ষমতা আছে, যাতে তার শব্দদৈন্য স্বচ্ছন্দে ঘুচে যেতে পারে, এবং তার এই ঔদার্যগুণ যে আধুনিক বাংলা গদ্য-পদ্য উভয়েরই পরম সম্পদ হতে

২৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ, প্রথম সংস্করণ ১৩৪৩, পৃ ৩৪-৩৭

পারে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে একাধিকবার নির্দেশ করেছেন। বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বিচার করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক ভাষারই দুটি দিক আছে, একটি শব্দার্থের দিক, আর-একটি শব্দধ্বনির দিক। শব্দার্থ সকল ভাষারই এক, ধ্বনিটা প্রত্যেক ভাষার স্বতন্ত্র। যেমন বাংলা 'জল' এবং ইংরেজী 'water' শব্দে একই অর্থ বোঝায়, কিন্তু এই দুটি শব্দের ধ্বনি একেবারে আলাদা। ভাষায় যে শিল্পরচনা করা হয় তাকে 'ধ্বনির শিল্প' বলা যায়। বিখ্যাত সমালোচক রিচার্ডস প্রত্যেক কবিতায় মুদ্রিত শব্দের চাক্ষুষ সংবেদনের কথাও বলেছেন— 'visual sensations of the printed words'— কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে এই চাক্ষুষ ক্রিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রতিক্রিয়া বা ধ্বনি-প্রতিরূপের (auditory image) সঙ্গে জড়িত।

Visual sensations of words do not commonly occur by themselves. They have certain regular companions so closely tied to them as to be only with difficulty disconnected. The chief of these are the auditory image— the sound of the words in the mind's ear— and the image of articulation— the feel in the lips, mouth, and throat, of what the words would be like to speak.[২১]

মনের উপর প্রত্যেকটি শব্দের ধ্বনির প্রতিধ্বনি, শব্দের বাচনভঙ্গি, এবং ওষ্ঠ, মুখ ও কণ্ঠে সেই শব্দের 'feel' বা স্পর্শানুভূতি কাব্যিক পরিমণ্ডল রচনায় সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন যে রূপসৃষ্টির এই ধ্বনিগৌরবই বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্বল। যাঁরা অর্থের মহাজন তাঁরা এই ধ্বনিসম্পদ অবজ্ঞা করতে পারেন, কিন্তু যাঁরা রূপরসিক তাঁদের শ্রেষ্ঠ মূলধন হল ধ্বনি। প্রাকৃত বাংলার দুয়োরানীকে যারা সুয়োরানীর অপ্রতিহত প্রভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই অশিক্ষিত-লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলা ভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্‌ধৃত করে দিই—

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয় ডাকে তারে
উচ্চস্বরে
কোন পাগেলা,
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে
থাকে ভোলা।

লালন ফকিরের এরকম দুটি বাউল গান উদ্‌ধৃত করে, তার সহজ ছন্দ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন—

২১ I. A. Richards, *Principles of Literary Criticism* (London 1938), Chapter XVI, 'The Analysis of a Poem', pp. 114-24.

এই ছন্দের ভঙ্গী একঘেয়ে নয়। ছোটো বড়ো নানাভাবে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধু-প্রসাধনে মেজে ঘ'ষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো। এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।

ব্যঙ্গকবিতায় এই প্রাকৃত ভাষা যে কতদূর জোরালো হতে পারে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি কবিতার নমুনা দিয়ে তিনি তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কবিতাটি এই—

তুমি মা কল্পতরু
মোরা সব পোষা গোরু
শিখিনি শিঙ বাঁকানো,
কেবল খাব খড়বিচিলি ঘাস,
যেন রাঙা আম্‌লা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না,
আমরা ভুষি পেলেই খুসি র'ব
ঘুষি পেলে আর বাঁচব না।

কবিতাটি পাঠকদের কাছে তুলে ধরে তিনি বলেছেন, কেবল এর হাসিটা নয়, এর ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিটা লক্ষ্য করে দেখবার বিষয়।[২৮] প্রাকৃত বাংলার আরও একটা বড় গুণ এই যে কোনো গুরুচণ্ডালী দোষ তাকে স্পর্শই করতে পারে না, কিন্তু সাধুভাষাতে এই পাঁচমিশেল শব্দসমাবেশ একেবারে অচল। অবশেষে তাঁর বক্তব্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তিনি এই বলে—

এ ভাষাকে যাঁরা প্রতিদিন ঘরে দেন স্থান, তাঁদের অনেকে সাহিত্যে একে অবজ্ঞা করেন। সেটাতে সাহিত্যকে তার প্রাণরসের মূল আধার থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্চে জেনে আমার আপত্তিকে বড়ো ক'রেই জানালুম।

বাংলা লোকসাহিত্যের ভাবসম্ভার, এবং তার অন্তরোৎসারিত ভাষার বৈশিষ্ট্য, ধ্বনিগৌরব ও নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের উপর যে কতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল, এবং তাঁর কবিমানসের ক্রমবিকাশে সহায় হয়েছিল, কবির এই বিশ্বাস ও স্বীকৃতি থেকে তার আভাস পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধানী দৃষ্টি কেবল লোকসাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, লোকসংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই তা সজাগ ছিল। স্বদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্যকরূপে অনুশীলন করতে হলে যে প্রাকৃতজনকীর্তিধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকা দরকার, এ কথা প্রথম থেকেই তিনি স্পষ্ট করে দেশবাসীকে বলেছেন। পাঠাগার ও মহাফেজখানার পুথি ও নথিপত্র দেখে যে ইতিহাস রচনা করা যায় তা প্রাণহীন বর্ণগন্ধহীন ইতিবৃত্ত মাত্র। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে তিনি একবার বলেছিলেন—

২৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ, পৃ ৫০-৫৩

পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে ; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না।

১৩১২ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক সভায় ছাত্রদের এই কথা বলে তিনি তাদের অনুরোধ করেছিলেন প্রত্যেকের নিজ নিজ জেলায় সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে যত রকমের ধর্মসম্প্রদায় আছে তার বিবরণ সংগ্রহ করতে। এই ভাষণেই তিনি বলেছিলেন—

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম, কৈবর্ত, পোদ-বাগ্দী রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্ত আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনি বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত-বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে— পুঁথিকে আমরা কত-বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব, তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না।…সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্ত অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য-ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে।[২৯]

রবীন্দ্রনাথ এখানে Ethnology বা জাতিবিদ্যার কথা উল্লেখ করেছেন। এই জাতিবিদ্যা ও নৃবিদ্যার (Anthropology) চর্চা ইংরেজরাই এ দেশে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে সূত্রপাত করেন বলা চলে। বাংলাদেশের এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্‌যোগেই এই নৃতাত্ত্বিক অনুশীলনের কাজ শুরু হয়। পৃথকভাবে বিদ্যানুরাগী ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা অবশ্য এ কাজে উৎসাহী হয়েছিলেন। ড্যাল্টন, বোডিং, রিস্‌লে, হাটন এবং আরও কয়েকজন পণ্ডিত সমাজবিজ্ঞানে সরজমিন অনুসন্ধানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তৎকালের বাংলা প্রদেশের (বাংলা বিহার উড়িষ্যা ছোটনাগপুর আসাম) বহু জাতি-উপজাতির সমাজ ও সংস্কৃতিধারার পরিচয় সংগ্রহ করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই অনুসন্ধান ও অনুশীলন বিদেশীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এ দেশের কোনো ব্যক্তি, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, এমন-কি বিশ্ববিদ্যালয়েরও দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যখন ১৩১২ সালে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সামাজিক অনুসন্ধানকর্মে আহ্বান করেছিলেন, তখন স্বদেশের কোনো মানববিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানীর মধ্যে আদৌ এই চৈতন্যের উদয় হয়েছিল কিনা সন্দেহ। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণটি পাঠ করলে মনে হয়, ঘটনাচক্রে কোনোক্রমে যদি তাঁর সাহিত্যসাধনায় বৈরাগ্য দেখা দিত তাহলে হয়তো তিনি নিজেই সোৎসাহে মানববিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান ও অনুশীলন -কর্মে আত্মনিয়োগ করতেন।

সে কাজও তিনি কতকটা করেছেন তাঁর সাহিত্যচর্চার ফাঁকে ফাঁকে, এবং সেদিক দিয়ে

২৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা (পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৫১), পৃ ২৪০-৫

তাঁকে এ দেশের মানববিজ্ঞানীদের কর্তব্যকর্মের অন্যতম পথপ্রদর্শক বলা যায়। তাঁর অনুরাগের আন্তরিকতা দেখে মনে হয়, নিজের সাহিত্যচর্চার পরেও তাঁর পর্যাপ্ত সময় থাকলে এ দেশের সমাজবিজ্ঞানের ভিতস্থাপনের কাজটুকু যতটা তিনি করে গেছেন তার চেয়ে আরও অনেক ভালোভাবে করতে পারতেন। নবীন বয়স থেকে দেশীয় জনকৃতির নিদর্শন সংগ্রহের কাজে তিনি যে ব্রতী হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে মনে হয় কোনোসময় তা থেকে বিরত হন নি। শান্তিনিকেতন ও শিলাইদহ, এই দুটি প্রধান কর্মকেন্দ্রের মধ্যে শিলাইদহেই তিনি লোকসংস্কৃতির নিদর্শন-সংগ্রহের কাজ করতেন বেশি। ১৯১৫-১৬ সালের শীতকালে একবার কবি মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন পদ্মার চরে বোটে বাস করছিলেন। সাক্ষাৎকালে মোহিতলাল দেখেন যে তাঁর ঘরের একপাশে কয়েকখানা বেঞ্চির উপর বিচিত্র সব দ্রব্যসম্ভার সাজানো। সেগুলির দিকে কৌতূহলীর মতন তাকাতেই কবি তাঁকে বলেন—

আমি কিছুদিন যাবৎ একটা বিষয়ে বড় উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি; বাংলার নিজস্ব আর্ট-আইডিয়া ক্রমেই বিদেশীয় প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন পরে আমাদের খাঁটি দেশীয় শিল্পের নিদর্শনগুলি লোপ পাইবে। তাই আমি এই সকল নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

মোহিতলাল লিখেছেন—

চাহিয়া দেখিলাম এক জায়গায় কয়েকটি মাটির ঘরের মডেল, তাহাদের খড়ের চালের বিবিধ স্টাইল লক্ষণীয়; বুঝিলাম, কবি, ওই ঘর-ছাওয়ার মধ্যেই যে শিল্পচাতুর্য্য আছে, তাহাই বাঙালীর নিজস্ব বলিয়া গৌরববোধ করেন। পাশেই কতকগুলি কাঁথা রহিয়াছে, তাহাদের সেই সূচী-কর্ম্ম সত্যই মহার্ঘ্য বলিয়া মনে হয়। স্মরণ হইতেছে, কতকগুলি 'শিকা'ও বোধ হয় ছিল, রজ্জু-শিল্পের নিদর্শন বলিয়া তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—মোটা ব্রাউন পেপারের একটি তবক, সেগুলিতে আলিপনার নানা নক্সা অতি সরল স্থূল রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। এগুলির প্রতি কবির মমতা যেন কিছু অধিক; ইহাই বাংলার প্রকৃতি-রূপা গৃহলক্ষ্মীদের স্বহস্তরচিত কারুসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাহাদের পরিকল্পনায়— ফুল, লতা, পাতা, পাখী ও নানা নিত্যপরিচিত রূপাবলীর যে সুষমা-বিন্যাস, তাহাই সত্যকার শিল্পী-মনের পরিচায়ক। সবচেয়ে মুগ্ধকর তাহাদের সেই অতি সরল ও সাবলীল রেখাঙ্কন— যেন শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধ একেবারে মন হইতে অঙ্গুলিপ্রান্তে পৌঁছিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আলিপনা-শিল্পকে ধরিয়া রাখিবার এই কৌশলটিও অভিনব বলিয়া মনে হইল— কবির প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহ যেন তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে।[৩০]

পদ্মার চরে নির্জন কক্ষে মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে লোকসংস্কৃতির যে নিদর্শনগুলি দেখেছিলেন তা ফোক্-মিউজিয়মে দেখা যেতে পারে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে ফোক্-মিউজিয়ম বলে আজও সে রকম কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা বলা যায় না। ১৯১৫-১৬ সালে কোনো সংস্কৃতিবিজ্ঞানীর কল্পনার সীমানার মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ। নমুনাগুলির তালিকা দেখে আজকের দিনে যে-কোনো সংস্কৃতিবিজ্ঞানী অবাক তো হবেনই, হয়তো কতকটা আফ্‌সোসও করবেন।

---

৩০ মোহিতলাল মজুমদার, রবি-প্রদক্ষিণ, (১৩৫৬), 'পদ্মা-বক্ষে রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়, পৃ ১৭৪-৫

বাংলার নানাপ্রকারের খড়ের চালাঘরের নমুনা— একচালা, দোচালা, চৌচালা, আটচালা— 'pitched' ও 'curvilinear' চালা— চালার গড়ন, বাঁধন, প্রসার ইত্যাদি যে 'material culture' অনুশীলনের অপরিহার্য বিষয়বস্তু তা নৃবিজ্ঞানীমাত্রই জানেন। কাঁথা, দড়ির শিকা ইত্যাদিও উপেক্ষণীয় নয়। লোকশিল্পের নিদর্শনরূপে তো বটেই, যে-কোনো দেশের লোকায়ত সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের জন্য, কিভাবে প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের সঙ্গে জনমনের শিল্পরস-বোধের মিলন ঘটেছে তার বিচার-বিশ্লেষণের জন্যও এগুলির প্রয়োজন আছে।[৩১] বাংলার মেয়েদের আলপনাচিত্রগুলিও যে কত যত্ন করে রবীন্দ্রনাথ তখন সংগ্রহ করতেন, তাও মোহিত-লালের বিবরণ থেকে বোঝা যায়। ব্রতকথা ও ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব আলপনাগুলিও তিনি সংগ্রহ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন ব্রতের ছড়ার সঙ্গে ব্রতীর জীবনের যে যোগ, ব্রতের আলপনার সঙ্গেও ব্রতীর জীবনের ঠিক সেই যোগ আছে। আলপনা-গুলি সংরক্ষণের জন্য তিনি সেগুলি মেয়েদের দিয়েই 'ব্রাউন পেপারে' আলতা দিয়ে আঁকিয়ে রাখতেন। এ সম্বন্ধে তিনি দুঃখ করে তখন বলেছিলেন যে সংগ্রহের কাজে অনেক দেরি হয়ে গেছে, মেয়েরা এর মধ্যে তাঁদের নিজস্ব কলাকর্মে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। অনেক আলপনায় বিলেতি নকশার ছাপ পড়েছে দেখা যায়। গ্রাম্য মেয়েদের মনে হয়তো এ রকম ধারণা হয়েছে যে দেশী আলপনার সঙ্গে বিলেতী নকশার বৈচিত্র্য কিছু মিশিয়ে দিলে আলপনার মর্যাদা বাড়বে এবং তা ভদ্রজনের প্রশংসা লাভ করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বাংলার আলপনাচিত্রগুলি অদম্য আগ্রহ নিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন, এবং মনে হয় তাঁর এই আগ্রহ (এবং সংগ্রহ) ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্র-নাথের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে 'বাংলার ব্রত' রচনায় তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

শান্তিনিকেতনে ও শিলাইদহে বসে লোকজনের সাহায্যে লোকসংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ করে তাঁর মনের ক্ষুধা মেটে নি। পরিচিতদের মধ্যে, বিশেষ করে যাঁরা বিদ্যোৎসাহী তাঁদের, যতদূর সম্ভব তিনি এ কাজে যোগ দেবার জন্য তাগিদ দিয়েছেন ও অনুরোধ করেছেন। একবার দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়কে একখানি চিঠিতে (১ পৌষ ১৩২২ সন) তিনি লিখেছিলেন—

চাটগাঁ অঞ্চলে মেয়েলি শিল্প যা-কিছু প্রচলিত আছে সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? ওরা লক্ষ্মীপূজা বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে যে সমস্ত আল্পনা এঁকে থাকে সেইগুলি কোনো শিল্পপটু মেয়েকে দিয়ে কাগজের উপর আলতার রঙে আঁকিয়ে পাঠাতে পারেন? খাঁটি সেকেলে জিনিষ হওয়া চাই। শিকে, কাঁথা প্রভৃতি গৃহস্থালীর শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতে চাই। আর একটি জিনিষ চাই— চাটগাঁ অঞ্চলে যত বিভিন্ন রীতির কুঁড়েঘর আছে তার ফোটো বা অন্ত কোনোরকমের প্রতিকৃতি। আপনার ছাত্রদের লাগিয়ে দিলে এটা দুঃসাধ্য হবে না। ওখানে

৩১ *Notes and Queries on Anthropology* : By A Committee of the Royal Anthropological Institution of Great Britain and Ireland (6th revised edition, London 1951). Part III, 'Material Culture', pp. 221-342

জনসাধারণের মধ্যে মাটির, কড়ির, বাঁশের বা বেতের শিল্পকাজ কি রকম চলিত আছে ভাল করে খোঁজ নেবেন। আমরা বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে এই সমস্ত গণশিল্প সংগ্রহ করতে ব্রতী। আপনার নিজের জেলার প্রতিও দৃষ্টি রাখবেন।[৩২]

মানববিজ্ঞানীরা যাকে 'material culture' বলেন তার প্রায় সমস্ত উপকরণেরই উল্লেখ আছে চিঠির মধ্যে। আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, বিষয়াসক্তির স্থায়িত্ব দেখে। ভিত অত্যন্ত মজবুত না হলে কোনো বিষয়েরই এ রকম একনিষ্ঠ অনুধাবন ও অনুধ্যান সম্ভব নয়, বিলীয়মান লোকায়ত সংস্কৃতির তো নয়ই। কেবল সাধক বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই লক্ষ্য স্থির রেখে ধৈর্য সহকারে এ রকম বিষয়ানুধাবন সম্ভব। প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকে হিসেব করলেও, সেই বাইশ-তেইশ বছর বয়সে বাউল-গানের সংকলন হাতে পড়ার পর থেকে চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন বছর বয়সে চাটগাঁর লোকশিল্পের যাবতীয় নিদর্শন সংগ্রহের অনুরোধপত্র পর্যন্ত দেশীয় জনকৃতি পুনরুদ্‌ধারের এই যে প্রচেষ্টা, এ কেবল সংস্কৃতি-বিলাস নয়। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ভাবসম্পদ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বমানবৈক্যের জীবনদর্শন আবিষ্কার করেছেন, কাব্যের বিচিত্র ছন্দের, সংগীতের অপূর্ব রাগরাগিণীর এবং হয়তো চিত্রকলার আঙ্গিকেরও প্রেরণা সঞ্চয় করেছেন। খাঁটি বাংলা ভাষার জাদুকর-স্রষ্টা হয়েছেন তিনি প্রাকৃত বাংলার বিচিত্র শব্দলোকে প্রবেশ করে, এবং তার শব্দসম্ভার বৃদ্ধির কৌশলটিকে আয়ত্ত করে। আর লোকায়ত সংস্কৃতির বহুমুখী ধারার সঙ্গে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি ও নিষ্ঠা নিয়ে প্রত্যক্ষ পরিচয়-লাভের জন্য তিনি নবীন বয়স থেকে প্রবীণত্বের প্রান্ত পর্যন্ত উন্মুখ হয়ে ছিলেন স্বদেশের লোক-সমাজের প্রকৃত ইতিহাস জানবার জন্য, যে-ইতিহাস হাজার পুথিপুস্তক পড়লেও সঠিক জানা যায় না। এ দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের জীবনে মানবশিল্পীর ও মানববিজ্ঞানীর এক বিস্ময়কর মিলন ঘটেছিল বলা যায়। তাঁর সমাজচিন্তা ও শিল্পচিন্তা এক হয়ে মিশে গিয়েছিল।

৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৩

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তা

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর ভাবরাজ্যে যে গৌরবময় নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তা সর্বাংশে এতই বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময়, যে অল্পকথায় তার দৃষ্টিভঙ্গীর মূল বৈশিষ্ট্যটিকে নির্দেশ করা সহজ নয়। তবু মোটামুটি সিদ্ধান্ত করলে সম্ভবতঃ ভুল হবে না যে, এর সামান্যলক্ষণ হচ্ছে দেশে নবাগত পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে ভারতবর্ষের চিরাচরিত জীবনচর্যাকে পরীক্ষাপূর্বক জাতীয় জীবনে তাকে নূতন করে প্রতিষ্ঠা করবার ঐকান্তিক প্রয়াস। সে যুগে যাঁরা সচেতনভাবে ইতিহাস রচনা করেছেন, এই উদ্যম যে কেবল তাঁদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। বিগত শতকের মনীষিবৃন্দের প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই কাজ করেছেন। প্রথাসম্মতভাবে ঐতিহাসিক এঁদের সকলকে বলা যাক বা নাই যাক, ইতিহাস-চিন্তা এঁদের অধিকাংশেরই মননকর্মের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তা প্রকাশ পেয়েছে এঁদের নিজ নিজ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী-জাত ভারত-ইতিহাসের ব্যাখ্যায়। এই ইতিহাসচেতনার পরিচয় রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই তাঁদের রচনা ও কর্মে বিভিন্নভাবে দিয়েছেন; অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রজনীকান্ত গুপ্ত বা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত যাঁরা নিছক পুরাতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক তাঁদের তো কথাই নেই। উনবিংশ শতাব্দীর মনোজগতের এই ব্যাপক ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ তিনটি ধারা লক্ষণীয়। এর মধ্যে যেটি সর্বপ্রাচীন সেটির প্রবর্তক উইলিয়ম জোন্‌স্‌, চার্ল্‌স্‌ উইলকিন্স, কোলব্রুক, প্রিন্সেপ, উইলসন প্রভৃতি একদল ইংরেজ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌। এই বিদগ্ধমণ্ডলীর অনেকের সুপরিকল্পিত উদ্যমের ফল-স্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৫ই জানুয়ারি, ১৭৮৪) কলিকাতার সুবিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যা-গবেষণাকেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। এর সঙ্গে অপর একটি ধারা যোগ করেন কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারি সম্প্রদায়। মুখ্যতঃ খ্রীস্টধর্মপ্রচার তাঁদের উদ্দেশ্য হলেও এ দেশের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে প্রসঙ্গতঃ তাঁরা যে আলোচনা করেছেন তার মূল্য কম নয়। এই সঙ্গে এঁদেরই উৎসাহে ও আনুকূল্যে তদানীন্তন কোনো কোনো শিক্ষিত বাঙালী লেখক, যেমন রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যে পাঠ্যপুস্তক-পর্যায়ের গ্রন্থগুলি রচনা করেন সেগুলির উল্লেখও করা যেতে পারে। তৃতীয় বা শেষ ধারাটির পশ্চাতে ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রেরণা। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে দীক্ষিত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা সোৎসাহে আত্ম-আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত-ইতিহাসের চর্চা শুরু করেছিলেন। এই ধারার ভগীরথ রূপে

রামমোহন রায়ের নাম করা চলে। রামমোহন মুখ্যতঃ ইতিহাস রচনা করেন নি কিন্তু বিরুদ্ধ-পক্ষীয়গণের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারকালে যে অসাধারণ নিষ্ঠা শ্রদ্ধা ও পাণ্ডিত্য সহকারে ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে অগ্রসর হয়েছিলেন তা এ দেশে আধুনিক কালে সম্পূর্ণ নূতন। রামমোহনের পরে এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ডিরোজিও-শিষ্যমণ্ডলী। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার অধিবেশনগুলিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নিয়মিত প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনাদি হত। কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গোষ্ঠীগত ভাবে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের আলোচনা শুরু করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা। এ বিষয়ে উক্ত সভার মুখপত্র, ১৮৪৩ সালে প্রবর্তিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দান অসামান্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রমুখ সুধীবৃন্দ এই সভা ও পত্রিকার সহায়তায় শাস্ত্রানুবাদ এবং ভারতীয় পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস আলোচনার যে-একটি অনুকূল পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন সেই পরিবেশে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত আলোচনার এই চালচিত্র পিছনে না থাকলে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তার সমগ্র রূপটি হৃদয়ংগম করা সহজ নয়।

রবীন্দ্রনাথের মননে ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও ইতিহাস-চিন্তা যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল তার প্রধান কারণ উপরি-উক্ত পরিবেশের প্রভাব। উনবিংশ শতকের বাঙালী বুদ্ধিজীবীর চিন্তার স্বাভাবিক প্রবণতাই ঐ দিকে। অবশ্য ইতিহাস-চর্চার যে ত্রিবেণীসংগমের উল্লেখ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে করা হয়েছে তার তিনটি ধারার নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কিছু তারতম্য ছিল। পাশ্চাত্ত্য বুধমণ্ডলী এশিয়াটিক সোসাইটির মধ্য দিয়ে যে সারস্বত সাধনার সূত্রপাত করেন তার প্রেরণা প্রধানতঃ নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক কৌতূহল। আলোচ্য বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা বা সহানুভূতির অভাব তাঁদের ছিল না কিন্তু বিদেশী শাসকশ্রেণীর স্বাভাবিক সংস্কার হেতু ভারতীয় জীবনচর্যার সঙ্গে তাঁদের মানসিক ও সামাজিক ব্যবধান কোনোদিন দূর হয় নি। মিশনারি সম্প্রদায় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আন্তরিকভাবেই অবজ্ঞা করতেন— তাঁদের সর্ববিধ প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল এ দেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। এঁদের ভাবশিষ্য বাঙালী খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক সুবিখ্যাত মনীষী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়েও পরবর্তীকালে প্রকাশ্যে বলতেন হিন্দুধর্ম খ্রীষ্টধর্মের পূর্বাভাস বলেই তার যা-কিছু মূল্য। কিন্তু রামমোহন থেকে শুরু করে তত্ত্ববোধিনী-যুগের মনীষিবৃন্দের দৃষ্টির মধ্যে ভারত-ইতিহাস সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং নৈর্ব্যক্তিক শ্রদ্ধা ছাড়া আরও কিছু ছিল। এঁরা চেয়েছিলেন ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত চর্চার দ্বারা ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপটিকে আবিষ্কার করে তার আলোকে জাতিকে আত্মসচেতন করতে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার দ্বারা সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত তদানীন্তন শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় জীবনচর্যার প্রতি

অনুরাগ সঞ্চার করতে। এই প্রসঙ্গে ১৭৭০ শকের (১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) শ্রাবণ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যা বলা হয়েছে তা স্মরণীয়—

……আমারদিগের ইংরাজী ভাষার বহু ছাত্র……পরদেশের ইতিহাস যথোচিত অভ্যাস করেন কিন্তু স্বদেশের পুরাবৃত্ত সন্ধান করা উচিত বোধ করেন না। ইউরোপখণ্ডের অন্তঃপাতি কোন দেশের কোন স্থানে কি নগর? কোন বৎসর তাহা নির্মিত হইয়াছে? তাহা তাঁহারদিগের সূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত হইতেই হইবে; কিন্তু আপনারদিগের এই জন্মভূমির তদ্রূপ বিবরণ জানিবার জন্য কত ব্যক্তি সচেষ্ট হয়েন?……আমারদিগের কি মূল? পূর্বে কোন সময়ে আমারদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল? কিরূপ ধর্ম ছিল? কি কি বিদ্যা প্রচার ছিল? এতাদৃশ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত কি পর্যন্ত সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে, কি আক্ষেপের বিষয়, ইহাও জানিবার জন্য কেহ অনুরাগী নহেন।

স্পষ্টই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এখানে ইতিহাস-চেতনা আর কেবল বুদ্ধির স্তরে সীমাবদ্ধ নেই, তার সঙ্গে স্বাজাত্যবোধজনিত একটি আবেগ সংযুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও পরিবেশ বিশেষ করে এই ভাবধারার সঙ্গে তাঁকে গভীরভাবে যুক্ত করেছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান যে সূত্র অবলম্বন করেছেন—তা হচ্ছে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনে ভারতীয় সভ্যতার অবিসংবাদিত প্রতিভা। তাঁর রচনার নানা স্থানে এই মর্মে তাঁর দ্বিধাহীন স্পষ্ট উক্তি স্থান পেয়েছে। এর কয়েকটি এখানে বেছে নেওয়া গেল—

হিন্দুসভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শক জাতীয় জাঠ ও রাজপুত; মিশ্র-জাতীয় নেপালী, আসামী, রাজবংশী; দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী, নায়ার—সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে। হিন্দুসভ্যতা এত বিচিত্র লোককে আশ্রয় দিতে গিয়া নিজেকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত করিয়াছে কিন্তু কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই— উচ্চ-নীচ, সবর্ণ-অসবর্ণ, সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে, সকলকে ধর্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে কর্তব্য পথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।

—আত্মশক্তি, 'ভারতবর্ষীয় সমাজ'

ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

—ভারতবর্ষ, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'

আমাদের প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রাজায়-প্রজায় ছিল না, সে ছিল এক জাতি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য জাতি-সম্প্রদায়ের। এই সকল নানা উপজাতির বর্ণ ভাষা আচার ধর্ম চরিত্রের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। অথচ

ইহারা সকলে প্রতিবেশী। ইহাতে এক দিকে যেমন পরস্পরের লড়াই চলিতেছিল তেমনি আর-এক দিকে পরস্পরের সমাজ ও ধর্মের সামঞ্জস্যসাধন-চেষ্টারও বিশ্রাম ছিল না। কী করিলে পরস্পরে মিলিয়া এক বৃহৎ সমাজ গড়িয়া উঠে, অথচ পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত না হয়, এই দুঃসাধ্য-সাধনের প্রয়াস বহুকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহার সমাধান হয় নাই।

—ইতিহাস, 'ভারত-ইতিহাস-চর্চা'

কিন্তু কোনো সভ্যতার ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির মূল সূত্রটি কি বা কোথায় তা সঠিক নির্দেশ করা অতি দুরূহ কাজ। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে তিনি স্বয়ং এই প্রসঙ্গ তুলেছেন—

ইংরাজ বল, ফরাসী বল, কোনো দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাবটি কী, দেশের মূল মর্মস্থানটি কোথায়, তাহা এক কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না; তাহা দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম। তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে তাহার বিচিত্র শক্তি দিয়া আমাদিগকে নিগূঢ়ভাবে গড়িয়া তোলে; আমাদের অতীতের সহিত বর্তমানের ব্যবধান ঘটিতে দেয় না; তাহারই প্রসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। এই বিচিত্র উদ্যমসম্পন্ন গুপ্ত পুরাতনী শক্তিকে সংশয়ী জিজ্ঞাসুর কাছে আমরা সংজ্ঞার দ্বারা দুই-চার কথায় ব্যক্ত করিব কী করিয়া?

কিন্তু কঠিন হলেও আধুনিক কালে সূত্রের ভাষ্য করবার দায়িত্ব সূত্রকারেরই। এই ভাষ্য কবি করেছেন 'পরিচয়' গ্রন্থের অন্তর্গত ১৩১৮ সালে রচিত তাঁর 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' শীর্ষক সুবিখ্যাত প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক রচনাবলীর মধ্যে এটিকে নিঃসন্দেহে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়।[১] এটি পাঠ করে কবির অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩১৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন— রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য স্বীকার করে নিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ তার পরিপোষক আরও কয়েকটি মূল্যবান ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কবি বিষয়টি ইংরেজি ভাষায় পুনরালোচনা করেন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলিতে প্রকাশিত A Vision of India's History শীর্ষক প্রবন্ধে।[২] ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পরিণততম চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে বাংলা ও ইংরেজি এই প্রবন্ধ দুটিতে।

রবীন্দ্রনাথ ধরে নিয়েছেন, কোনো সভ্যতার ইতিহাসের একেবারে গোড়ার কথাটি হল জাতিসংঘাত। ভারত-ইতিহাসের আদিকাণ্ডে এর দুটি রূপ তিনি আবিষ্কার করেছেন, প্রথমটি আর্য-অনার্য গোষ্ঠীদ্বয়ের সংঘাত; দ্বিতীয়টি আর্যগোষ্ঠীর অভ্যন্তরস্থ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়দ্বয়ের

১ বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক রচনার সংকলন 'ইতিহাস' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। আচার্য যদুনাথ সরকার 'My Interpretation of Indian History' শিরোনামে মডার্ন রিভিউ পত্রিকার ১৯১৩ সালের অগস্ট ও সেপ্টেম্বর সংখ্যাদ্বয়ে প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

২ বিশ্বভারতী কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত (১৯৫১)।

বিরোধ। কিন্তু এই সংঘর্ষই কবির মতে ভারত-ইতিহাসের শেষ কথা নয়। বিরোধের অন্তে আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিলনের সেতু রচনার জন্য অগ্রসর হলেন প্রাচীন ক্ষত্রিয়সমাজের তিন বিরাট পুরুষ— জনক, বিশ্বামিত্র— ইনি আদিতে ক্ষত্রিয়, পরে আপন পুরুষকার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন— এবং রামচন্দ্র। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে এঁদের ভূমিকার বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে আর্য-সমাজের অভ্যন্তরে সংঘটিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিরোধের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা চাই। বৈদিক সমাজ বিভিন্ন কুল বা clanএ বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি কুলের এক ব্রাহ্মণ কুলর্ষি বা কুলগুরু থাকতেন। এ যুগের কৌলিক বিদ্যা যাগযজ্ঞ বিধিগুলি উত্তরোত্তর যত বিস্তারিত এবং জটিল হয়ে উঠতে থাকে ততই ব্রাহ্মণ কুলপুরোহিতগণ এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকেন। তাঁদের কর্তব্য হয় দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও অভ্যাস-সাপেক্ষ সাধারণের আয়ত্তাতীত এই ক্রিয়াকর্মগুলির বিশুদ্ধ অনুষ্ঠানের দ্বারা কৌলিক সূত্র এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা। দেশরক্ষা উপনিবেশ-বিস্তার রাজ্যশাসন প্রভৃতির ভারপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়শ্রেণী বৃত্তিভেদহেতু ব্রাহ্মণসমাজ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে পরিণত হন। কিন্তু গতিশীল ক্ষত্রিয়সমাজকে নিত্যনূতন ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছিল বলেই সম্ভবতঃ প্রথামূলক বাহ্যানুষ্ঠানভেদের বোধ ক্ষত্রিয়মানসে দৃঢ়মূল হতে পারে নি। ব্রাহ্মণকর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডকে নিষ্ফল বলে উপেক্ষা করে এই কারণেই একদিন ক্ষত্রিয়সমাজ ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে ব্রতী হল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর এই প্রভেদকে আশ্রয় করেই আর্যগোষ্ঠীতে পুরাতন ও নূতনের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত। দুই দলের উপাস্য দুই পৃথক দেবতার কথা স্মরণ করলে এই আদর্শভেদের একটি স্পষ্ট উদাহরণ দেখা যাবে। প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র-ক্রিয়াকাণ্ডবাদী ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের দেবতা ব্রহ্মা এবং নব্য ক্ষত্রিয়দলের দেবতা বিষ্ণু—

> ব্রহ্মার চারি মুখ চারি বেদ— তাহা চিরকালের মতো ধ্যানরত স্থির; আর বিষ্ণুর চারি ক্রিয়াশীল হস্ত কেবলই নব নব ক্ষেত্রে মঙ্গলকে ঘোষিত করিতেছে, ঐক্যচক্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, শাসনকে প্রচারিত করিতেছে এবং সৌন্দর্যকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে।

মূলতঃ ক্ষত্রিয়-প্রবর্তিত ধর্ম হওয়ার ফলে বৈষ্ণবধর্ম আদিতে ব্রাহ্মণসমাজের কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। বিষ্ণুবক্ষে ব্রাহ্মণ ভৃগুর পদাঘাতের কাহিনীর মধ্যে সেই বিরোধের ইতিহাস সংহত হয়ে আছে। বৈষ্ণবধর্ম যে ক্ষত্রিয়-প্রবর্তিত তার আরও দুটি পরোক্ষ প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ, যে দুজন মানুষ পৌরাণিক যুগে বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকৃত হয়েছেন তাঁরা দুজনেই ক্ষত্রিয়— একজন শ্রীকৃষ্ণ, অন্যজন শ্রীরামচন্দ্র। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উপদেশাবলীর মধ্যে স্পষ্টতঃ ব্রাহ্মণস্বীকৃত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডকে নিকৃষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের সংঘর্ষের প্রসিদ্ধ কাহিনী ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিরোধের আর-একটি নিদর্শন। প্রাচীন ভারতবর্ষের দুটি মহাকাব্যেরই মূল আলোচ্য বিষয় সমাজের এই অন্তর্বিপ্লব। মহাভারতে ক্ষত্রিয় নায়ক শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও কীর্তির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় এবং তার মধ্যে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের

সঙ্গে তাঁর সংঘাতের দৃষ্টান্ত সংখ্যায় কম নয়। দুই মহাকাব্যের প্রসঙ্গ সাধারণভাবে উল্লেখ করলেও কবি তাঁর সিদ্ধান্তের সপক্ষে রামায়ণ থেকেই অধিকাংশ প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর মতে আপন কুলপুরোহিত প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগুরু বশিষ্ঠের সনাতন ধর্মকে উপেক্ষা করে রামচন্দ্র বশিষ্ঠের বিরুদ্ধপক্ষ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করেছিলেন। বিশ্বামিত্রের প্রভাবে বশিষ্ঠপন্থী পিতার আশ্রয়চ্যুত হয়ে, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন ক্ষত্রিয় নব্যপন্থিগণের নায়ক। ভৃগুবংশজাত পরশুরাম তাঁর হাতে লাঞ্ছিত হলেন, বিশ্বামিত্রের নির্দেশে ব্রহ্মবিদ্ ক্ষত্রিয় রাজা জনকের সঙ্গে তাঁর হল নিবিড় আত্মীয়তাবন্ধন। এই ভাবে নবযুগের তিন নায়ক, জনক বিশ্বামিত্র এবং রাম, একত্র সম্মিলিত হলেন এবং এঁদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল আর্য ও অনার্য সভ্যতার পরস্পর মিলনের সেতু। আদিতে আর্যগোষ্ঠীর বিশেষ উপজীবিকা ছিল পশুপালন। ক্ষত্রিয়সম্প্রদায়ের উদ্যমেই আর্যসভ্যতা ক্রমশঃ পশুপালন থেকে কৃষিকার্যের স্তরে উন্নীত হয়। রাজা জনকের স্বহস্তে হলচালনার কাহিনী এক অর্থে অতি নিগূঢ় ব্যঞ্জনাময়। এই জনকের ভূকর্ষণজাত কন্যা সীতা রামচন্দ্রের ধর্মপত্নী। বিশ্বামিত্র-জনক-রামচন্দ্রের পারস্পরিক চুক্তির ফলে এমন একটি শক্তিশালী ও প্রগতিশীল ক্ষত্রিয়সম্মিলন গড়ে উঠল যার লক্ষ্য হল দাক্ষিণাত্যের অনার্য আরণ্যক সভ্যতার উচ্ছেদপূর্বক সে অঞ্চলে কৃষিসভ্যতার বিস্তার। তখন বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে শিবোপাসক রাক্ষসদের প্রতিপত্তি। এরা বৈদিক দেবমণ্ডলী ও যাগযজ্ঞবিধির শত্রু। এদের বিরুদ্ধেই রামচন্দ্রের অভিযান। বিশ্বামিত্রের নেতৃত্বে তিনটি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ইতিপূর্বে এ বিষয়ে নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন : প্রথমতঃ, শৈব রাক্ষসদের পরাজিত করে তিনি 'হরধনু' ভঙ্গ করেছিলেন; দ্বিতীয়তঃ, যে ভূমি হলচালনের অযোগ্যরূপে 'অহল্যা' হয়ে পাষাণে পরিণত হয়েছিল ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম যে ভূমিকে একদা গ্রহণ করেও অবশেষে অভিশপ্ত বলে পরিত্যাগ করে যাওয়াতে যা দীর্ঘকাল বৃথা পড়ে ছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করে আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন; তৃতীয়তঃ, ক্ষত্রিয়বিরোধী ব্রাহ্মণসমাজকে তিনি পরাভব করেছিলেন। রামচন্দ্রের প্রগতিশীল মতামতই আপন রাজ্য থেকে তাঁর নির্বাসনের কারণস্বরূপ হল। রাম-বিরোধী প্রবল রক্ষণশীল দলের বিরোধিতা দশরথ উপেক্ষা করতে পারলেন না। রামের নেতৃত্বে আর্যসমাজের নব্যদল দাক্ষিণাত্য অভিযান করলেন, কৃষিবিদ্যা ও ক্ষত্রিয়প্রচারিত নবধর্মনীতি বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে প্রচলিত হল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অনার্যসভ্যতার পরাজয় কেবল অস্ত্রবলে সম্ভব হয় নি। অনার্যগোষ্ঠীর অনেকগুলি শাখাকে রামচন্দ্র আপন সহৃদয়তার দ্বারা বশ করেছিলেন। কিষ্কিন্ধ্যার বানর ও ভল্লুকগণের সঙ্গে তাঁর সখ্য, গুহক চণ্ডালের সঙ্গে তাঁর মিতালি, বিভীষণের সঙ্গে বন্ধুত্ব ইত্যাদি এ সিদ্ধান্তের সমর্থক প্রমাণ। অনার্যসমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশের হৃদয় জয় করে তিনি তাদের ভক্তির পাত্র হয়েছিলেন এবং দক্ষিণে কৃষিস্থিতি-মূলক সভ্যতা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করেছিলেন। যে মিলনের বীজটি এইভাবে উপ্ত হল, বহু শতাব্দী পরেও ভারতবর্ষ তার ফল লাভ করেছে। এই দাক্ষিণাত্যে ক্রমে অনার্য শৈবধর্মও

ভক্তিধর্মের রূপ গ্রহণ করে এবং এখান থেকেই কালক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বৈত ও অদ্বৈত দুই ধারা সমগ্র দেশের চিত্তে আলোড়ন জাগায়। সুতরাং দেখা গেল যে বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডকে উপেক্ষা করে ক্ষত্রিয়গোষ্ঠী যখন ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে ধর্মের একটি ঐক্যভূমি আবিষ্কার করলেন, তখন অনার্যসমাজের সঙ্গে মিলনের কাজটি তাঁদের দ্বারাই সুসম্পন্ন হল। প্রথমে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজ অক্লান্তভাবে এর বিরোধিতা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষত্রিয়-প্রচারিত এই ব্রহ্মবিদ্যা ও মিলননীতি তাঁরাও স্বীকার করে আত্মসাৎ করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মানুষের এক দিকে তাহার বিশেষত্ব, আর-এক দিকে তাহার বিশ্বত্ব, এই দুই দিকের টানই ভারতবর্ষে যেমন করিয়া কাজ করিয়াছে, তাহা যদি আমরা আলোচনা করিয়া না দেখি তবে ভারতবর্ষকে আমরা চিনিতেই পারিব না। একদিন তাহার এই আত্মরক্ষণশক্তির দিকে ছিল ব্রাহ্মণ, আত্মপ্রসারণশক্তির দিকে ছিল ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় যখন অগ্রসর হইয়াছে তখন ব্রাহ্মণ তাহাকে বাধা দিয়াছে, কিন্তু বাধা অতিক্রম করিয়াও ক্ষত্রিয় যখন সমাজকে বিস্তারের দিকে লইয়া গিয়াছে তখন ব্রাহ্মণ পুনরায় নূতনকে আপন পুরাতনের সঙ্গে বাঁধিয়া সমস্তটাকে আপন করিয়া লইয়া আবার একটা সীমা বাঁধিয়া লইয়াছে।

আর্য-অনার্য-সম্পর্কের সূত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ আরও সম্প্রসারিত করেছেন তাঁর প্রবন্ধের শেষ অংশে। বৈদিক সাহিত্যে ও মহাভারতে এই দুই গোষ্ঠীর আদি বিরোধ ও পরবর্তী মিলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অনার্যদেবতা শিবের সঙ্গে আর্যগণের প্রথম সম্পর্ক বৈরিতার এবং সে দীর্ঘকালস্থায়ী বিরোধের ইতিহাসে কখনো আর্যপক্ষ কখনো বা অনার্যপক্ষ জয়লাভ করেন। এর দৃষ্টান্ত— কৃষ্ণসখা অর্জুনের কিরাতগণের দেবতা শিবের নিকট পরাজয়; এবং কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ কর্তৃক শিবভক্ত বাণাসুরের কন্যা ঊষা-হরণ। বৈদিক যজ্ঞে স্বীকৃতি না পাওয়ার আক্রোশে শিবের অনার্য অনুচরগণ কর্তৃক দক্ষযজ্ঞনাশও এ সংঘর্ষের উদাহরণস্বরূপ গণ্য হতে পারে। অতএব বৈদিক রুদ্রের সঙ্গে শিবকে মিলিয়ে আর্যগণ তাঁকে আপন দেবমণ্ডলীতে স্থান দিলেন এবং সাময়িক ভাবে এই ধর্মবিরোধের অবসান ঘটালেন। আর্য-অনার্যের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সামাজিক মিলনকেও অধিককাল বাধা দিয়ে রাখা সম্ভবপর হয় নি। মহাভারত পাঠ করলে তদানীন্তন সমাজে বর্ণসংকর ও ধর্মসংকরের ক্রমবর্ধমান আবির্ভাব সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না। এর ফলে সমাজের আত্মরক্ষণী শক্তি উদ্‌ব্যস্ত ও উৎপীড়িত হয়ে পড়ে। নূতন সামাজিক কোমগুলিকে বর্জন করাও চলে না অথচ সেগুলিকে শুদ্ধ বর্ণের তুল্য মর্যাদা দিতেও সংকোচ। এই দোলায়িত চিত্তবৃত্তির আভাস পাওয়া যাবে মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে। এই পরিবেশে উত্তর-পূর্ব-ভারতে দেখা দিল বৌদ্ধ ও জৈন বিপ্লব। এই দুই আন্দোলনের নেতা দুই ক্ষত্রিয় তাপস, বুদ্ধ ও মহাবীর প্রচার করলেন, ধর্মনীতি কদাচ মানুষের সহিত মানুষের কোনো ভেদকে চিরন্তন সত্য বলে গণ্য করতে পারে না। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সংঘাত বা আর্য-অনার্য সংঘাতের ইতিহাসে ভারতীয় সভ্যতার যে অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তার মর্মকথা বিভিন্ন সামাজিক শক্তির স্বকীয়তা রক্ষাপূর্বক সেগুলির মিলন সাধন করা— সেগুলির মধ্যকার সমস্ত বাঁধ ভেঙে সব কিছুকে একাকার

করে দেওয়া নয়। কিন্তু এই স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্যের পরিবর্তে বৌদ্ধবিপ্লব নিয়ে এল এক বেড়া-ভাঙা বন্যা। এর ফল শুভ অশুভ দুই হয়েছে। এই সময় বাহির থেকে ভারতবর্ষে শক হূন প্রভৃতি নূতন বিদেশী জাতির ক্রমশঃ সমাগম হতে থাকে এবং বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় পেয়ে এই নব আর্যেতর গোষ্ঠীগুলি একেবারে ভারতীয় সমাজের মর্মস্থলে প্রবেশ করে। এদের ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত করে নেওয়া বৌদ্ধধর্মের একটি বিশিষ্ট সামাজিক কীর্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি হল। এখন আর্য-অনার্য সম্পর্কের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ আর্যসমাজের আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। এদিকে আর্যসমাজের ভিতরকার পরিস্থিতিতে একটি গভীর পরিবর্তন এসেছিল। ক্ষত্রিয়শ্রেণী নিজ স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে অনেক পরিমাণে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যেতে আরম্ভ করেছিল। এই যুগসন্ধিক্ষণে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ই আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সক্ষম হয় কেননা আর্যসমাজবিধিতে সংরক্ষণের ভার চিরদিনই ব্রাহ্মণের হাতে। ব্রাহ্মণ-নেতৃত্বে এই সামাজিক প্রলয়ঝড়ের অবসানে প্রধানতঃ দুটি কাজ আরম্ভ হল। এক, ভারতীয় সভ্যতার ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলিকে সংগ্রহ করে, জোড়া দিয়ে পূর্বধারার সঙ্গে যোগ রক্ষা; আর-এক, নূতনকে তার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া। এই সংগ্রহকার্যের নিদর্শনস্বরূপ বেদ পুরাণ মহাভারত ইত্যাদি সংকলনের উল্লেখ করা যায়। বিশ্লিষ্ট সমাজকে সংহত করবার জন্য এমন শাস্ত্রের বা জনশ্রুতি সংগ্রহের প্রয়োজন হয়েছিল যার প্রামাণ্য লোকে বিনা তর্কে স্বীকার করে নেবে। এই শাস্ত্র-বেদ-পুরাণ, যা এতকাল শিক্ষণীয় ছিল, তা এবারে সংগৃহীত হয়ে দৃশ্যমান অভ্রান্ত শাস্ত্রগ্রন্থে রূপান্তরিত হল; এবং এই জনশ্রুতির সংগ্রহ হল মহাভারত— যার মধ্যে আর্যসভ্যতার দীর্ঘদিনের ভাঙাগড়ার ইতিহাস জনশ্রুতির আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। একটি বৃহৎ সামাজিক বিপ্লবের পরে জাতির আত্মস্থ হবার এই স্পৃহা দেখা দিয়েছিল বলেই এই উদ্যমের সর্বক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি সমাধানের মূলসূত্রগুলির উপর জোর দেবার একটি বিশেষ প্রবণতা। তাই মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ভগবদ্গীতাকে, ভারতীয় চিত্তের ত্রিমুখী ধারা জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়যোগ যার চরমতত্ত্ব। বিপুল বৈদিক সাহিত্যের মধ্য হতেও এ যুগের সামাজিক ব্যবস্থাপকগণ একটি সূত্র উদ্ধার করলেন যা হল ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত। একদিকে যেমন সংরক্ষণ অপরদিকে তেমনি সমন্বয়। অনার্যসভ্যতা কোনো অংশে আর্যসভ্যতা অপেক্ষা হীন ছিল না। তার সংস্পর্শে আর্যসংস্কৃতি রূপে বিচিত্র ও রসে গভীর হয়েছে। শৈব বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের সংগঠনে দক্ষিণাঞ্চলের দ্রাবিড় সভ্যতার ঋণ অপরিসীম; সমাজের নূতন ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণগোষ্ঠীও এ যুগে অনার্যপ্রভাবের প্রতি বিমুখ হন নি কেননা বৌদ্ধবিপ্লবের পূর্ববর্তী কালেই ক্ষত্রিয়গণের নেতৃত্বে আর্য-অনার্য মিলনের বনিয়াদটি পাকা হয়ে গিয়েছিল; আর্যসমাজদেহে অনার্যপ্রভাব অস্বীকার করবার আর উপায় ছিল না। কিন্তু এ যুগে অনার্যগণ আর আর্যসমাজের বাহিরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ এখন আর্য-অনার্য সংমিশ্রণে গঠিত— অনার্যগণ সে সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি অংশ। সুতরাং অনার্যগণের সঙ্গে যুদ্ধ করবার দিন আর ছিল না। তাই তার পরিবর্তে সামাজিক অনার্য-

বিদ্বেষ এ যুগে প্রবল ও নিষ্ঠুর আকার ধারণ করল। ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা বিধিনিষেধের নিগড়ে সমাজকে অতি কঠিনভাবে পাকে পাকে বাঁধলেন, এবং সমাজের সর্বক্ষেত্রে অকুণ্ঠভাবে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব ঘোষণা করলেন। অনার্য শূদ্রসম্প্রদায় হলেন সমাজের সর্বনিম্ন ও ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে সর্ব-নিকৃষ্ট স্তর। প্রাচীন ক্ষত্রিয়সম্প্রদায় লুপ্ত হয়েছিল। ভারতে বহিরাগত কয়েকটি জাতির বংশ-ধরেরা এই সময়ে রাজপুত নামে আপন শৌর্যবীর্যের দ্বারা উত্তরভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। অনার্যগণের মতো এঁদেরও সামাজিক স্বীকৃতি দান করে ব্রাহ্মণগণ একটি কৃত্রিম ক্ষত্রিয়সম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন। কিন্তু বুদ্ধি প্রকৃতিতে রাজপুতগণ ব্রাহ্মণগণের সমকক্ষ নন। প্রাচীন ক্ষত্রিয়সমাজের সৃজনীপ্রতিভা এঁদের ছিল না। এঁদের সাহস ও বাহুবল সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণসমাজের অনুকূলে প্রয়োগ করে এঁরা ব্রাহ্মণ-প্রবর্তিত রক্ষণশীল অসম সমাজব্যবস্থাকেই দৃঢ় করলেন মাত্র। এই ভাবে ভারতীয় সমাজবিবর্তনের ইতিহাসের এই দ্বিতীয় স্তরে ব্রাহ্মণ-নেতৃত্বে সংরক্ষণ-সমন্বয়বৃত্তির দুই অংশের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যেটুকু সমাজদেহে গ্রহণ না করে উপায় ছিল না সেটুকু নেওয়া হল বটে, কিন্তু আত্মপ্রসারের পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে আত্মরক্ষার মনোভাব এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে সমাজ সর্বাংশে তার জীবনীশক্তি হারাল। চিন্তায় ও কর্মে কর্তৃত্বভাবের অযোগ্য হয়ে জাতি সর্বতোভাবে পরাধীনতার জন্য প্রস্তুত হল।

কিন্তু তবুও মুসলমান-শাসনকালে ভারতের বন্ধনজর্জর চিত্ত সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে নি। আত্মসংকোচনের শতবিধ আয়োজনের মধ্যেও আত্মপ্রসারণের একটি মহৎ প্রচেষ্টাও এযুগে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে তা রূপগ্রহণ করেছে মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলনে। নানক কবীর প্রভৃতি উক্ত আন্দোলনের প্রধানবৃন্দ একান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ভারতের চিরন্তন ঐক্য-সাধনাকে জীবিত রেখেছেন তাঁদের শিক্ষার দ্বারা।

কবীরের রচনা ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আবর্জনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্যসাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার পন্থীকে বিশেষরূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে। ···সেই মধ্যযুগে পরে পরে বার বার সেইরূপ গুরুরই অভ্যুদয় হইয়াছে— তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা এই ছিল, যাহা বোঝা হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই সোজা করিয়া তোলা। ইহারাই লোকাচার শাস্ত্রবিধি ও সমস্ত চিরাভ্যাসের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া সত্য ভারতকে তাহার বাহ্য বেষ্টনের অন্তঃপুরে জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

বহুবৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের এই যে নিরন্তর প্রয়াস, কবির মতে ভারতবর্ষে তার এখনও শেষ হয় নি। বর্তমানে ভারত যে অবস্থার সম্মুখীন, তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের যুগের অবস্থার একটি গভীর সাদৃশ্য আছে। শেষোক্ত যুগে, বিশেষতঃ বৌদ্ধবিপ্লবের পরে, ভারতবর্ষের চিত্ত সমাজদেহের অভ্যন্তরে বহিরাগত উপাদানের প্রাচুর্যহেতু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে তার সংরক্ষণীবৃত্তি সমন্বয়প্রবণতা অপেক্ষা প্রবল হয়ে উঠে সভ্যতার অন্তঃপ্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। আজ আমাদের সম্মুখে বাহিরের জিনিস আরও অনেক বেশি, অথচ সমাজে সুদীর্ঘকাল

যাবৎ (সমগ্র মধ্যযুগে) যে শক্তি আধিপত্য করে এসেছে তা রক্ষণীশক্তি। নির্বিবাদে সংগ্রহ ও নির্বিচারে সংরক্ষণ এর ধারাগত বৈশিষ্ট্য। 'তাহা যা-কিছু আছে তাহাকেই রাখিয়াছে, যাহা ভাঙিয়া পড়িতেছে তাহাকেও জমাইতেছে, যাহা উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে তাহাকেও কুড়াইতেছে।' এমন অবাধে শক্তিক্ষয় করলে জাতির প্রাণভাণ্ডার নিঃশেষিত হতে অধিক সময় লাগবে না। এই নবযুগসন্ধিক্ষণে তাই 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'র অনুশীলন একান্ত কর্তব্য। ইতিহাসের প্রতি যাঁর দৃষ্টি তাঁর নিরাশ্বাসের কোনো কারণ নেই কেননা তিনি জানেন ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্নিহিত সৃজনশীল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসন্ধানী প্রকৃতি যুগে যুগে ভারতবর্ষের প্রাণশক্তিকে নূতন সৃষ্টির পথে প্রবাহিত করেছে, ভবিষ্যতেও করবে।

রবীন্দ্রনাথ-কৃত ভারত-ইতিহাসের এই ব্যাখ্যার মূল্য বিচার করবার সময়ে আমাদের সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে যে ইতিহাস অর্থে কবি রাজকীয় ইতিহাস— রাজবংশাবলীর ধারাবাহিক উত্থান-পতনের কাহিনী, যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা, রাজ্যশাসনতন্ত্রের খুঁটিনাটি ইত্যাদি বোঝেন নি। সাম্প্রতিক কালে পিপ্‌ল্‌স্ হিস্ট্রি বা জনসাধারণের ইতিহাস কথাটি খুব চালু হয়েছে এবং ক্রমশঃ এ কথাও স্বীকৃত হচ্ছে যে রাজা-বাদশাদের কীর্তিকলাপ ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য নয়। আজ থেকে প্রায় ষাট বৎসর আগে (১৩০৯ সালে) এই সত্য কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তকে নিছক রাজনৈতিক ইতিহাস বা পোলিটিকাল হিস্ট্রির দৃষ্টিকোণ থেকে অনুশীলন করবার তৎকালীন প্রচলিত মনোভাবকে সমালোচনা করে ঐ বৎসরে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।…তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়। সেই অন্ধকারের মধ্যে নবাবের বিলাসশালার দীপালোকে নর্তকীর মণিভূষণ জ্বলিয়া উঠে; বাদশাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস উন্মত্ততার জাগররক্ত দীপ্তনেত্রের ন্যায় দেখা দেয়।…সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হস্তির বৃংহিত, অস্ত্রের ঝনঝনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা, কিংখাব-আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা, মসজিদের ফেনবুদ্‌বুদাকার পাষাণমণ্ডপ, খোজাপ্রহরী-রক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্য-নিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন, এ-সমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল রচনা করে, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কী? তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে; সেই পুঁথিখানি কেহ খোলে না, সেই আরব্য উপন্যাসেরই প্রত্যেক ছত্র ছেলেরা মুখস্থ করিয়া লয়। তাহার পরে প্রলয়রাত্রে এই মোগলসাম্রাজ্য যখন মুমূর্ষু, তখন শ্মশানস্থলে দূরাগত গৃধ্রগণের পরস্পরের মধ্যে যে-সকল চাতুরী প্রবঞ্চনা হানাহানি পড়িয়া গেল তাহাও কি ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত? এবং তাহার পর হইতে পাঁচ পাঁচ বৎসরে বিভক্ত ছক-কাটা শতরঞ্জের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার ঘরগুলি কালোয় সাদায় সমান বিভক্ত নহে, ইহার পনেরো আনাই সাদা। আমরা পেটের অন্নের বিনিময়ে সুশাসন সুবিচার সুশিক্ষা সমস্তই একটি বৃহৎ হোয়াইট্যাওয়ে-লেডল'র দোকান হইতে কিনিয়া লইতেছি, আর সমস্ত দোকানপাট বন্ধ।……ইহার মধ্যে কেরানিশালার এক কোণে আমাদের ভারতবর্ষের স্থান অতি যৎসামান্য।
>
> —ভারতবর্ষ, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'

এই উক্তির সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে, কবি তার নয় বৎসর পরে রচিত 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' নিবন্ধে ভারত-ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তার ভিত্তিস্বরূপ, ভারতের রাষ্ট্র-বিবর্তনকে গ্রহণ না করে ভারতীয় সমাজের ধারাবাহিক অভিব্যক্তিকেই গ্রহণ করেছেন[৩]। সমাজগঠনের প্রধান উপাদান সর্বশ্রেণীর মানুষ, সুতরাং সামাজিক ইতিহাসেরও প্রধান উপজীব্য মানবগোষ্ঠীসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক-সূত্রের বিবর্তন। যে সময়ে আমাদের দেশে এবং কতকাংশে পশ্চিমেও রাজবংশাবলীর উত্থান-পতন, যুদ্ধ-বিগ্রহ-সন্ধি, শাসনতন্ত্র প্রভৃতি ইতিহাসের প্রধান আলোচ্য বস্তু ছিল, সেই সময়ে কবি আপন সহজ অন্তর্দৃষ্টির বলে এই সংকীর্ণ পরিধি থেকে মুক্ত হয়ে ইতিহাসচর্চাকে একটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্থাপন করেছেন,— এ এক পরম বিস্ময়ের বস্তু। এ ক্ষেত্রে অবশ্য একটি কথা মনে রাখতে হবে। জনসমাজের ইতিহাসকে আলোচনার প্রধান বিষয় রূপে গ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথের মতে এই ইতিহাস-বিবর্তনের মূলে প্রধান শক্তি হচ্ছে মানুষের চিত্তবৃত্তির সংঘাত ও সমন্বয়। বস্তুবাদী ইতিহাস-ভাষ্যকারবৃন্দের সঙ্গে এখানে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। শেষোক্তগণ বস্তুসংঘাতকেই ইতিহাসের মূল প্রেরণা বলে স্বীকার করেন। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং মুখ্যতঃ উপনিষদের ভাবরসে পুষ্ট কবির পক্ষে এই বস্তুবাদী আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। অবশ্য তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি। ইতিহাস যখন প্রামাণিক বিজ্ঞান নয় তখন কোনো একটি সূত্রের সাহায্যে, তা সে ভাববাদীই হোক বা বস্তুবাদীই হোক, তার সমস্ত গ্রন্থি উন্মোচন করাও সম্ভবপর নয়। ইতিহাসের যে-কোনো ব্যাখ্যা বা interpretationএর মূল্যনির্ণয়ের বেলাতে এই সীমাটুকুকে মেনে নিতেই হবে। পাশ্চাত্ত্য পরিমাপ অনুযায়ী আমাদের প্রাচীন যুগের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস রক্ষিত হয় নি এবং মধ্য-যুগের ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি যা আছে তা রাজবংশাবলীর উত্থানপতনের বিবরণে পূর্ণ। রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসকে কবি প্রাধান্য দেন নি এ তো পূর্বেই দেখা গিয়েছে। সুতরাং তথ্যের জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে প্রধানতঃ বৈদিক ও বেদোত্তর কালের সংস্কৃত সাহিত্য, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র এবং মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলনের আশ্রয়ে গড়ে ওঠা সন্ত-সাহিত্যের উপরে। ভারত-ইতিহাসচর্চায় বর্তমান কালের অন্যতম প্রধান অবলম্বন প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য যে তাঁকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছিল এমন প্রমাণ নেই। এই শ্রেণীর উপকরণ ব্যবহার করতে হলে ইতিহাস-ভাষ্যকারের যা একমাত্র পন্থা কবিকেও তাই অবলম্বন করতে হয়েছে— অর্থাৎ স্থলবিশেষে প্রতীকী বা symbolical ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে। প্রতীক ব্যবহারের সুবিধা অসুবিধা দুই আছে। বুদ্ধি সজাগ, অন্তর্দৃষ্টি গভীর

৩ প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা যেতে পারে, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে বক্তব্য সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ আকারে উপস্থিত করেছেন, সেটির আংশিক আলোচনা বা উল্লেখ তাঁর রচনাবলীর অন্যত্রও আছে। উদাহরণস্বরূপ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'সাহিত্য' পুস্তকের অন্তর্গত 'সাহিত্যসৃষ্টি' ও 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নিবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।

এবং বস্তুপরিচয় নির্ভুল হলে ইতিবৃত্তকারের পক্ষে প্রতীকী ব্যাখ্যার সাহায্যে ইতিহাসের অন্ধকারতম কোণগুলিকেও অনেক সময়ে আলোকিত করে তোলা সম্ভব। অপর পক্ষে এ কথাও সত্য যে বহু ক্ষেত্রে (বিশেষতঃ আমাদের দেশে, ভারত-ইতিহাসের ব্যাখ্যায়) প্রকৃত শিক্ষা-সংযমের অভাববশতঃ রূপকভিত্তিক আলোচনা কল্পনার অসংযত এমন-কি হাস্যকর উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-ব্যাখ্যার আনুপূর্বিক ক্রমগুলি আলোচনা করে দেখলে বোঝা যাবে এমন পদস্খলন তাঁর কোথাও ঘটে নি। এর কারণ তাঁর বস্তুপরিচয় ছিল নিশ্ছিদ্র, মহামনীষীর সদাজাগ্রত বুদ্ধি ও প্রজ্ঞালব্ধ অন্তর্দৃষ্টির কথা তো বাদই দিলাম। আর্যগোষ্ঠীর আদিজীবিকা পশুপালন, পরে ক্রমশঃ কৃষিবিদ্যায় তার রূপান্তর; প্রাচীন ভারতে জাতিসংঘাতের দুই রূপ—আর্য-অনার্য বিরোধ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধ; আর্যগোষ্ঠীর মধ্যে নূতন চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির নেতৃত্ব ক্ষত্রিয়দল কর্তৃক গ্রহণ; নব্য ক্ষত্রিয়দল কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মের সংগঠন এবং আদিতে ব্রাহ্মণসমাজের বৈষ্ণবধর্ম-বিরোধিতা; ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সংঘাত ও সমন্বয়; ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক দক্ষিণে কৃষিবিস্তারমূলক আর্য-সভ্যতার বিস্তার ও তত্রস্থ অনার্যগণের পরাজয়; শৈব অনার্যগণের বৈদিক ধর্মের সঙ্গে আপস-মীমাংসা; বৌদ্ধবিপ্লবের সামাজিক পরিণতি; প্রাচীন ক্ষত্রিয়সমাজের বিলুপ্তি; বৌদ্ধ বিপ্লবোত্তর কালের ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব; ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে বেদ পুরাণ ইতিহাস ধর্মশাস্ত্রাদির সংগ্রহ এবং বহিরাগত বস্তুপুঞ্জের চাপে উদ্‌ভ্রান্ত সমাজে রক্ষণী মনোবৃত্তির প্রাবল্য; অনার্য দ্রাবিড় সভ্যতার দান; নূতন সমাজে ব্রাহ্মণ-প্রভুত্ব এবং অনার্য-বিদ্বেষ; বিদেশী রাজপুত-গণের দ্বারা এক কৃত্রিম ক্ষত্রিয়সম্প্রদায় সৃষ্টির চেষ্টা; মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিচিত্র ধর্মীয় মতবাদসমূহের মধ্যে ঐক্যস্থাপন-প্রচেষ্টা; প্রভৃতি তথ্যগুলির সম্পর্কে সম্ভবতঃ অধিকাংশ ঐতিহাসিক তর্ক তুলবেন না। এগুলির সঙ্গে কিছু কিছু পরিশিষ্ট যোগ করা অবশ্যই যায়—খুঁটিনাটির ব্যাপারে কিছু সংশোধনও হয়তো আবশ্যক, কিন্তু মূল ঘটনাস্রোতকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সাজিয়েছিলেন এখন পর্যন্ত সেই বিন্যাসক্রম অটুট আছে। জনক রামচন্দ্র ভৃগু বিশ্বামিত্র সীতা অহল্যা প্রভৃতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের যে রূপকাশ্রয়ী ব্যাখ্যা কবি করেছেন তা এই ঘটনা-স্রোতকে যোগসূত্রে গ্রথিত করেছে এবং পূর্বাপর সংগতি রক্ষা করে একটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছে। প্রতীক ব্যবহারের মধ্যে কোথাও তিনি অসংযত বস্তুভিত্তিহীন কল্পনার আশ্রয় নেন নি, দেশকালগত পরিবেশকে বিস্মৃত হন নি। অবশ্য প্রতীক ব্যবহারের যেটুকু মূল অসুবিধা — অর্থাৎ প্রতীকের নির্বাচন এবং ব্যাখ্যায় মতভেদের অবশ্যম্ভাবিতা— রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-ব্যাখ্যা সে দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়। শুধু এইটুকু মনে রাখতে হবে সে ত্রুটি এই বিশিষ্ট ব্যাখ্যা-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত নয়। তাঁর ব্যাখ্যার আলোকে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগের আরম্ভ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ-বিবর্তনের যে সমগ্র রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে, বর্তমান কালের ইতিহাস-গবেষক তার থেকে নানা ভাবে পথের ইঙ্গিত পেতে পারেন।

এই প্রসঙ্গের প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিবর্তনের

অন্যতম প্রধান সূত্র বহুবৈচিত্র্যের মধ্যে একটি মৌলিক ঐক্য স্থাপনে ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট প্রতিভা। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'র মধ্যে কবি দেখেছেন যুগে যুগে এই চিত্তবৃত্তির বিচিত্র প্রকাশ। আপাতদৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্ত কোনো কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতের প্রতিধ্বনি বলে মনে হতে পারে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে শিখজাতির ইতিহাস-রচয়িতা কানিংহাম উক্তি করেন—

Hindustan moreover from Cabul to the valley of Assam and the island of Ceylon, is regarded as one country and dominion in it is associated in the minds of the people with the predominance of one monarch or one race.

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, লেখক এখানে ভারতবর্ষের ঐক্যবোধ আছে মাত্র এ কথা বলে ক্ষান্ত হন নি; তাঁর মতে এই ঐক্যবোধের প্রকৃতি ও ভিত্তি প্রধানতঃ রাষ্ট্রনৈতিক। অর্থাৎ এখানে ঐক্যবোধ অখণ্ড রাষ্ট্রবোধের নামান্তর। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ অবশ্য ভারতীয় সভ্যতায় রাষ্ট্রীয় বা ভৌগোলিক ঐক্য অপেক্ষা গভীরতর এক ঐক্যের আভাস দেখেছিলেন—

India beyond all doubt possesses a deep underlying unity, far more profound than that produced either by geographical isolation or political suzerainty. That unity transcends innumerable diversions of blood, colour, language, dress, manner and sect.

কিন্তু যেখানে এই শ্রেণীর পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকগণ রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র তা হচ্ছে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস যে জাতীয় ঐক্যবোধের সার্থকতম অবলম্বন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ইংরেজ-শাসনের পূর্বে হিন্দু-মুসলমান যুগে আমরা সর্বভারতীয় রাষ্ট্রের কল্পনা করলেও তা গঠন করতে পেরেছি অতি অল্প সময়ের জন্য। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতায় যতই 'গভীর ঐক্যবোধ' থাক্ এই মনোভাবসম্পন্ন ঐতিহাসিক-গণের মতে তা অসম্পূর্ণ, ভারতে প্রকৃত রাষ্ট্রীয় এবং শাসনতান্ত্রিক ঐক্য স্থাপন করে ইংরেজ-শক্তি সে ঐক্যবোধকে পরিপূর্ণতা দান করেছে। অন্যত্র সপ্তম শতকে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের অবস্থাবর্ণন-প্রসঙ্গে স্মিথ যা বলেছেন, তাতে তাঁর বক্তব্যের অভিপ্রায় স্পষ্ট ধরা পড়ে—

Harsha's death loosened the bonds which restrained the disruptive forces always ready to operate in India, and allowed them to produce their natural result, a medley of petty states with ever varying boundaries and engaged in unceasing internecine war ...The three following chapters, which attempt to give an outline of the salient features in the bewildering annals of Indian petty states when left to their own devices for several centuries, may perhaps serve to give the reader a notion of what India always has been when released from the control of a supreme authority and what she would be again, if the hand of the benevolent power which now safeguards her boundaries should be withdrawn.

এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু স্বদেশী যুগের আরম্ভে এই মতবাদের যে অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ভারতীয় পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক মহলে দেখা দিয়েছিল এ প্রসঙ্গে তাও মনে রাখা প্রয়োজন। এঁরা

প্রমাণ করতে অগ্রসর হলেন, রাষ্ট্রসাধনাতেও ভারতবর্ষ কোনো কালে হীনবল বা পশ্চাৎপদ ছিল না, সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগের ন্যায় রাষ্ট্রচিন্তা রাষ্ট্রগঠন এবং রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকেই সমান তৎপর। কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতির রচনায় এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের দিব্য প্রতিভা এই দুই শ্রেণীর আতিশয্যের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেছিল। ভারত-ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক ঐক্যবোধ সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। রাষ্ট্রের ভূমিতে তা যে সম্প্রসারিত হয় নি তার মূলও নিহিত আছে ভারতীয় সভ্যতার অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের এই রাষ্ট্রবিমুখতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়েই তিনি তাঁর ইতিহাসব্যাখ্যার দ্বিতীয় সূত্রটিতে উপনীত হয়েছেন।

কবি-উত্থাপিত এই পরবর্তী সূত্রটি হল, ভারতীয় সভ্যতায় চিরদিনই সমাজসত্তা রাষ্ট্রসত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এই মর্মে কবির অনেক উক্তি আছে, দুই-একটি বেছে নেওয়া গেল—

আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন— প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্তব্যদ্বারা আবদ্ধ। রাজা যুদ্ধ করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকার্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সে জন্য ধর্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না— সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্যরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।··· ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত।··· বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এইজন্য য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এই জন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণ পণ করি নাই কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি।

—আত্মশক্তি, 'স্বদেশী সমাজ'

কেবল ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র প্রাচ্যসভ্যতারই এই বৈশিষ্ট্য—

প্রাচ্যসভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র; তাহার মধ্যে যথাযোগ্য-ভাবে রিলিজন পলিটিক্স সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে; কারণ সমাজেই তাহার মর্মস্থান।

—স্বদেশ, 'সমাজভেদ'

এ-কথা আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে— আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকলপ্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে।

—আত্মশক্তি, 'ভারতবর্ষীয় সমাজ'

এই তত্ত্বটি মনে রাখলেই ভারত-ইতিহাসের অনেক রহস্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়। পাশ্চাত্ত্য

অর্থে রাষ্ট্র বা 'নেশন' গঠনের সাধনা ভারতবর্ষ করে নি। এটা তার পক্ষে গৌরব বা অগৌরবের কথা নয়, এটা তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য মাত্র। রাষ্ট্রের উত্থানপতনের উপর এখানে সংস্কৃতির উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ভর করে না, কেননা এখানে জীবনচর্যা রাষ্ট্রনির্ভর নয়, সমাজনির্ভর। অনেক সহানুভূতিশীল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ভারতবর্ষের এই বৈশিষ্ট্য না বুঝতে পেরে বিভ্রান্ত হয়েছেন, এর জন্য দায়ী করেছেন ভারতবাসীর অতিরিক্ত অধ্যাত্মপ্রবণতাকে। ম্যাক্স্ মুলারের মত সুধী পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করেন নি—

...taken as a whole, history supplies no second instance where the inward life of the soul has so completely absorbed all the practical faculties of a whole people, and in fact, almost destroyed those qualities by which a nation gains its place in history.

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ কথা জোর দিয়ে বলেছেন য়ুরোপের মত 'নেশন' বা 'রাষ্ট্র' গঠন না করলেই যে জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ অসম্ভব, এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ভারতে সে বিকাশ হয়েছিল এবং তার মূলে কার্যকর হয়েছে সমাজের শক্তি, রাষ্ট্রপরিবর্তন সমাজজীবনে পরিবর্তন ঘটায় নি। সমাজ বিবর্তিত হয়েছে তার নিজের নিয়মে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসশাস্ত্রে যাঁরা কৃতবিদ্য তাঁরা আক্ষেপ করে বলেন ভারতবাসী ইতিহাস রচনা করে নি, ভারতবর্ষের কোনো ইতিহাস নেই। এর উত্তরে কবি বলেছেন—

ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। যে ব্যক্তি রথচাইল্ডের জীবনী পড়িয়া পাকিয়া গেছে সে খৃষ্টের জীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বলিবে, যাহার এক পয়সা সংগতি ছিল না, তাহার আবার জীবনী কিসের? তেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্স নাই সেখানে আবার হিস্ট্রি কিসের, তাঁহারা ধানের খেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল খেতের আবাদ এক নহে ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ।

—ভারতবর্ষ, 'ভারতবর্ষের-ইতিহাস'

কবিকথিত এই দ্বিতীয় সূত্রটি এক হিসাবে তাঁর প্রথম সূত্র অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ কেননা এখানে তিনি ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের কাছে ভারত-ইতিহাসের তাৎপর্য-ব্যাখ্যার এমন একটি সংকেত রেখে গিয়েছেন যার সম্ভাবনা সুদূরপ্রসারী। এ যুগে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা ও চিন্তা অল্পবিস্তর শিক্ষিত সমাজের সকলকেই প্রভাবিত করেছে এবং ভারতবর্ষ পশ্চিমী নেশন ও রাষ্ট্রের আদর্শকে গ্রহণ করেই আপন ভবিষ্যৎ গঠনে মন দিয়েছে। এ অবস্থায় আমাদের ইতিহাসচর্চাও যে পশ্চিমী আদর্শে গড়ে উঠবে তা আশ্চর্য নয় এবং হয়তো কিছু মন্দও নয়। কিন্তু এই রাষ্ট্রকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ

থেকে ব্রিটিশপূর্ব যুগের ভারত-ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বুঝতে চেষ্টা করা বৃথা; অথবা সমাজাশ্রয়ী একটি সমগ্র জাতির ইতিহাস কোনো একটি প্রাচীন গ্রন্থে অন্বেষণ করা অর্থহীন। এ ইতিহাস সংগ্রহ করতে হবে লোকসম্পর্ক ও লোকসংস্কৃতির যে সকল ঐতিহ্যগত নিদর্শন জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে তারই মধ্যে। এ কাজের অন্যতম পথপ্রদর্শক কবি স্বয়ং, তার দৃষ্টান্ত 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের অন্তর্গত তাঁর 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধ, এবং 'লোকসাহিত্য'। কিন্তু তার চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে সাম্প্রতিক কালে ইতিহাসবিদ্যা যে রাজবৃত্তের দিক থেকে লোকবৃত্তের দিকে মোড় ফিরবার উপক্রম করেছে এই নূতন পথের ইঙ্গিত কবি তাকে বহুপূর্বেই দিয়ে গিয়েছেন তাঁর ইতিহাস-ব্যাখ্যার দ্বিতীয় সূত্রের মাধ্যমে। ব্রিটিশ-পূর্ব যুগের ভারত-ইতিহাসের গবেষক তাঁর প্রদর্শিত পথে চললে ঐতিহাসিক নবদিগন্ত তাঁর দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, এ বিষয়ে সংশয় নেই।

আমাদের দেশে ইতিহাসচর্চার যে ধারাটি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল বলে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল স্বাজাত্যবোধ। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তাও এই স্বাদেশিকতার দ্বারা উদ্দীপিত, কিন্তু স্বাদেশিকতার সুরটি সেখানে অনেক সূক্ষ্ম, পরিমার্জিত এবং রূপান্তরিত। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের সেই চড়া গলার দেশভক্তি তাঁর রচনায় নেই। অন্তর্দৃষ্টি সহকারে স্বদেশী সংস্কৃতির মূল প্রকৃতিটি আবিষ্কার করে তার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এবং বিদেশী ইতিহাসের সঙ্গে তার স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করেছেন। এই স্বাতন্ত্র্য বর্ণনে কোনো আস্ফালন নেই, যদিও তত্ত্ববোধিনী যুগের স্বাজাত্যবোধ সর্বাধিক তাঁকে এখানেই প্রভাবিত করেছে। উনবিংশ শতকের মনীষিবৃন্দের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহু বিষয়ে মতের অনৈক্য ছিল কিন্তু একটি ব্যাপারে তাঁদের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের মতো এবং রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই ভূদেব আবিষ্কার করেছিলেন যে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে রাষ্ট্রশাসন অপেক্ষা ধর্মশাসন বলবত্তর এবং রাজা ধর্মের নিয়ন্তা নন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে ভূদেবও সিদ্ধান্ত করেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা বৃহত্তর শক্তি—

> এখানে ধর্মশাসন রাজ্যশাসন অপেক্ষা অল্পগৌরবের বিষয় বলিয়া মনে হয় নাই; প্রত্যুত ধর্মশাসনকার্যে অধিকতর বিদ্যাবত্তা এবং জ্ঞানের এবং পবিত্রতার প্রয়োজন বলিয়া উহাই সমধিক গৌরবান্বিত হইয়াছিল। এখানে ধর্মশাসন রাজশাসনের অধীন হইয়া পড়া দূরে থাকুক, উহাই প্রবলতর এবং রাজশক্তির অযথা বৃদ্ধির নিবারণে সক্ষম হইয়াছিল।
>
> —সামাজিক প্রবন্ধ, সপ্তম সংস্করণ, পৃ ১৬০

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তা সত্ত্বেও দেখা যায় ভূদেব ইংরেজ আমলের রাষ্ট্রগঠনপ্রয়াসকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ঐক্যকে জাতীয়তার একটি উপাদান হিসাবে গণ্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যেমন ভাবে মান্ধাতা শ্রীরামচন্দ্র যযাতি যুধিষ্ঠির বিক্রমাদিত্য অশোক আকবর প্রভৃতির ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্যস্থাপন-প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন, তার থেকে

স্বভাবতঃ মনে হয় জাতীয় ভাব গঠনে রাষ্ট্রের উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট মোহ ছিল— দ্রষ্টব্য সামাজিক প্রবন্ধ, পৃ ৮-৯। রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যের প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করলেও (দ্রষ্টব্য, 'আত্মশক্তি'র অন্তর্গত 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' এবং 'সফলতার সদুপায়', রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ ৫২২, ৫৫৯), তাকে সমধিক গুরুত্ব কোথাও দেন নি। তাঁর রচনায় তাই ভূদেবের মতো প্রকাশ্য স্ববিরোধ কোথাও নেই। পাশ্চাত্ত্য 'নেশন'বাদ ও 'রাষ্ট্র'বাদ সম্পর্কে ভারতীয় মনীষিগণের মধ্যে প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন সর্বাধিক মোহমুক্ত।

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তিনি জোর দিয়েছেন ভারতীয় সভ্যতার স্বতন্ত্র প্রকৃতির উপর। এর থেকে হঠাৎ এমন মনে হওয়া বিচিত্র নয়, যে-বিশ্ববোধ কবির দার্শনিক দৃষ্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, হয়তো বা তার সঙ্গে তাঁর ইতিহাসচিন্তার সর্বাংশে সামঞ্জস্য নেই। আত্মশক্তি বা ভারতবর্ষ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি আপাতদৃষ্টিতে এই ধারণা গঠনে সহায়তা করে। উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম দশকে যে সব বাঙালী লেখক ঐতিহাসিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন ভারতবর্ষ এক হিসাবে তাঁদের মনকে এতটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে ভারতীয় সভ্যতার গতিপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রায় এঁদের সকলেরই প্রধান আলোচ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। ইউরোপীয় সভ্যতা ও ইংরেজশাসন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিতে উনবিংশ শতাব্দীর আদি ও মধ্য ভাগে যে মোহাঞ্জন ছিল তা তখন ক্রমশঃ ধুয়ে মুছে যেতে আরম্ভ করেছে। একটির পর একটি আঘাতে বাঙালী বুদ্ধিজীবী ক্রমশঃ দিশাহারা হয়ে পড়ছে। জাতীয় আন্দোলনের পরমুখাপেক্ষিতা ও তজ্জনিত উত্তরোত্তর আশাভঙ্গ ধীরে ধীরে চিন্তাশীল শিক্ষিতসমাজের মনে নিয়ে এসেছিল আত্মস্থ হবার প্রেরণা। এবং এই প্রথম ঝোঁকে অল্প সময়ের জন্য যদি স্বদেশী সংস্কৃতির সব কিছুই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত বলে মনে হয়ে থাকে, তবে সে মনোভাবকে অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন রচনা সর্বাংশে এই প্রভাবমুক্ত, এমন কথা মনে করবার হেতু নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এও সত্য যে প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের কথাও বলে এসেছেন। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে রচিত 'বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য' প্রবন্ধে[৪] এ বিষয়ে সুস্পষ্ট উক্তি আছে—

> ইউরোপের স্বাধীনতা-প্রধান ভাব ও ভারতবর্ষের মঙ্গল-প্রধান ভাব, পূর্বদেশীয় গম্ভীর ভাব ও পশ্চিমদেশীয় তৎপর ভাব, ইউরোপের অর্জনশীলতা ও ভারতবর্ষের রক্ষণশীলতা, পূর্বদেশের কল্পনা ও পশ্চিমের কার্যকরী বুদ্ধি, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হইয়া কি পূর্ণ চরিত্র গঠিত হইবে।

৪ ১২৮৪ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার ভারতীতে প্রকাশিত স্বাক্ষরহীন রচনা (পৃঃ ৩০৪-১০); রবীন্দ্রনাথের বলে ধরা হয়।

১৩১২ সালে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত অপর এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে দেখি হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যারূপী মূঢ়তার তীব্র সমালোচকরূপে। এই প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে তিনি বলেন—

আমরা···ভারতবর্ষীয় সভ্যতাকে অন্যান্য সভ্যতার সহিত মিলাইয়া মানবপ্রকৃতির মধ্যে তাহার একটা বৃহত্ত্ব একটা ধ্রুবত্ব উপলব্ধি করিতেছি না। ভারতবর্ষকে কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে দেখিলেই তাহার সভ্যতা, তাহার স্থায়িত্বযোগ্যতা আমাদের কাছে যথার্থরূপে প্রমাণিত হয় না।

—ভারতবর্ষ, 'চীনেম্যানের চিঠি'

এখানে দেখা যাচ্ছে কবি স্বাজাত্যবোধের পরিধি অতিক্রম করে বিশ্ববোধের ভূমিতে উপনীত হয়েছেন। ১৩১৫ সালে বিশ্বজনীনতার আরও স্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যায় তাঁর রামমোহন-প্রশস্তিতে—

অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন।··· আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

—সমাজ, 'পূর্ব ও পশ্চিম'

সুতরাং এ কথা স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যেতে পারে, ঘোরতর স্বাদেশিকতার যুগেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবিকতার আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ চ্যুত হন নি। তখন যা বীজাকারে ছিল পরবর্তীকালে তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মরচে-পড়া তলোয়ার খাটানো দেউড়ি, ঠাকুর-দালান, তিন-চারটে উঠোন, সদর অন্দরের বাগান··· আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সন্ধ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল। . . .
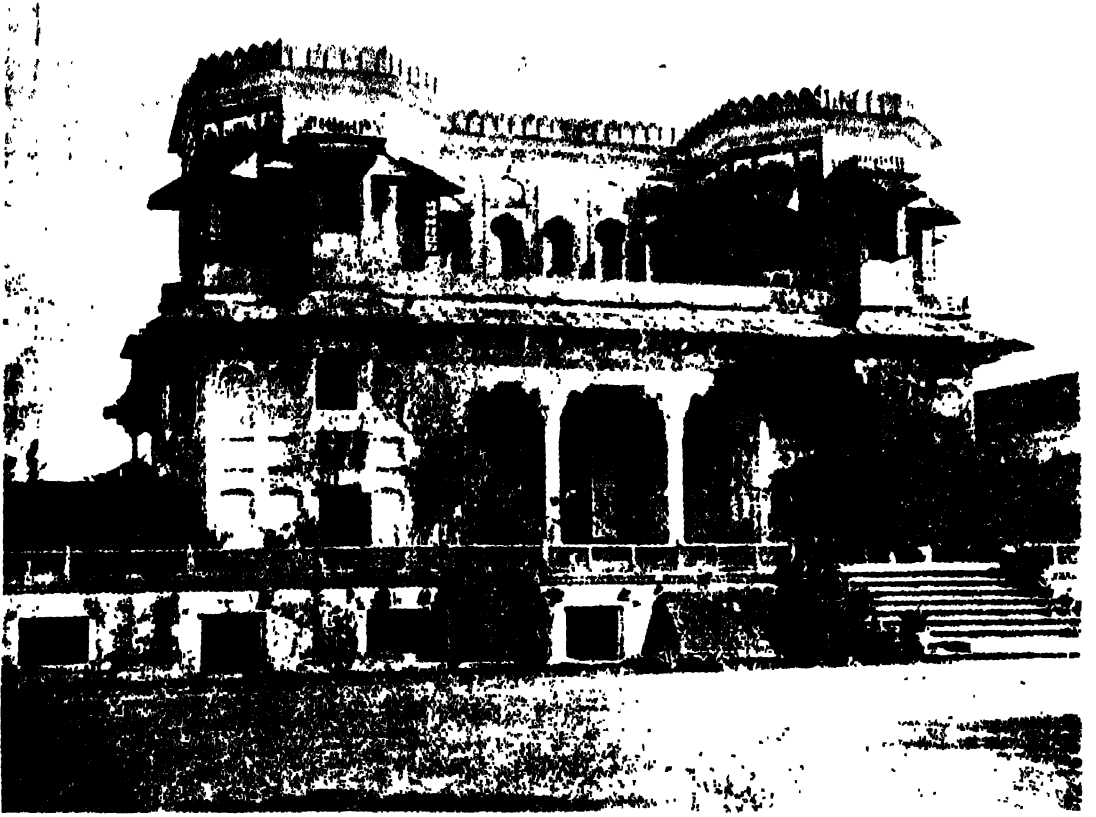
। প্রথমবার বিলাত যাত্রার পূর্বে। এই বাড়িতেই আমি বাস করিয়াছি এবং ইহাই ক্ষুধিত পাষাণের সেই বাড়ি।... শীর্ণ স্বর্ণমতী নদী ইহার প্রাকারতল চুম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে— ইহাকেই আমি গল্পে 'সুস্তা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। ছবিটা দেখিয়া আমার সেই ১৭ বৎসর বয়সের নির্জন মধ্যাহ্নের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনাসকল মনে উদয় হইতেছে।

সকলের উপরের তলায় একটি ছোট ঘরে আমার আশ্রম ছিল। রাত্রেও আমি সেই নির্জন ঘরে শুইয়া থাকিতাম। শুক্লপক্ষের কত নিস্তব্ধ রাত্রে আমি সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।...

যখন বালক ছিলেম তখন চন্দননগরে আমার প্রথম আসা।·· সেদিন লোকের ভিড়ের বাইরে ছিলাম প্রচ্ছন্ন ·· কেবল আদর পেয়েছিলেম বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে।··· সেই অতিথিবৎসলা বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর অবারিত আঙিনায় সেদিন যখন বালককে বসালেন, তাকে কানে কানে বললেন, 'তোমার বাঁশিটি বাজাও।' বালক সে দাবি মেনেছিল।

ছেলেমানুষের বাঁশি ছেলেমানুষি সুরে যেখানে বাজত সে আমার মনে আছে। মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি বড়ো যত্নে তৈরি, তাতে আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু সৌন্দর্যের ভঙ্গি ছিল বিচিত্র। তার সর্বোচ্চ চূড়ায় একটি ঘর ছিল, তার দ্বারগুলি মুক্ত, সেখান থেকে দেখা যেত ঘন বকুলগাছের আগ্‌ডালের চিকন পাতায় আলোর ঝিলিমিলি। চার দিক থেকে দুরন্ত বাতাসের লীলা সেখানে বাধা পেত না, আর ছাদের উপর থেকে মনে হত মেঘের খেলা যেন আমাদের পাশের আঙিনাতেই। এইখানে ছিল আমার বাসা, আর এইখানেই আমার মানসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেম—

এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।
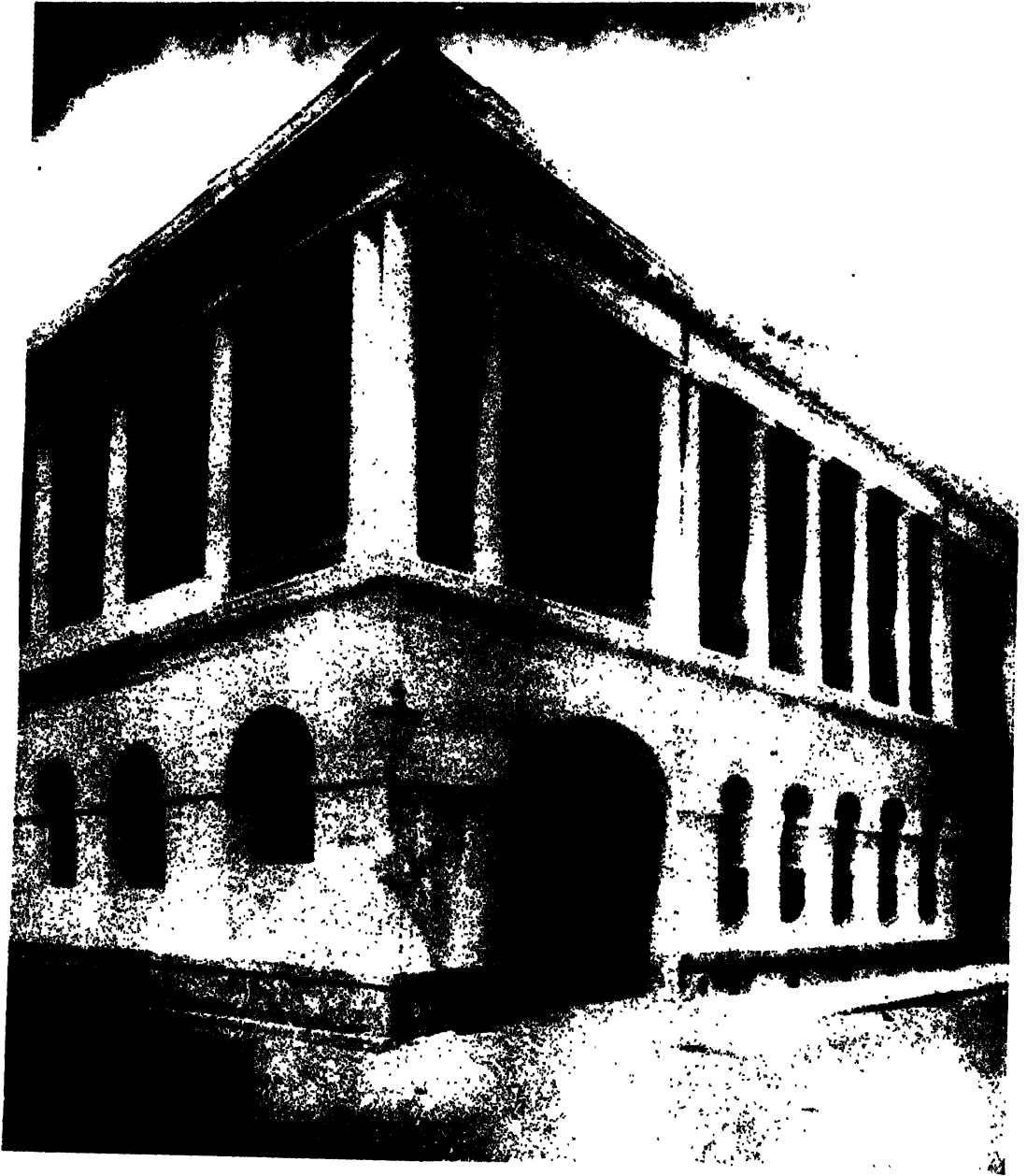
সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধকরি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল।...আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।...

মনে পডছে সেই শিলাইদহের কুঠি, তেতালার নিভৃত ঘরটি, আমের বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে। দিনগুলো অবকাশে ভরা— সেই অবকাশের উপর প্রজাপতির ঝাঁকের মতো উডে বেডাচ্ছে রঙিন পাখাওয়ালা কত ভাবনা এবং কত বাণী··· মনের গভীরে ছিল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, পরিচয়হীন বেদনা। . . .

এই যেন আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমিই একমাত্র কর্তা—এখানে আমার উপরে, আমার সময়ের উপরে, আর-কারও কোনো অধিকার নেই।···যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি, এবং যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন-মনে এই আকাশপূর্ণ আলোকপূর্ণ আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি। . . .

কতদিন গেছে এখানকার নির্জন প্রান্তরে। তখন এখানে বিদ্যালয় ছিল না, তখন শান্তিনিকেতনের বাড়ির গাড়িবারান্দায় ব'সে খুব বৃহৎ একটি নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যেতে পারতুম ; রাত্রে ঐ বারান্দায় যখন শুয়ে থাকতুম তখন আকাশের সমস্ত তারা যেন আমায় পাড়াপড়শির মতো তাদের জানলা থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে কী বলত, তাদের কথা শোনা যেত না, কিন্তু তাদের মুখচোখের হাসি এসে আমাকে স্পর্শ করত।...

সন্ধ্যার সময় ছাতে চুপচাপ বসে থাকি— কিন্তু এক-একদিন ছেলেরা আমার কাছে কবিতা শুনতে আসে। তার পরে অন্ধকার হয়ে আসে— তারাগুলিতে আকাশ ছেয়ে যায়— দিনুর ঘর থেকে ছেলেদের গলা শুনতে পাই।… ক্রমে রাত্রি আরো গভীর হয়, তখন ছেলেদের ঘরের গানও বন্ধ হয়ে যায়, আর দূরে গ্রামের রাস্তার ভিতর দিয়ে দু-একটা আলো চলচে দেখতে পাই। তার পরে সে আলোও থাকে না, কেবলমাত্র আকাশজোড়া তারার আলো।…তার পরে কখন একসময়ে আমার পূর্বদিকের দরজার সম্মুখে আকাশের অন্ধকার অল্প অল্প ফিকে হয়ে আসে, দুটো-একটা শালিক পাখি উসখুস করে ওঠে, মেঘের গায়ে গায়ে সোনালি আভা ফোটে, খানিক বাদেই সাড়ে চারটার সময় আদ্যবিভাগে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকে, অম্‌নি আমি উঠে পড়ি।… আমার সেই পূর্বদিকের বারান্দায় পাথরের চৌকির উপর আসন পেতে উপাসনায় বসি। সূর্য ধীরে ধীরে উঠে তার আলোকের স্পর্শে আমাকে আশীর্বাদ করে।

এই কটা দিন তোমায় আমায় কথা হল কানে কানে,
আজ কানে কানে বলছ আমায়,—
'আর নয়, এবার তোলো বাসা।'
আমি পাকা করে গাঁথিনি ভিত,
আমার মিনতি ফাঁদিনি পাথর দিয়ে তোমার দরজায় ;
বাসা বেঁধেছি আলগা মাটিতে
যে চলতি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেসে,
যে মাটি পড়বে গলে শ্রাবণধারায়।

যাব আমি।
তোমার ব্যথাবিহীন বিদায়দিনে
তোমার ভাঙা ভিটের 'পরে গাইবে দোয়েল লেজ দুলিয়ে।
এক শাহানাই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী,
যেদিন আসি আবার যেদিন যাই চলে।

রবীন্দ্ররচনায় মুক্তির রাষ্ট্রদর্শন

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত

ইউরোপের ইতিহাসে মুক্তিচিন্তার অন্যতম নায়ক মিল্টন, আমেরিকার মানবপ্রেমিক কবি হুইটম্যান এবং এশিয়ার মুক্তিসাধনার অগ্রণী প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ যুগে যুগে প্রমাণ করে গেছেন যে মানুষের স্বোপলব্ধি নিছক রাষ্ট্রনেতার দায়িত্ব নয়, সমাজনেতারও নয়— সভ্যতার সংকটকালে মানবাত্মার মুক্তিসাধনা যখন উন্মত্ততার আঘাতে তার পতাকা হারিয়ে ফেলে তখন অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কবি-হৃদয় অবহেলিত মানবাত্মার অহল্যাভূমিতে প্রাণসঞ্চার করে নতুন মুক্তি-সংগীতের দ্বারা। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে এই অভিনব মুক্তিপ্রয়াস আপন সাক্ষ্য রেখে গেছে। স্বীয় কর্তব্যভ্রষ্ট রাষ্ট্রপ্রয়াস ও মানববিরোধী সমাজবিধি প্রতি যুগে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে বাধ্য হয়েছে মনস্বী কবির প্রাণবন্ত আহ্বান থেকে।

রবীন্দ্ররাজত্বে মানুষ একচ্ছত্র সম্রাট। মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি স্বভাবতই রবীন্দ্ররচনার অন্যতম উপজীব্য। মুক্তির যে-চিত্র রবীন্দ্রনাথের মানসপট অধিকার করে আছে তার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে অনেক চিন্তানায়কের চিন্তাকল্পের প্রভূত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু মুক্তিপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা তার সঙ্গে উপরোক্ত চিন্তন ও রূপকের বৈসাদৃশ্যও গুণে এবং পরিমাণে কম নয়। বিশেষ করে কয়েকটি মৌল উপাদানের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের মুক্তিদর্শন পাশ্চাত্ত্য চিন্তাজগতের প্রচলিত ধারণা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত বলে মনে হয়। দুটি চিন্তাধারার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে আপাততঃ বিচার স্থগিত রেখে রবীন্দ্রনাথের মুক্তিদর্শনের ভিত্তিভূমি ও মূল উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বিশ্লেষণের ইতিহাসগত প্রেক্ষিতটিও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য। বিদেশী শাসনের স্পর্ধিত ক্ষুধার অসহায় খাদ্য ভারতবর্ষে বাস করে বিশ্বকবি মুক্তির যে চিন্তাসৌধ ও কর্মবিন্যাস রচনা করেছিলেন তার কালগত ও দেশগত প্রভাব রবীন্দ্র-রচনায় নিশ্চিতরূপে প্রতিভাত। স্বাধীন ভারতে রবীন্দ্রসংস্কৃতির উত্তরসাধকের মূল্যনিরূপণকালে এই পটভূমিকার ফলশ্রুতি বিস্মৃত হলে রবীন্দ্রপ্রতিভা তথা রবীন্দ্রবক্তব্যকে অবিচার করা হবে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ সাহিত্যস্রষ্টা— সামাজিক বক্তব্য কবির জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হলেও, প্রধানতঃ তিনি যে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রশ্নে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না, সে কথা মনে রাখতে হবে। তৃতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় দুটি ধারা ছিল— বিশেষ করে রাষ্ট্র-নৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নে এই দৃষ্টিদ্বৈত লক্ষণীয়। এক দিকে তাঁর মন আকাশবিহারী ভাববাদে আবিষ্ট, আর-এক দিকে কর্মচঞ্চল সমাজজীবনের সংস্কারপ্রয়াসী ঋষিপ্রতিম রবীন্দ্রমন ব্যাবহারিক

জগতে প্রয়োগবাদী হতে দ্বিধাবোধ করে নি। আদর্শ-কল্পনা ও প্রয়োগসম্মত বাস্তববুদ্ধিকেন্দ্রিক বিচার, এই দুটি ধারার উপযুক্ত সম্মিলনে কবির মুক্তিপ্রসঙ্গে ধারণাগুলি একটা নূতন বৈশিষ্ট্য ও সমগ্রতা লাভ করেছে, যা মিল্টন বা হুইটম্যানের চিত্রাবলীর খণ্ডসত্তার মধ্যে সম্ভবতঃ অনুপস্থিত। চতুর্থতঃ, ভারতের সুমহান দর্শন রবীন্দ্রনাথের মুক্তিপ্রসঙ্গে আলোচনাগুলিকে এক অভিনব মহিমা অর্পণ করেছে। জার্মানির জাতীয় জাগরণের প্রত্যুষপ্রহরে গ্যেটে, শিলার, শেলিং প্রভৃতি চিন্তানায়কদের রচনায় প্রকৃতি, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও সমাজসংহতি যে বিচিত্র মহিমা লাভ করেছিল, তার সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমধর্মী চিন্তাধারা। ইতিহাসের সংকটকালে সমাজের আত্মগ্লানির ফলে মনস্তত্ত্বগত কারণে রোমান্টিকতার পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস সম্ভবতঃ অনেকাংশে স্বাভাবিক। এই সূত্রসমূহকে একত্র গ্রন্থন করে রবীন্দ্রনাথের মুক্তিদর্শনের আলোচনার উপযোগী পটাভাস পাওয়া সম্ভব।

২

মুক্তির দর্শন ও সমাজনীতি আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে আঙ্গিক বা বাক্‌রীতি ব্যবহার করেছেন তা প্রচলিত রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনায় ইউরোপে ব্যবহৃত হয় নি। ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্র-দর্শনের সদাব্যবহৃত আলোচনার রীতি পরিত্যাগ করায় এ কথা মনে হতে পারে যে এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলির মূল্য নিছক সাহিত্যিক। ভারতীয় মানসে ও দেশের রাষ্ট্রতত্ত্ব আলোচনার পরিভাষার ও ভাষণভঙ্গির প্রভাব এত প্রবল যে অতি সহজ বিচারে 'বিজ্ঞানবাদী' মন হয়তো বিশ্ব-কবির কাব্যগন্ধি রচনাবলীর যথাযথ মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হতে দ্বিধা বোধ করতে পারে। সংস্কার বর্জন করে, প্রচলিত আঙ্গিকের ভূষণজনিত মোহ পরিত্যাগ করে, সহানুভূতিসম্পন্ন ও যুক্তিস্বচ্ছ মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে যে সমাজপ্রজ্ঞা, মানবতাবোধ ও রাষ্ট্রবীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় তার ঐশ্বর্য ভারতে তথা পাশ্চাত্ত্য মননমেরুতেও তুলনারহিত। অত্যন্ত সংগত বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাধারা অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ মানবিক মুক্তির প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই মানবচরিত্রের কথা তুলেছেন। মানবপ্রকৃতি-প্রসঙ্গে তাঁর মূল প্রত্যয় তিনি বহুবার ব্যাখ্যা করেছেন, রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ ও সমাজবিন্যাস আলোচনাপ্রসঙ্গে পুনরায় তার বর্ণনাও করেছেন। পরিষ্কার একটি বিবৃতি—

> যে-কোনো মতবাদ মানুষসম্বন্ধীয় তার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মানবপ্রকৃতি। এই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য কী পরিমাণে ঘটবে তার সিদ্ধান্ত হতে সময় লাগে। তত্ত্বটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করবার পূর্বে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তবু সে সম্বন্ধে আলোচনা করা চলে, কেবলমাত্র লজিক নিয়ে বা অঙ্ক কষে নয়— মানবপ্রকৃতিকে সামনে রেখে।

এবং এই মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও সম্পূর্ণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত—

মানুষের মধ্যে দুটো দিক আছে, এক দিকে সে স্বতন্ত্র আর এক দিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। এর একটাকে বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে সেটা অবাস্তব।[১]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী, এই দুটি আদর্শের শিবিরে বিভক্ত রাষ্ট্রদর্শনে মানুষের যে ইচ্ছাকল্পিত চরিত্রের কথা বর্ণিত ও স্বীকৃত হয়েছে তার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের মানুষ আধুনিক সামাজিক মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ মানুষের চরিত্রের অনেক নিকটবর্তী। এবং এ দিক থেকে বিচার করে বলা অসংগত হবে না যে রবীন্দ্রনাথের মুক্তিদর্শন কবির অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত হলেও বহু তথাকথিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সমকালীন বিচারের তুলনায় এই দর্শনের মূল ভিত্তি দৃঢ়তর এবং অধিকতর যুক্তিসম্মত।

পাশ্চাত্য দর্শনের, বিশেষ করে রাষ্ট্রদর্শনে প্রচারিত স্বাধীনতার তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছিলেন। যে স্বাধীনতার তত্ত্বে আত্মার স্বীকৃতি নেই, আছে শুধু স্বার্থের অভিযান, তার প্রতি কবি সহানুভূতি অনুভব করেন নি কোনোকালে। ইউরোপ যাকে ফ্রীডম্ বলে অভিহিত করে, রবীন্দ্রনাথের মতে

সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু, তাহা স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর,— তাহা পরের প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না, এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে। তাহা কেবলি অন্যকে আঘাত করে, এইজন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রিদিন বর্মে-চর্মে, অস্ত্রে-শস্ত্রে কণ্টকিত হইয়া বসিয়া থাকে— তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখে···এই ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর বিশালতর যে মহত্ত্ব— যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি··· তবে ভারতবর্ষের নগ্নচরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাজমুকুট পবিত্র হইবে।[২]

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনে মুক্তিচিন্তার যে যান্ত্রিকতার সুর ধ্বনিত রবীন্দ্রনাথের মন তাতে অতৃপ্ত বোধ করেছিল। অতএব বৃহত্তর ও সর্বাঙ্গীণ মানবিক মুক্তির জন্য তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন এক সামগ্রিক মানবদর্শনে। এই দর্শনের উৎস বহুলাংশে ঔপনিষদিক। আত্মার বিকাশ ও চরম উপলব্ধির প্রত্যয়ে সমুজ্জ্বল এই মুক্তির ধারণা জীবন ও ভাবজীবনে সর্ববিধ সংকীর্ণ শিবিরের আবিলতা থেকে মুক্ত। ব্রহ্মবিস্ময়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত মানুষ প্রসঙ্গে বিশ্বকবির ধারণার পরিসর পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতির ধারণার তুলনায় অনেক বৃহত্তর। জন স্টুয়ার্ট মিল বা হার্বার্ট স্পেন্সারের মানুষ আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থসন্ধানী এবং অহংবাদী। আত্মার প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে নি এঁদের রচনায়। পরবর্তী দার্শনিকরা ইউরোপে কখনো জড়বাদ, কখনো পজিটিভিজম্ আলিঙ্গন করে স্বাধীনতার নতুন সুর শোনবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও আত্মার প্রশ্ন অনুচ্চারিত ও অবহেলিত। সমাজতন্ত্রবাদের প্রবাহ পাশ্চাত্য জনসমাজে মুক্তির প্রশ্নকে নববেশে সজ্জিত করেছিল সন্দেহ নেই।

---

১ রাশিয়ার চিঠি (১৩৩৮), পৃ ১১১-১১২

২ স্বদেশ (১৩১৫), পৃ ৩২

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল সমাজতান্ত্রিক প্রত্যয় আশু অবিচারকে বড় করে দেখার চেষ্টা করেছিল। তার প্রয়োজন ছিল। তবুও এ কথা মানতেই হবে যে আধ্যাত্মিকতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার ফলে এই সংগ্রাম মানুষকে তার সম্পূর্ণ মূল্য দিতে পারে নি। যে আধ্যাত্মিক ন্যায়বোধ থাকলে মানুষকে পরম মূল্যসত্তা বলে স্বীকার করা যায় এবং কাণ্টের মতো মানুষকে কোনো অবস্থাতেই উপায় (means) হিসাবে ব্যবহার না করার প্রত্যয় ঘোষণা করা যায় তা উনিশ এবং বিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অথবা সমাজতন্ত্রবাদের মুক্তিদর্শনে অনুপস্থিত ছিল। এই অনুপস্থিতি উপরোক্ত দুটি মুক্তিচিন্তার ধারাগুলিকে অসার্থক বলে প্রমাণ করেছে বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের মানুষ এই মুক্তি চায় নি। কারণ রবীন্দ্রনাথের আদর্শ মানুষ কোনোক্রমেই অহংকেন্দ্রিক নয়, ক্ষুদ্র আকাশে তার স্বার্থান্ধ সত্তা আপনাকে হারিয়ে ফেলতে রাজি নয়। বিরাট বিশ্বের সঙ্গে তার অধ্যাত্মযোগ ঘোষণা করে রবীন্দ্রনাথ মুক্ত মানুষের যে সাধনার কথা বলেছেন তার মূল্য ইতিহাসের অনেক বাঁক ঘুরে মানুষ আজ বোধ হয় কিছু পরিমাণে বুঝতে পেরেছে। সভ্যতার গভীর সংকটের মুখে এই বৃহত্তর মুক্তির সাধনা নতুনভাবে অর্থবহ হয়ে উঠেছে।—

> আমাদের এক দিক অহং আর-একটা দিক আত্মা। অহং যেন খণ্ডাকাশ··· সেই আকাশের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ··· বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খণ্ডাকাশে যে ভেদ, অহং আর আত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। ··· যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি তখন আমরা মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাট পুরুষ, যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন তাঁর সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ।[৩]

৪

আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে চলে জীব, আপন উপস্থিতিকে আঁকড়ে ধরতে চায়। এই জীবভাব মানুষের একটিমাত্র দিক। রবীন্দ্রনাথ এই জীবভাবকে স্বীকার করেছেন এবং স্বীকৃতির পর অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন উচ্চতর মানবিক প্রয়োজনে—

> মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে-সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ।

আধুনিক বিজ্ঞানবাদী রাষ্ট্রদার্শনিকের বস্তুসত্যকেন্দ্রিক মন রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শগত উপলব্ধিকে যুক্তিবর্জিত বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু সংগত কারণে নয়। স্বাধীনতাপ্রসঙ্গে ইউরোপীয় চিন্তাধারা মূলতঃ জীবভাবকে প্রাধান্য দিয়েছে বলেই আদর্শভাবের মূল্য অস্বীকার করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। জীবকেন্দ্রিকতা হয়তো আজ ইউরোপেও সম্পূর্ণ আধুনিক চিন্তাধারা বলে পরিগণিত হয় না। মানুষের স্বকীয় প্রকৃতি বিবৃত করতে গিয়ে যখন বলা হয়, "Man....is a child of earth and of the starry heaven,....a combination of God

৩ মানুষের ধর্ম, পৃ ৮২-৮৩

and beast",[8] তখন পাশ্চাত্ত্য চিন্তাজগতেও জীবত্ববাদের অসম্পূর্ণতার স্বীকৃতি পাওয়া যায় বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ কবি। তাই ভাবা সম্ভব যে তিনি মুক্তির বস্তুতান্ত্রিক দিকটি উপেক্ষা করেছেন। অথচ আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি চল্লিশের রাজনীতির সাম্যধর্মী নবচেতনার বহু পূর্বেই বিশ্বকবির রচনায় মুক্তির এই দিকটি সবিশেষ আলোচিত। মুক্তির তুটি দিক— মুক্তি লাভ করা এবং লব্ধ মুক্তির সদ্ব্যবহার করা। প্রথমটি প্রয়োজনীয় হলেও দ্বিতীয়টির উপরই মুক্তির সাফল্য নির্ভর করে থাকে। মুক্তি লাভ করার জন্য যে সাহস, আন্দোলন ও সংগ্রামী চেতনার প্রয়োজন তাকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে পাবার পর মুক্তিকে সম্যক-রূপে ব্যবহার করা সম্ভব হবে কিনা তা আগে থেকে বিচার করে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। অর্থাৎ মুক্তির সঙ্গে কর্তব্যবোধ ও দায়িত্বকে সংযুক্ত করতে তাঁর আগ্রহ তীব্র ছিল। রাষ্ট্রীয় মুক্তি অর্জনের পরে বিচার্য নাগরিকের মুক্তি। রাষ্ট্র স্বাধীন হ'লেই নাগরিকরা মুক্তি অর্জন করবে এমন কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই। এবং রাষ্ট্র মুক্তিপত্র আইনের অক্ষরে রচনা করে সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করলেও সমাজ সেই মুক্তিকে বর্জন করতে পারে। মুক্তিতত্ত্বের এই জটিলতা রবীন্দ্রনাথের রচনায় স্বীকৃত, যা তাঁর সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা অনেক সময়ে এড়িয়ে গেছেন। রবীন্দ্ররচনায় তাই রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টা প্রবলতর, যদিও সামাজিক প্রাচীনতা ও অসাম্য থেকে মুক্তি দেবার জন্য রাষ্ট্রের যে-ভূমিকা সম্ভাব্য, তাকে তিনি অস্বীকার করেন নি।

মিল এবং স্পেন্সারের রাষ্ট্রসংশয়বাদের (state scepticism) মূল প্রত্যয় সামাজিক সম্বন্ধ বর্জিত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ মুক্তির সন্ধান করতে অগ্রসর হয়ে ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিকতাকে প্রশ্রয় না দিয়েও রাষ্ট্রের অনিষ্টকর দিকটি দেখতে পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা হ্যারল্ড লাস্কি অথবা অন্যান্য অধুনাগ্রাহ্য রাষ্ট্রনীতিবিদগণের তুলনায় অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য। 'রাশিয়ার চিঠি'তে ১৯৩০ সালে মুক্তির সাম্যসম্মত যে ভিত্তির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায় তার অনেক পরে পাশ্চাত্ত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রদর্শনে স্বাধীনতার অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রশ্ন সাধারণভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, উদারতন্ত্রের উপাসক লাস্কি অকস্মাৎ যখন সাম্যের ভক্ত হয়ে উঠলেন তখন দেখা যায় যে সাম্যকে স্বীকার করে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ লাস্কি বা স্ট্র্যাচীর ভ্রান্তিযোগ এড়িয়ে যেতে পেরেছেন। পরশ্রমজীবী ও পরিশ্রমজীবী— এই তুই শ্রেণীর সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ প্রথমটির প্রতি কোনো সমর্থন জানান নি। কিন্তু পরিশ্রম-জীবীকে সমর্থন জানিয়ে সমতার নিমন্ত্রণ ঘোষণা করেও রবীন্দ্রনাথ বিপ্লব-পরবর্তী সমাজে একনায়কতন্ত্রের সমর্থন জানাতে অস্বীকার করেছেন। নবলব্ধ সাম্য-মোহের আবেশে যারা

৪ Bertrand Russell, *Human Society in Ethics and Politics*, 1954, p. 236.

৫ লক্ষ্য করতে হবে, শব্দটি রবীন্দ্রনাথ 'বুর্জোয়া'র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে শব্দটি মার্কসীয় ভাবানুষঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে বললে অসংগত হবে না।

পরিবর্তনের আশু ফসলটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বিরুদ্ধে সে যুগেই যুক্তিসিদ্ধ প্রতিবাদ রচনা করতে কুণ্ঠিত হন নি। প্রথমতঃ, অন্ধ সমত্ব রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল। ইউরোপের রাষ্ট্রদর্শন একই শতকে যখন একবার আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আরেকবার একনায়ক-তন্ত্রবাদী সাম্যবাদের মধ্যে প্রকৃত পথনির্দেশের অভাবে দিশাহারা তখন রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট চিন্তাধারা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিস্ময়। সমত্বপ্রসঙ্গে তাঁর চিন্তা আজও অনাধুনিক হয়ে যায় নি ; তার সত্যতা এখনো অম্লান—

সমত্ব এবং পঙ্গুত্ব কি একই কথা নয়? ভেদ নষ্ট করে মানবসমাজের সত্য নষ্ট করা হয়। ভেদের মধ্যে কল্যাণসম্বন্ধ স্থাপনই তার নিত্য সাধনা, আর ভেদের মধ্যকার অন্যায়ের সঙ্গেই তার নিত্য সংগ্রাম। এই সাধনায়, এই সংগ্রামেই মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে।[৬]

দ্বিতীয়তঃ, ফসলের লোভে রবীন্দ্রনাথ কৃষকের কথা ভুলে যান নি, সাম্যমার্গের অভিনন্দন ঘোষণাকালেও উপায় ও লক্ষ্য, এই দুটি পর্যায়ের চিন্তাধারার মধ্যে প্রকৃত সমন্বয়-পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন 'রাশিয়ার চিঠি' ও অন্যান্য গ্রন্থে—

যদি অভিলাষ সফল হয় তবে যে হিংসার সাহায্যে সফল হবে সেই রক্তবীজেরাই জয়ডঙ্কা বাজিয়ে সেই সফলতার কাঁধের উপর চড়িয়ে দেবে। কেবলই চলতে থাকবে রক্তপাতের চক্রাবর্তন।···অবশেষে চরম শান্তি কি বিশ্বব্যাপী শ্মশানক্ষেত্র?

বিশ্বকবির এই প্রশ্ন মুক্তিব্রতীদের চিরন্তন প্রশ্ন। অসাম্য বিতাড়ন প্রয়োজন কিন্তু তাকে তাড়াতে গিয়ে অসহিষ্ণু জনগণমন যদি নতুন দানবকে অলক্ষ্যে আমন্ত্রণ করে আনে তবে জীবনের মুক্তধারা আবার আবদ্ধ হয়ে যাবে সংকীর্ণতার নতুন এবং কুটিলতর জলাশয়ে। একনায়কতার বিপদকে উপেক্ষা করেন নি তিনি। লাস্কি অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে প্রাথমিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে তার পরবর্তী দ্বিতীয় কর্তব্য বলে অভিহিত করেছিলেন। যেন একটি এলে আর-একটি আসবেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রাদর্শে এই দুর্বলতা অনুপস্থিত। সাম্যকে প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গেই একনায়কতার বিপদসমূহ বিবৃত করেছেন। তাঁর মতে—

একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর, তার ক্রিয়ার একতানতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত, যে চালক ও যারা চালিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার অসম্পূর্ণ যোগসাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্বদাই ঘটে ; তা ছাড়া সবলে চালিত হওয়ার অভ্যাস চিত্তের ও চরিত্রের বল হানি করে— এর সফলতা যখন বাইরের দিকে দুই-চার ফসলে হঠাৎ আঁজলা ভরে তোলে, ভিতরের শিকড়কে দেয় মেরে।[৭]

---

৬ রাশিয়ার চিঠি, পৃ ১৪৩

৭ রাশিয়ার চিঠি, পৃ ১০৫

৫

এই ভিতরের শিকড়টিই রবীন্দ্রনাথের মুক্তিচিন্তার মূল প্রশ্ন। প্রচলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মুক্তির যে তত্ত্ব পাওয়া যায় তার মধ্যে মানুষের বহিরঙ্গ সত্তার স্থানটি অধিকতর স্বীকৃত, অন্তর্নিহিত স্বোপলব্ধির প্রশ্ন হয় অনুচ্চারিত নয়তো নামমাত্র উদ্ধৃত। অথচ বহিরঙ্গ আচরণ মানুষের জীবনের একটি অংশ মাত্র এবং কেবলমাত্র এই অংশের মুক্তি নিয়ে ব্যাপৃত থাকলে বৃহত্তর মুক্তির প্রশ্ন অবহেলিত হতে পারে। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রদর্শনে ভাববাদী বিভাগ আত্মোপলব্ধি ও আত্মার মুক্তির কথা স্বীকার তথা আলোচনা করেছেন। মানুষের প্রকৃতি তার পারিপার্শ্বিক সামাজিক সম্বন্ধ দ্বারা নির্ণীত হয় এ কথা বলতে গিয়ে ভাববাদীরা রাষ্ট্রকে সমাজের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন; কাণ্ট ও গ্রীন রাষ্ট্রের ভূমিকার উপরে সংবাধসীমা আরোপ করলেও হেগেল তথা প্রধান ভাববাদী দার্শনিক চিন্তনপ্রবাহে রাষ্ট্র সমাজের ঈশ্বরনির্ণীত সম্রাটের স্থান অধিকার করে আছে। রবীন্দ্রনাথকে ভাববাদের উত্তরাধিকার দেওয়া হয়; অনেকটা কাণ্ট-গ্রীন-বার্কারের সমগোত্রীয় হিসাবে তাঁর স্থান আপাতদৃষ্টিতে নির্ধারণ করা হয়। এই মূল্যায়নের সমর্থন—

> Tagore's political ideals sprang from the idealist theory of the State and the dynamic view of social co-operation owing obedience not to any specific organ of coercion but to the moral instincts of man.[৮]

মনে হওয়া স্বাভাবিক যে পাশ্চাত্ত্য ভাববাদী রাজনীতির রাষ্ট্রপ্রধান বক্তব্যকে, রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সহযোগিতা-কেন্দ্রিক মানবধর্মী রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার বিশেষ সার্থকতা নেই। রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক অন্তর্মুখীনতায় বিপিনচন্দ্র পাল 'নিঃসঙ্গ স্বানুভূতি' (subjective individualism)[৯] আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু মানবমুক্তির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী সাম্যবাদ পরিহার করে যে সহযোগিতার সূত্রে সমাজকে ঢেলে সাজিয়ে ব্যক্তিস্বরূপের বিশ্বজনীনতা ও চরম সার্থকতালাভের প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তার পর তাঁকে 'নিঃসঙ্গ স্বানুভূতি'র উপাসক বলা অযৌক্তিক। মুক্তির যে দর্শন রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন তার উপাদান ইউরোপ বা আমেরিকার বিভিন্ন দর্শনের উপাদানগুলির মধ্যে কয়েকটির অনুরাগী হতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ সাযুজ্য অনুসন্ধানের প্রয়াস অর্থহীন। প্রাচীন ও একান্ত নবীন প্রচলনের ইউরোপীয় মতামত রবীন্দ্রনাথের রচনায় আংশিক ভাবে পাওয়া সম্ভব, এমন কি আধুনিক অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা আত্মার প্রশ্ন স্বীকার করেন তাঁদের সম্প্রতি গৃহীত অভিনব মানবপ্রকৃতির ও মুক্তি সংক্রান্ত মতামত রবীন্দ্রনাথের রচনায় আশ্চর্য ঐশ্বর্যে অবস্থিত বলে মনে হতে পারে। এমানুয়েল মুনিয়ের, গ্যাব্রিয়েল মার্সেল ও কার্ল জ্যাসপার্স-এর

৮ Sachin Sen, *The Political Thought of Tagore*, 1947, p. 97.

৯ বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১৩১৮

বিশ্লেষণের সিদ্ধান্ত বিশেষ করে মুক্ত মানবের কল্পচিত্র রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বিদগ্ধসমাজে অভিনব বলে ধরা হয় কিন্তু গভীর বিচারে সিদ্ধান্তগত কোনো মানব-প্রগতির সূত্র যা রবীন্দ্রনাথের ধারণাকে ম্লান করে দেয় তা বোধ হয় পাওয়া যায় না। ব্যক্তি ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে এই অভিনব দার্শনিকরা যখন নতুন বাগ্‌ভঙ্গীর অবতারণা করেন তখন 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে পুনরায় মন চলে গেলে অন্যায় নাও হতে পারে। এঁরা মুক্তি বলতে personএর মুক্তিতে আগ্রহী, individual এঁদের কাছে নিম্নতর সত্তার অধিকারী। মুনিয়েরের রচনায়

The term 'individual' is used in a pejorative sense : it is used to denote man considered as a 'centre or spring of egoistic desire',

কিন্তু 'person' উচ্চমার্গের—

The person...is conceived by the personalists in close connection with the idea of moral vocation...the person can be described according to three dimensions, vocation, incarnation, communion.[১০]

মুক্তির আলোচনায় ব্যক্তি ছাড়িয়ে মানুষে এগিয়ে ইউরোপীয় চিন্তাধারা যদি আধুনিকতা অর্জন করে থাকে তাহলে রবীন্দ্রনাথ কতক পরিমাণে সে যুগেই আমাদের আধুনিকতাকে ম্লান করে দিয়েছিলেন তাঁর সুবিন্যস্ত আলোচনার দ্বারা।

মানুষের দুটি পৃথক সত্তার স্বতন্ত্র উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় সহজ ভাষায় বিবৃত আছে; বোধ হয় এত সহজ ভাষায় যে তার ফলে জটিলতাপ্রবণ আধুনিক বিদগ্ধ মন অনেক সময়ে আগ্রহশীল হয় নি। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলি আমি; আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে যা-কিছু, যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধনজনমান, এই যা-কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু পরমপুরুষ আছেন সেই সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে···। সত্তার এই দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করিতে পারি নে।···কোনো-এক সময়ে সহসা দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন। যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে।[১১]

অথচ এই মানবসত্যকে অতিক্রম করার মধ্যে "অতিমানব" বা "অমানব" সত্যের সন্ধান-প্রচেষ্টা নেই। রবীন্দ্রনাথের মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার মূল কথা হচ্ছে যে—

আপনাকে ত্যাগ না ক'রে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র আছে— তিনি নিখিলমানবের আত্মা।[১২]

---

১০ Frederick Copleston, *Contemporary Philosophy*, 1956, pp. 109-110,

১১ মানুষের ধর্ম, পৃ ৯০

১২ মানুষের ধর্ম, পৃ ৯১

মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান এবং মানব-চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ, এই দুটি আলোর যুগ্মরশ্মিতে রবীন্দ্রদর্শনের মানুষ উদ্ভাসিত। মানুষকে বিলুপ্ত করে মানুষের যে মুক্তি তার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন জানাতে চান নি। সন্দেহ নেই যে আবেগ ও যুক্তির একত্রমিশ্রণ রবীন্দ্রনাথের মুক্তিদর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এ কথা মানতে সত্যি দ্বিধা নেই যে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হবার অভিলাষ পোষণ না করলেও তাঁর রচনার অন্তর্দৃষ্টি, যুক্তিনিষ্ঠা ও দূরদর্শনের দ্বারা মানুষের মুক্তির রাষ্ট্রদর্শন-রচনার যে সন্ধান এবং সূত্রাবলী উত্তরকালকে উপহার দিয়ে গেছেন তা অবলম্বন করে এ যুগের সমাজসন্ধানীরা অনায়াসে অপার-ঐশ্বর্যমণ্ডিত দর্শনসৌধ রচনা করতে পারেন। তত্ত্ব ও প্রয়োগ, এই দুই দিক থেকেই তাঁর রচিত মুক্তিদর্শন ভারত তথা বিশ্বের রাষ্ট্রদর্শনের এক বিশিষ্ট সম্পদ। যন্ত্রদানব, যন্ত্রানুগ সংঘ-মানব, অ-গণতান্ত্রিক অতিমানব এবং অনুদার, মনোহীন যূথজনতার আক্রমণের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত মানবতা সহজ মুক্তির পথ পরিহার করে রবীন্দ্রনাথ আত্মবিচারণা, সহযোগিতা এবং স্বোপলব্ধির পথ অবলম্বন করে নতুন করে সভ্যতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে, এ বিশ্বাসে বোধ হয় অতিকথনের অপরাধ নেই।

রাষ্ট্র বনাম সমাজ

শ্রীশচীন সেন

সভ্যতার প্রাণশক্তির পরিচয় পেতে হলে আমাদের জানতে হবে কল্যাণশক্তির নিহিত আধার কোথায়। সাধারণের কল্যাণভার যেখানে পুঞ্জিত হয়, সেখানে দেশের মর্মস্থান। য়ুরোপের শক্তির ভাণ্ডার স্টেট অর্থাৎ সরকার। সমস্ত হিতকর কর্মের ভার স্টেটের উপর। তাই আধুনিক স্টেটকে সর্বগ্রাসী বা মঙ্গলপ্রসূ স্টেট বলা যায়। ভারতবর্ষের কল্যাণশক্তি ছিল সমাজের মধ্যে, তাই ভারতের শক্তির ভাণ্ডার সমাজ। মঙ্গল করবার স্বাধীনতাই হল সত্যিকারের স্বাধীনতা। য়ুরোপ রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে মেনেছে, ভারত সমাজের স্বাধীনতাকে জেনেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, সভ্যতার লক্ষণ হল বিচিত্রকে মিলিত করবার শক্তি। য়ুরোপ ঐক্য এনেছে রাষ্ট্রের সাহায্যে। তাই য়ুরোপের কাছে রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক ঐক্যই শ্রেষ্ঠ। ভারত বিচিত্রকে মিলিত করেছে সমাজের সূত্রে। য়ুরোপ যাদের এক নেশনে বেঁধেছে তারা সবর্ণ। ভারত যাদের এক করেছে তারা অসবর্ণ। রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য মিথ্যা নয়, কিন্তু ভারতের কাছে তা প্রধান নয়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় এই তত্ত্ব নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

য়ুরোপে রাষ্ট্র সবচেয়ে বড়, ভারতে সমাজ সকলের বড়। য়ুরোপ রাষ্ট্রকে চরম জেনেছে বলেই নেশনকে মেনেছে। ভৌগোলিক সীমাবিভাগ নেশনকে রূপ দেয় বটে, কিন্তু সর্বসাধারণকে যখন দেশরক্ষার প্রয়োজনে বা বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির কাজে সংঘবদ্ধ করা হয়, তখন রাষ্ট্রীয় ন্যাশনালিজম্ গড়ে ওঠে। রাষ্ট্র জোর দেয় শক্তির উপর, সহযোগিতার উপর নয়। মানুষ যে জাতির বা ভাষার বা প্রাকৃতিক সীমাবিভাগের দাস নয় এ কথা রাষ্ট্র মানতে চায় না। তাই রাষ্ট্র নেশনকে ঘিরে গড়ে ওঠে, ন্যাশনালিজমকে পোষণ করে। য়ুরোপে গড়ে উঠেছে নেশন-স্টেট। ভারত জেনেছে সমাজকে। মানুষ নিজেকে সার্থক করতে চায় দান করে। মানুষের মন্ত্র হল কল্যাণের মন্ত্র, সে চায় অপরের সঙ্গে আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপন করতে। মানুষের সামাজিক বৃত্তি ঘোষণা করে যে, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ সেই মঙ্গলপ্রসূ সমাজ গড়বার পক্ষে। তিনি বলেছেন যে, ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম হল বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। এ কাজ নেশন-স্টেটের সাহায্যে সম্ভব নয়। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলে জানে নি, পরকে শত্রু বলে কল্পনা করে নি, সমাজের মধ্যে সকলকে স্থান দিতে চেয়েছে। স্বস্থানে সকলের মাহাত্ম্য স্বীকার করতে হলে, সমস্ত পথকে স্বীকার করতে হলে সমাজকে প্রধান করতে হবে, সমাজকে সজীব সজাগ রাখতে হবে।

ভারতবর্ষ এই নেশন-স্টেটকে গ্রহণ করে নি, তাই রাজত্ব নিয়ে বাণিজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি

করে নি। ভারতবর্ষ সৈন্য ও পণ্য নিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে উৎসাদন করবার চেষ্টা করে নি— সে সবাইকে গ্রহণ করেছে। ভারতের এই গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের মূল কথা হল নিজেদের শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করে বেঁচে থাকতে হবে, স্টেটের শাসনকে সবল বা সচেতন করে নয়। রাষ্ট্র মানুষকে বল দেয়, সমাজ মানুষকে প্রেম দেয়। যে শক্তিমান সে মিলতে চায় না, সে জয় করতে চায়, বাধা দূর করতে চায়। তাই *Nationalism* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলতে দ্বিধা বোধ করেন নি—

Logic does not know that, under the lowest bed of endless strata of wealth and comforts, earthquakes are being hatched to restore the balance of the moral world, and one day the gaping gulf of spiritual vacuity will draw into its bottom the store of things that have their eternal love for the dust. Man in his fulness is not powerful but perfect. Therefore, to turn him into mere power, you have to curtail his soul as much as possible....The process of dehumanizing has been going on in commerce and politics. And out of the long birth-throes of mechanical energy has been born this fully developed apparatus of magnificent power and surprising appetite which has been christened in the West as the Nation.

আধুনিক য়ুরোপীয় চিন্তাধারায় সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের প্রধান হোতা হলেন জার্মান দার্শনিক হেগেল। তিনি বলেছেন যে, স্টেট হল 'Divine Idea', ইতিহাস হল 'March of the Absolute'। সর্বপ্রকার মঙ্গলপ্রয়াস ও ধর্মবোধ ব্যক্ত ও সার্থক হবে স্টেটের সাহায্যে। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হল স্টেটের আধিপত্য প্রণতিপূর্বক গ্রহণ করা। স্টেটের এই হেগেলীয় ব্যাখ্যানের ভিতর স্বৈরতন্ত্রের বীজ আছে। হেগেল শ্রেণীসংঘাত স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, শ্রমিক স্বার্থান্ধ, চাষী বুদ্ধির আলোতে প্রদীপ্ত নয়— যাঁরা সমাজের উচ্চতর সোপানে অবস্থিত তাঁরাই তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জনসাধারণের মঙ্গলকামী হতে পারেন। তাঁরাই একমাত্র নেশন-স্টেটের নৈতিক বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখতে পারেন, পূর্ণতা দান করতে পারেন। হেগেল এই উনজন সম্প্রদায়কে অধিজন সম্প্রদায়ের শিক্ষক ও গুরু হিসাবে গ্রহণ করতে বলেছেন। সমাজে যাঁরা উচ্চাসনে স্থিত, তাঁরাই শাসনযন্ত্রের সত্যিকারের অধিকারী। তাঁরা পরের জন্য ভাবতে পারেন, পরের মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে পারেন। তাঁরা যতটা পান, তার চেয়ে বেশি দিতে চান। তাই নেশন-স্টেটের স্বার্থ সবার স্বার্থের উপরে— এবং স্টেটের বিধান যাঁদের হাতে তাঁরা সমাজের সবার প্রণম্য। হেগেল বলেছেন—

A true State and a true Government only appear where there already exists a difference between class, when both riches and poverty are great, and when the situation develops in which a mass of people who once were accustomed to satisfy their needs find themselves no longer able to do so.

ইতিহাসের প্রগতি লক্ষ্য করলে একটা কথা মানতে হবে যে, যখন কোনো বিশেষ

রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করে, তখন সেই শ্রেণী তার শ্রেণীগত স্বার্থের সম্প্রসারণের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে দেখা যায় যে, কোনো বিশেষ শ্রেণী বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির গর্তে আবদ্ধ হয়। তাই দেখা যায় যে, শাসকশ্রেণী বলে এক বিশেষ শ্রেণী গড়ে ওঠে। কার্ল মার্ক্স হেগেলের শিষ্য, কিন্তু তিনিই প্রথম প্রচার করলেন যে, রাষ্ট্রের রূপকে বুঝতে হলে সমাজের সম্পত্তি-সম্বন্ধের দিক্ নির্ণয় করতে হবে। সমাজে শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীসংঘাত আছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ এই শ্রেণীসংঘাতের অনুপ্রেরণা জোগায়। দেশের ধন-উৎপাদনে শ্রমিকদের দান সবচেয়ে উচ্চে, সেই শ্রমিকশ্রেণীকে প্রধান আসনে বসাতে হবে। মার্ক্স স্টেটের অধিনায়কত্ব অস্বীকার করেন নি। কিন্তু শ্রেণী-সংঘাতে শ্রমিকের জয় অবশ্যম্ভাবী করতে হলে ধনিক-শাসিত স্টেটকে বিচূর্ণ করতে হবে। তাই মার্ক্স ও এঙ্গেল্স্ লিখলেন—'The executive of the modern state is simply a committee for managing the common affairs of the bourgeoisie.' স্টেটকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্ক্স বললেন— ১. স্টেট হল ধনিক ও বণিক -সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ; ২. শ্রেণী-বোধকে দূরীভূত করতে পারলেই বণিক-শাসিত স্টেটের বিলোপ হবে ; ৩. শ্রেণীসংঘাতের সাহায্যে শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ; ৪. শ্রেণীহীন সমাজে স্টেটের প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে, এবং স্টেটের স্থান অধিকার করবে 'Commune' ; ৫. স্টেটের সমস্ত অধিকার করায়ত্ত করে শ্রমিকশ্রেণী তার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে। মার্ক্স স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, শ্রেণীহীন সমাজে কোনো বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণের কথা উঠবে না। একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজেই শাসক-সম্প্রদায়ের স্বার্থ যথার্থ সর্বসাধারণের স্বার্থ বলে ঘোষিত হতে পারে। ধনের উৎপাদন, ধনের বণ্টন, ধনের বিকিরণ, সব যখন সমাজের হাতে ন্যস্ত হবে, তখন স্টেটের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। বিরোধ যেখানে নেই, শাসনতন্ত্র সেখানে বাহুল্যমাত্র। তখন গড়ে উঠবে শ্রেণীহীন সমাজের দাবি, এবং শ্রেণীবোধবর্জিত মানুষের নীতি। তখন স্টেটের স্থান গ্রহণ করবে Commune— জনমঙ্গলের সামাজিক সংস্থা। বুর্জোয়া সমাজের রীতি ও নীতি হল শ্রেণীর স্বার্থ-সংঘটিত, মনুষ্যত্বের দাবিতে সমুজ্জ্বল নয়।

মার্ক্সের স্বপ্ন ভেঙে দিলেন লেনিন। মার্ক্সের দর্শন প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক নির্ধারণতত্ত্বের উপর ; লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল শক্তিপূজার দিকে। ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, ১৯১৭ নভেম্বরের রাশিয়ার বিপ্লব লেনিনের অধিনায়কত্ব ছাড়া সম্ভব হত না। এই বিপ্লবের ভিতর আছে লেনিন-তত্ত্বের পরিপোষণ। লেনিনকে গ্রহণ করতে হবে আধুনিক কম্যুনিজমের স্রষ্টা হিসাবে। রাশিয়ার নভেম্বর-বিদ্রোহের পূর্বে লেনিন বলশেভিক পার্টিকে বলেছিলেন— 'History will not forgive delay by revolutionists who could be victorious to-day, while they risk losing much tomorrow, they risk losing all.' লেনিন তাঁর *What Is To Be Done* গ্রন্থে শক্তিপূজার রীতি ও নীতি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন— ১. বিপ্লব ঘটাতে হলে বিপ্লবাত্মক তত্ত্বের প্রয়োজন ; ২. বিপ্লবকে আন্তর্জাতিকের সুরে বাঁধতে হবে ;

৩. বিপ্লব সার্থক করতে হলে বিপ্লবাত্মক তত্ত্ব-চালিত পার্টির প্রয়োজন ; ৪. ক্ষমতা অধিকার করতে হলে পার্টিকে সংঘবদ্ধ করতে হবে, এবং সংখ্যাল্পের সাহায্যে সংখ্যাগরিষ্ঠকে শাসন করা সম্ভব। লেনিনবাদের আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি পার্টি স্টেটের প্রধান পুরোহিত। লেনিনবাদে আছে হেগেলের দৃষ্টিকোণ, কিন্তু মার্ক্সীয় তত্ত্বের বিপর্যয়। মার্ক্স মেনেছিলেন প্রোলেটারিয়ান রাষ্ট্রকে, লেনিন মেনেছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টিকে। লেনিনের মতে, রাষ্ট্রের অধিকরণ ও পরিচালনের দায়িত্ব কম্যুনিস্ট দলের উপর। এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন দলের কুক্ষিগত হবে, তখন দলের পীঠ ধীরে ধীরে প্রসারিত হবে। মার্ক্সের পরিকল্পনায় ছিল ডিক্টেটরশিপ অব প্রোলেটারিয়েট, লেনিনবাদে তা রূপায়িত হল ডিক্টেটরশিপ অব পার্টিতে। পার্টির আবর্তনে মানুষের কতটা আত্মিক দুর্গতি ঘটতে পারে, তার সংকেত রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন চার অধ্যায় উপন্যাসে।

রবীন্দ্রনাথের মঙ্গলপ্রসূ সমাজে প্রোলেটারিয়ান স্টেট বা পার্টি স্টেটের স্থান নেই, এমনকি তথাকথিত ওয়েলফেয়ার স্টেটের স্থানও সংকীর্ণ। য়ুরোপের রাজনীতিজ্ঞের দল একসময় নেশন-স্টেটের প্রশংসায় চতুর্মুখ ছিলেন ; আজ তাঁরাই বলছেন যে নেশন-স্টেটের ভিতর শান্তি নেই। রাষ্ট্রের প্রাধান্যকে স্বীকার করলে সমাজের স্বাধীনতা সংকীর্ণতর হয়ে পড়ে। ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজের বেষ্টন। ব্যক্তির অধিকার ও অনুসন্ধিৎসা, সমাজের বৈচিত্র্য, সামাজিক বিধানের সুর ছন্দ ও গতি, সবকিছুই রক্ষা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৭ সালে প্রকাশিত *Nationalism* গ্রন্থে যা বলেছেন, য়ুরোপের আধুনিক রাজনীতিজ্ঞ সে কথা এখন স্বীকার করছেন। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলতে দ্বিধা করেন নি—

> The power to call the state to account is essential to freedom, and it cannot exist where the state is sovereign...The way out is the abrogation of national sovereignty Indeed, I should be almost tempted to argue that the abrogation of national sovereignty, is the condition upon which alone peace is safe in a world of democratic states.

রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষ পূর্ণ হতে চায়— শক্তির মত্ততায় পূর্ণতার পথ সুপ্রশস্ত হয় না। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা জাতিকে বলবান করে, কিন্তু সমাজের স্বাধীনতা মানুষকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে দেয়। রাষ্ট্র চায় বিরুদ্ধশক্তির বাধাকে দূর করতে, সমাজ চায় পরের সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপন করতে। রাষ্ট্রের গোড়ার কথা হল সংঘাতকে সংহত করা ; সমাজের মূল কথা হল মিলনকে সার্থক করা। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রবিমুখ সমাজতত্ত্বের কথঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

প্রাণের মধ্যে দুটো প্রবৃত্তি আছে, একটি নিষেধ, অপরটি তাগিদ। মানুষ সব জিনিস পরখ করে দেখতে চায়, নূতন পথে নিজেকে বিস্তার করতে চায়। এই পরখ-প্রবৃত্তি প্রাণকে দুঃসাহসের পথে নিয়ে চলে। পথে চলতে চলতে ব্যাঘাত ঘটলেও সে নিজে জয়যাত্রার পথ থেকে নিরস্ত হতে পারে না। কিন্তু প্রাণের মধ্যে নিষেধবৃত্তিও আছে। সেখানে তার ভয়। বাধার চেহারা

দেখে সে সংকুচিত হয়ে পড়ে। প্রাণের রাজ্যে নিষেধ-প্রবৃত্তি যখন একেশ্বর হয়ে বসে, তখন মানুষের সর্বনাশ ঘটে। প্রাণের চঞ্চলতা এনে দেয় পরথ-প্রবৃত্তি, এবং প্রাণের সংযম এনে দেয় নিষেধ-প্রবৃত্তি। প্রাণের রাজ্যাধিকারে এই উভয় শরিককেই স্বীকার করতে হবে।

প্রাণকে সজীব ও চঞ্চল রাখতে হবে, সকলের সঙ্গে প্রাণের বিনিময় চলবে— এই বিনিময় যেখানে বন্ধ, সেখানে সমাজ নিস্তব্ধ ও নিশ্চল হয়ে ওঠে। প্রাণের মধ্যে যে দুঃসাহসিকতা আছে, তা ইতিহাসের গতিকে সচল রাখে। কিন্তু চলার বেগ তখনই সার্থক হয়, যখন তার মধ্যে সংযম থাকে। মানুষকে কখনো বলা চলে না যে, সে যেন শক্তি না চালায়, বুদ্ধি না চালায়, সে যেন শুধু ঘানি চালায়। পথে তার চলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

যে পথে চলাফেরা বন্ধ, সে পথে ঘাস জন্মায়, এবং ঘাসের মধ্যে নানা রঙের ফুলও ফোটে। সে ঘাস সে ফুল সুন্দর এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না, কিন্তু পথের সৌন্দর্য ঘাসেও নহে, ফুলেও নহে, তাহা বাধাহীন বিচ্ছেদহীন বিস্তারে; তাহা ভ্রমরগুঞ্জনে নহে, কিন্তু পথিকদলের অক্লান্ত পদধ্বনিতেই রমণীয়।

সমাজসেবায় রবীন্দ্রচিন্তাধারায় কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। তার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে রবীন্দ্রনাথের কল্যাণপ্রসূ সমাজ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হবে না।

প্রথম কথা, যে-মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না, সে মানুষের উপকার করতে মানুষ অক্ষম। লোকের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে হলে, তাকে জয় করতে হবে প্রীতির দানে। প্রীতির দানে অপমান নেই। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করবার উপায় তার হিত করা অথচ তাকে প্রীতি না করা।

দ্বিতীয় কথা, দেশহিতের কাজ শুরু করতে হবে অন্তরের তাগিদে, প্রয়োজনের গরজে নয়। মানুষ কোনোদিন যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে ঋণরূপে গ্রহণ করতে চায় না, সে প্রাপ্য বলে গ্রহণ করতে চায়।

তৃতীয় কথা, অশক্তের শক্তি যদি না জাগে তাহলে মানুষের পরিত্রাণ নেই, কারণ শক্তিমানের শক্তিশেল অতিমাত্র প্রবল হয়ে উঠেছে। বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদবোধ, এ উভয়ের অভাব ঘটলেই দুঃখীর দুঃখ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

চতুর্থ কথা,

দূরের সঙ্গে নিকটের, অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধপথটা সমস্ত দেশের মধ্যে অবাধে বিস্তীর্ণ হইলে তবেই তো দেশের অনুভবশক্তিটা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। মনের চলাচল যতখানি, মানুষ ততখানি বড়ো। মানুষকে শক্তি দিতে হইলে মানুষকে বিস্তৃত করা চাই।

পঞ্চম কথা,

আমাদের সমাজ লোকসাধারণকে যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে, এইখানেই সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে। পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নির্ভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে— এইখানেই মানুষের পতন।

লোকের সঙ্গে আমরা যখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখি, তখন সত্যিকারের হিতসাধন করা সম্ভব হয় না। দেশের বা সমাজের কল্যাণপ্রচেষ্টার প্রথম সোপান হল এই যোগসাধন। সেই যোগসাধন তখনই সম্ভব হয় যখন আমরা চলতে থাকি, আমাদের চিত্ত যখন সজাগ থাকে। মানুষের চলা যখন বন্ধ হয় তখন সে চারিদিকে প্রাচীর গড়তে থাকে। চিত্ত সক্রিয় না থাকলে তার সৃজনীশক্তি বন্ধ হয়। যেখানে আশ্লেষ নেই, শুধু বিশ্লেষ আছে, সেখানে প্রীতি নেই, শোভা নেই। বিভিন্ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি বারংবার উচ্চারণ করেছেন যে, মানুষ পথিক, মানুষ প্রেমিক। মানুষ পথের চলায় আনন্দ পাবে এবং প্রেমের ত্যাগে পূর্ণ হবে। হৃদয় যেখানে এক না হয়, পরস্পরের পার্থক্য সেখানে উগ্র হয়ে ওঠে। সমাজের উদ্দেশ্য হল এই পার্থক্যের উপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছিয়ে দেওয়া।

সমাজে ছোট বড় সর্বপ্রকারের লোক আছে। অনেক অখ্যাত লোক আছে যারা মানুষ হবার সুযোগ পায় নি। সমাজের কাছে সমাজপতিদের কাছে তারা সবচেয়ে কম মূল্য পায়, অথচ সকলকে তারা পরিচর্যা করে। সেই অখ্যাত লোকদের মানুষ হতে হবে। এ কথা রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন মেনে নিতে পারেন নি যে, একদল লোক সব-কিছু সুযোগ-সুবিধে পাবে, এবং আর-একদল লোক সব-কিছুর থেকেই বঞ্চিত হবে। রবীন্দ্রনাথ এই বঞ্চিতদের বলেছেন, 'সভ্যতার পিলসুজ', যারা প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে, উপরের সবাই আলো পায়, অথচ তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে। সমাজের নানা স্তর আছে। এই স্তরবিন্যাসকে সুসংগত ও সুসংযত রাখতে হবে। শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনা তিনি করেন নি, কিন্তু শ্রেণীবদ্ধ সমাজের ছন্দ ও গতি সক্রিয় রাখতে বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছন্দ ও গতির উপাসক। তিনি জানেন ও মানেন যে, ছন্দ ও গতি যেখানে ব্যাহত হবে, বিপ্লব সেখানে অবশ্যম্ভাবী। ছন্দ ও গতির অভাবে সমস্ত কিছু অসুন্দর হয়ে ওঠে। অন্তরের তালমান নষ্ট হয়, বাইরের ঠেলাঠেলি চলতে থাকে, সমাজের ওজনবোধ নষ্ট হয়। তখন আসে বিপ্লব, যা ছাই হবার তা ছাই হয়ে যায়। ছন্দ ও গতির মহিমা রবীন্দ্রসাহিত্যে নানাভাবে আখ্যাত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

কালের যাত্রা নাটিকায় কবি বলেছেন—

> আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে। আমি তাল রেখে গান গাব।

মানুষের সঙ্গে মানুষের বাঁধন যখন নষ্ট হয়, তখন আসে উন্মত্ততা, কেটে যায় সমস্ত তালমান। যখন একটা দিক উঁচু হয় অতিশয় বেশি, তখন আসন সমান করতে হলে যে দিকটা ঝুঁকে পড়েছে, তাকে ওঠাতে হবে। কিন্তু যারা নীচে ছিল, তারা যখন উঁচু হয়ে আবার মাতলামি শুরু করবে, তখন আবার নতুন বোঝাপড়া হবে। এই বোঝাপড়ার চেষ্টা ইতিহাসে চিরদিন চলতে থাকবে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

যারা এতদিন মরে ছিল, তারা উঠুক বেঁচে, যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

কিন্তু এই নীচের দল যদি হয়ে ওঠে বলরামের চেলা, তখন আবার ছন্দপতন হবে। তাই কালের যাত্রায় কবি বলেছেন—

মরে মানুষ এই অসুন্দরের হাতে, চালচলন যার একপাশে বাঁকা, কুম্ভকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান, যার ভোজন কুৎসিত, যার ওজন অপরিমিত।

কালের যাত্রা নাটিকার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধন এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।

অচলায়তন নাটকে রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন যে, আচার ধর্ম নয়, বাহ্যিকতায় অন্তরের ক্ষুধা মেটে না, নিরর্থক অনুষ্ঠান মুক্তির পথ দেখায় না, তা বন্ধন। এই বন্ধন ভাঙবার জন্য মহাপুরুষের আগমন। তাই অচলায়তনে গুরু এসেছেন সমস্ত ভেঙেচুরে শূন্যতা বিস্তার করবার জন্য নয়— তিনি স্বভাবকে জাগাবেন, অভাবকে ঘোচাবেন, বিরুদ্ধকে মেলাবেন। অচলায়তনের গুরু বলছেন— যেখানে ভাঙা হবে, তা আবার প্রশস্ত করে গড়তে হবে। গুরুর আঘাত নষ্ট করবার জন্য নয়, বড় করবার জন্য। অচলায়তনে দাদাঠাকুর বলছেন—

কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।...আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে, যাক না— আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।...এবার আর লাল নয়, একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুই দলে, লাগো তোমাদের কাজে।

মন্ত্র যখন মননকে সাহায্য করে না, চিত্তকে রুদ্ধ করে, গতিকে আহত করে, আচারের কদর্যতাকে বড় স্থান দেয়, অন্তরকে উপবাসী করে রাখে, তখন সে মানুষের দুর্গতি সৃষ্টি করে। সংস্কারের জড়তা আচারের আবর্জনা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে আবদ্ধ করে রাখে। তাই অচলায়তনে শত্রুবেশে গুরু প্রবেশ করলেন সবাইকে প্রণত করবার জন্য, কারাগার ভেঙে ফেলবার জন্য, সম্মিলিতভাবে নতুন মন্দির গড়বার জন্য। এই যে মিলনের ডাক, অচলায়তনকে সচল করবার তাগিদ, নতুন করে গড়বার আহ্বান, তাই রবীন্দ্রনাথের মন্ত্র। এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে অচলায়তনের দাদাঠাকুর বলেছেন—

যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকে বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্তেই আমি নিজে এসেছি।

রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মিলনের মধ্যে আছে সত্য। এবং সেই সত্য হল প্রেম। প্রেম আংশিককে সমগ্র করে, বুদ্ধিকে সতেজ করে, হৃদয়কে পূর্ণ করে। জগৎ আমাদের নিকট যতক্ষণ প্রেমরূপে ব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ তা পূর্ণসত্যরূপে ব্যক্ত হল না। শক্তি আমাদের গতি দেয় বটে, কিন্তু প্রেমহীন শক্তি মানুষকে চঞ্চল বিক্ষিপ্ত করে। প্রেমের মধ্যে স্থিতি আছে সংহতি আছে, প্রেমহীন গতি মিলনকে সার্থক করতে পারে না। শক্তি আপনাকে ঘোষণা করে, প্রেম মানুষকে পরের কল্যাণে সচেতন করে। প্রেম চায় দিতে, সে কিছু না দিয়ে বাঁচতে পারে না। যে মানুষ পেতে চায়, দিতে চায় না, সে আত্মগত, বিশ্বগত নয়। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন যে, খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, একের মধ্যে সৌন্দর্য। যা আংশিক, খণ্ডিত, তার মধ্যে বিরোধ বৈষম্য। একের মধ্যেই মঙ্গল, সমন্বয়। তাই যা বহু যা বিচ্ছিন্ন, তাকে প্রেমের দ্বারা এক করতে হবে। এই যোগসাধন হল মানুষের প্রধান ব্রত। যে-মন্ত্র যে-তন্ত্র যে-যন্ত্র বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, বিরোধের মধ্যে মঙ্গল, বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন আনতে পারে না, তা অধর্ম। তাই সমাজের সামঞ্জস্যের চেষ্টা হতে ভ্রষ্ট হলে মানুষের পতন শুরু হয়।

উপনিষদের 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্' মন্ত্র আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

আমাদের সমস্ত জ্ঞানের দ্বারা যেন শান্তকে জানতে পারি, আমাদের সমস্ত কর্মের দ্বারা যেন শিবকে দেখতে পাই, আমাদের সমস্ত প্রেমের দ্বারা যেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করি।

মানুষের মধ্যে একটি ছোট-আমি আছে, সে স্বতন্ত্র, পৃথক। এবং তার মধ্যে একটি বড়-আমি আছে, সে দিতে চায়, মিলতে চায়। যখন এই ছোট-আমির সঙ্গে বড়-আমির বিরোধ ঘটে, তখন আসে সংঘাত প্রলয়। তাই, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, শক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বাড়িয়ে তোলে, মঙ্গল স্বাতন্ত্র্যকে সুন্দর করে, প্রেম স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেয়। মানুষ শুধু জীব নয়, মানুষ সামাজিক জীব। এই সামাজিক জীব বলেই মানুষের জানতে হবে বিশ্বকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

আসল কথা এই, যদি লক্ষ্য সজাগ থাকে, তবে নিয়মসংযমের বন্ধনই একমাত্র মুক্তির উপায়। ভারতবর্ষ একদিন নিয়মের দ্বারা সমাজকে খুব করিয়া বাঁধিয়াছিল। মানুষ সমাজের মধ্য দিয়া সমাজকে ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়া বাঁধিয়াছিল। ঘোড়াকে তাহার সওয়ার লাগাম দিয়া বাঁধে কেন, এবং নিজেই বা তাহার সঙ্গে রেকাবের দ্বারা বদ্ধ হয় কেন— ছুটিতে হইবে বলিয়া, দূরের লক্ষ্যস্থানে যাইতে হইবে বলিয়া। ভারতবর্ষ জানিত, সমাজ মানুষের শেষ লক্ষ্য নহে, মানুষের চির-অবলম্বন নহে, সমাজ হইয়াছে মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য।

সমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্র-দিগ্‌দর্শনের গোড়ার কথা হল যে, আমরা যেখানে থেমেছি, সেখানে আমাদের ধ্বংস আরম্ভ হয়েছে। সবার সঙ্গে সমগতিতে চলতে হবে। যারা থামবে, জগৎপ্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তাদের উপর এসে আঘাত করবে—

হয় অবিশ্রাম চলো এবং জীবনচর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও, পৃথিবীর এই নিয়ম।

এ কথা ঠিক যে, যে-সমাজে জীবনের প্রবাহ আছে, সেখানে ভালো মন্দ দুইই প্রবল। সচল সমাজের মন্দ দেখে যদি নির্জীবতা ও জড়ত্বকে প্রশংসার চোখে দেখি, তা হলে অগ্রগতির পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। যে ছুটোছুটি করে, তাকে নিয়ে বিষম ঝঞ্ঝাট। কিন্তু ঝঞ্ঝাট এড়াতে গিয়ে যদি আমরা নির্জীবতা অক্ষমতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করতে থাকি, তা হলে ক্ষতি আমাদেরই হবে। উন্নত সমাজের দায়িত্ব বেশি, তাতে কর্তব্যের জটিলতা বেশি, এমন-কি বিপদও বেশি। ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ যুগে জীবনের আবেগ বলবান ছিল। 'সে-সমাজে সকল পুরুষ সাধু, সকল স্ত্রী সতী, সকল ব্রাহ্মণ তপঃপরায়ণ ছিলেন না।' যে-মানুষ জীবিত সে ভুল করে, কিন্তু সে ভুলকে অতিক্রমও করে। ভুলের তালিকা দেখিয়ে যারা সমাজের জাগ্রত শক্তিকে নির্জীব করতে চায় তারা প্রসারণের পথকে সংকুচিত করে। মানুষকে লঙ্ঘন করে কর্মকে বড় করবার চেষ্টা ভারতবর্ষে ছিল না। তাই ভারতের সমাজের আদর্শ ছিল মানুষকে সজীব রাখা সামাজিক নিয়মাবলীর প্রেরণা ছিল মানুষের হীনতা ও দীনতা সংহত করবার জন্য, মানুষকে নির্জীব বা জড় পদার্থে পরিণত করবার জন্য নয়। আমাদের সমাজে পঙ্কিলতা দেখা দিয়েছে যখন এই চলার গতি বন্ধ হয়েছে, যখন ঐক্যসাধনের চেষ্টা ব্যাহত হয়েছে। ভারতবর্ষ কর্মের উত্তেজনার পথ গ্রহণ করে নি। মানুষ যেখানে আচ্ছন্ন হয়েছে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ভারতবর্ষ সেই পথ অস্বীকার করেছে। ধর্মের সঙ্গে কর্মকে, কর্মের সঙ্গে শান্তিকে জড়িত রাখতে হবে। পরের কাছে বল পাওয়া যায় না, নিজের বলে প্রবল ও বেগবান হতে হবে। আমাদের দীনতা এই বলের অভাবে, এই গতির অভাবে।

ভারতবর্ষীয় সাধনার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে দুটি তত্ত্বের উপর জোর দিয়েছেন। প্রথম, আমিত্ব ব'লে যে সুদুর্ভেদ্য আবরণ নিজেকে সকলের সঙ্গে অত্যন্ত বিভক্ত করে রেখেছে তাকে ছেদন করে বিশ্বের আত্মার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। ভারতের সাধনার লক্ষ্য যে, আমি আমার দ্বারা যেন কাউকে আচ্ছন্ন বিকৃত না করি, এবং আমার মধ্যে অন্যের এবং অন্যের মধ্যে আমার বাধা যেন দূর করতে পারি। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষ এই বিশ্বমিলনের সুরে সমাজকে বাঁধবার চেষ্টা করেছিল। সমাজকে বেঁধে মানুষের আত্মাকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করেছিল। ক্ষুদ্র-আমি যখন বৃহৎ-আমির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই আত্মার জয়, আত্মার মুক্তি। এই জয় ও মুক্তি লাভ করতে হবে সমাজকে পরিহার করে নয়, সমাজের সমস্ত বন্ধনকে স্বীকার করে।

মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আর-এক জন্ম সকলকে নিয়ে। সীমার দিক ও অনন্তের দিক, এই দুইকে মিলিয়ে চলতে হবে। সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি ধর্মনীতি, সবার কাজ এই দ্বন্দ্বে সামঞ্জস্য সাধন করা। সমগ্রের সঙ্গে যে যোগসাধন তা হল মঙ্গল। যখন মানুষ ভূমার দিকে চলে না, বহুর দিকে চলে না, তখন সে ক্ষুদ্র, আবদ্ধ ও কুৎসিত। মানুষ মুক্তি চায় ক্ষুদ্র-আমির বন্ধন থেকে, পূর্ণতা চায় পরম-আমির অধীনতা স্বীকার করে। তাই সমাজে রাষ্ট্রে ধর্মে অখণ্ড

অদ্বৈতের সাধনা করতে হবে। যা সকলের ভালো তা আমার ভালো, এই মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ মেনেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> যখনই প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে, যখনই বর্ণের কুলের ধনের ক্ষমতার ভাগ-বিভাগ ভেদ-বিভেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য করে তুলেছে, তখনই সমাজে ঝড় উঠেছে।

প্রভুত্ববৃত্তি হল সংঘাতের বা লড়াইয়ের মূল। প্রভুত্ব মানুষের সহজ চলাচলের মধ্যে একটা বাধা। সমাজে বা রাষ্ট্রে এক শ্রেণী যখন আর-এক শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তখন দ্বন্দ্ব আসে সংঘাত ঘটে। যারা প্রবল তারা দুর্বলকে নিশ্চল করতে চায়, দুর্বলের প্রাণশক্তিকে হরণ করতে চায়। প্রাণশক্তি মানুষকে সক্রিয় রাখে, নানা সৃষ্টির পথে এগিয়ে দেয়। প্রভু চায় নিজের জন্য গ্রহণ করতে এবং দাসকে করতে চায় নিজের সম্পত্তি। এই সম্পত্তিবোধ চিত্তের সম্পদ বিনষ্ট করে। প্রভুত্বের একটা নিজস্ব অধিকার আছে, তা হল মনুষ্যত্বের অধিকার। যে পরকে দাস করতে চায় তার প্রভুত্ব পীড়াদায়ক। যে পরকে বিস্তারের পথে এগিয়ে দিতে চায় তার প্রভুত্ব মঙ্গলদায়ক।

রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আত্মকর্তৃত্ব চেয়েছিলেন, কারণ ভারতবাসীর বড় হতে হবে। মনুষ্যত্বের বৃহৎ ভূমিকায় তার কাজ করতে হবে। মানুষকে চলতে হবে, তাই তার আত্মকর্তৃত্বের প্রয়োজন। কিন্তু আত্মকর্তৃত্ব সার্থক হয় না যদি আত্মশক্তির উপর মানুষ বিশ্বাস হারায়। ভারতবর্ষের ঋষিরা বলেছিলেন যে অবিদ্যা অসত্য আমাদের বন্ধন। অসত্য হল নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করে জানা। সকলের সঙ্গে যোগসাধন করতে হলে নিজের শক্তির মূলধন নিয়ে কারবার করতে হবে। মানুষ যখন নিজের শক্তি হারায়, তখন সে দৈবের কাছে পরের কাছে গ্রহের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করে। তখন আত্মকর্তৃত্ব নূতন বন্ধন সৃষ্টি করে।

তাই রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে মেনেছেন ধর্মতন্ত্রকে মানেন নি। ধর্ম বলে মানুষকে শ্রদ্ধা করতে, ধর্মতন্ত্র বলে আচার-অনুষ্ঠানকে বড় করে দেখতে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।' ধর্ম মনকে সচল করে, ধর্মতন্ত্র মনকে পঙ্গু করে। রবীন্দ্রনাথের মতে, যাঁরা সত্যিকারের প্রভু, সত্যিকারের সবল, তাঁরা

> সকলের দুঃখকে আপনি বহেন, সকলের পথকে আপনি কাটেন, সমস্ত বিরুদ্ধতার মধ্যেও মনুষ্যত্বকে বিশ্বাস করেন।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি মূলতত্ত্ব আছে। প্রথম কথা, আত্মকর্তৃত্বের প্রয়োজন আছে, কারণ আমাদের দেশের নির্বাপিত দীপকে জ্বালাতে হবে। দ্বিতীয় কথা, দেশ বড় হয় নিজের সম্পদকে দান করে। পরাধীন জাতির পক্ষে দানের চেষ্টা প্রহসন মাত্র। তৃতীয় কথা, রাষ্ট্রক্ষেত্রে যাঁরা ব্যাহত ও পরাজিত, তাঁরা অন্য ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন না।

যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, ইংরেজ শাসনের অবসান হলে ভারতের সর্বপ্রকার দুঃখের অবসান ঘটবে, রবীন্দ্রনাথ সেই দলের মুখপাত্র ছিলেন না। তিনি জানেন যে মানুষের ধর্ম হল নিজেকে

নানা দিকে বিস্তার করা। আত্মকর্তৃত্ব ভারতবাসী দাবি করেছিল ঔদ্ধত্য বা প্রভুত্ব প্রকাশ করবার জন্য নয়, দেশকে সর্বপ্রকারে সেবা করবার সুযোগ পাবার জন্য। ভারতবাসীকে মিলতে হবে সবার সঙ্গে। নিজের শক্তি অর্জন করতে না পারলে ভারত সবার সঙ্গে মিলতে পারবে না। ১৩২৪ সালে 'ছোট ও বড়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

কিন্তু এমন যদি হয় যে, একদিন ভারত-ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-পরিবর্তনকালে প্রস্থানের বেলায় ইংরেজ তার সুশাসনের ভগ্নাবশেষের উপর রাখিয়া গেল আত্মনির্ভরে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম, আত্মকল্যাণসাধনে অসিদ্ধ, আত্মশক্তিতে নষ্টবিশ্বাস নরনারীকে— রাখিয়া গেল এমন ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিবেশী নব উদ্যমে জাগ্রত, নবশিক্ষায় অপরিমিত শক্তিশালী, তবে আমাদের সেই চিরদৈন্যপীড়িত অন্তহীন দুর্ভাগ্যের জন্য কাহাকে আমরা দায়ী করিব?

ইতিহাসের চক্রে তাই ঘটল। ইংরেজ চলে গেল, কিন্তু আমরা আত্মরক্ষায় অক্ষম, আত্ম-কল্যাণসাধনে অসিদ্ধ এবং আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথ ভাবী যুগের কল্পনা করে বলেছেন—

সেদিন যে মারিতে পারিবে, তার জিত হইবে না, যে মরিতে পারিবে তারই জয় হইবে। সেদিন দুঃখ দেয় যে-মানুষ তার পরাজয় হইবে, দুঃখ পায় যে-মানুষ তারই শেষ গৌরব। সেদিন মাংসপেশীর সহিত আত্মার শক্তির সংগ্রাম হইয়া মানুষ জানাইয়া দিবে যে, সে পশু নয়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম সে অতিক্রম করিয়াছে।

তাই রবীন্দ্রনাথ উদাত্তকণ্ঠে বলতে পেরেছেন—

আমাদিগকে নিজের শক্তিতেই পরের শক্তির সঙ্গে সন্ধি করিতে হইবে। সেই শক্তি ধার-করা শক্তি, ভিক্ষা-করা শক্তি না হউক। তাহা সত্যের জন্য ন্যায়ের জন্য দুঃখ সহিবার অপরিসীম শক্তি হউক।

দুর্বল ভয় করে যে, সে ব্যথা পাবে; সবল ভয় করে যে, সে বাধা পাবে। দুর্বলকে শক্তি দিতে হবে, সবলের চিত্তে প্রীতিবোধ জাগাতে হবে। তবে মিলনসাধন সম্ভব হবে। মানুষ প্রকাণ্ডতা লাভ করে যখন সে নিজের দিকে সমস্তকে টানতে চায়। কিন্তু নিজেকে সমস্তর দিকে উৎসর্গ করে সামঞ্জস্য লাভ করতে হয়। আজ আমাদের আঙিনা থেকে দুর্বলের কান্না চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, কারণ 'দুর্বল আজ অত্যন্ত দুর্বল।' বিদেশী শাসন শেষ হলেই প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয় না। তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনে। তাই, স্বরাজসাধনা কোনো দেশেই শেষ হয় না— চিত্তের বন্ধনদশা শেষ করবার প্রয়াস চলবে ইতিহাসের সর্বযুগে। যে বুদ্ধি সকলকে সংযুক্ত করে, সেই হচ্ছে শুভবুদ্ধি। আমাদের জাতীয় চেষ্টার মধ্যে এই শুভবুদ্ধিকে সজাগ রাখতে হবে।

মানুষের এক দিকে তার বিশেষত্ব, আর-এক দিকে তার বিশ্বত্ব। এই দুয়ের সামঞ্জস্যচেষ্টা হল ইতিহাসের প্রগতি। তাই, আত্মরক্ষণশক্তির ও আত্মপ্রসারণশক্তির মিলন ঘটাতে হবে। যেখানে তাল কেটে গেছে, সেখানেই এসেছে বিরোধ, উঠেছে ঝড়, চলেছে প্রলয়ের তাণ্ডবলীলা। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজচিন্তার মূলতত্ত্ব বুঝতে হলে তাঁর ইতিহাসের ব্যাখ্যানতত্ত্ব জানতে

হবে। ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা আলোচনা করে তিনি কয়েকটি সূত্র নির্ণয় করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য—

১ যাহাকে মারি সে যখন ফিরিয়া মারে তখন মানুষের মঙ্গল, যাহাকে মারি সে যখন নীরবে সে-মার মাথা পাতিয়া লয় তখন বড়ো দুর্গতি।

২ যেখানেই কোনো এক পক্ষ সম্পূর্ণ একেশ্বর হয়, যেখানেই তাহার সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ কেহই থাকে না, সেখানেই কেবল বন্ধনের পর বন্ধনের দিন আসে; সেখানেই একেশ্বর প্রভু নিজের প্রতাপকে সকল দিক হইতেই সম্পূর্ণ বাধাহীনরূপে নিরাপদ করিতে গিয়া নিজের প্রতাপই নত করিয়া ফেলে।

৩ মানুষ যেখানেই মানুষকে ঘৃণা করিবার অপ্রতিহত অধিকার পায়, সেখানে যে মাদক বিষ তাহার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে তেমন নিদারুণ বিষ মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।

৪ স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে, এবং সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়। এই কথা নিশ্চিতরূপেই বুঝিব যে, আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।

রাষ্ট্রগৌরবের মূলে আছে বিরোধভাব। সমাজ স্থাপন করতে চায় বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য, রাষ্ট্র চায় বিচ্ছেদ ও বিরোধকে জাগ্রত রাখতে। 'বিরোধ যাহার বীজ বিরোধই তাহার শস্য।' ভারতীয় সভ্যতা যে মিলনমূলক, বিরোধমূলক নয়, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

ঐক্যস্থাপন করবার বিভিন্ন উপায় আছে। যারা পৃথককে শক্তির জোরে এক করতে চায়, তাদের দৃষ্টি রাষ্ট্রের দিকে। আর যারা পরকে আপন করে নিতে চায়, তাদের দৃষ্টি সমাজের দিকে। ভারতবর্ষ পরকে দূর করে, উৎসাদন করে দেশকে নিরাপদ করতে চায় নি। সকলের স্বতন্ত্র স্থান ও অধিকার ভারতবর্ষ মেনে নিয়েছে। পরকে আপন করতে বিশেষ প্রতিভার প্রয়োজন। ভারতীয় সভ্যতায় সেই প্রতিভা ছিল—

ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই, ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে, ভারতীয় সভ্যতায় যে-সুর ঝংকৃত হয়েছে তা হল এই যে মানুষ বড়, কর্ম-বিশেষ বড় নয়। যে-কর্ম মনুষ্যত্বকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, ভারতবর্ষ তাকে বড় স্থান দিয়েছে। সমাজ চেষ্টা করেছে সকলের সুনির্দিষ্ট অধিকারের মর্যাদা দিতে। তাই ছোট সুযোগ পেলে বড়কে আঘাত করে নি, বড় ছোটকে খেদিয়ে দেবার চেষ্টা করে নি। য়ুরোপ যাকে ফ্রীডম বলে, তা রবীন্দ্রনাথের

মতে দানবীয় ফ্রীডম। যে-মুক্তি অন্যকে আঘাত করে, মনুষ্যত্বকে অশ্রদ্ধা করে, তা ভারতবর্ষের চরম লক্ষ্য নয়। যে-ফ্রীডম স্পর্ধিত, পরের প্রতি অন্ধ, নিজের ক্ষমতায় মত্ত, তা কোনোকালে ভারতবর্ষের তপস্যার ধন ছিল না। য়ুরোপ প্রাধান্য দেয় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে, ভারতবর্ষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে মানুষের প্রকাশ ও বিকাশকে। তাই, ভারতবর্ষ নেশন-গঠনের চেষ্টা করে নি। রবীন্দ্রনাথ মানেন নি যে, নেশনই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। আমাদের ব্যক্তিগত কর্তব্যের সঙ্গে সমস্ত জগতের প্রতি কর্তব্য জড়িত রয়েছে। আর যাঁরা নেশন-গঠনে ব্যস্ত, তাঁরা সমস্ত প্রাধান্য অর্পণ করেন নিজের দেশের স্বাধীনতার উপর। ভারতবাসীর কর্তব্য ন্যাশনালিস্টের কর্তব্য নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপের সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।

মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য সমাজ। যে-সমাজ মানুষকে খাটো করে, সে ধর্ম ও কর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না—

সমস্ত উন্নত সমাজই সমাজস্থ লোকের নিকট প্রাণের দাবি করিয়া থাকে, আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া আরামে জড়ত্ব-সুখভোগে যে-সমাজ আপনার অধিকাংশ লোককে প্রশ্রয় দিয়া থাকে, সে-সমাজ মরে, এবং না-ও যদি মরে, তবে তাহার মরাই ভালো।

রবীন্দ্র-শিক্ষানীতির মূল কথা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সর্বদেশে সর্বকালে কবিরাই দেশের এবং জাতির সর্বোত্তম শিক্ষক। রামায়ণ মহাভারতের কবি আমাদের আদিগুরু, ইলিয়াড অডিসির রচয়িতা ইউরোপের। মহাকাব্য মাত্রই বিশেষ কোনো সভ্যতার এবং বিশেষ কোনো যুগের সর্বাঙ্গীণ আলেখ্য। সামগ্রিক জীবনের চিত্র হিসাবে প্রত্যেকটি মহাকাব্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; কারণ জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের নামই শিক্ষা। সংসারধর্ম পালন করতে গেলে সাধারণভাবে যে জ্ঞানের প্রয়োজন হত সেকালের লোকেরা তার সমস্তই এই-জাতীয় মহাকাব্য থেকে আহরণ করেছে। সাধারণ লোকাচার থেকে শুরু করে সামাজিক রীতিনীতি রাষ্ট্রনীতি ধর্মনীতি, মানুষের সুখদুঃখ স্নেহপ্রেম ভয়ভাবনা— মানুষের সকল রকম বৃত্তি এবং প্রবৃত্তি নিয়ে মহাকাব্যের বিস্তৃত আসর। এই-জাতীয় মহাকাব্যকে একটি মহাবিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় বললে কিছুই অন্যায় হয় না। সত্যি বলতে কি, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতেও ব্যাপকতর এর শিক্ষা, কারণ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই সমগ্র জীবনের সঙ্গে বিদ্যার্থীর পরিচয় সাধন করে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকে জীবিকার জন্য যদিবা প্রস্তুত করে জীবনের জন্য করে না।

রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য রচনা করেন নি। কিন্তু সর্বকালের মহাকবিদের ন্যায় তাঁরও প্রতিভা দশভুজা। মানবজীবনের এমন সর্বাঙ্গীণ চিত্র এ যুগের আর কোনো কাব্যে বিরল। এবং সেই কারণেই তিনি বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আগেই বলেছি কবিমাত্রেই কাব্যের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শিক্ষাদানের কার্য করে থাকেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর একমাত্র কবি যিনি শুধু কাব্যের মারফতে পরোক্ষভাবে শিক্ষাদান করেই ক্ষান্ত হন নি, নিজে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাকার্যের ভার নিয়েছিলেন।

কোনো কবি যখন নিজহাতে শিক্ষাদানের কার্য গ্রহণ করেন তখন তার মধ্যে খানিক পরিমাণে কাব্যগুণ প্রবেশ করতে বাধ্য। কাব্যের প্রধানতম গুণ আনন্দদান। আমি গোড়াতেই কবিকে জনগণের শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছি। কিন্তু শুধু শিক্ষক বললে সবটুকু বলা হয় না। তাঁরা লোকরঞ্জন শিক্ষক, মনোরঞ্জন তাঁদের স্বভাবধর্ম। কবি জানেন, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কল্যাণকর তারই জন্ম আনন্দ থেকে। কাজেই রবীন্দ্রনাথ যখন নিজস্ব শিক্ষাধারার প্রবর্তন করলেন তখন তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার্থীর আনন্দবিধান। বিদ্যারম্ভে বালকবয়সের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা তাঁর মনে ছিল। ইস্কুলে যাওয়ার নাম দিয়েছিলেন দ্বীপান্তর বাস, নিজেকে বলেছেন ইস্কুলপালানো ছেলে। সেই ইস্কুলপালানো ছেলে বড় হয়ে নিজেই এক ইস্কুল করলেন।

উদ্দেশ্যটা খুবই স্পষ্ট; নিশ্চয় ভেবেছিলেন এমন ইস্কুল করে দেব যেখানে ছেলেরা ঘর থেকে পালিয়ে ইস্কুলে আসবে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সব চাইতে বড় পরিচয়— এটি ইস্কুলপালানো ছেলের নিজের হাতে গড়া ইস্কুল।

ইস্কুলপালানো ছেলে যখন ইস্কুল স্থাপন করেন তখন শুধু তার প্রকৃতি নয় আকৃতিও বদলে যায়। তাই হল। ইস্কুল বসল খোলা মাঠে, গাছের তলায়। গাছের তলায় ক্লাস, কাজেই ক্লাসের চেহারা বদলাল, সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাব। যেখানে গাছের ডালে পাখি গান করছে, ঝোপে ঝাড়ে ফুল ফুটে আছে সেখানে গুরুমশায়ের কর্কশ কণ্ঠও আপনিই একটু মোলায়েম হয়ে আসে। গতানুগতিক পাঠাভ্যাসের মধ্যেও একটু সুর একটু রঙের ছোপ না লেগে যায় না।

বিদ্যালয়ের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি অনুকূল পরিবেশ। গাছ যেমন মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া আর রৌদ্র থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে, শিশু তেমনি আপন অজ্ঞাতসারে চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশ থেকে জীবনরস সংগ্রহ করে। বিদ্যালয়ের গৃহ, পাঠ্যপুস্তক, নিত্যকার পাঠাভ্যাস নিয়মকানুন বিধিনিষেধ— এসবের চাইতে ঐ পরিবেশ অনেক বেশি মূল্যবান এ কথা রবীন্দ্রনাথ গোড়াতেই বলে নিয়েছিলেন।

ছাত্র শিক্ষক দুইয়ে মিলে প্রতিদিন যে জীবনযাপন করবেন তাই থেকেই সে পরিবেশের সৃষ্টি হবে। তাই হয়েছে। ছেলেরা যেখানটায় সারাদিন আনাগোনা করেছে তারই একপাশে দেখেছে ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর জ্ঞানসাধনায় মগ্ন। কবি স্বয়ং সাহিত্যসাধনায় লিপ্ত। তথাপি বিদ্যালয়প্রাঙ্গণের অঙ্গসজ্জা এবং ছাত্রদের আনন্দবিধানে তাঁর নিরলস অধ্যবসায়। অধ্যাপকরাও সকলেই দৈনন্দিন অধ্যাপনা ছাড়া আপন আপন অভিরুচি অনুযায়ী কোনো বিশেষ বিদ্যা কিংবা শিল্প-চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। দিনের অধিকাংশ সময় কোথাও-না-কোথাও সংগীতচর্চা চলছে, তার সুর ভেসে আসছে। কোথাও নাটকের মহড়া হচ্ছে, অভিনয়কুশলী ছাত্রদের সেখানে ডাক পড়েছে। ছাত্রদের নতুন আবাসগৃহ তৈরি হয়েছে, শিল্পী-অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে তার দেয়ালগাত্রে ছবি আঁকা হচ্ছে। চোখে দেখে ভালো লাগে, কানে শুনে ভালো লাগে এমন অনেক জিনিস চতুর্দিকে থাকলে তবে সৌন্দর্যবোধ জন্মাবে, রুচি পরিমার্জিত হবে।

আমাদের দেশে বলেছে অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। কবি তাঁর বালখিল্যদের তপঃক্লিষ্ট মূর্তি দেখতে চান নি। তিনি তাদের আনন্দোজ্জ্বল মুখই দেখতে চেয়েছেন। নীরস পাঠাভ্যাসকে সরস করবার জন্যে বহুবিধ আনন্দের আয়োজন করেছিলেন। নিত্যকার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা গান শিখেছে, ছবি এঁকেছে, নাটক করেছে। ক্লাসের খাঁচা থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি তাদের খোলা মাঠে ছুটির নিমন্ত্রণে আহ্বান করেছেন। পাঠ্য বইয়েরও নাম দিয়েছেন 'ছুটির পড়া'। পড়া আর কাজ আর খেলা, এই তিনের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। নিত্যদিনের বিদ্যাভ্যাস বৈচিত্র্যের অভাবে নীরস হতে বাধ্য এ কথা তাঁর জানা ছিল। পড়াকে হৃদয়গ্রাহী করবার জন্যে নতুন নতুন খেলা উদ্ভাবন করে খেলার মাধ্যমে নতুন কথা শিখিয়েছেন।

কাব্যসাহিত্য রচনায় যে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন বিদ্যালয়-পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ সেই কল্পনাশক্তির ব্যবহার করেছেন। কাব্যরচনা যেমন সৃষ্টিমূলক কাজ তাঁর শিক্ষারীতির প্রবর্তনে সেই সৃজনীপ্রতিভাই কাজ করেছে। বিদ্যালয়ের কাজ তাঁর সাহিত্যকর্মের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, একটি আর-একটির সহায়তা করেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যেমন শান্তিনিকেতনকে গড়ে তুলেছেন শান্তিনিকেতন তেমনি অংশতঃ রবীন্দ্রনাথকে গড়েছে। ছাত্রদের সকল রকম ক্ষ্যাপামির প্রশ্রয় তাঁর কাছে। তিনিই নাটের গুরু, ছেলেক্ষ্যাপানো সর্দার, দলের ঠাকুর্দা; ছেলেমেয়েদের জন্য গান বেঁধেছেন, কবিতা লিখেছেন, নাটক রচনা করেছেন; এই ছেলের দল চতুর্দিকে না থাকলে 'শারদোৎসব' 'ফাল্গুনী' কখনো লেখা হত না, অসংখ্য গানে প্রাণের আনন্দ এমন ভাবে উচ্ছ্বসিত হত না, এরা তাঁর সাহিত্যে অনেকখানি বৈচিত্র্য এনেছে। এই দিক থেকে ছাত্র শিক্ষক সকলেই এক বিরাট সৃষ্টিমূলক কাজের অংশীদার। শিক্ষাকে তিনি সৃষ্টিধর্মী কাজে পরিণত করেছিলেন বলেই সেই কাজে এতখানি আনন্দের সঞ্চার করতে পেরেছিলেন।

নিজের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের কৌতূহলকে উদ্দীপিত করেছেন। পশুপাখি পোকামাকড় গাছপালা ফুলফল সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছেন। ঋতুবৈচিত্র্য কখনো তাদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। চোখে আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দিয়েছেন— তুমি কে গো, আমি বকুল; তুমি কে গো, আমি পারুল; তোমরা কে বা— আমরা আমের মুকুল গো। শরৎ-আকাশে সোনার আলো যেদিন প্রথম ফুটেছে সেদিন প্রত্যুষে ছেলেমেয়েরা বৈতালিক করেছে— আমার নয়নভুলানো এলে; বসন্তসমাগমে ধরণী যেদিন রোমাঞ্চিতকলেবর সেদিন ছাত্ররা সমস্বরে গেয়েছে — আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। বর্ষার দিনে তো কথাই ছিল না, মিলিত কণ্ঠের গান বর্ষার ঝমঝমানিকে হার মানাত।

কেবল প্রকৃতিপাঠের শিক্ষাই দেন নি, চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীর জীবনযাত্রার সঙ্গেও ছাত্রদের পরিচিত করেছেন। বিদ্যাচর্চাকে রবীন্দ্রনাথ জীবনচর্চার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। গোড়াতেই বলে নিয়েছিলেন, 'শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে একতালে একসুরে, সেটা ক্লাস নামধারী খাঁচার জিনিস হবে না।' আগেই বলেছি, বসেছেন গাছের তলায়, পথের ধারে। বিদ্যাকে পুথির গণ্ডি থেকে বের করে পথের ধারে নিয়ে এলেন। অর্থাৎ যে বিদ্যাচর্চা এতদিন ছিল পুথির পাঁচালী এখন তার নাম হল পথের পাঁচালী। যেখানে পায়ে চলার পথ সেখানেই জীবনের স্রোত। নিত্যবহমান স্রোত থেকে যে বিদ্যা আহরণ করা হয় সে বিদ্যাই জীবন্ত বিদ্যা। হাটের দিনে গাঁয়ের লোক গোরুর গাড়ি কিংবা ঝাঁকা মাথায় শহরের হাটে জিনিস বিক্রি করতে চলেছে। ছেলেরা রাস্তার ধারে বসে তার ফর্দ করেছে। এ অঞ্চলে কোন্ ঋতুতে কি জিনিস জন্মায় তার স্পষ্ট একটা ধারণা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া কিংবা ক্যানাডায় কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হয় তার চাইতে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভূগোলপাঠকে অনেক বেশি জীবন্ত

করে তুলেছে। অন্যান্য বিদ্যালয়ে ইতিহাসের ছাত্র যখন রাজারাজড়ার কাহিনী কণ্ঠস্থ করেছে তখন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকরা ছাত্রদের নিয়ে গিয়েছেন পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে। ছেলেরা স্বচক্ষে দেখেছে গ্রামবাসীদের অতিজীর্ণ বাসগৃহ, তাদের নিরতিশয় দরিদ্র জীবনযাত্রা। দেশের সঙ্গে সত্যকার পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ছেলেটাকে আমরা ভূগোলের পাঠ মুখস্থ করাই কিন্তু তার নিজের জগৎ থেকে তাকে নির্বাসিত করি, তার নিজের চতুষ্পার্শ্বকেই সে চেনে না। তাকে ব্যাকরণ শেখাই, কিন্তু তার মুখের ভাষা কেড়ে নিই। মাস্টার বক্তা, ছাত্রটি নীরব শ্রোতা, গুছিয়ে কথা বলতে শেখে না। এই জন্যে শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের সাহিত্যসভার ব্যবস্থা। ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ খুশিমত নিজের মনের কথা সাজিয়ে গুজিয়ে সকলের সামনে হাজির করে। সেদিন ছাত্ররা বক্তা, মাস্টারমশাইরা শ্রোতা। নিজেকে প্রকাশ করার আনন্দ যে শিশুমনকে কতখানি আন্দোলিত করে শান্তিনিকেতনের এই সব সাহিত্যসভা দেখলে তবে বিশ্বাস হবে। ছেলে-মেয়েদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী এই আনন্দময় আত্মপ্রকাশের আর-একটি নিদর্শন।

অন্যান্য বিদ্যালয়ে যে পাঠ্যক্রম এখানেও তার ব্যতিক্রম ছিল না, কিন্তু তারই মধ্যে পরীক্ষা পাসের যৎসামান্য প্রয়োজন ছাপিয়ে অনেকখানি উদ্বৃত্তের অবকাশ রচনা করা হয়েছিল। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারায় এখানেই মূল পার্থক্য। পরীক্ষাসর্বস্ব শিক্ষায় উদ্বৃত্তের কোনো স্থান নেই। কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে একটি চাকুরে মনুষ্য তৈরি করে দেওয়াই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। যে মানুষটা তৈরি হয় সে ভাবে-ভাবনায় যেমন আটপৌরে, কাজে তেমনি নড়বড়ে। জীবিকার সংস্থান যদিবা হয় জীবনের শূন্য কিছুতেই ভরাট হয় না। তার শিক্ষার মধ্যে এতটুকু উদ্বৃত্ত নেই যা দ্বারা মনের সেই শূন্যতা বা দারিদ্র্যকে সে ঢেকে রাখতে পারে। মানুষকে জীবিকার জন্যে তৈরি করা আর জীবনের জন্যে গড়ে তোলায় অনেক তফাত। অবশ্য জীবিকার কথাও ভাবতে হবে। রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই সে কথা বলেছেন। আমাদের শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ তার কারণ আমরা একটা গোটা মানুষের সামান্যতম অংশ অর্থাৎ কেবল তার স্মৃতিশক্তি, খানিকটা বা বুদ্ধিবৃত্তির খবরদারি করি। যেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তার মনের পরিচর্যা, করি না। তাছাড়া দেহটা থেকে যায় অপটু, কোনোরকম হাতের কাজে দক্ষতা জন্মায় না। রবীন্দ্রনাথ এদের বলেছেন বোকা হাতের মানুষ। খাদ্য বস্ত্র নিত্য-ব্যবহারের প্রত্যেকটি বস্তু সে সমাজের কাছ থেকে হাত পেতে গ্রহণ করে ; ক্ষুদ্রতম বস্তুটিও নিজ-হাতে প্রস্তুত করে সমাজের হাতে তুলে দেয় না। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র ভক্ষক, যে কোনো জিনিসের উৎপাদক নয়, সামাজিক প্রাণী হিসাবে তাকে শিক্ষিত বলা চলে না। আমাদের আধুনিক কবি বলেছেন— আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের, মুটে মজুরের— রবীন্দ্রনাথ ও কথা কবিতায় বলেন নি, কিন্তু একজন শিক্ষিত ব্যক্তি যাতে মুচি বা ছুতোরের কাজে খানিকটা দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেদিকে তাঁর কড়া নজর ছিল। তাঁর বিদ্যালয়ে তিনি কাঠের

কাজ চামড়ার কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ছেলেরা সবজির বাগান করেছে; শুধু নিজেদের রান্নাঘরে নয় পাড়াপ্রতিবেশীর রান্নাঘরেও তাই থেকে জোগান দেওয়া হত কারণ ধারে কাছে হাটবাজার ছিল না।

আগেই বলেছি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার অপর নাম পরীক্ষাপাস। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেটাও ন্যূনতম প্রয়োজনে; কেবলমাত্র পরীক্ষাপাসের জন্যে। বাঁধা গত মুখস্থ করা আর কিছু মামুলি তথ্য সংগ্রহ করার নাম হয়েছে শিক্ষা। সেই তথ্যের বেশির ভাগই জীবনের কোনো কাজে লাগে না। রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলেছেন শিক্ষা শুধু মনকে জাগিয়ে দেবে, কৌতূহলকে উদ্দীপিত করবে। আপন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করবে, পারিপার্শ্বিককে ছাপিয়ে সহানুভূতির সম্পর্ক বৃহত্তর সমাজে প্রসারিত হবে। মনের স্থূলতা দূর করে রুচিকে মার্জিত করবে, শিক্ষিত মনের স্পর্শে চতুর্দিক প্রসন্ন হবে। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে — বিদ্যা বৃংহণানাম্— বৃংহণের মধ্যে অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে বিদ্যা শ্রেষ্ঠ। পরীক্ষাপাসের বিদ্যায় সেই পুষ্টি কোথায়? আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে এমন ভিটামিন পদার্থ নেই যা মনকে পুষ্ট এবং প্রাণবন্ত করতে পারে। জীবিকার্জনের জন্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। খুব ভালো কথা। বৃত্তিতে আমার আপত্তি নেই যদি তাতে উদ্বৃত্তের একটু অবকাশ থাকে। কেবলমাত্র খাওয়াপরার চিন্তা নিয়ে যে জীবন তাতে জীবধর্ম যদিবা বজায় থাকে মনুষ্যধর্ম বজায় থাকে না। জীবিকার সঙ্গে জীবনকে মেলাতে পারলে তবেই শিক্ষা সার্থক হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই মিলন সাধনেরই চেষ্টা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে বিদ্যাচর্চার আর-এক নাম জীবনচর্চা। তাঁর বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে একটি জীবন তিনি গড়ে তুলেছিলেন। বিদ্যালয়ের কাজ আর জীবন গড়ার কাজ একই সঙ্গে অগ্রসর হয়েছে এবং সেই কাজে ছাত্র শিক্ষক সকলে তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। গোড়ার দিকের সেই ইতিহাসটুকু বলে নিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। রুক্ষ প্রান্তরের মধ্যে ইস্কুল। এক দিকে খোয়াই, ক্ষয়ে-যাওয়া মাটি, তাতে তৃণটুকু জন্মায় না। মাটির প্রাণশক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে। আর-এক দিকে মানুষের ক্ষয়ে-যাওয়া মন, মনের জীবনীশক্তি লুপ্ত। মাটির পরিচর্যা আর মানুষের মনের পরিচর্যা দুইই একসঙ্গে শুরু করলেন। জানতেন মাটির বন্ধ্যাত্ব ঘুচলে তবে মনের বন্ধ্যাত্ব ঘুচবে। খোয়াইএর বিস্তার বন্ধ হল। মাটির গায়ে যেমন সবুজের ছোঁয়াচ লাগল তেমনি ছাত্র মাস্টার সকলের মনে। একটি স্থান এবং তার আনুষঙ্গিক জীবনকে গড়ে তোলার কাজে তিনি ছাত্র শিক্ষক সকলের সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন। কোনো কিছুকে গড়ে তোলার মধ্যে যে রোমাঞ্চ আছে রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই শিক্ষার মধ্যে সেই রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছেন। সেদিনকার শান্তিনিকেতনে প্রকৃতিদেবীর দাক্ষিণ্য বড় সুপ্রচুর ছিল না। আহার্যদ্রব্য, পানীয় জল এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক কিছুই দুষ্প্রাপ্য ছিল। প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে রবিন্‌সন্ ক্রুশোর মত জোড়াতালি দিয়ে অনেক ব্যাপারে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আপন বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে বাধা উত্তরণের

রোমাঞ্চ ছেলেমেয়েরা প্রতিনিয়ত অনুভব করেছে। এখানকার দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার ভার অনেকখানি ছাত্রদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। নিজেদের আবাসগৃহ, বিদ্যালয়প্রাঙ্গণ এবং চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কার রাখা এবং স্বাস্থ্যবিধিমূলক ব্যবস্থার ভার তাদের উপরেই থাকত। রান্নাঘরের তদারক তারাই করেছে, অতিথিপরিচর্যা তাদের অন্যতম দৈনিক কর্তব্য ছিল। নিজেদের খেলাধুলার ব্যবস্থা তো করেছেই; এমন কি ছাত্রদের মধ্যে কেউ অন্যায় আচরণ করলে নিজেদের পরিচালিত বিচারসভায় তার বিচার হয়েছে। শাস্তি দিতে হলে তারাই দিয়েছে। এ ছাড়া নিজেদের প্রতিষ্ঠিত সেবাবিভাগের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে নিয়মিত সেবাকার্য করেছে। এই যে ব্যবস্থা, শিক্ষার দিক থেকে এর মূল্য অপরিসীম। যে প্রতিষ্ঠান এবং যে জীবনকে তারা গড়ে তুলেছে তার প্রতি তাদের মমতা বেড়েছে। এই মমতাবোধ ক্রমে প্রসারিত হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে— এক কথায় জীবনকে ভালোবাসতে শিখেছে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে সার্ মাইকেল স্যাডলার তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টে শান্তিনিকেতন-জীবনের এই শিক্ষণীয় দিকটির প্রতি সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আজকের দিনে এই কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন আজকের যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও একটা নির্মমতা আছে। কোনো কিছু নিজহাতে গড়ে তোলে নি বলে অপরের গড়া জিনিস তারা অনায়াসে ভেঙে দিতে চায়। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র শক্ত হলে ইস্কুল-কলেজে দক্ষযজ্ঞের পালা হয়, রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের নামে ট্রাম-বাস পুড়িয়ে দেয়। দেশের এবং দশের সম্পত্তির প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া নেই। এই চিত্তবিকারের জন্যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং খানিকটা আমাদের সমাজব্যবস্থা দায়ী। আমাদের শিক্ষাবিদ্‌রা বলেন, ছাত্রদের ভালোবাসতে হবে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম শেখালেন যে শুধু ভালোবাসলেই হবে না, তাকে শ্রদ্ধাও করতে হবে। ছেলেদের আমরা নিতান্ত ছেলে-মানুষ বলেই মনে করি। কোনো কাজে তাদের ডাকি না, তাদের সহযোগিতা দাবি করি না। জন্মে' অবধি এরা অতিথি, এরা আগন্তুক। এরা কোনো কিছুর শরিক নয়। কোনো ব্যাপারে মালিকানা তো দূরের কথা শরিকানা স্বত্বও অনুভব করে না। ফলে জীবনকে এরা ভালোবাসতে শেখে না। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ থেকে আমাদের যা শিক্ষণীয় এইটি তার মধ্যে সর্বপ্রধান। এখানে বলে রাখা ভালো যে রবীন্দ্রসাহিত্য এবং রবীন্দ্রশিক্ষাবিধি দুইয়েরই মূলকথা এক। রবীন্দ্র-সাহিত্য আমি কিছুমাত্র যদি বুঝে থাকি তবে বলব তার প্রধানতম কথা হচ্ছে— আমি যে পৃথিবীতে এসেছি সেই পৃথিবীকে ভালোবাসব, আমি যে জীবন লাভ করেছি, দেহে মনে প্রাণে সেই জীবনের আমি শরিক হব। ইংরেজিতে যাকে বলতে পারি— fullest possible participation in life— তাঁর শিক্ষার মূলেও সেই কথা। ছেলেটির চতুষ্পার্শ্বে যে জীবনধারা চলছে তার অংশীদার তাকে হতে হবে। তাতে এক দিকে যেমন সে জীবনকে ভালোবাসতে শিখবে তেমনি জীবনের দায়িত্বকেও সে স্বীকার করে নেবে।

এখানে আর-একটি কথা উল্লেখযোগ্য। যৌবনে কবি যখন বিলেতে যান তখন

রেলপথে ফ্রান্স অতিক্রম করেছিলেন। মানুষের যত্নে এবং শ্রমে দেশ যে কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে তাই দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। রেলের দু ধারে পপ্‌লার গাছের সারি, কোথাও ফলের বাগান, কোথাও আঙুরের ক্ষেত। ছবির মত মনোরম দৃশ্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলেছেন, দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি এরা কঠিন পরিশ্রমে সুন্দর করে তুলেছে। ফলে এদের দেশভক্তি সত্য হয়ে উঠেছে। আর আমরা নিজহাতে দেশকে গড়ে তুলছি না বলে দেশের প্রতি সত্যকার মমতাবোধ জন্মাচ্ছেই না। স্বাধীনতা লাভের পরে দেশকে গড়ে তোলবার জন্যে দেশব্যাপী বিরাট আয়োজন চলছে, কিন্তু এর উদ্যোগপর্বটা হওয়া উচিত ছিল ইস্কুলে-কলেজে। তা হয় নি বলে ফল কিছুই হচ্ছে না। ছেলেবেলা থেকে যে আপন চতুষ্পার্শ্বকে সুন্দর করে গড়তে শেখে নি সে আজকে হঠাৎ দেশকে গড়ে তুলবে, এ কথা মনে করাই হাস্যকর।

দেশকে জাতিকে গড়ে তোলাই সকল শিক্ষার মূলগত উদ্দেশ্য। মনকে গড়ে তোলবার জন্যে খানিকটা পুথিগত বিদ্যার প্রয়োজন হবেই। মনীষী ব্যক্তিদের মনীষা এবং মহৎ চিন্তার সঙ্গে পরিচয় মানসিক উৎকর্ষের জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু কেবলমাত্র পুথির জগতে আবদ্ধ থাকলে মনের শৌখিন বৃত্তি ঘোচে না, শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলে তবে মনে সজীবতা আসবে, বলিষ্ঠতা আসবে। যেখানে চাষী চাষ করছে, তাঁতি তাঁত বুনছে, কলু ঘানি ঘোরাচ্ছে, কুমোর হাঁড়িকলসী গড়ছে, কামার কোদালকুড়ুল তৈরি করছে—সেই জীবনের সঙ্গে পরিচয় চাই তবে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। দেশের মাটির সঙ্গে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে পরিচয় না হলে শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য দেশকে গড়ে তোলা, তা কিছুতেই সফল হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারীতি আলোচনা করবার সময় একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। পৃথিবীর খুব কম শিক্ষাবিদ্‌ই হাতেকলমে শিক্ষাদানের কাজ করেছেন। বেশির ভাগ শিক্ষাবিদ্‌ই দূর থেকে কতকগুলি মূলনীতি নির্দেশ করেছেন। সেগুলি খুবই মূল্যবান জিনিস, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষার ইমারত গড়তে বসেছিলেন তার ভিত থেকে শুরু করে প্রতিটি ধাপ তিনি নিজহাতে গড়ে তুলেছেন, প্রয়োজনবোধে গড়া জিনিস ভেঙেছেন, আবার গড়েছেন, অদলবদল করেছেন। শিক্ষাপ্রণালীর অপূর্ণতা যখন যেমন চোখে পড়েছে তেমনি ভাবে তার পরিবর্তন সাধন করেছেন। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই পরবর্তী কালে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যে মানুষকে জানবার জন্যে ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য দর্শন অধ্যয়নের আয়োজন সেই মানুষকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানতে হবে, তার অভাব-অভিযোগের কথা ভাবতে হবে। তার বাসের অযোগ্য গৃহকে বাসযোগ্য, তার ভাগ্যহীন জীবনকে উপভোগ্য করবার ভার শিক্ষিতেরা যদি গ্রহণ না করেন তবে দেশের শ্রীহীন মলিনমূর্তি কখনো ঘুচবে না। এইজন্য শান্তিনিকেতনের বিদ্যার্থীদের চোখের সুমুখে তিনি শ্রীনিকেতনের অনুশীলনকেন্দ্রটি স্থাপন করেছিলেন। এই দিক থেকে শ্রীনিকেতনকে বলা চলে শান্তিনিকেতনের ল্যাবরেটরি-গৃহ।

শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন— একটি আর-একটির পরিপূরক। এই দুটিকে মিলিয়ে দেখলে তবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার সামগ্রিক রূপটি পাওয়া যায়।

শিক্ষার চরম লক্ষ্য সহানুভূতির বিস্তৃতি। অশিক্ষিত মন একান্তভাবে আপন স্বার্থের সীমানায় আবদ্ধ। তার আনুগত্য কেবলমাত্র নিজের এবং আপন জনের প্রতি। অপর পক্ষে শিক্ষিত মনের সহানুভূতি আপন পরিবারকে ছাড়িয়ে প্রতিবেশী, প্রতিবেশীকে ছাড়িয়ে আপন সমাজ, সমাজকে ছাড়িয়ে দেশ এবং দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিদেশ, এক কথায় সমগ্র মানব-সমাজে পরিব্যাপ্ত। পরবর্তীকালে কবি যখন বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন তখন বিশ্বমৈত্রী এবং বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠাকেই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটুকু জানা থাকলে কথাটা স্পষ্ট হবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে কবি পশ্চিম মহাদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। দেশে দেশে তিনি শান্তির বাণী প্রচার করেছিলেন। যুদ্ধক্লান্ত ইউরোপ-আমেরিকার জনসাধারণ তাঁকে শান্তির দূত হিসাবে রাজকীয় সংবর্ধনা জানিয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের মতিগতি দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। অল্পদিনেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এঁরা শুধু মুখেই শান্তির বাণী উচ্চারণ করছেন কিন্তু গোপনে প্রত্যেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। উগ্র জাতীয়তার বিষ বিশ্বের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। আর-একটি মহাযুদ্ধ অনিবার্য, এটি তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে শান্তিনিকেতনের একজন অধ্যাপককে তাঁর হৃদয়বেদনা জানিয়ে লিখেছিলেন—

> পশ্চিম ভূভাগ কামানবন্দুকের আয়োজন করুক— যে শক্তিতে সেই সমস্ত আয়োজনকে তুচ্ছ করতে পারি আত্মার সেই পরমশক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের সাধনা।······ ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোল-বিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণরূপে মুছে যাক্— সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক— সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন। আমাদের জন্যে একটিমাত্র দেশ আছে সে হচ্ছে বসুন্ধরা, একটিমাত্র নেশন আছে সে হচ্ছে মানুষ। আমাদের শান্তিনিকেতন উদয়গিরির কাছে, সেখানে আমি অস্তগিরির লোকদের নিমন্ত্রণ করেছি। তাদের বরণ করে নেবার জন্যে তোরা তোদের ঘরকে প্রশস্ত কর্— হৃদয়কে উন্মুক্ত কর্— শান্তি-নিকেতনের আকাশ আজকের দিনের বিশ্বব্যাপী আঁধির আক্রমণে যেন নিরালোক হয়ে না ওঠে।

বলা বাহুল্য দেশে প্রত্যাবর্তনের অনতিকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বভারতী স্থাপনের এই হচ্ছে ইতিহাস। স্পষ্ট বুঝে নিয়েছিলেন যে শিক্ষারীতির আমূল পরিবর্তন চাই। মানুষের মনকে নতুন করে গড়তে হবে তবেই বিশ্বসমস্যার সমাধান হবে। বিশ্বভারতী যে কেবলমাত্র বি. এ. এম. এ. পাস আর ডিগ্রি বিতরণের জন্যে স্থাপিত হয় নি সে কথাটি সকলের স্মরণ রাখা কর্তব্য।

দৈনন্দিন শিক্ষণব্যাপারের নানা সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বহু স্থলে বহু কথা বলেছেন সেসব কথা বিশেষ মূল্যবান হলেও আমি এ প্রবন্ধে তার আলোচনা করি নি। আমি শুধু তাঁর শিক্ষা-নীতির কয়েকটি মূলসূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি। সর্বশেষে একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ

করব। বিদ্যা এবং শিক্ষা— এই দুটি কথাকে আমরা সমার্থবোধক বলে মনে করি এবং ব্যবহার করি। লক্ষ্য করবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন কিন্তু বিদ্যাদানের কথা যৎসামান্যই বলেছেন। সারাজীবন শিক্ষার কথাই বলেছেন। তার কারণ বিদ্যার চাইতে শিক্ষা ঢের বড় জিনিস। বিদ্যা আহরণের বস্তু, শিক্ষা আচরণের। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করলেই যেমন ধার্মিক হওয়া যায় না, বিদ্যালাভ করলেই তেমনি শিক্ষিত হওয়া যায় না। অধীত বিদ্যার সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষের যোগ নেই বলে দেখা যায় তেমন-তেমন বিদ্বান্ ব্যক্তিও মূলতঃ অশিক্ষিত। মুখস্থ বিদ্যা যখন ধাতস্থ হবে তখনই তার নাম শিক্ষা। পরীক্ষা পাসের তাগিদে যা-কিছু শিখেছিলুম তা বাদ দিয়ে বাড়তি কিছু যদি আমার মনে মজ্জায় লেগে থাকে সেটুকুই আমার শিক্ষা, বাকিটুকু বিদ্যার ছোবড়া। ধর্ম যেমন আচরণের বস্তু শিক্ষাও তেমনি আচরণের বিষয়। যিনি সত্যিকারের শিক্ষিত ব্যক্তি তিনি মনসা কর্মণা বাচা শিক্ষিত অর্থাৎ তিনি যে যথার্থই শিক্ষিত তা প্রকাশ পাবে তাঁর মনের চিন্তায়, মুখের বাক্যে, তাঁর প্রতিদিনের কর্মে। আমি মানুষটা ধার্মিক কি না সেটা আচরণের দ্বারা প্রকাশ করা যদি কঠিন হয়ে পড়ে তবে বাধ্য হয়ে আমাকে বাহ্যিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয় অর্থাৎ ফোঁটাতিলকের প্রয়োজন হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে— ডিগ্রি ডিপ্লোমা পাসের মার্কা তথাকথিত শিক্ষিতের ফোঁটাতিলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে এই ফোঁটাতিলকটা দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন। পুথি-পড়া পণ্ডিত চান নি, নির্ভেজাল শিক্ষিত মানুষ চেয়েছিলেন। সকলেই পণ্ডিত হয় না কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার গুণে সহজ সরল সুস্থচিত্ত মানুষ হতে পারে। আমাদের দেশ নিষ্প্রাণ, সেখানে তিনি প্রাণবন্ত মানুষ চেয়েছেন। তারা নিঃশ্বাসবায়ুর মত অনায়াসে আনন্দ উপভোগ করবে, সর্বত্র আনন্দ পরিবেশন করবে। 'যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি'— প্রকৃত শিক্ষিতমনের এই হচ্ছে প্রসাদগুণ, তার স্পর্শে চতুর্দিক প্রসন্ন হবে। বলা বাহুল্য এ শিক্ষা তিনি শুধু শান্তিনিকেতনের জন্য চান নি সমস্ত দেশের জন্য চেয়েছেন। প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার— সেখানে এই সব প্রাণবন্তরা একটু সুর একটু রং এবং ব্যবহারের সৌকর্যে অনেকখানি মাধুর্য বিকীর্ণ করবে, যৌবনের দূত হিসাবে সর্বত্র নতুন জীবনের বার্তা বহন করে আনবে।

র বী ন্দ্র না থ ও বি জ্ঞা ন

শ্রীপরিমল গোস্বামী

সর্বশিক্ষাগ্রহণক্ষমতা

পৃ থি বী তে প্রা ণী আসবার আগে সূর্যের আলো থেকে পৃথিবী তার ভাণ্ডারে বহু জিনিস গ্রহণ ক'রে জমা ক'রে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথও ঠিক এমনিভাবে তাঁর সমস্ত মানসভাণ্ডারে বাইরের সূর্যকিরণ থেকে বহু জিনিস গ্রহণ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে এই সূর্যকিরণ হচ্ছে তাঁর সমসাময়িক কালের জ্ঞানবিজ্ঞানের সূর্যকিরণ। এ এক আশ্চর্য গ্রহণক্ষমতা। যে-কেউ তাঁর রচনা পড়তে শুরু করবেন তিনিই তাঁর লেখার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর মনের ভাণ্ডারে সংগৃহীত জ্ঞানরশ্মির বহুরঞ্জিত দীপ্তি দেখতে পাবেন।

শিক্ষাকে সমস্ত দেশের মধ্যে সাধারণ লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াকেই তিনি 'শিক্ষার বিকিরণ' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই বিকিরণক্ষমতা আমি আর-এক দিক থেকে তাঁরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তাঁর প্রত্যেকটি কথা থেকে— তিনি যা-কিছু শিক্ষা বাল্যকাল থেকে তাঁর জ্ঞানতৃষার্ত মনে গ্রহণ করেছেন তা থেকে— সেই আলো হীরকের বহুমুখী দ্যুতির মতো চারদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

একেই বলে শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ। চাপানো শিক্ষা নয়, আপন গরজে শিক্ষা। এক দিকে বই আর-এক দিকে প্রকৃতি, এই দুইই তাঁর শিক্ষকের কাজ করেছে। তাঁর সমসাময়িক কালের কোনো-কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি।

বিজ্ঞান : বিস্ময় ও প্রেরণা

রবীন্দ্রনাথের লেখায় যে শিক্ষা সব চেয়ে বেশি বিকীরিত হয়েছে— সব চেয়ে বিস্ময়ের এই যে তা বিজ্ঞানের আবিষ্কার-বিস্ময় থেকেই বেশি। এবং তা তাঁর প্রথম রচনার দিকে সব চেয়ে বেশি। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রথম স্বাদ পেয়েই তিনি তারই কথা যত রকমে সম্ভব শোনাতে চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞানের খবরের পথে প্রথম প্রবেশলাভ করে তিনি তার খবর যথাজ্ঞাতভাবে পুনরাবৃত্তি করেন নি, সব নবলব্ধ জ্ঞানকেই তিনি নিজের মনের রসে জারিত করে, কখনো বা নিজের বক্তব্যের উপমারূপে, কখনো বা সেই জ্ঞানকেই কাব্যের কেন্দ্রবিন্দুরূপে ব্যবহার করেছেন। এই শেষের ব্যাপারটিতে দেখা যায়, তাঁর নতুন জানার বিস্ময়ই তাঁকে কাব্যে উদ্বুদ্ধ করেছে।

মৌমাছি নানা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, কিন্তু চাকে সেই সব মধুর মিশ্রণমাত্র জড়ো হয় না। মৌমাছি তার দেহের ভিতরে তৈরি যে ল্যাবরেটরি আছে তাইতে সেই সব মধু তার নিজের অতিরিক্ত একটি রাসায়নিকে জারিত ক'রে নতুন স্বাদের মধু রচনা করে। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের কথাতেও এই জাতীয় নবস্বাদের রস। এমন-কি তাঁর বিশুদ্ধ সাহিত্য বা সমাজ বা শিক্ষা বিষয়ের অনেক রচনায় যার মধ্যে আমরা তাঁর বিজ্ঞানের বা অন্য কোনো আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় কিছুমাত্র আশা করি না, সেখানেও তিনি প্রয়োজনবোধে বিজ্ঞানের যে-কোনো বিভাগ থেকে উপমা আহরণ করেছেন অতি অনায়াসে। যে বিষয়েই চিন্তা করতে গেছেন, তারই মধ্যে সমান্তরালভাবে আরও একটি করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা বিষয় মনে পড়ে গেছে। কখনো তাঁর উপমা বিবর্তনবাদকে আশ্রয় করেছে, কখনো নক্ষত্রবিজ্ঞানকে, কখনো সৃষ্টিতত্ত্বকে, কখনো ভূতত্ত্বকে, কখনো রসায়নকে, কখনো প্রাণিবিজ্ঞানকে, কখনো পদার্থবিদ্যাকে— তা ভিন্ন দর্শন মনোবিজ্ঞান অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি তো আছেই।

সাধারণতঃ আমরা গীতিকবিতায় আপন হৃদয়ের আবেগ বা কোনো বিশেষ মেজাজের পরিচয় পাই, এবং তাতে উপমা ব্যবহৃত হলে তা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পরিচিত দৃশ্য বস্তু থেকে অথবা কোনো অনুভূতি থেকে নেওয়া হয়। আপন মনের বিস্ময় বা আবেগ সার্থকরূপে প্রকাশিত হয়ে যদি তা অন্যের মনে কিছু পরিমাণে সঞ্চারিত করতে পারা যায় তা হলে কবি ও পাঠকের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে কাব্যরচনা চরিতার্থতা লাভ করে। এই কাব্যের প্রেরণা আসে কোনো একটিমাত্র সহজ আনন্দ বা বেদনা থেকে, অথবা কোনো কারণহীন দুর্বোধ্য আনন্দ বা বেদনা থেকে, অথবা শুধু অস্তিত্বের আনন্দ বা বেদনা থেকে, অথবা বিশ্বপ্রকৃতির কোনো সুন্দর অথবা ভীষণ রূপের অনুভূতি থেকে, অথবা যে-কোনো তুচ্ছ বস্তু বা বিষয় থেকে।

না বলে থাকা যায় না।

কোনো বস্তুর কল্পনা বা কোনো ভাব, বা কোনো আঘাত বা আনন্দ মনকে আলোড়িত করলে সেই কথাটি প্রিয়জনকে না শুনিয়ে পারা যায় না। সে আলোড়ন মনের পাত্রে ধারণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, উপছে পড়ে। এই অবস্থাই হচ্ছে সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল। প্রসিদ্ধ লেখক আরনল্ড বেনেটও এই ধরণের কথা আরো ভালোভাবে বলেছেন—

> ...You were full of your discovery. You were under a divine impulsion to impart that discovery. You had a strong sense of the marvellous beauty of something, and you had to share it.
>
> —*Literary Taste*

এই অবস্থাটা হচ্ছে সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল। অবশ্য এর প্রকাশ নানা ভাবে হতে পারে। কারও প্রকাশ কান্নায়, কারও গানে, কারও বা কাব্যে। আরও অনেক রকমে হতে পারে।

রচনার ভিতর দিয়ে যখন অন্যকে জানানো হয় তখনই তার সাহিত্য হবার সম্ভাবনা। সব সৃজনধর্মী সাহিত্যের গোড়ার কথাই এই।

এরই প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায়। নর্মাল স্কুলে পড়বার সময় বালক রবীন্দ্রনাথ যেদিন প্রথম জানতে পারলেন 'সূর্য পৃথিবীর চেয়ে চোদ্দ লক্ষ গুণ বড়' সেদিন তাঁর মনে যে বিস্ময় জেগেছিল তা তাঁর মায়ের আসরে সেইদিনই এসে উৎসাহের সঙ্গে প্রকাশ না করে পারেন নি।

অথবা—

সম্প্রতি প্রক্‌টরের গ্রন্থ হইতে গ্রহতারা সম্বন্ধে অল্প যে একটু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম তাহাও…বিবৃত করিতে লাগিলাম।

দুটি দৃষ্টান্তই জীবনস্মৃতি থেকে নেওয়া। প্রকটর নামক যে বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে— তিনি হচ্ছেন ইংরেজ জ্যোতির্বিদ রিচার্ড অ্যানটনি প্রকটর (১৮৩৭-৮৮)। তিনি *Handbook of the tars* (১৮৬৬) নামক গ্রন্থের লেখক। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে এই বইখানাই পড়ে থাকবেন।

প্রথম বয়সেই বিজ্ঞানের বিষয় থেকে বিস্ময়বোধ এবং তা মায়েদের আসরে উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করা— তাঁর পরবর্তী কালের বিজ্ঞানপ্রিয়তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। অর্থাৎ বিজ্ঞান তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির একটা বড় প্রেরণা জোগাবে এই সামান্য দুটি ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই যে আপন মনের বিস্ময়ের খবরটা অন্যকে না শুনিয়ে থাকা যায় না এর মূল প্রেরণার কথা আগেই বলেছি। তা সাধারণতঃ ব্যক্তিগত বা সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ বা অভিজ্ঞতা বা সমাজচিন্তা বা ঐ জাতীয় কিছু। কিন্তু বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কারও যে একজন কবির চিত্তকে এমন গভীরভাবে এবং ব্যাপকভাবে উদ্বেল করে তুলতে পারে তার দৃষ্টান্ত সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ একা। বিশ্ববিষয়ে তাঁর মনে জিজ্ঞাসা জেগেছিল তাঁর বাল্যকাল থেকেই। এটি তাঁর মতো অসাধারণ জ্ঞানতৃষার্ত মনের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার। মনে হয় সব ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যটি দেখবার সহজ ক্ষমতা নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। আর এই অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কারই হচ্ছে বিজ্ঞানীর মূল লক্ষ্য। এবং বিশ্ববিধানের মূল সত্যটা কি তারও আবিষ্কার ঐ একই পথে।

ঐক্যের চেতনা

লক্ষ কোটি বিভিন্ন বস্তুতে জগৎ পরিপূর্ণ। কিন্তু ঐ বিভিন্নতাই যদি একমাত্র সত্য হত তা হলে মানুষের পক্ষে বিভ্রান্তিকর আর কিছু হত না। তাই মানুষ ঐ বিভিন্নতার মধ্যে যে ঐক্য লুকিয়ে আছে, তারই সন্ধান করে আসছে সভ্যতার আদি থেকে। বহুজাতীয় গাছপালা লতাপাতা শুধু উদ্ভিদ নামে ঐক্য লাভ করেছে, মানুষ পশুপাখি কীটপতঙ্গ শুধু প্রাণী নামে

ঐক্য লাভ করেছে, উদ্ভিদ ও প্রাণী বাদে যাবতীয় বিচিত্র জিনিস শুধু জড় নামে ঐক্য লাভ করেছে, আবার উদ্ভিদ প্রাণী এবং জড়— সবই বস্তু নামে ঐক্য লাভ করেছে।

অত্যন্ত স্থূলভাবে গোটাকত দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। কোটি কোটি রকমের শ্রেণীবিভাগের সীমায়িত ঐক্যের ভিতর দিয়ে সকল বিশ্ব মহা ঐক্যের মধ্যে এসে মিলছে। এই ঐক্যের এক দিকে হচ্ছে পরমাণু নামক একটি কণিকা (যা আরও কয়েকটি দুর্বোধ্য-জাতীয় 'পারটিক্‌ল্'-এ গড়া) এবং যা বিশেষভাবে কোনো বস্তু নয়, ভাব নয়, অথচ কি তা ঠিক বোঝা যায় না। এই পরমাণুর একটি জটিল কেন্দ্র আছে আর তার চতুর্দিকে আছে ঘূর্ণমান ইলেকট্রন।

এই পরমাণুকণিকাই বিশ্ববস্তুর চরম উপাদান, আর এই হচ্ছে বস্তুবিশ্বের অন্তিম ঐক্য। একমাত্র মন বাদ দিলে সমস্ত বস্তু— জড় বা জৈব— ঐ একই কণিকা দিয়ে গড়া। এইখানে লোহায় সোনায় কোনো ভেদ নেই। অবশ্য পরমাণুতে পরমাণুতে ভেদ আছে, কিন্তু সে শুধু ওজনগত ভেদ। অন্য দিকটা কিভাবে গড়া তা এখনো অজ্ঞাত— বিশ্বের অসীমতার দিকটা। তা আমাদের ধারণার বাইরে।

সৃষ্টি বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। এক দল বলেন আদিতে সমস্ত বিশ্ববস্তু ঘনীভূত আকারে অল্পপরিসর জায়গায় বদ্ধ ছিল। একে বলা হয়েছে প্রাইমীভ্যাল অ্যাটম, বা আদিম পরমাণু। এর বাইরে স্থান ও কাল কিছুই ছিল না। 'There was no before; there was no elsewhere' তার পর এই অ্যাটম ফেটে সেই মুহূর্তে স্থান, কাল ও বস্তু তৈরি হল। আর-এক দল বলেন, বিশ্বের আরম্ভ বলে কিছু নেই, এর শেষ বলেও কিছু নেই। শূন্য থেকে বস্তু জন্মাচ্ছে এবং তা থেকে নতুন নতুন নক্ষত্র বা নতুন নতুন বিশ্ব জন্মাচ্ছে, লয় পাচ্ছে, আবার জন্মাচ্ছে। কিন্তু এর কোন্‌টি যে সত্য তা জানবার উপায় নেই।

দুই জগতের মিলন

কিন্তু তত্ত্ব যাই হোক, বস্তুবিশ্বের পাশাপাশি চেতনার আর-একটি জগৎ আছে, মানুষের মধ্যে যার চরম পরিণতি হচ্ছে মন। বস্তুজগৎ ও মনোজগৎ, এই দুই জগৎও সম্ভবতঃ কোথাও এক হয়ে মিলেছে— যা শুধু অনুমান করা যায়, অনুভব করা যায়, কিন্তু প্রমাণ করা যায় না। মানুষের মন শুধু মানুষেই শেষ, বিশ্বে এর কোথাও পৃথক কোনো উৎস নেই, কিংবা আরও একটি বৃহত্তর এবং সর্বব্যাপী মনের সঙ্গে মানুষের মনের কোনো চিরন্তন যোগ নেই, এ কথা কল্পনা করতে ভালো লাগে না। যুক্তির পথে চললেও স্বতোবিরোধী মনে হয় না, কিন্তু তবু যুক্তি সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার পথে পৌঁছে দেয় না। ধ্যানের সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়, মনের একটি বিশেষ মুহূর্তে অনুভূতির দিক থেকে সকল সন্দেহ দূর হয়েও যায়, কিন্তু মনের প্রশ্ন দূর হয় না। প্রশ্ন জাগে: পার্থিব যুক্তি কি সর্বত্র বিশ্বব্যাখ্যায় চলে?

এবং এ প্রশ্ন, এ সন্দেহ থেকে যায় বলেই মানুষের সর্বাঙ্গীণ প্রগতি অব্যাহত থাকে, দূর হলে

আমাদের জীবনের সকল প্রয়োজন হয়তো শেষ হয়ে যেত। তাই সেই পরম ঐক্যের স্বপ্নই শিল্পীর চেতনাকে আনন্দরসে ডুবিয়ে তাকে সেই আনন্দের গান গাইতে উদ্বুদ্ধ করে।

এই ঐক্যের বোধ মানুষের নিজের সকল সত্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। নিজেকে দেহের দিক থেকে দেখলেও নিজেকে সমগ্র বস্তুজগতের একটি অপরিহার্য উপাদান বলে চেনা যাবে, কেননা দেহ পরমাণুর সমষ্টি। এবং মনের দিক থেকে দেখলেও বিশ্বমনের সঙ্গে তাকে অবিচ্ছেদ্য মনে হবে— যদিও বিশ্বমনের কোনো প্রমাণ এখনো মেলে নি। মনে শুধু প্রশ্ন জাগে, বিশ্বমন না থাকলে বিশেষ মন এল কোথা থেকে? বিজ্ঞান হয়তো একদিন প্রমাণ করবে আমাদের সীমাবদ্ধ ধারণায় আর যুক্তিতে যা সত্য মনে হয়, আসল সত্য তার বাইরে। কিন্তু তা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ নিজের অনুভূতিটা মিথ্যা বলা যায় কি করে? বিজ্ঞানে অনুভূতির খবর প্রকাশ নিষেধ, কিন্তু অনুভূতির খবর প্রকাশ নিয়েই কাব্যের কারবার। কোথাও তার হারিয়ে যাবার মানা নেই।

ছোটকে বড়র সঙ্গে মিলিয়ে দেখা

প্রয়োজনের সীমা বার বার ভেঙে দিয়ে মহাকাশে কল্পনার পাখা মেলা। বিশ্বের -মধ্যে নিজেকে বিস্তার করে দেওয়া। বিশেষের সঙ্গে বিশ্বের এই সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ কোনো অবস্থাতেই ছেদন করতে রাজি হন নি। কারণ এরই মধ্যে তিনি তাঁর অস্তিত্বের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। সমস্ত বিশ্ব যে নিয়মে চলছে সেই মহানিয়মের সঙ্গে নিজেকে বার বার তিনি নিজেকে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ ও বিশ্ব, এই দুইকেই তিনি পরস্পরের আত্মীয় বলে মেনেছেন বলেই তাঁর কাব্যজীবন সার্থক। সর্বত্র দুয়ের যোগ এবং দুইকে অতিক্রম ক'রে এক। একে যে নামেই ডাকা হোক— (ডায়ালেকটিক মেটিরিয়্যালিজম অথবা ডায়ালেকটিক স্পিরিচুয়্যালিজম!)— জিনিসটা একই থাকে, অধিকন্তু এটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জিনিস, অতএব এটি কিছু না (অথবা 'এম্পিরিক্যাল নলেজ' অতএব বৈজ্ঞানিক সত্য নয়) বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ নয়।

বাল্যকালে উপবীত গ্রহণের পর রবীন্দ্রনাথ যে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেছেন তার ভিতর দিয়ে তিনি সেই বয়সেই বিশ্বভুবনের সঙ্গে একাত্মকতা অনুভব করতে চেষ্টা করেছেন—

> আমার বেশ মনে আছে, আমি ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন…।
>
> —জীবনস্মৃতি

এই 'প্রসারিত' করার চেষ্টাই তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা। এবং বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ার পরম আনন্দ তাঁর মনকে কখনো অল্প পরিসরের মধ্যে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে নি।

বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার এমনি অবস্থায় তাঁকে বিজ্ঞানবিমুখ করা দূরে থাক্, বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ক্রমে বাড়িয়ে দিয়েছে, কেননা সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য তিনি কবিরূপে উপলব্ধি করেছিলেন, বিজ্ঞান সে উপলব্ধিতে আশ্চর্য রকমের সাহায্য করেছে। বিজ্ঞানের এক-একটি আবিষ্কার তাঁর মৌলিক মহাজিজ্ঞাসার পারে উত্তীর্ণ করতে এক-একটি ধাপের কাজ করেছে। যে রহস্যলোক যে-কোনো কবির স্বর্গ, বিজ্ঞান সেই রহস্যলোকের বিস্তারই তো ক্রমে বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে।

কবি যেভাবে বস্তুজগৎ ও ভাবজগৎকে সমান্তরাল রেখে বাল্যকাল থেকে এগিয়ে চলেছিলেন, আপন চিত্তের মাঝখানে সেই দুটি সমান্তরাল জগৎই একটি বিন্দুতে এসে মিলেছে। এই সমান্তরালের মিলন অবশ্যই ইউক্লিডের নিয়মে হয় না। বিশ্বমহাকাশে ইউক্লিড অচল, চিত্তমহাকাশেও তেমনি ইউক্লিড অচল।

এক দিকে জ্ঞানরাজ্য, আর-এক দিকে ভাবরাজ্য, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কবির চিত্তে অতি সহজেই ঘটেছে। আমাদের চোখে সমস্ত বিশ্ব একটি ছন্দে বাঁধা। সৌরজগতে এ ছন্দ আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই ছন্দের সঙ্গে, কবির চিত্তে যে ছন্দের উৎস আছে, তার কোনো বিরোধ নেই। এই দুই যে-মুহূর্তে চেতনার মধ্যে ঐককেন্দ্রিক হয়ে যায়, সেই মুহূর্তে আপন চিত্ত বিশ্বের মধ্যে সহজে ব্যাপ্ত হয়। নিজের ছন্দোরচনার অভিজ্ঞতা বিশ্বছন্দের প্রতিফলন বলে বোধ হয়। আর-একজন বড় ছন্দঃস্রষ্টার ছবি ভেসে ওঠে। তার সঙ্গে তখন পরিচয়ে আর কোনো বাধা থাকে না। ছন্দের ভিতর দিয়ে গানের ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে সহজ পরিচয়—

> গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
> তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি ॥

এ হল ছন্দ ও সুরের ভিতর দিয়ে আর-এক বড় ছন্দ ও সুরকারের উপলব্ধি। এইভাবে নিজের সৃষ্টি থেকে, নিজের কাজ থেকে, আরো একজনের কথা মনে পড়ে। শিশু কাব্যগ্রন্থের 'কেন মধুর' নামক কবিতাটি এর একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

> রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
> তখন বুঝি রে বাছা, কেন যে প্রাতে
> এত রং খেলে মেঘে জলে রং উঠে জেগে,
> কেন এত রং লেগে ফুলের পাতে
> রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে ॥···

এ শুধু চেতনার উপলব্ধি, এর কোনোটাই বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। কোনো জিনিসের আমার কাছে গরম লাগা বা মিষ্টি লাগা যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য নয়, কেননা অন্যের কাছে তা অন্য রকম লাগতে পারে।

এই দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে আমি বলতে চাই, কবির কাছে কোনো ছোট বস্তুই স্থায়ীভাবে ছোট নয়, তা আরও বড়র একটি অংশ, তেমনি আমি নামক ব্যক্তিত্বও সেই আমিত্বের সীমার

মধ্যেই স্থায়ীভাবে বদ্ধ নয়— সেও বড়-আমির অংশরূপে না দেখা পর্যন্ত তাঁর তৃপ্তি নেই। সব ছোটই আরও কোনো বড়র অংশ, এ কথা প্রমাণিত সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনে এমন একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় যে, ছোটকে বা কোনো বিশেষ বস্তুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার পটভূমিটি তাঁকে স্মরণ করতেই হবে। তাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখে তিনি তৃপ্তি পাবেন না। তাই মা যখন সন্তানকে রঙিন খেলনা দিয়ে খুশি, তখনো তাঁর মনে হচ্ছে ঐ মায়ের মন ভোলাতে প্রকৃতিতে যে এত রঙের ছড়াছড়ি, তার মধ্যে কি কোনো ইঙ্গিত নেই? আরো কি কেউ এই পৃথিবীর মানুষ-শিশুকে ভোলাবার জন্য প্রকৃতিতে এই রঙের আয়োজন করেন নি?

আমি এর আগে বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিভ্রান্তিকর বৈচিত্র্যকে খণ্ড খণ্ড ঐক্যে গেঁথে বৃহত্তর ঐক্যের পথে যাওয়ার কথা বলেছি, রবীন্দ্রনাথের চিত্তেও প্রায় ঐ একই রীতিতে ঐক্যদর্শনের ক্রিয়া চলেছে, উপরে উদ্ধৃত দুটি গান ও কবিতার অংশ তারই উদাহরণ।

এই ঐক্যদর্শনের পথে তিনি বালককাল থেকেই চলতে অভ্যস্ত হয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁর জীবনস্মৃতিতে। বড় সত্য থেকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন খণ্ড অংশকে দেখে তিনি ছেলেবেলায় শিউরে উঠেছিলেন মেডিক্যাল কলেজের শবব্যবচ্ছেদ ঘরে।

> …মেজের উপরে এক খণ্ড কাটা পা পড়িয়া ছিল, সে দৃশ্যে আমার সমস্ত মন একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে এইরূপ টুকরা করিয়া দেখা এমন ভয়ংকর এমন অসংগত যে সেই মেজের উপর পড়িয়া-থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা আমি অনেকদিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।
>
> —জীবনস্মৃতি

আমরা স্বভাবতই যা বিচ্ছিন্ন দেখি না, তা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখলে মনে ঘা লাগা স্বাভাবিক। এমনি দেখার আরো একটা দৃষ্টান্ত আছে। তাঁকে একদিন মানুষের বিচ্ছিন্ন একটি কণ্ঠনালী দেখানো হয়েছিল। সেদিনও তাঁর মনে এমনি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

এই দুটি দৃষ্টান্ত অহেতুক নয়। একজন বিজ্ঞানীর কাছে কণ্ঠনালীকে স্বরযন্ত্র রূপে দেখে মুগ্ধ হওয়া বা তাকে দেহযন্ত্রের একটি পৃথক্ যন্ত্ররূপে দেখা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু একটি মানুষ যেখানে একটি অখণ্ড সত্য, সেখানে তার কোনো বিচ্ছিন্ন অংশ, যথা হাত পা অথবা কণ্ঠনালী অথবা রক্ত, দেখলে তাকে অখণ্ড সত্যের বিকাররূপে চিনতে পারা যে-কোনো অনভ্যস্ত বালকের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এটি সম্পর্কযুক্ত। তাই তিনি এর কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন তাঁর জীবনস্মৃতিতে। অর্থাৎ তিনি কোনো ছোটকে বা অংশকে যেখানেই মেনেছেন, সেখানেই তার সঙ্গে তাকে আরও বড়র পটভূমিতে ফেলে দেখেছেন। মানুষের হাত বা পা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তা হয় সত্যের বিকার— যা চোখ এবং মনকে পীড়িত করে। কিন্তু সম্পূর্ণ মানুষ সত্যের বিকার নয়— ছোট ক্ষেত্রে তার মধ্যে তার নিজস্ব সম্পূর্ণতা আছে। কিন্তু তবু সেখানেও সে শেষ নয়, তাকে কবি আরও বড় সত্যের অংশরূপে দেখতে অভ্যস্ত। এ দুটি জিনিস চেহারায় পৃথক, কিন্তু ধর্মতঃ এক।

দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ সত্য

এই যে খণ্ড সত্যকে দেখামাত্র খণ্ডকে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া, এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই ক্ষমতা নিয়েই যেন তিনি জন্মেছিলেন। এবং তাঁর সকল জীবনদর্শনের মূলে আছে এই দৃষ্টিভঙ্গি। তাই বিজ্ঞান তাঁর পথের এতবড় সহায় হতে পেরেছে। বিজ্ঞানই তাঁকে জানিয়ে দিল গ্রহরা একই নিয়মে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, পৃথিবীতে ঋতুচক্র আবর্তিত হচ্ছে। একই নিয়মে, একই ছন্দে। তুচ্ছতম বস্তু থেকে, এমন-কি পরমাণুকণিকা থেকে গ্রহনক্ষত্রপূর্ণ বিশ্ব— সবই এক অমোঘ ছন্দের অধীন, কোথাও এর ব্যতিক্রম নেই, অন্ততঃ আমাদের দৃষ্টিতে নেই। আলো-আঁধার জন্ম-মৃত্যুর চাকা ঘুরে চলেছে আমাদের চোখের সম্মুখ দিয়ে। এ সবই তো আমাদের দেখা জিনিস।

একেই বলা হয়েছে ছন্দ। এই ছন্দ অন্তরে বাহিরে। এই ছন্দে চলছে ভাঙা এবং গড়া, ছাড়া এবং পাওয়া। মৃত্যুকে স্বীকার না করলে জীবন অর্থহীন, অন্ধকারকে স্বীকার না করলে আলো অর্থহীন। মরণকে যে পর করেছে, জীবন তার ব্যর্থ। একই চাকা ঘোরার ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কাব্যে নাট্যে গানে আছে এই উপলব্ধির প্রকাশ— কখনো সহজভাবে কখনো প্রচ্ছন্নভাবে। মহানৃত্যের ছবি জেগেছে এই ছন্দোবর্ণনায়— মহাকালের নৃত্য। 'তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম।'

দুই বিপরীতের ছবি সর্বত্র, এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব না ঘটলে সৃষ্টির ধারা এগিয়ে চলে না। রবীন্দ্রনাথ কত গানে কত ভাবে যে সৃষ্টির এই বিস্ময়ের কথা বলেছেন তার সংখ্যা নেই। এ বিষয়ে একটি গানের কথা মনে পড়ছে—

কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে
ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নূতন সংঘাতে।...

তালে তালে সাঁঝ-সকালে
রূপসাগরে ঢেউ লাগে।
শাদা কালোর দ্বন্দ্বে যে ঐ
ছন্দে নানান রং জাগে॥

দুই বিপরীতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিপরীত কথাটা সংকীর্ণ অর্থে ধরলে চলবে না। বিপরীত অর্থে বিরোধ নয়, বরং বলা চলে দুইই সমধর্মী কিন্তু চেহারায় দুজন পৃথক্। বিচিত্র অর্থে বিপরীতও বোঝা যেতে পারে। বৈপরীত্য বা বিরোধ বাইরের জিনিস, বাইরের আবরণটা সরিয়ে দিলে আপাত-বিপরীতের আত্মীয়তা প্রত্যক্ষ করা যাবে।

প্রকৃতির পদে পদে বিরোধী উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারা কি বাস্তবিকই বিরোধী ? তাহারা দুই বিপরীত সত্য।

—তার্কিক, ১৮৯৩

এই দুই বিপরীত সত্য মিললে তবে সম্পূর্ণ সত্যটা দেখতে পাওয়া যায়। তখন তাকে আর-এক বিপরীতের পাশে ধরতে হয়, কারণ ছোট ক্ষেত্রের সত্য, চরম সত্য নয়। এইভাবে পরম ঐক্যের পথে যাত্রা। ছোটকে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গিতে চিনে নিয়ে তারপর তাকে আরো বড়তে নিয়ে উত্তীর্ণ করা। তাঁর অনেক রচনাতেই এর দৃষ্টান্ত মিলবে। অচলায়তন নাটকটি এই উদ্দেশ্যেই রচিত। গোরা উপন্যাস এই উদ্দেশ্যে রচিত। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে গোরাকেও রূপক উপন্যাস বলতে বাধা কোথায় ?

রবীন্দ্রনাথ কতখানি অতীন্দ্রিয়বাদী

আপন রচনার ভিতর দিয়ে তিনি এইভাবে তাঁর উপলব্ধিগত সত্যকে নানারূপে চিহ্নিত করে গেছেন। তিনি নিজে স্রষ্টা, তাই বিশ্বসৃষ্টির বিস্ময় তাঁর ঘোচে না। এই বিস্ময়ের ভিতর দিয়ে তিনি এক অদ্ভুত আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয়বাদী বা মিস্টিক বলা চলবে না। আংশিকভাবে তিনি সবই। তাই তাঁর প্রতিভার উপর কোনো লেবেল আঁটা চলে না। আর তিনি যদি মিস্টিক কবি হন, তবে কোন্ কবি মিস্টিক নন, কোন্ বিজ্ঞানী মিস্টিক নন ?

মিস্টিসিজম বলতে বহুজাতীয় উপলব্ধি বা তার প্রকাশ বোঝায়। প্রকাশ অবশ্য ঠিকমতো করা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে ইন্‌টেলেক্টই প্রধান, এবং তাকে অতিক্রম ক'রে বিশুদ্ধ আনন্দ-সমাধির দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এর চরম দৃষ্টান্ত 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে-যে নাচে' নামক গানটি।

সাধারণভাবে তিনি এমন কবিতা আর দ্বিতীয় লেখেন নি। মনে হয় যেন এটি একেবারে সমাহিত অবস্থাতেই লিখেছেন, কাব্যের ক্ষেত্রে যা অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু তাঁর অন্যান্য অনেক কাব্যে যে আনন্দের প্রকাশ তা কোনো বিশেষ রীতিতে নয়, তা প্রায় সম্পূর্ণ বিজ্ঞানীর রীতিতে জানাকে অজানার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার আনন্দ। এবং রবীন্দ্রনাথে সেই পরিমাণ মিস্টিসিজম দেখা যাবে যা ওল্যাফ স্টেপলডনের ভাষায় 'is said to give profound insight into the essential nature of reality' (*Philosophy and Living*, II), এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই মানসিক বিশেষ অবস্থায়—

> In which the burthen of the mystery
> In which the heavy and the weary weight
> Of this unintelligible world
> Is lighted...

While with an eye made quiet by the power
Of harmony and the deep power of joy
We see into the life of things.

—Tintern Abbey

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে তর্জমা করে নিতে পারি। এই জগৎব্যাপী দৃশ্যপ্রবাহের অবিশ্রাম কম্পনধ্বনিকে কেবল একবার চোখ বুজে মনের কান দিয়ে শুনতে হয়। কিন্তু আমি এই সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের কথা কতবার লিখব! নিত্য নূতন করে অনুভব করা যায়, কিন্তু নিত্য নূতন করে প্রকাশ করি কী করে।

—ছিন্নপত্র ৬৬, ১৮৯২

এ কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আগেই বলেছি তিনি বিশেষ কোনো বাঁধা রীতিতে তাঁর কল্পনাকে চালিত করেন নি, সেই কথাটিই পাওয়া যাবে তাঁর এই স্বীকারোক্তির মধ্যে। এই যে 'নিত্য নূতন করে অনুভব' অথবা 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে'— এর মধ্যেই তাঁর মূল কবিধর্মের কথাটি বলা হয়েছে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার-বিষয়ের জ্ঞান তাঁর জীবনদর্শনকে আরও মধুর করেছে, আরও বিচিত্র করেছে, তাঁর কল্পনার দিগন্ত আরও বিস্তার করে দিয়েছে। সমস্ত কবিজীবনে তিনি বিচিত্র রূপের ভিতর দিয়ে একের স্বাদগ্রহণের সাধনা করেছেন। এ তো রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শকে এড়িয়ে নয়, সবকে স্বীকার করে তবে তার ঊর্ধ্বে মাথা তোলা। এবং তা বারে বারে নতুন ক'রে। কোনো বাঁধা রীতিতে নয়। বিশ্ব-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যাকে বলে 'কমন-সেন্স ভিউ'— তাই। আর কমন-সেন্সকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে বিজ্ঞানীর কাজ।

আগে বলেছি সমস্ত বস্তুবিশ্বের আদি উৎস কি, এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের মনের আদি উৎস কি, প্রশ্নটি। মানবিক পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং লজিক দিয়ে তার শেষ মীমাংসা আজও করা সম্ভব হয় নি। অনেক রকম থিওরি খাড়া করেছেন দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা। একমত হতে পারেন নি তাঁরা। হওয়া সম্ভবও নয়। অতএব যা সম্পূর্ণ জানা যায় নি, সে বিষয়ে তর্কের পথে যাওয়া অথবা প্রচলিত কোনো একটা দার্শনিক মতকে বিশেষতঃ যে মত কল্পনাকে অবাধ মুক্তি দেয় না তাকে মেনে নেওয়া, এ দুইই কবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি তাঁর কল্পনার মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর নিজস্ব পথে। তিনি 'মন' নামক আমাদের মগজাশ্রিত এক আশ্চর্য জিনিসের ব্যবহার থেকে এমন একটি সূত্র আবিষ্কার করেছেন যা মানবীয় যুক্তিশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বাইরে নয়, অথচ যা ভাবতে ভালো লাগে, এবং পরস্পরবিরোধী মনে হয় না।

তাঁর ভাষাতেই বলি—

জড় প্রকৃতির সর্বত্রই নিয়মের প্রাচীর চীনদেশের প্রাচীরের অপেক্ষা দৃঢ় প্রশস্ত ও অভ্রভেদী, হঠাৎ মানব-প্রকৃতির মধ্যে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র বাহির হইয়াছে। সেইখানে চক্ষু দিয়াই আমরা এক আশ্চর্য আবিষ্কার

করিয়াছি। দেখিয়াছি প্রাচীরের পরপারে এক অনন্ত অনিয়ম রহিয়াছে; এই ছিদ্রপথে তাহার সহিত আমাদের যোগ; সেইখান হইতে সমস্ত সৌন্দর্য স্বাধীনতা প্রেম আনন্দ প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। সেই জন্য এই সৌন্দর্য ও প্রেমকে কোনো বিজ্ঞানের নিয়মে বাঁধিতে পারিল না।

—পঞ্চভূত (১৮৯৭), বৈজ্ঞানিক কৌতূহল

উনবিংশ শতাব্দীতে উচ্চারিত হলেও কথাটা আজও একই রকম আছে। অর্থাৎ মনকে বিজ্ঞানীরা আজও কোনো নিয়মে বাঁধতে পারেন নি, পারবেন বলেও মনে হয় না। ফ্রয়েড ইউংও পারেন নি। অথচ কবির পক্ষে নিজের সত্তাকে অন্যতে প্রতিফলিত করে দেখা, বা বিজ্ঞানীর পক্ষে কোনো জিনিসের আর্কিটাইপ খোঁজা—দুইই স্বাভাবিক ব্যাপার। বিবর্তনের পথের সন্ধানে পিছু হটে মানুষ আদি জীবনে গিয়ে পৌঁছেছে— একেবারে একক কোষে। জানা গেছে, সেইখান থেকে উঠে এসেছে মানুষ। জৈবদেহের সরলতা থেকে জটিলতায় আসার ব্যাপার। ভাইরাস্ থেকে মানুষে। অথবা পরমাণু নামক সংহত তেজ থেকে মানুষে। দেহের ব্যাপার হল এটা। মনও হয়তো দেহপ্রদীপের শিখা। কিন্তু যদি বিপরীতটা সত্য হয়? অর্থাৎ বড় থেকেই যদি পৃথকভাবে ছোটতে এসে পৌঁছে থাকে?

কবিধর্মে নিষ্ঠা

আমি বলি, কিছুই যখন নিশ্চিত জানা নেই, তখন মন বস্তুরই একটি গুণমাত্র কল্পনা করা যত নিরাপদ, মন স্বতন্ত্র উৎস থেকে উদ্ভূত বলাও তত নিরাপদ। কোনো জিনিস তার অন্তর্নিহিত তেজ থেকেও জ্বলে উঠতে পারে, আবার কোনো জিনিস বাইরে থেকে তাপ পেয়ে তবে জ্বলে। ঘটনা দুটি পৃথিবীপৃষ্ঠে ঘটলে উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ অক্সিজেনের উপস্থিতি আবশ্যক, এইটুকু মাত্র দুয়ের মধ্যে মিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিতে এর কোনো একটার দিকে সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্ব আছে এমন কথা বলা যায় না। কারণ তাঁর জ্ঞানে কোনো জানা কখনো শেষ হবে না, এটি সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত। তবে বিজ্ঞানের জ্ঞান যখন যতটা পাওয়া গেছে সে সময়ের জন্য সেটা সত্য, এটি তিনি সব সময়েই মেনেছেন। যখন তিনি বলেন,

জড় হইতে মনুষ্য-আত্মার অভিব্যক্তি; মধ্যে কত কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধান।

—নিষ্ফল আত্মা, ১৮৮৫

তখন মনে হবে তিনি বস্তুবাদী। মনে হলে ভুল হবে না, যদিও প্রচলিত অর্থে তিনি বস্তুবাদী নন। তিনি প্রচলিত অর্থে ভাববাদী নন, অথচ তিনি ভাববাদী। কোনো বিশেষ একটামাত্র সংজ্ঞা দিয়ে তাঁকে জানা যাবে না, কেননা তাঁর মনে সম্ভবতঃ স্পেশালাইজেশনের কোনো স্থান ছিল না। মূলতঃ তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, এবং তাঁর চিন্তাধারা যথাসম্ভব বিজ্ঞান-সম্মত, এবং তাঁর যুক্তির শেষ লক্ষ্য সৃষ্টির আনন্দে অবগাহন— তা সে বিশ্বসৃষ্টির বিস্ময়জনিত আনন্দেই হোক, বা আপন সৃষ্টির আনন্দেই হোক। অর্থাৎ শেষ লক্ষ্য কবিধর্মচ্যুত না হওয়া।

কবির নিজস্ব জগৎ মায়া নয়

আনন্দ জিনিসটা তো যুক্তির বাইরে। অতএব যুক্তির পথে চললেই যে আনন্দে নাচা নিষেধ হবে এমন কোনো কথা নেই। একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে যা নিষিদ্ধ, একজন কবির পক্ষে তা নিষিদ্ধ হতেই পারে না। কবি, অথচ বিশুদ্ধ ভাবের রাজ্যে বাস নয়, এ বড়ই আশ্চর্য লাগে অনেকের কাছে।

পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ তা না মনে ক'রে একে বিশ্বাস ক'রে ভালোবেসে, ভালোবাসা পেয়ে, মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই যথেষ্ট— দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।

—ছিন্নপত্র ৩৬, ১৮৯১

অথবা—

বেদান্তপাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদিকারণ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন, কিন্তু আমার সংশয় দূর হয় না।…সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরাও নেই, আছেন কেবল ব্রহ্ম, আর মনে হচ্ছে যেন আমরা আছি। আশ্চর্য এই, মানুষ মনে এ কথা স্থান দিতে পারে।

—ছিন্নপত্র ১১৭, ১৮৯৪

এই দুটি উদ্ধৃতির বক্তব্য থেকে বোঝা যায় কবির মনে বিশ্ববিষয়ে যে ছবি আছে তার সঙ্গে যে ছবি মেলে না, তাকে তিনি মানতে পারেন না। পরমাণু থেকে মহাবিশ্ব, বস্তুগত এবং চেতনাগত, দুইই যাঁর কাছে একান্ত সত্য, তিনি একটিকে ছেড়ে আর-একটিকে মানবেন কি করে? কোনো তুচ্ছ জিনিসই কবির কাছে অসত্য নয়, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া কোনো ইনটেলেকচুয়ালের পক্ষেই সম্ভব নয়। ছোট, বড়, আরও বড়, সব এক সুরে বাঁধা। ক্ষুদ্র বৃহতের অংশ। অংশকে বাদ দিলে বৃহৎ অর্থহীন হয়ে পড়ে। একেই তো বলে যুক্তির পথে চলা।

উপমায় বিজ্ঞান

বাইশ বছর বয়সে লিখেছেন—

অহর্নিশি জগতের চেষ্টা তোমাকে তাহার সহিত এক করিয়া লইতে। জগতের ইচ্ছা নহে যে, তাহার কোন একটা অংশ, কোন একটা ঢেউ, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া জগতের স্রোতকে হুট্ করিয়া দিয়া উজানে বহিয়া যায়। সে চায় সকল ঢেউগুলি এক স্রোতে বহে, এক গান গায়; তাহা হইলেই সমস্ত জগতের একটি সামঞ্জস্য থাকে, জগতের মহাগীতের মধ্যে কোনখানে বেসুরা লাগে না।

—সমালোচনা, বাউলের গান, ১৮৮৩

এ সমস্তই বৈজ্ঞানিক সত্য, কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে, বাউলের কথা বলতে গিয়েও বিজ্ঞান থেকে উপমা সংগ্রহ করা হয়েছে। আর এ শুধু একটিমাত্র ক্ষেত্রে নয়, তার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।— এবং ঐ 'বাউলের গান' প্রবন্ধেই আরও আছে, যথা—

উত্তাপ যদি সর্বত্র একাকার হইয়া যায় তাহা হইলে হাওয়া খেলায় না, নদী বহে না, প্রাণ টেকে না। একাকার হইয়া যাওয়ার অর্থই পঞ্চত্ব পাওয়া। অতএব আমাদের সাহিত্য যদি বাঁচিতে চায়, তাহা হইলে ভাল করিয়া বাঙ্গালা হইতে শিখুক।...প্রেমের তারের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তড়িৎ খেলাইতে থাকে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের খবর নিমিষের মধ্যে প্রাণের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহার কাছে বসিয়া থাক, অদৃশ্য প্রেমের তার দিয়া তাহার প্রাণ হইতে তোমার প্রাণে বিদ্যুৎ বহিতে থাকে...।

পদার্থবিদ্যা ও প্রেমের এমন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক কল্পনা খুবই চমকপ্রদ, কিন্তু উপায় নেই। সব বিষয়েই বিজ্ঞানের ছবি জাগছে পাশাপাশি, বিজ্ঞানে মন এমনই আচ্ছন্ন হয়ে আছে বাল্যকাল থেকে। 'কাব্যের অবস্থা-পরিবর্তন' নামক প্রবন্ধেও (১৮৮১) স্বাধীনভাবে বিজ্ঞান থেকে উপমা টেনে এনে বক্তব্যকে সরল করা হয়েছে—

প্রথমে সৌরজগৎ একটি বাষ্পচক্র ছিল মাত্র, পরে তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহ উপগ্রহ সকল সৃজিত হইল। এখনকার মতন তখন বৈচিত্র্য ছিল না। আমাদের এই বিচিত্রতাময় খণ্ড ও গীতিকাব্য সমূহের বীজ মাত্র সেই সৌর মহাকাব্যের মধ্যে ছিল।...সকলেরই মূল কারণ মাত্র ছিল। এখন বিচ্ছিন্ন হইয়া সৌরজগৎ পরিপূর্ণতর হইয়াছে।...এখন সৌরজগতের মহত্ত্ব অনুধাবন করিতে হইলে এই বিচ্ছিন্ন, অথচ আকর্ষণ-সূত্রে বদ্ধ মহারাজ্য-তন্ত্রকে একত্র করিয়া দেখিতে হইবে...। সৌরজগতের কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া কাজের ভাগ না করিলে কোন মতেই চলে না। যদি আধুনিক বিজ্ঞান-রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়াও কিয়দ্দূর যাওয়া যায়, যদি এই একত্র-সম্মিলিত বাষ্পরাশিগত অবস্থার পূর্বেও আর কোন অবস্থা থাকে এমন অনুমান করা যায়, তবে তাহা নানা স্বতন্ত্র আদিভূত সমূহের অস্ফুট ভাবে পৃথক ভাবে বিশৃঙ্খল সঞ্চরণ, পরস্পর সংঘর্ষ। যাহাকে ইংরাজিতে chaos বলিয়া থাকে। প্রথমে বিশৃঙ্খল পার্থক্য, পরে একত্র সম্মিলন, ও তাহার পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিচ্ছেদ। আমাদের বুদ্ধির রাজ্যেও এই নিয়ম। প্রথমে কতকগুলা বিশৃঙ্খল পৃথক সত্য, পরে তাহাদের এক শ্রেণী বদ্ধ করা ও তৎপরে তাহাদের পরিস্ফুট বিভাগ। সমাজেও এই নিয়ম। প্রথমে বিশৃঙ্খল পৃথক পৃথক ব্যক্তি, পরে তাহাদের এক শাসনে দৃঢ়রূপে একত্রীকরণ, তাহার পর প্রত্যেক ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত ও যথোপযুক্ত পরিমাণে সুশৃঙ্খল স্বাতন্ত্র্য, সুসংযত স্বাধীনতা; কবিতাতেও এই নিয়ম খাটে।

অথবা—

অভিব্যক্তি-বাদকে প্রাণীজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে কেন? অভিব্যক্তি-বাদ আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছে? না, কিছুই আকাশ হইতে পড়িয়া হয় না, প্রকৃতিতে কিছুরই হঠাৎ মাঝখানে আরম্ভ নাই।

—জগৎপীড়া, ১৮৮২

সাহিত্যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানে সাহিত্য

এতক্ষণে একটি বিষয় অবশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমাদের দেশে অন্ততঃ, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই সাহিত্যের কথার মধ্যে এমন অবলীলাক্রমে বিজ্ঞান প্রবেশ করেছে। প্রকৃতই এর তুলনা বিরল। এবং এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের পাঠক অদ্যাবধি এ রকম উপমা-প্রয়োগে কোনো অসুবিধা বোধ করেন নি। এমন-কি যাঁরা রবীন্দ্রনাথের

সাহিত্যজীবনের আরম্ভ থেকেই তাঁর ত্রুটি খুঁজেছেন, তাঁরাও এই অভিনবত্বকে সন্দেহের চোখে দেখেন নি।

এ কথা উত্থাপনের কারণ আছে। কারণটা হচ্ছে এই যে সাহিত্যে বিজ্ঞানের উদার প্রবেশে কোনো আপত্তি না থাকলেও বিজ্ঞানে সাহিত্যের প্রবেশ যথাসম্ভব ঠেকিয়ে রাখা হয়। আগেও হয়েছে, এখনও হয়ে থাকে। ইংল্যাণ্ডে যখন রয়্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয় (১৬৬০), সে সময় তখনকার প্রধান বিজ্ঞানীরা তাতে যোগ দেন, কিন্তু সার টমাস ব্রাউনের নাম তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না। এ সম্পর্কে কম্পটন রিকেট মন্তব্য করেছেন—

A notable exclusion from the list of members was the learned Sir Thomas Browne, probably owing to his literary style, since the Society insisted on its members adhering to a plain matter-of-fact language that could be understood by the ordinary artisan.—*A History of English Literature*

রাজশেখর বসুর মতেও 'বিজ্ঞানদর্শনাদির আলোচনায় উচ্ছ্বসিত ভাষা অনর্থকর।'— 'বিচিন্তা', ১৯৫৫

এমনি অবস্থায় সাহিত্য বিষয়ে বক্তব্য সহজ করার জন্য বিজ্ঞান বিষয়ের উপমা কেমন আত্মগোপন করে সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে আছে ভাবলে অবাক হতে হয়। তার কারণ উপমাপ্রয়োগে কোথাও কৃত্রিমতা নেই, আর সাহিত্য এমনই উদার যে তার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে এলে সবারই সেখানে অবারিত দ্বার।

জীবনদর্শন গঠনে বিজ্ঞানের ভূমিকা

কবি যে-সত্য কল্পনায় দেখেছেন, সব সময় বিজ্ঞান এসে তা তাঁর জ্ঞানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই রাত্রিদিন বা উদয়াস্ত বা জন্মমৃত্যুর আবর্তনের যে ছবি তিনি সহজ বোধের মধ্যে পেয়েছেন, তা যখন বৈজ্ঞানিক সত্য রূপে জ্ঞানের মধ্যে পেলেন, তখন তাঁর কল্পনার সৌন্দর্য আরও বাড়ল। ছোট ও বড়র ঐকসুরের সম্পর্কটি আরও একবার গানের ভিতর দিয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠল—

> …নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হতে
> অরণ্যের পতঙ্গ অবধি, মিলাইছে এক স্রোতে
> সংগীতের তরঙ্গিণী বৈকুণ্ঠের শান্তিসিন্ধুপারে।
>
> —ভাষা ও ছন্দ, ১৮৯৯

অ্যাস্ট্রনমি ও এন্‌টমোলজি— জ্যোতির্বিজ্ঞান ও কীটতত্ত্ব, দুইয়ের জ্ঞানই এই কটি ছত্রের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে আছে। ছোটকে ও বড়কে একই ছন্দের মধ্যে আবিষ্কার। ছোটকে ছোটর গণ্ডির মধ্যে স্থায়ীভাবে মানা চলবে না। বড়র সঙ্গে, বিশ্বের সঙ্গে তার আত্মীয়তা আবিষ্কার

করতে হবে। এমন-কি মানুষের ভাষা অর্থ দিয়ে ঘেরা থাকবে তাও তাঁর কাছে পূর্ণ সত্য নয়। অর্থবদ্ধ ভাষা মানুষের চার দিকে ঘুরে মরে, তার বাইরে যেতে পারে না। কবির আশা, সেই ভাষাতেও তিনি নতুন সুর যোজনা ক'রে তাকে ভাবের স্বাধীন লোকে নিয়ে যাবেন— 'সে আশায় ভাসে চিত্ত মম।'

এক সুরে বাঁধা থাকলেই ছোটর সঙ্গে বড়র সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। ছোটও তখন সত্য হয় ছোট পরিসরে। সুর থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তা আর ছোট পরিসরেও সত্য থাকে না। যেমন—

> আমাদের কোন একটা প্রবৃত্তি উন্মত্ত হইয়া উঠিলে সেও আমাদিগকে নিখিলের প্রবাহ হইতে টানিয়া লইয়া একটা বিন্দুর উপরেই ঘুরাইয়া মারিতে থাকে।···সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে দেখিলে যাহাকে হঠাৎ মনোহর বলিয়া বোধ হয়, নিখিলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার সৌন্দর্যের বিরোধ চোখে পড়ে। মদের বৈঠকে মাতাল জগৎ-সংসারকে ভুলিয়া গিয়া নিজেদের সভাকে বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া মনে করে, কিন্তু অপ্রমত্ত দর্শক চারি দিকের সংসারের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার বীভৎসতা বুঝিতে পারে। আমাদের প্রবৃত্তির উৎপাত যখন ঘটে, তখন সে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিলাভ করিলেও বৃহৎ বিশ্বের মাঝখানে তাহাকে ধরিয়া দেখিলেই তাহার কুশ্রীতা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এমনি করিয়া স্থিরভাবে যে ব্যক্তি বড়োর সঙ্গে ছোটোকে সমগ্রের সঙ্গে প্রত্যেককে মিলাইয়া দেখিতে না জানে, সে উত্তেজনাকেই আনন্দ ও বিকৃতিকেই সৌন্দর্য বলিয়া ভ্রম করে।
>
> —সৌন্দর্যবোধ, ১৯০৭

কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্যে আমি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাটাকেই অনুসরণ করে চলেছি। সে জন্য বার বার আমাকে তাঁর ঐ বড় পটভূমির সঙ্গে ছোটকে মিলিয়ে দেখার আজন্ম অভ্যাসটির কথা উল্লেখ করতে হয়েছে। তার কারণ কবি এই দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যেই তাঁর মূল লক্ষ্যটিতে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন। ইন্দ্রিয়ের বোধের ভিতর দিয়ে ইন্দ্রিয়াতীতের লক্ষ্যে। এর মধ্যে কোথাও মত্ততা নেই, মাদকতা নেই, এ হচ্ছে মূলতঃ নিজেকেই বিশ্বের বুকে মেলে ধ'রে চেতনার মধ্যে বিশ্বের সঙ্গে একাত্মকতা অনুভব করা।

বিজ্ঞানের পক্ষসমর্থনে কবির ভূমিকা

আধুনিক বিজ্ঞানের যত কিছু আবিষ্কার তার প্রায় কোনো অঙ্গই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা থেকে বাদ পড়ে নি। শিক্ষকের কাছে তিনি সামান্যই পড়েছেন, তার বাইরে নিজের জ্ঞানতৃষার্ত মনের আপন গরজে বিজ্ঞানের প্রায় সকল সংবাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। তার প্রমাণ তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন তাঁর প্রথম দিকের প্রায় সকল লেখাতে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রহস্যের পর রহস্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে আর তা কবিকে মুগ্ধ করছে। এ এক অদ্ভুত বিস্ময়। এক দিকে অজস্র গীতিকবিতা লেখা চলছে, অন্য দিকে চলছে বিজ্ঞানের বিস্ময়মিশ্রিত প্রবন্ধ রচনা, এবং সে বিস্ময় কবিতার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্য তাঁকে কোনোমতেই স্থির থাকতে দিচ্ছে না। চিন্তাধারা তাঁর এমনই স্বচ্ছ যে, যাঁরা বলছেন প্রকৃতির রহস্য ভেদ হলে কাব্যের কল্পনাসীমা খাটো

হয়ে যাবে, তাঁদের কথায় তিনি আদৌ চিন্তিত হচ্ছেন না, কারণ তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন প্রকৃতির অনন্ত রহস্য ভেদ করা মানুষের সাধ্য নয়। এবং শুধু তাই নয়, তিনি স্বয়ং কবি হয়ে বিজ্ঞানের পক্ষ সমর্থনে লেগেছেন—

…একদল পণ্ডিত বলেন যে, যতদিন অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব থাকে ততদিন কবিতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব সভ্যতার দিবসালোকে কবিতা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। আচ্ছা, তাহাই মানিলাম। মনে কর কবিতা নিশাচর পক্ষী। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, জ্ঞানের অনুশীলন যতই হইতেছে, অজ্ঞানের অন্ধকার ততই বাড়িতেছে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন? বিজ্ঞানের আলো আর কি করেন, কেবল "makes the darkness visible"। বিজ্ঞান প্রত্যহ অন্ধকার আবিষ্কার করিতেছেন। অন্ধকারের মানচিত্র ক্রমেই বাড়িতেছে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক কলম্বস-সমূহ নূতন নূতন অন্ধকারের মহাদেশ বাহির করিতেছেন। নিশাচরী কবিতার পক্ষে এমন সুখের সময় আর কি হইতে পারে! সে রহস্য-প্রিয়, কিন্তু এত বড় রহস্য কি আর কোন কালে ছিল! এখন একটা রহস্যের আবরণ খুঁজিতে গিয়া দশটা রহস্য বাহির হইয়া পড়িতেছে।"

—কাব্যের অবস্থা-পরিবর্তন, ১৮৮১

বিজ্ঞান ক্রমে রহস্য বাড়াবে, এও বিজ্ঞানের প্রতি কবির আকর্ষণের অন্যতম হেতু। উপরের ঐ কথাগুলিতে মনে হয় যেন কবির উপরেই ভার পড়েছে বিজ্ঞানের মহাসত্যের মন্দিরের দেউড়ি রক্ষার। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে মন্দির পাহারা দিচ্ছেন আর অবিশ্বাসীর আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করছেন। এ এক আশ্চর্য দৃশ্য।

জানা যে কোনোদিনই ফুরিয়ে যাবে না, তা সে 'আপনাকে' জানাই হোক আর বাইরের বিশ্বকে জানাই হোক। তাই তিনি জ্ঞানের পথে চলতে সংকুচিত নন, মনেপ্রাণে কবি হয়েও বিজ্ঞানের সমর্থনে তাই তিনি অকুণ্ঠ।

বাংলাদেশে বিজ্ঞানের পটভূমি

রবীন্দ্রনাথের জন্মের (১৮৬১) বহু পূর্ব থেকেই (প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্ব থেকেই) বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেছে। তার মানে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের সংবাদও প্রচারিত হয়েছে, এবং শিক্ষিতদের মধ্যে একটি প্রধান দল বিজ্ঞানের পরম অনুরাগী হয়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রচারে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। তাঁরা সাময়িক পত্রের সাহায্যে এবং নানা বিষয়ে বাংলা বই লিখে বিজ্ঞান প্রচার করেছেন এদেশে। সাময়িক পত্রের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই প্রধান। এই পত্রিকাটি অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় (১৮৪৩-৫৫) নিয়মিত বিজ্ঞান আলোচনার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় এবং সেজন্য এর জনপ্রিয়তাও বাড়ে।

কিন্তু অক্ষয়কুমারের (১৮২০-১৮৮৬) বিজ্ঞানে বিশ্বাস এবং অলৌকিকত্বে অবিশ্বাস সম-সাময়িক আর সবার উর্ধ্বে। অবশ্য তাঁর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার আগে বিজ্ঞানের

অনেক অনুবাদ-বই বা ইংরেজীর উপর ভিত্তি করে লেখা বই বাংলায় লেখা হয়েছে। এই সময়ে যাঁরা বিজ্ঞানপ্রচারে উৎসাহী হন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই খ্যাতনামা এবং তাঁদের বয়সের পার্থক্যও খুব বেশি নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত— দুজনেরই জন্ম ১৮২০। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৩, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮২২, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮২৫, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১৮৪৩, মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৩৩, যোগেশচন্দ্র রায় ১৮৫৯, জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৫৮, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৮৬১ (রবীন্দ্রনাথের সমবয়স্ক)।

রবীন্দ্র-পূর্ববর্তীদের কয়েকজনের কথাই প্রধানতঃ বলা হল। একটা চমকপ্রদ ব্যাপার লক্ষ করা যায় এই যে, এই সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১২ থেকে ১৬ পৃষ্ঠার কাগজ !) অধিকতর জনপ্রিয় হয়েছিল বিজ্ঞান আলোচনার জন্য। শাস্ত্রাদি আলোচনা এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান। ভাষা আগাগোড়া সরল এবং আকর্ষক। আজ ১৯৬১তে এ কথাটা স্মরণীয় এ জন্য যে এখন বিজ্ঞান অকল্পিতপূর্ব উন্নতির পথে এগিয়ে এসেছে, অথচ আজ বাংলাদেশের অনেক বিখ্যাত পত্রিকাতেও বিজ্ঞানের নামগন্ধ থাকে না।

এ থেকে প্রমাণ হয় আমাদের দেশে যে জ্ঞানের যুগ এসেছিল, তাকে এগিয়ে নেবার মতো শক্তি আমাদের আর অবশিষ্ট নেই। সেইজন্যই আরও বিশেষ করে এই কথাটা বলা দরকার যে বিজ্ঞানসাহিত্যে আমাদের যে উত্তরাধিকার স্বাভাবিক ছিল, তা আমরা হয়তো হারিয়েছি। এবং সাধারণভাবে বিজ্ঞানসাহিত্য বাংলা ভাষায় যা প্রচার হচ্ছে তার প্রায় অধিকাংশই ভ্রমাত্মক। শেষ পর্যন্ত কবি রবীন্দ্রনাথকেই 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) নামক বিজ্ঞানের বই লিখতে হয়েছিল, কিন্তু তা এমন সময় যখন তাঁর গদ্যরীতির অনেক বদল হয়েছে এবং আগের সরলতা আর নেই। তবু এ বই নির্ভুল এবং সুখপাঠ্য, যদিও আধুনিক কালে আরও সংযোজন দরকার।

যাই হোক রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের বিজ্ঞানপ্রচারনিষ্ঠরা এ যুগে তাঁদের উত্তরাধিকার হারিয়েছেন। সেজন্য আজ মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে বা তাঁর সমকালে যাঁরা বিজ্ঞান প্রচার করেছেন তাঁরা অধিকাংশই বিজ্ঞানী ছিলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অথবা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞানী ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের পিতাও বিজ্ঞানী ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাঁর সমসাময়িক কালের বিজ্ঞানের আবহাওয়াকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানশিক্ষা অনেকখানি তাঁর পিতার কাছেই পাওয়া। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মনে বিজ্ঞানের কৌতূহল জাগিয়েছিলেন তিনিই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে নিজে কতখানি বিজ্ঞানপ্রিয় ছিলেন তা জানা যাবে অজিতকুমার চক্রবর্তী -রচিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' নামক জীবনীগ্রন্থে। তিনি লিখছেন—

১৮৯৩ সালে পার্ক স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকিবার সময় বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প বলার ছলে "জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি" সম্বন্ধে তিনি ধারাবাহিকভাবে যে উপদেশগুলি দিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে তাঁহার মনের প্রসার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), ভূতত্ত্ব (Geology), জীবতত্ত্ব (Biology),

নৃতত্ত্ব (Anthropology)...এ সমস্ত বিষয়গুলির মধ্যে তাঁহার কি অসাধারণ প্রবেশ ছিল! সমস্ত বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া বিধাতার সৃষ্টির অভিপ্রায়টি যে কেমন করিয়া ক্রমশঃ পরিণাম লাভ করিতেছে...ঐ গ্রন্থে তাহাই তিনি বিশেষ ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং ঐ গ্রন্থ এক হিসাবে মানুষের অভিব্যক্তি (The Evolution of Man) ও ধর্মের অভিব্যক্তির (The Evolution of Religion) একটি মোটামুটি রকমের চমৎকার ইতিহাস।

এই কটি কথা পড়লে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের বিষয়ে প্রেরণার উৎস সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

বাংলাদেশে রবীন্দ্র-পূর্ব বিজ্ঞান-সাহিত্য বিষয়ে আলোচনার কথা বলা হল, কিন্তু তারও পিছনে ইউরোপে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বিজ্ঞান কি পরিমাণ এগিয়েছে তার একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল, অর্থাৎ উনবিংশ শতকের তিন ভাগ প্রায় শেষ হয় এমনি সময়ে, বিজ্ঞান তার সূচনার ধাপ পার হয়ে এসেছে। প্রধান প্রধান আবিষ্কার অধিকাংশই তখন শেষ হয়েছে এবং বিজ্ঞান পরবর্তী ধাপের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল ছাত্ররূপে কাটিয়েছেন ইংল্যাণ্ডে। সুতরাং তিনি ঘরে বাইরে সর্বত্রই বিজ্ঞানের আবহাওয়া নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। অতএব তাঁর মতো প্রতিভার পক্ষে বিজ্ঞানের খবর যে মস্ত বড় একটা প্রেরণার কাজ করবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান

পূর্ব শতকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। হেরশেল (১৭৩৮-১৮২২) এই শতকের শেষ দিকে ইউরেনাস আবিষ্কার করেন এবং ৮০০টি যুগ্মতারার অস্তিত্ব টের পান। মহাকর্ষ সৌরজগৎ উত্তীর্ণ হয়েও কাজ করছে তা বোঝা যায় এই যুগ্মতারাদের প্রত্যেক জোড়া একে অপরকে বেষ্টন করে ঘুরছে তা থেকে। ইনি ২০০০ নেবুলা বা নীহারিকার সন্ধান পান এবং অনুমান করেন ঐ সব নীহারিকা নতুন সূর্য এবং গ্রহ গঠনের এক একটি পর্যায়। হ্যালি (১৬৫৬-১৭৪২) ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করেন। এই সময় কতগুলি 'স্থির' নক্ষত্র যে স্থির নয় তা আবিষ্কৃত হয়। লাপ্লাসের (১৭৪৯-১৮২৭) নীহারিকাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়। রাম্‌ফোর্ড পরীক্ষা চালিয়ে তাপ যে গতিরই একটি রূপ এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। শব্দ নিয়ে গবেষণা করেন হক্‌সবী, তিনি ১৭০৫ সালে শব্দ বায়ু-নির্ভর প্রমাণ করেন। আকাশের সৌদামিনী যে তড়িৎধর্মী তা ফ্র্যাঙ্কলিনের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়। গালভানি ও ভোলটার নাম 'গ্যালভানিক' ব্যাটারি, 'গ্যালভানিজম', 'ভোলটেইক পাইল', 'ভোলটেজ' প্রভৃতি বিদ্যুৎসম্পর্কিত বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অমর হয়েছে।

রসায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয়েছে এ শতকে এবং ঐ সঙ্গে পুরনো অনেক মত বাতিল হয়ে গেছে। ফ্লজিস্টনতত্ত্ব (ষ্টীল প্রচারিত) নস্যাৎ হয়ে যায়। আগে ধারণা ছিল

কোনো ধাতু পোড়ালে যে রূপান্তর ঘটে তার নাম ক্যালক্স, তার অর্থ করা হয়েছিল ধাতু ক্যালক্স ও ফ্লজিস্টন দিয়ে তৈরি, পোড়াবার পর ফ্লজিস্টন হাওয়ায় মিশে যায়, ক্যালক্স পড়ে থাকে। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কিছুই বেরিয়ে যায় না, উপরন্তু অক্সিজেন যোগ হয়। প্রিস্টলি এবং শীলে পৃথকভাবে অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। পারদের ক্যালক্স উত্তপ্ত করে এই গ্যাস পাওয়া যায়। এ থেকে লাভোয়াসিয়ের দহনক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন। ক্যাভেণ্ডিশ হাইড্রোজেন আবিষ্কার করেন এবং অক্সিজেনের সঙ্গে তার যৌগিক মিলন ঘটিয়ে জল তৈরি করতে সক্ষম হন। লাভোয়াসিয়েরই তাঁর কালের সমস্ত রাসায়নিক গবেষণার লব্ধ তথ্যকে প্রকৃত রসায়নের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন, রাসায়নিকসমূহের বিজ্ঞানসম্মত নাম দেন, রাসায়নিক সমীকরণ বা কেমিক্যাল ইকোয়েশনের দৃষ্টান্ত দেখান এবং বস্তুর নিত্যতা বা conservation of matter-এর তত্ত্ব গঠন করেন।

এ শতকে স্টীম এঞ্জিন আবিষ্কৃত হয় এবং জৈববিজ্ঞানও অনেকটা এগিয়ে আসে। বাফন তাঁর সময় পর্যন্ত (১৭৮৮) প্রাণীসমূহের আবহাওয়াভেদে কোথায় কিভাবে অবস্থান এবং তাদের আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন তাঁর ন্যাচরাল হিস্টরি নামক গ্রন্থে। তুলনামূলক অনেক গবেষণা চলে। কবি গোয়েটের উদ্ভিদের রূপান্তর (metamorphosis) গ্রন্থ থেকে বিবর্তনের ধারণাটি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে থাকে। এ সময়ে ফসিল বা শিলীভূত দেহ ইত্যাদি এবং ভূতত্ত্ব নিয়ে অনেক গবেষণা হয়। হাটন তাঁর *Theory of the Earth* (১৭৮৮) গ্রন্থে ভূবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। জেনার সংক্রামক বসন্ত রোগ নিরোধক টিকার আবিষ্কার করেন।

বিশুদ্ধ গণিতে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ নিয়মবদ্ধ জ্যামিতির বাইরে জ্যামিতি গড়া সম্ভব, এই বিপ্লবকারী তথ্য আবিষ্কৃত হয়।

উনবিংশ শতকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান

উনবিংশ শতকে বিজ্ঞান নানা দিকে এমন ব্যাপকভাবে উন্নতিলাভ করেছে যে, সামান্য পরিসরে তার অংশবিশেষও যথার্থ ভাবে বর্ণনা করা চলবে না। তবু একটা স্থূল চেহারা খাড়া করছি। জ্যোতির্বিজ্ঞান আকাশ-রহস্য ভেদে দুটি বড় সাহায্য লাভ করেছে, একটি ফোটোগ্রাফি অন্যটি স্পেক্‌ট্রোস্কোপি বা বর্ণালীবীক্ষণ। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে কয়েকটি নাম এই শতকে বিখ্যাত হয়েছে— যথা লর্ড কেলভিন, ওয়েরস্টেড, অ্যাম্পিয়ার (আঁপের), নয়মান, ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল, ওহ্‌ম, জুল বেবের প্রভৃতি। এঁদের গবেষণায় তড়িত্তত্ত্ব ও তড়িতের ব্যবহারক্ষেত্র বিস্তার লাভ করেছে অনেকখানি। রসায়নে ডলটনের পরমাণুবাদ সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি প্রচার করলেন প্রত্যেকটি মূল পদার্থ বিশেষ জাতীয় পরমাণুতে গড়া, এবং প্রত্যেক জাতীয় পরমাণুর নিজস্ব বিশেষ ওজন আছে ইত্যাদি। তা-ভিন্ন দুটি মূল পদার্থ যখন একত্র মেলে তখন প্রতিটি পরমাণু অন্য পদার্থের একটিমাত্র পরমাণুর সঙ্গে মেলে, এবং দুইয়ের পৃথক ওজন যোগে সেই

যৌগিকের ওজন পাওয়া যায়। এই ভাবে তিনি হাইড্রোজেন পরমাণুকে একক ধরে নিয়ে তার সম্পর্কে তাঁর সময়ের জানা মৌলগুলির পারমাণবিক ওজন নির্ধারণ করেন, যদিও তাঁর এই হিসাবে ভুল ছিল। ১৮০৯ সালে গে-লুসাক প্রচার করেন— গ্যাসসমূহ পরস্পর ঘনমানের সহজ অনুপাতে মেলে। এর পর ১৮১১ সালে অ্যাভোগ্যাড্রো পরমাণু-গুচ্ছ রূপে অণু এবং একক পরমাণুর পার্থক্য লক্ষ করেন এবং মৌলিক গ্যাসে অণুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। অণু অর্থাৎ মোলিকিউল।

এই শতকে উইলিয়াম প্রাউট (১৭৮৫-১৮৫০) প্রচার করেন মূল পদার্থ মাত্রেই হাইড্রোজেন থেকে উদ্ভূত। এটি প্রাউট-তত্ত্ব নামে খ্যাত। মূলে সবই এক এই ধারণা গঠনে এই তত্ত্ব খুবই সাহায্য করে। উল্লেখযোগ্য এই যে, এই শতকের গোড়ার দিকে ৩০টি মৌলের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু শেষের দিকে প্রায় ৮০টির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। উনবিংশ শতকের আর একটি উল্লেখ-যোগ্য আবিষ্কার হচ্ছে ভোলের কর্তৃক ১৮১৪ সালে অজৈব বস্তু থেকে জৈব বস্তু সৃষ্টি। রাসায়নিক ইতিহাসে এ কৃতিত্ব এই প্রথম।

জৈববিজ্ঞান দ্রুত এগিয়ে চলেছে। পাস্তোয়র কর্তৃক জীবাণুসম্পর্কিত গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লিউবেনহুক প্রথম (১৬৮৩) দণ্ডাকৃতি অণুবীক্ষণদৃশ্য জীবাণুর অস্তিত্ব লক্ষ করেন, কিন্তু তাঁর এ আবিষ্কার অনুল্লেখ্যবোধে চাপা পড়ে যায়। এর দু শ বছর পরে শ্‌বান নামক এক জারমান শারীরতত্ত্ববিদ, পচন এবং সুরাউৎপন্নকারী গাঁজন-ক্রিয়া যে জীবাণুদ্বারা ঘটে তা প্রমাণ করেন এবং জারম্ থিওরি প্রবর্তন করেন। পাস্তোয়র এর পর থেকে গবেষণা চালিয়ে ব্যাকটিরিও-লজি বা জীবাণুতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর ফলে লিস্টার ১৮৮৭ সালে পচন-রোধক অস্ত্রবিদ্যা প্রবর্তনে সক্ষম হন। তার আগেই ডেভি প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা নির্বেদন বা নিঃসাড়কারী রাসায়নিক আবিষ্কার করেছিলেন। এই দুইয়ে মিলে অস্ত্রচিকিৎসা নিরাপদ হতে পেরেছিল।

ভ্রূণবিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি হয়। কার্ল এর্ন্‌স্ট ফন বের নামক জারমান প্রাণীবিজ্ঞানী প্রথম নিষিক্ত কোষ থেকে ভ্রূণবৃদ্ধির কৌশলটি লক্ষ করেন। আরম্ভে কোষ থাকে সমজাতীয়, কিন্তু ক্রমে কোষবিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শ্রেণীভেদ আরম্ভ হয়ে যায়। বের এই তথ্যটি প্রথম আবিষ্কার করেন। অর্থাৎ কোষের এক-একটি স্তর থেকে এক-এক জাতীয় দেহাঙ্গ জন্মায়। এক স্তর থেকে স্নায়ু, এক স্তর থেকে ত্বক, বা এই রকম। তিনি এর নাম দিলেন কোষস্তর বা বীজাণুস্তর। কোষতত্ত্ব এইখান থেকে উন্নতির পথে যাত্রা করে। এর পর, আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় বার বার প্রাণীকুলের ধারাকে প্রতিহত করেছে— এই মতকে মিথ্যা প্রমাণ করেন লাইয়েল তাঁর প্রিনসিপ্‌ল্‌স অভ জিওলজি (১৮৩০) বইতে। তার পর ১৮৪৫ সালে ডারউইন বিবর্তনের ইঙ্গিত দেন, এবং ১৮৫৯ সালে তিনি ওরিজিন অভ স্পিসিজ (বা প্রজাতির উৎপত্তি) প্রকাশ করেন।

সব সত্যই প্রাকৃত সত্য

এই হল দুই শতকের বিজ্ঞানের মোটামুটি চেহারা। রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রত্যেকটি চিন্তার মধ্যে এই সব আবিষ্কারের কোনো-না-কোনো অংশ অনুপ্রবেশ করেছিল তাঁর প্রথম জীবনেই। কিন্তু তবু পৃথিবীর জন্মতত্ত্ব, প্রাণের আবির্ভাব এবং বিবর্তন— প্রকৃতিবিজ্ঞানের এই দিকগুলিই তাঁকে সব চেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল।

বর্তমানের স্থলজলগাছপালা কীটপতঙ্গপশুপাখিমানুষপূর্ণ পৃথিবী এককালে উদ্দীপ্ত গ্যাসপিণ্ড ছিল (লাপ্লাস)। তার পর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে জমে মোটামুটি একটা আকার গ্রহণ করল। তখনো কিন্তু সবটাই জল, তারপর মাটি জাগল, তার পর ধীরে ধীরে প্রাণ। এই প্রাণের আবির্ভাব ঘটবে বলেই এত আয়োজন। প্রথমে সব একাকার ছিল, জড়ের মধ্যে জীবনের সম্ভাবনা ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, কত অযুত নিযুত বছর ধরে এমনি চলতে চলতে সেই রূপহীন সম্ভাবনা কি বিচিত্র রূপে ফুটে উঠল, আর সেই বিচিত্র রূপ দেখবার চোখ আর মন নিয়ে এলো মানুষ। চোখ না থাকলে আলো-অন্ধকার নেই, রং নেই, কান না থাকলে শব্দ নেই, চেতনা না থাকলে সাড়া নেই, মন না থাকলে জিজ্ঞাসা নেই, বিস্ময় নেই। তাই কি মানুষ এলো সব বোধ আর চেতনা নিয়ে ?

'আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি' কিংবা 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা' কিংবা 'আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা···মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।'— এ সবই কবির যুক্তিসংগত কল্পনা বা উপলব্ধি বা অনুভূতি।

একই সত্যের দুটি দিক

কিন্তু এভাবে কথা বলা বা এরকম আপাত-নিরালম্ব হাইপথেসিস খাড়া করা বা যে সত্য প্রমাণিত করার কোনো চেষ্টা নেই তাকে সত্যরূপে প্রকাশ করা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিষেধ। এ জিনিস বিজ্ঞানীরা মানেন না। খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত জীবনে কোনো উপলক্ষেই বিজ্ঞানীর ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। একবার মাত্র তিনি বিজ্ঞানের বই লিখেছেন এবং সেখানে তিনি সেই সময়ের জন্য কবিধর্ম ছেড়েছিলেন। যেখানে তিনি কবি, সেইখানে তাঁর কল্পনা কোনো বাধা মানে না, সেইখানে তাঁর কবিজনোচিত উপলব্ধি। তাঁর কাছে এই উপলব্ধি প্রায় বিজ্ঞানের সত্য। আলো-আঁধার জন্ম-মৃত্যুর মতোই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতিজাত সত্য তাঁর কাছে একটি অখণ্ড সত্যের দুটি ভাগ। বস্তুজগৎ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু, সব তাঁর কাছে বড় সত্যের অংশ, এক অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়— দুই মিলে অবিচ্ছিন্ন সত্য। অতএব কোনোদিন এ অপবাদ তাঁকে দেওয়া যাবে না যে তিনি 'strictly scientific on weekdays and super-naturist on Sundays.' কারণ অতিপ্রাকৃত তাঁর কল্পনায় আছে কি না সন্দেহ, সমস্ত সত্য

তাঁর কাছে প্রাকৃত, বিশ্বপ্রকৃতিতে যাকেই তিনি সত্য বলে মেনেছেন তাই তাঁর কাছে প্রাকৃত। অতএব দুটি পৃথক ব্যক্তিসত্তার প্রশ্ন ওঠে না রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে, কারণ সব সত্যই তাঁর কাছে অভিন্ন জাতের।

বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ক্রমাগত একের প্রতি ধাবমান হইতেছে। সহজচক্ষে যাহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল, তাহারাও অভেদাত্মা হইয়া দাঁড়াইতেছে।...জ্ঞানে যাহারা বর্বর তাহারা যেমন জগতে বৈজ্ঞানিক ঐক্য দার্শনিক ঐক্য দেখিতেও পারে না বুঝিতেও পারে না, তেমনি ভাবে যাহারা বর্বর, তাহারা কবিতাগত ঐক্য দেখিতেও পায় না বুঝিতেও পারে না।...কবিতা বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চলিতেছে, কিন্তু একই জায়গায় আসিয়া মিলিবে।

—ডুব দেওয়া : তুলনায় অরুচি, ১৮৮৪

রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের মূলসূত্র

চব্বিশ বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনদর্শনের উন্মেষ ঘটেছে। মূলসূত্রটি তিনি পেয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে নি।

এই মূলসূত্রটি কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করতে হবে। আমি কবির বিবর্তনবাদে আকর্ষণের কথা আগে বলেছি। আজ যে মননশক্তিসহ কবির সত্তা মানুষরূপে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, তার সম্ভাবনা পৃথিবীর সমস্ত অণুপরমাণুর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল, এ কথা কল্পনা করতে কবির আনন্দ। এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভ হওয়ার আগেই তাঁর প্রকৃতির প্রতি সহজ আকর্ষণ ছিল। এই সহজ বোধের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমর্থন তাঁর মনকে এমনই উদ্বেল করে তুলেছিল যে এর বিস্ময় তিনি যত রকমে সম্ভব প্রকাশ করেও যেন তৃপ্তি পাচ্ছেন না। প্রকৃতির প্রতি তাঁর টান আত্মীয়তার টান। তাঁর এই মনোভাব গঠনে বিজ্ঞান সাহায্য করার আগে তিনি উপনিষদের শিক্ষাও পেয়েছিলেন, যা তাঁকে একের শিক্ষা দিয়েছিল। বিভিন্নতা একেরই বিভিন্নতা, বস্তুতঃ বিভিন্ন নয়। অতএব মন বলছে এ কথা, বিজ্ঞান সমর্থন করছে এ কথা।

জড় হইতে জন্তু এবং জন্তু হইতে মানুষ পর্যন্ত যে একটি অবিচ্ছেদ্য ঐক্য আছে এ কথা আমাদের কাছে অত্যদ্ভুত বোধ হয় না; কারণ বিজ্ঞান এ কথার আভাস দিবার পূর্বে আমরা অন্তর হইতে এ কথা জানিয়াছিলাম।

—পঞ্চভূত (১৮৯৭), সৌন্দর্যের সম্বন্ধ

এখানে 'আমরা' অর্থ ভারতবর্ষ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই বোধ তাঁর প্রতি স্নায়ুতে জড়িত, প্রতি বিন্দু রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত। কাব্যে গানে প্রবন্ধে শত রকমে বলছেন। তাই তাঁর কাছ থেকে বিজ্ঞান-প্রেরিত বিচিত্র সাহিত্য আমরা উপহার পেয়েছি। বিস্ময়ের কোথাও শেষ নেই।

একবার চেয়ে দেখুন কী বিপুল বল।...পৃথিবীর সৃষ্টির আরম্ভ থেকে এই ডাঙায় জলে লড়াই চলছে—ডাঙা ধীরে ধীরে এক-এক পা ক'রে আপনার অধিকার বিস্তার করছে...আর পরাজিত সমুদ্র পিছু হটে হটে কেবল

ফুঁসে ফুঁসে বক্ষে করাঘাত করে মরছে। মনে রাখবেন এক কালে সমুদ্রের একাধিপত্য ছিল— তখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভূমি তারই গর্ভ থেকে উঠে তার সিংহাসন কেড়ে নিয়েছে…

—ছিন্নপত্র ১, ১৮৮৫

অথবা উপমার ছলে—

…বিলের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। এই বিলগুলো ভারী অদ্ভুত, কোনো আকার আয়তন নেই, জলে স্থলে একাকার, পৃথিবী সমুদ্রগর্ভ থেকে নতুন জেগে উঠবার সময় যেমন ছিল।

—ছিন্নপত্র ৯৩, ১৮৯৩

তার পর এই বোধ যখন কবির রক্তে মিশেছে, তখনই তা চমকপ্রদ কল্পনায় রূপায়িত হয়ে উঠল—

…এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম— তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে।

—ছিন্নপত্র ৬৪, ১৮৯২

পৃথিবীর মাটিজলের সঙ্গে এক হয়ে মিশে থাকার ঘটনাটা কবির পক্ষে কল্পনা করা সাধারণ ব্যাপার মাত্র—

আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত ক'রে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।

—ছিন্নপত্র ৬৭, ১৮৯২

আগে বলেছি কবির বর্তমান অস্তিত্ব এবং তাঁর অব্যবহিত পারিপার্শ্বিক— এই দুইকেই তিনি একান্তভাবে সত্য মনে করেও কখনো তাকে চরম সত্য বলে মানেন নি। নিজেকে বিশ্বের পটভূমিতে বার বার স্থাপন করে আপনাকে বিস্তার করে নিজের বিরাটত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন, অথবা নিজেরই মধ্যে যে বিরাটের প্রতিফলন আছে, তাকে দেখার চেষ্টা করেছেন। একটি ধূলিকণাও তাঁর কাছে তুচ্ছ নয়, তারই মধ্যে তিনি অনন্তের প্রতিফলন দেখেছেন।

…একটি বালুকণার মধ্যে অনন্ত পরমাণু আছে, একটি পর্বতের মধ্যেও অনন্ত পরমাণু আছে, ছোট বড় আর কোথায় রহিল ? একটি পর্বতও যা, পর্বতের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশও তাই ; কেহই ছোট নহে, কেহই বড় নহে, কেহই অংশ নহে সকলেই সমান।… চোখে ছোট দেখিতেছি বলিয়া একটা জিনিস সীমাবদ্ধ নাও হইতে পারে। হয়ত ছোটও যেমন অসীম হইতে পারে বড়ও তেমনি অসীম হইতে পারে।…

—ডুব দেওয়া : ছোট বড়, ১৮৮৪

এই জ্ঞানের জানাকে আপনমনে উলটেপালটে দেখতে গেলে এর রহস্য মনকে স্বভাবতই আলোড়িত করবে। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে এ আলোড়ন বার বার কবিতার আবেগের মধ্যে এসে মুক্তি পেয়েছে। নিজেকে জাগতিক ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার মানে হচ্ছে মনের এক দিকের দৈনন্দিন প্রয়োজন-আবেষ্টন থেকে মুক্ত রাখা। এ যেন প্রতিদিনের তোলা জলের স্নান থেকে সমুদ্রে অবগাহনের মুক্তি।

জ্ঞানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথমজীবনে যে বিশ্বকে জেনেছিলেন তাতে পরমাণু বা অ্যাটমের বাইরের পরিচয়টি শুধু জানা ছিল, অ্যাটমের কেন্দ্র সম্পর্কে তখনও কোনো তথ্য জানা যায় নি। অর্থাৎ তখন পরমাণু শুধু ডলটনের পরমাণু, টমসনেরও (১৮৯৮) নয়, রাদারফোর্ডেরও (১৯১০) নয়। ছোটর দিকে ঐ পর্যন্ত— এবং তা ডলটনের পরমাণু হওয়া সত্ত্বেও, অর্থাৎ তার গঠনরহস্য জানা না গেলেও পরমাণুই যে বস্তুর ছোটর দিকে প্রথম বা আদি উপকরণ এ সত্য অত্যাবধি মানা হয়ে থাকে। ছোটর দিকে ঐ পর্যন্ত। বড়র দিকে নীহারিকাবাদের ভিত্তিতে সৃষ্টিতত্ত্ব একরকম কল্পনা করা গিয়েছিল। গ্রহের জন্মবিষয়ে তখন যেসব তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছিল, তা এখন আর নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু তবু সৃষ্টি সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্বও যে একান্ত নির্ভরযোগ্য তা বলা চলে না। অতএব আগের যুগের সঙ্গে এ যুগের পার্থক্য শুধু তথ্যগত, অর্থাৎ সামান্য কিছু নতুন তথ্য বেশি জানা গেছে। এবং কান্ট- লাপ্লাসের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘূর্ণমান নীহারিকার সংকোচন এবং পরে তা থেকে সূর্য এবং তার পর গ্রহের জন্মকথা এখন আর বিজ্ঞানীরা মানেন না। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি বিষয়ে ঐক্য এখনও নষ্ট হয় নি, সে হচ্ছে বিশ্ববস্তু এলো কোথা থেকে সে বিষয়ে সবাই সমান অজ্ঞ। এ বিষয়ে দুটি দল দুটি মত প্রচার করেছেন, তাঁদের কথা আগে বলেছি, কিন্তু তাঁদের কোনো দিকেই খুব বেশি সমর্থক জোটে নি। নানা ভাবে বিশ্বধাঁধার উত্তর খোঁজা হচ্ছে, কিন্তু শেষ উত্তর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এখনো।

অনন্ত আকাশ-সমুদ্রে অসংখ্য বিশ্ব এক-একটা দ্বীপপুঞ্জের মতো ভেসে আছে, এইটুকু মাত্র বোঝা যাচ্ছে। অতএব অসীমতার বিস্ময় তখনো যা ছিল, এখনো তাই আছে।

সেই মূলসূত্র— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পূর্ণ আবর্তন

এই বিশ্বের প্রত্যেকটি পরমাণু আমার আত্মীয় এ রকম কল্পনায় রোমাঞ্চ আছে। এবং একে রোমান্টিক আনন্দও বলা যেতে পারে, কিন্তু তবু এটি নিছক কল্পনা নয়, এর ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক সত্য। এই সত্য আর এই রোমাঞ্চকর অনুভূতি, এই দুটিতে মিলে রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু আমি যে কথাটি বলব বলে এই অধ্যায়টি আরম্ভ করেছি, সে হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর বর্তমান সত্তাকেই বিশ্বের আত্মীয় কল্পনা করেছেন তাই নয়, তাঁর অতীতও এই বিশ্বের সঙ্গে এক হয়ে মিশে ছিল, এইটি উপলব্ধি করে তিনি তাঁর অস্তিত্বের অর্থ বিশ্বের অস্তিত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছেন। এমন-কি এই অতীত ইতিহাসটি বিজ্ঞান এমনভাবে আবিষ্কার করে না দিলে তাঁর কল্পনা সম্পূর্ণ সার্থক হত না। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জুড়ে তিনি তাঁর চেতনার মধ্যে তাঁর কল্পনার মধ্যে তাঁর অস্তিত্বচক্রকে সম্পূর্ণ করেছেন। এক দিকে অতীত, যখন তিনি পৃথিবীর প্রতিটি পরমাণুর সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন ; আর-এক দিকে ভবিষ্যৎ, যখন তিনি সমস্ত বিশ্বের মধ্যে আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন ; এই দুইয়ে মিলে একটি জীবনচক্র সম্পূর্ণ, এই কল্পনাই তাঁর মনে অস্তিত্বের চরিতার্থতা-বোধের আলো জ্বালিয়ে দেয়— যেমন বিদ্যুতের চক্র সম্পূর্ণ হলে ল্যাম্পের মধ্যে আলো জ্বলে, ঠিক তেমনি। পূর্ণতাই তাঁর ছিল লক্ষ্য, সেই পূর্ণতার উপলব্ধি সত্য হল বিজ্ঞানের সাহায্যে। এই উপলব্ধির জন্য বিজ্ঞান অপরিহার্য নয়, কিন্তু আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ ইনটেলেক্ট-প্রধান, বুদ্ধির সমর্থন পেলে তাঁর কল্পনা অধিকতর তৃপ্ত হয়।

বিবর্তনবিষয়ে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যতখানি সত্য রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসও ততখানি সত্য। প্রাণের সম্ভাবনা কিভাবে মহাশূন্যকে আশ্রয় ক'রে, আচ্ছন্ন ক'রে, সমস্ত পরমাণুর মধ্যে সুপ্ত থাকে তা আমরা কেউ জানি না, কিন্তু এটুকু নিশ্চিত জানি যে পরমাণুদের বিশেষ সংযোগে বিশেষ অবস্থায় ঐ বিদ্যুৎ-কণিকা থেকেই যা কিছু রূপের, প্রাণীর, এবং প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে। অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজছে, চিরকালই লুকিয়ে থাকবে। এই বিবর্তন নামক ঘটনা— ঘটনাই বলা উচিত কেননা বিবর্তন এখন আর কোনো থিওরি নয়, এখন প্রমাণিত ঘটনা— রবীন্দ্রনাথের মনকে অভিভূত করেছে।

… মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে, সেও যেন ওই ভাষা জানে,
… মনে হয় যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে

অজ্ঞাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ
গর্ভস্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের— অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়···
··· প্রতি প্রাতে উষা এসে
অনুমান করি যেত মহাসন্তানের জন্মদিন,
নক্ষত্র রহিত চাহি নিশি-নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়নশিয়রে। সেই আদিজননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,
আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত ভবিষ্যৎ লাগি, হৃদয়ে আমার
যুগান্তরস্মৃতিসম উদিত হতেছে বারম্বার।

— সমুদ্রের প্রতি

অথবা

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকা-সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। তাই আজি
কোনোদিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি,
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি—
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
কী জীবনরসধারা অহর্নিশি ধরে
করিতেছে সঞ্চরণ, কুসুমমুকুল
কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল

সুন্দর বৃন্তের মুখে, নব রৌদ্রালোকে
কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া…
তাই আজি কোনোদিন শরৎকিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র-'পরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা—
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লবনিলয়ে
আকাশের নীলিমায়।

—বসুন্ধরা

বিবর্তনে বিশ্বাস কবিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ

ইংরেজী অলংকারশাস্ত্রে 'প্যাথেটিক ফ্যালাসি' নামক একটি কথা আছে। মানুষের মনের সুখ-দুঃখ ক্রোধবিদ্বেষ বা ভাবাবেগ যখন অচেতন পদার্থে আছে কল্পনা করে কাব্যে বা কোনো রম্য-রচনায় সেই সব অচেতন পদার্থকে সাময়িকভাবে চেতনের মতো সম্বোধন করা হয় তখন তাকে প্যাথেটিক ফ্যালাসি বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু আমি রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র থেকে অথবা কাব্যগ্রন্থাদি থেকে বিবর্তন-বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের যে সব লিখন উদ্ধৃত করেছি তার কোনোটি প্যাথেটিকও নয়, ফ্যালাসিও নয়। প্রকৃতিকে দেখে, তার আলোর খেলা দেখে, ফলফুললতাপাতাগাছপালা দেখে, সমুদ্রনদীঝরনা দেখে মনে যে অহেতুক আনন্দ জাগে তা অহেতুক নয়, এইটি কবির বিশ্বাস। তার কারণ আগেই বলা হয়েছে। সেই আত্মীয়তাবোধ এখনো আমাদের রক্তে মিশে আছে। কোথাও অচেতন পদার্থে চেতনা আরোপ করা হয় নি, আমার উদ্ধৃতি প্রকৃত বিবর্তন-বিশ্বাসীর উপলব্ধির দৃষ্টান্ত। শুধু জানার নয়, উপলব্ধির। কারণ কুসুমমুকুল যে আনন্দের আবেগে ফুটে উঠছে তা 'অন্ধ আবেগ,' যে সরসতা তার মধ্যে লক্ষ করা যায় তা 'মূঢ়' প্রমোদরসজাত। আলোর ঝিকিমিকি, অথবা নারকেলপাতার কাঁপন, অথবা সমুদ্রের কলকল্লোল, তা তাদের চেতন প্রকাশ নয়। তা দেখে কবিই সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে সমধর্ম অনুভব করেন, তাঁর মনে মহাব্যাকুলতা জাগে, যাদের কথা বলছেন তাদের মনে কিছু জাগে না। কারণ তাদের চেতনা নেই।

এটি এমনই সত্য ঘটনা এবং সত্য বিশ্বাস যে এ লেখাগুলো ভূতত্ত্ব এবং প্রাণবিবর্তনের বইতে স্থান পেলেও অস্বাভাবিক মনে হত না, কিন্তু একমাত্র বাধা এগুলো কাব্য এবং এর সঙ্গে একটিমাত্র ব্যক্তির বিশেষ অনুভূতির কথা ব্যক্ত হয়েছে। কথাটা উল্লেখ করছি এ জন্য যে বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এর কোনোটাই বিজ্ঞান-সাহিত্য নয়। বিজ্ঞান-সাহিত্য

সংক্ষিপ্ত কথায় শুধু বিবরণ দেয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনা হচ্ছে কাব্য, যাঁর মধ্যে তাঁর সমস্ত বোধ বিশ্বাস কল্পনা উপলব্ধি আর বিস্ময় এক হয়ে মিলেছে। মনে রাখতে হবে— তাঁর এ বিশ্বাস ব্যক্তি-নিরপেক্ষ যান্ত্রিক বিশ্বাস নয়। এ সাধারণ বিজ্ঞানীর মতো মানস-সম্পর্কবর্জিত কোনো তত্ত্ব নয়। ক্লাসঘরে গ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিয়ে বাড়িতে ফিরে হাঁড়ি-ফেলা জাতের বিজ্ঞান-বিশ্বাসও নয়। তাঁর সমস্ত বিশ্বাসই তাঁর জীবনের সঙ্গে আচরণের সঙ্গে জড়িত। বিজ্ঞানের সভায় বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ আলোচনায়ও যদি তাঁর সেই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় তবু তিনি তাঁর জন্য লজ্জিত নন। তাতে তিনি বিজ্ঞানী বিশেষণ পাবেন না, কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থাকবেন। এবং শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থাকাকেই তিনি তাঁর চরম কর্তব্য বিবেচনা করেছেন।

এবং তার প্রমাণও তিনি রেখে গেছেন খুব স্পষ্ট ভাবাতেই। সে একখানি চিঠি— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা। ছিন্নপত্র সংকলন কালে তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিগুলোর সম্পাদনায় রামেন্দ্রসুন্দরের সাহায্য নিয়েছিলেন— সম্ভবতঃ বিজ্ঞান-সম্পর্কিত উল্লেখ থাকার জন্যই। এবং সম্ভবতঃ রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ব্যক্তিত্ববর্জিত দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের নগ্ন সত্য বর্ণনায় কবির ব্যক্তিত্ব-যোগে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিখানা লেখেন তাতে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বাসের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাষাতেই বলেছেন। পড়লে এ কথায় সন্দেহ থাকে না যে তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাসকে তিনি কখনো পৃথকভাবে দেখেন নি, বিশেষ করে যেখানে তিনি উভয়ের যোগে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হয়ে যান অতি সহজেই। সে হচ্ছে তাঁর কবির ধর্ম আর নিষ্ঠা।

আমার পুরাতন চিঠিপত্রের এক জায়গায় ছিল, আমি একদিন সমুদ্রস্নানসিক্ত তরুণ পৃথিবীতে গাছ হইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। আপনি সম্পাদকের কুঠার লইয়া আমার এই গাছের স্মৃতির গোড়ায় কোপ মারিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু এ তো অনাবশ্যক ডালপালা ছাঁটিয়া দেওয়া নয়, এ যে প্রাণে আঘাত করা। কেননা এ আমার প্রাণের কথা। আমার প্রাণের মধ্যে গাছের প্রাণের গূঢ় স্মৃতি আছে, আজ মানুষ হইয়াছি বলিয়াই এ কথা কবুল করিতে পারিতেছি। শুধু গাছ কেন, সমস্ত জড়জগতের স্মৃতি আমার মধ্যে নিহিত আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দন আমার সর্বাঙ্গে আত্মীয়তার পুলক সঞ্চার করিতেছে— আমার প্রাণের মধ্যে তরুলতার বহু যুগের মূক আনন্দ আজ ভাষা পাইয়াছে— নহিলে আজ গাছে গাছে যখন আমের মুকুলের উচ্ছ্বাস একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন আমি কোন্ নিমন্ত্রণে বসন্ত-উৎসবের আয়োজন করিতে যাই। আমার মধ্যে একটা বিপুল আনন্দ আছে সে এই জলস্থল গাছপালা পশুপক্ষীর আনন্দ— সে আপনি আমাকে কবুল করিতে দিবেন না কেন? পাছে লোকে আমাকে উপহাস করে?······দেখুন, আমি আমার বোটের খোলা জানালায় বসিয়া এই পুরাতন পৃথিবীটার গৈরিক রঙের মাটির উপরে যখন সূর্যের আলো পড়িতে দেখিয়াছি তখন আমার সমস্ত দেহটা যেন বিস্তীর্ণ হইয়া ঐ ধুলা এবং ঘাসের মধ্যে দিক্‌প্রান্ত পর্যন্ত অবাধে আতত হইয়া গিয়াছে। আমি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র এবং মাটি পাথর জল সমস্তের সঙ্গে একসঙ্গে আছি এই কথাটা এক-এক শুভ মুহূর্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট সুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহ মন পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আমার কবিত্ব নহে, ইহা আমার স্বভাব। এই স্বভাব হইতেই আমি কবিতা লিখিয়াছি, গান লিখিয়াছি, গল্প লিখিয়াছি। অতএব ইহাকে গোপন করিবেন না। ইহাকে লইয়া আমি লেশমাত্র লজ্জাবোধ করি না। আমি মানুষ, এইজন্যই আমি

ধুলা মাটি জল গাছপালা পশুপক্ষী সমস্তই— ইহাই আমার গৌরব— আমার চেতনায় জগতের ইতিহাস দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে— আমার সত্তায় জড় ও জীবের সমস্ত সত্তা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এইজন্যই আমার রক্ততরঙ্গ সমুদ্র-তরঙ্গের তালটাকে চিনিতে পারিয়া নৃত্য করে, কিন্তু সমুদ্রতরঙ্গ আমাকে চেনে না— এইজন্য আমার প্রাণের সুখ গাছপালার প্রাণের সুখের সঙ্গে যুক্ত হইয়া এমন প্রফুল্ল হইয়া উঠে, কিন্তু গাছপালা আমাকে চেনে না। আমার স্মৃতি তাহাদের মধ্যে নাই।...

—ছিন্নপত্র, সংযোজন, ১৩১৮

বিবর্তনে বিশ্বাস সম্পর্কে যতগুলো কবিতা বা চিঠি বা অন্য রচনার উদ্ধৃতি দেওয়া হল তাতে এ কথায় আর সন্দেহ নেই যে কবির মনে যে বিস্ময় যে আনন্দ, তা তাঁর নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাসের বিস্ময় ও আনন্দ থেকে খুব স্বতন্ত্র নয়। 'আমার পৃথিবী তুমি বহু বরষের' এ কথা কবির কোনো বিশেষ মেজাজ বা মুডের ব্যাপার নয়, খেয়াল নয়, অলস মায়া নয়, স্বপ্নরচনা নয়। কোনো বিশেষ মেজাজে কোনো জিনিস এক রকম মনে হলে, সে মেজাজ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই একই জিনিস অন্য রকম মনে হয়। তার সঙ্গে এর তুলনা চলবে না। এ সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। লামার্ক, ডারউইন কিংবা হাটন, লাইয়েল, প্রভৃতি জীবিত থাকলে কবির কাছে মাথা নত করতেন, কারণ তাঁরা পৃথিবীর জন্ম বা বিবর্তনের পথে মানুষের আবির্ভাব নিয়ে সে যুগে যা কিছু বিশ্বাস করেছেন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস গভীরতায় তাঁদের বিশ্বাসকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রকৃতি যেমন অজৈব পরমাণুকে একত্র করে জীবন্ত কোষে পরিণত করেছে, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিও তেমনি বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বাসে ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া লাগিয়ে তাকে জীবন্ত করে তুলেছে। এ প্রকৃতি, বিজ্ঞানবিষয়ে গবেষণা চালিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রকৃতি নয়, বিজ্ঞান তথ্যের পথ উন্মুক্ত করে দিলে সেই পথকে নতুন নতুন বিস্ময়ের পথরূপে মনেপ্রাণে গ্রহণ করার প্রকৃতি। তিনি বিজ্ঞানী নন, কিন্তু বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা তাঁর মনের ধর্ম। তাঁর জীবনস্মৃতির একজায়গায় আছে—

ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কী আছে বলো দেখি। কোন্‌টা থাকা যে অসম্ভব তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।

অথবা

কী মাটি, কী জল কী গাছপালা কী আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত— মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবল উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে বলিতে পারি না।

—জীবনস্মৃতি

কিন্তু এ শুধু বালক রবীন্দ্রনাথের কথা নয়; এই কথা সকল যুগের সকল বিজ্ঞানীর কথা। কবি ও বিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসা এক, কিন্তু সত্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার পথ পৃথক। এই হল

সাধারণ নিয়ম। রবীন্দ্রনাথে এর কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। কারণ তিনি তাঁর কবিধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ খুঁজে পান নি। দেহটাকে বাদ দিয়ে মনকে স্বীকার করেন নি, প্রদীপকে বাদ দিয়ে শুধু শিখাকে সত্য বলে মানেন নি। দুইই তাঁর কাছে সত্য, যেমন সত্য তাঁর কাছে দুই বিপরীত। 'তোমার আঁধার তোমার আলো দুই আমার লাগল ভালো।'

বিজ্ঞানী আর কবি— এ দুইয়ের মানসিক গঠনের যদি মূল আবিষ্কার করা যেত তা হলে দেখা যেত দুইই একজাতীয় পরমাণু, ওরা শুধু আইসোটোপ নামক দুই প্রজাতি।

বিজ্ঞানে কবিমানসের বিস্ময়কর ব্যাপ্তি

রবীন্দ্রনাথের নানা রচনার মধ্যে তাঁর বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ কি ভাবে লুকিয়ে আছে, তা তাঁর রচনার ভঙ্গি এবং বক্তব্যের দিকে পাঠককে প্রবল বেগে টেনে নেওয়ার ক্ষমতায় সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। অবশ্য কোনো কোনো রচনায় বিজ্ঞানীদের নামও স্পষ্ট বলে দেওয়া আছে। যা হোক, যখন তিনি বলেন—

ভিক্ষাবৃত্তি করে না তপন
পৃথিবীরে চাহে সে যখন;
সে চাহে উজ্জ্বল করিবারে
সে চাহে উর্বর করিবারে
জীবন করিতে প্রবাহিত
কুসুম করিতে বিকসিত।

— সন্ধ্যাসংগীত, অনুগ্রহ, ১৮৮২

তখনই বুঝতে পারি এই কয়েকটি ছত্রের মধ্যে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি ও প্রাণপ্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য সূর্যের যে ভূমিকা তারই বিজ্ঞানসম্মত বিবরণটি দেওয়া হয়েছে। উদ্ভিদ-জগতের সবুজ অংশে রোদের সাহায্যে যে ফোটো-সিন্থিসিস ঘটে, তারই সাহায্যে গাছ বাতাসে অবস্থিত কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জলের সাহায্যে আপন দেহের পরিপুষ্টির জন্য কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে নেয়, এবং অপ্রয়োজনীয় অক্সিজেন বাতাসে ছেড়ে দেয়। এইভাবে অজৈব বস্তু জৈবপদার্থে পরিণত হয়, আমরা তা খাদ্যরূপে ব্যবহার করি। সূর্যের আলো না থাকলে কার্বন ডাইঅক্সাইড-অক্সিজেন-কার্বনের চক্র অব্যাহত থাকতে পারত না, সমস্ত পৃথিবী অনুর্বর মরুতে পরিণত হত, এবং অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব লোপ পেত।

এই বিষয়েরই আরও একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭) নামক বইতে। রচনার নাম অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি। গোকুলনাথ স্বর্গে গিয়ে তথাকার আবহাওয়া বিষয়ে বলছে—

অনেক উচ্চে থাকার দরুন অক্সিজেন বাষ্পটি বেশ বিশুদ্ধ পাওয়া যায়, এবং রাত্রিকাল না থাকাতে নন্দনবনের তরুলতাগুলি কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস পরিত্যাগ করবার সময় পায় না, হাওয়াটি বেশ পরিষ্কার।…

লাপ্লাসের নীহারিকাতত্ত্ব (১৭৯৬) এবং নিউটনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব -জাত গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষাবদ্ধ আবর্তননীতির কথা শোনা যাবে 'সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়' (১৮৮৩) কবিতাটিতে—

জগতের গঙ্গোত্রী শিখর হতে
শত শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর…
জ্বলিছে দ্বিগুণ অগ্নিরাশি
আঁধার হতেছে চুরচুর।
অগ্নিময় মিলন হইতে
জন্মিতেছে আগ্নেয় সন্তান
অন্ধকার শূন্যমরু-মাঝে
শত শত অগ্নি-পরিবার
দিশে দিশে করিছে ভ্রমণ।…
কত চন্দ্র, কত সূর্য কত গ্রহ কত তারা
কত বর্ণ কত গীতময়
নিজ নিজ পরিবার লয়ে
ভ্রমে সবে নিজ নিজ পথে।…
চক্রপথে ভ্রমে গ্রহতারা
চক্রপথে রবি শশী ভ্রমে
শাসনের গদাচক্র লয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।…
পৃথিবীর সমুদ্র-হৃদয়
চন্দ্রে হেরি উঠে উথলিয়া…

'অগ্নিময় মিলন' কথাটিতে লাপ্লাসের পরবর্তী গ্রহজন্ম-তত্ত্ব অর্থাৎ এক ভ্রাম্যমাণ নক্ষত্রের আকর্ষণে সূর্যের খানিকটা অংশ শূন্যে প্রলম্বিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে যাবতীয় গ্রহের জন্ম দিয়েছে—সম্ভবত এমন ইঙ্গিত এতে নেই। তার কারণ চেম্বারলিন ও মূলটন এই মত প্রচার করেন ১৯০৫ সালে। কবিতার তারিখ ১৮৮৩। এখন অবশ্য এই শেষের মতও পরিত্যক্ত। উদ্ধৃত শেষ দুটি ছত্রে চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রের স্ফীত হয়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে।

প্রথম যুগের এই সব লেখার মধ্যে বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং পার্থিব বিবর্তনকথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে।

শনিবার থেকে আর আজ এই মঙ্গলবার পর্যন্ত কেটে গেল। জগতে ঘটনা বড় কম হয় নি— সূর্য চার বার উঠেছে এবং তিন বার অস্ত গেছে……জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড়ো বড়ো ব্যাপার সবেগে চলছিল। — য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী, ১৮৯১

…এই যে শূন্য অনন্ত আকাশ ইহাও আমাদের কাছে সীমাবদ্ধভাবে প্রকাশ পায়, মনে হয় যেন একটি অচল কঠিন সুগোল নীল মণ্ডপ আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে।

— ডুব দেওয়া : সাম্য, ১৮৮৪

বিশ্ব সর্বত্রই অসীম গভীর এবং অসীম প্রশস্ত। অতএব বিশ্বের এক কাঠা জমিকে যথার্থভাবে ভালবাসিতে গেলে বিশ্বজননীতা থাকা চাই।

— ডুব দেওয়া : এক কাঠা জমি, ১৮৮৪

…লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছোয়, আর আমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না।

—ছিন্নপত্র ৫২, ১৮৯২

সব সময়েই বিশ্বপ্রকৃতির ছবিটি মনে পড়ে—

এত বড় এ ধরণী মহাসিন্ধু ঘেরা
দুলিতেছে আকাশ সাগরে—
দিন দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা
শুধু কি মা যাব খেলা করে।
তাই কি ধাইছে গঙ্গা ছাড়ি হিমগিরি
অরণ্য বহিছে ফুলফল—
শত কোটি রবি তারা আমাদের ঘিরি
গনিতেছে প্রতি দণ্ড পল।

—মঙ্গলগীত, ১৮৮৬

…এই বৃহৎ পৃথিবী সত্য সত্যই যে অসীম আকাশে পথচিহ্নহীন পথে অহর্নিশি হুহু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এক নিমেষও দাঁড়াইতে পারিতেছে না, ইহা একবার মনের মধ্যে অনুভব করিলে কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া থাকে।… এমন একটি পৃথিবী কেন— যখন মনে করিতে চেষ্টা করা যায় যে, ঠিক এই মুহূর্তেই অনন্ত জগৎ প্রচণ্ড বেগে চলিতেছে এবং তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরমাণু থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে; অতি বৃহৎ অতি গুরুভার লক্ষ কোটি অযুত নিযুত নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য তারা গ্রহউপগ্রহ, উল্কা ধূমকেতু, লক্ষ যোজন ব্যাপ্ত নক্ষত্রবাষ্পরাশি কিছুই স্থির নাই; অতি বলিষ্ঠ বিরাট এক যাদুকর পুরুষ যেন এই অসংখ্য অনল-গোলক লইয়া অনন্ত আকাশে অবহেলে লোফালুফি করিতেছে…প্রতি পলকেই কি অসীম শক্তি ব্যয় হইতেছে— তখন কল্পনা অনন্তের কোন্ প্রান্তে বিন্দু হইয়া হারাইয়া যায়!

— কথাবার্তা : সন্ধ্যাবেলায়, ১৮৮৪

বিজ্ঞানের দেওয়া এই সব জ্ঞান যে কবির পক্ষে কত বড় মুক্তি, তা তাঁর প্রথম দিকের রচনা থেকে পড়া আরম্ভ না করলে সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। ১৮৮৪ সাল বা কাছাকাছি সময়ে বিজ্ঞান অতি প্রবলভাবে কবিকে ভর করেছিল সন্দেহ নেই। পড়তে পড়তে মনে হয় জ্ঞানরাজ্যের এই পথটি না পেলে রবীন্দ্রনাথকেও আমরা সম্পূর্ণভাবে পেতাম না। জ্যোতির্বিজ্ঞান তাঁকে বিশ্বের

বিরাটত্বের ধারণা গঠনে সাহায্য করেছে এবং রসায়ন পদার্থবিদ্যা ভূবিদ্যা ইত্যাদি তাঁকে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে যে অনন্ত রহস্য আছে তার সংবাদ দিয়েছে। এমন-কি যখন পরমাণুর উপাদানরহস্য জানতে পারা গেছে, তখন ইলেকট্রন-প্রোটনরূপ দুই বিপরীত বিদ্যুৎশক্তির মিলনে পরমাণু যে তড়িৎধর্মনিরপেক্ষ হয়েছে এবং ঐ দুই শক্তি শান্ত সংহত হয়েছে সে বিস্ময়ও তিনি কাব্যে প্রকাশ না করে পারেন নি। আগে যে পরমাণুর কম্পন-কথা উল্লেখ করেছেন সে অন্য জিনিস, সে সম্পর্কে পরে বলছি।

১৯০২ থেকে পরমাণু বা অ্যাটমের গঠন জানবার চেষ্টা চলছিল। তার আগে টমসন ইলেকট্রনের অস্তিত্ব টের পান। কিন্তু পরমাণু যে ঘূর্ণমান ইলেকট্রন ও তার স্থির কেন্দ্র প্রোটন—অর্থাৎ নেগেটিভ ও পজিটিভ—এই দুই জাতীয় তড়িৎশক্তির মিলনে গড়া এটি সর্বশেষ প্রমাণিত হয়েছে ১৯১৯ সালে। অবশ্য পরমাণু-কেন্দ্রের গঠন সম্পর্কে জ্ঞান আরও এগিয়ে গেছে আজ। কিন্তু মূল ধারণাটা ঠিকই আছে। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ নটরাজ রচনা করেন, এবং তার ভিতরের একটি গানে এই 'বিদ্রোহী' শক্তিতে গড়া পরমাণুর কথা আছে।

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু।

একটি পরমাণু যে-সমস্ত উপাদান দিয়ে গড়া, ইলেকট্রন ও তার বিরাট শক্তির আধার অতিপরমাণু বা কেন্দ্র, তারা পৃথক ভাবে সবাই বিদ্রোহী। কেন্দ্রটি মোটামুটি বলতে গেলে প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে গড়া। এর প্রথমটি তড়িৎ-আহিত, দ্বিতীয়টি তড়িৎ-নিরপেক্ষ। এরা সবাই মিলে একটি নির্দিষ্ট রীতিতে সংযত এবং সংহত হয়ে পরমাণুর রূপ নিয়েছে। কল্পনায় পরমাণুর গঠনরূপটি কবির মনে পড়েছে।

অন্যান্য উদ্ধৃতি—

…ঈথর কাঁপিতেছে, আমি দেখিতেছি আলো; বাতাসে তরঙ্গ উঠিতেছে, আমি শুনিতেছি শব্দ; ব্যবচ্ছেদ-বিশিষ্ট অতি সূক্ষ্মতম পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে, আমি দেখিতেছি বৃহৎ দৃঢ় ব্যবচ্ছেদহীন বস্তু। বস্তুবিশেষ কেনই যে বস্তুবিশেষরূপে প্রতিভাত হয়, আর কিছু রূপে হয় না, তাহার কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

— ডুব-দেওয়া : জগৎ মিথ্যা, ১৮৮৪

এই উদ্ধৃতির প্রথমে যে ঈথারের কথা আছে, তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অদৃশ্য অস্পৃশ্য এবং কল্পনার অতীত একটি নিরেট পদার্থ যা না হলে আলো ইত্যাদি মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে আসতে পারত না। অর্থাৎ ঈথারই ছিল এদের একমাত্র বাহন। কিন্তু আইন্‌শ্‌টাইন এত দিনের এই পরম নির্ভর বাহনকে অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, বহু জাগতিক ঘটনা আলো বা উত্তাপ-রশ্মি বা অন্যান্য রশ্মির বাহনরূপে ঈথারের আর দরকার নেই, তাকে বাদ দিয়েই এ সবের ব্যাখ্যা করা চলে।

পূর্বগামী একটি উদ্ধৃতির এক জায়গায় আছে 'প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরমাণু থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে', আর-একটিতে আছে 'অতি সূক্ষ্মতম পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে।'

পরমাণু কাঁপছে, অথবা পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণবিকর্ষণ চলছে—এ দুটি কথাই অবশ্য পরমাণুর আভ্যন্তরীণ বিষয়ের নয়, অর্থাৎ অতিপরমাণু ও ইলেকট্রনের কথা নয়, কেননা সে খবর ১৮৮৪ সালে জানা যায় নি। এই দুটি ঘটনাই তবে কি যাকে বলা হয় ব্রাউনিয়ান মোশন—তাই?

রবার্ট ব্রাউনের একটি আবিষ্কার থেকে এই কথাটির উৎপত্তি। রবার্ট ব্রাউন (১৭৭৩-১৮৫৮) সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ। তিনি একদিন এক ফোঁটা জলে ভাসমান ছোট্ট কোনো উদ্ভিদের স্পোর বা বীজরেণু অণুবীক্ষণে দেখছিলেন। দেখা গেল স্পোরসমূহ এলোমেলোভাবে নড়ে বেড়াচ্ছে, যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তারা লাফিয়ে লাফিয়ে এমনভাবে এগিয়ে আর পিছিয়ে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ছুটছিল, যাতে প্রত্যেকবার পিছিয়ে আসতে একটি করে কোণ তৈরি হচ্ছিল এবং যতই নড়াচড়া করুক তারা নিজ নিজ স্থান থেকে খুব বেশি দূরে যাচ্ছিল না। ১৮২৮ সালে এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা হয়, কিন্তু এর অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে। জলের অণু ছুটছে, সেই অণুই রেণুকে ধাক্কা মারছে। অণুর উপর তাপজনিত ক্রিয়ার ফল।—কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথের মনে এই ব্রাউনিয়ান মোশন বা মুভমেন্টের কথা ছিল কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ থেকে গেল।

আর-একটি উদ্ধৃতি—

> বিজ্ঞান বলে, সূর্যকিরণে অন্ধকার-রশ্মিই বিস্তর, আলোক-রশ্মি তাহার তুলনায় ঢের কম, একটুখানি আলোক অনেকটা অন্ধকারের মুখপাত্রস্বরূপ।
>
> —ধর্ম : জড় ও আত্মা, ১৮৮৪

এটিও পদার্থবিজ্ঞানের কথা। এ কথাটির কি অর্থ তা এর বায়ান্ন বছর পরে কথিত কবির নিজের ভাষাতেই দেওয়া যাক। ১৮৮৪ সালে তিনি লিখেছিলেন সাহিত্য— ১৯৩৭ সালে তাঁরই লেখা বিজ্ঞানের বইতে তার ব্যাখ্যা—

> এককালে মনে হয়েছিল অ-দেখারা রঙিন দলেরই পার্শ্বচর, অন্ধকারে পড়ে গেছে। যত এগোতে লাগল গুপ্ত আলোর সন্ধান, ততই সাতরঙা দলেরই আসন হল খাটো। বিজ্ঞানের জরীপে আলোর সীমানা আজ সাতরং-রাজার দেশ ছাড়িয়ে গেছে শতগুণ। লাল-উজানি আলোর দিকে ক্রমে আজ দেখা দিল যে ঢেউ সেই ঢেউ বেয়ে চলে আকাশবাণী, যাকে বলে রেডিও-বার্তা, বেগনি-পারের দিকে প্রকাশ পেল বিখ্যাত রয়ন্টগেন আলো, যে আলোর সাহায্যে দেহের চামড়ার ঢাকা পেরিয়ে ভিতরকার হাড় দেখতে পাওয়া যায়।
>
> —বিশ্বপরিচয়, ১৯৩৭

১৮৮৫ সালে অদৃশ্য রশ্মির ক্ষেত্র যে অনেক বিস্তৃত হতে পারে তা অনুমান মাত্র করা গিয়েছিল। ক্লার্ক-ম্যাক্সওয়েলের (১৮৩১-৭৯) নাম করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে।

আরও কয়েকটি বিভিন্ন উদ্ধৃতি লক্ষণীয়—

> পাখির গানের মধ্যে পক্ষীসমাজের প্রতি যে কোনো লক্ষ্য নাই এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না।
>
> —সাহিত্যের সামগ্রী, ১৯০৭

প্রকৃতিতে আমরা দেখি ব্যাপ্ত হইবার জন্য টিকিয়া থাকিবার জন্য প্রাণীদের মধ্যে সর্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে।

—ঐ

সূর্যকিরণের বেশির ভাগ শূন্যে বিকীর্ণ হয়, গাছের মুকুল অতি অল্পই ফল পর্যন্ত টিঁকে। কিন্তু সে যাঁহার ধন তিনিই বুঝিবেন। সে ব্যয় অপব্যয় কিনা বিশ্বকর্মার খাতা না দেখিলে তাহার বিচার করিতে পারি না।

—পনেরো আনা, ১৯০২

সকল ঘাস ধান হয় না। পৃথিবীতে ঘাসই প্রায় সমস্ত, ধান অল্পই। কিন্তু…সে যেন স্মরণ করে যে, পৃথিবীর শুষ্ক ধূলিকে সে শ্যামলতার দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, রৌদ্রতাপকে সে চিরপ্রসন্ন স্নিগ্ধতার দ্বারা কোমল করিয়া লইতেছে।

—ঐ

বাতাসে চলনশীল জলনধর্মী অক্সিজেনের পরিমাণ অল্প, স্থিরশান্ত নাইট্রোজেনই অনেক। যদি তাহার উল্টা হয়, তবে পৃথিবী জ্বলিয়া ছাই হয়।

—ঐ

স্থানসংকীর্ণতা বলিয়া কোনো পদার্থ প্রকৃতির মধ্যে নাই। সে আমাদের মনে। দেখো— বীজের মধ্যে অরণ্য, একটি জীবের মধ্যে তাহার অনন্ত বংশপরম্পরা। আমি যে ঐ ষ্টীফেন সাহেবের এক বোতল ব্লু-ব্লাক কালী কিনিয়া আনিয়াছি, উহারই প্রত্যেক ফোঁটার মধ্যে কত পাঠকের সুষুপ্তি মাদার-টিংচার আকারে বিরাজ করিতেছে।

—সরোজিনীপ্রয়াণ, ১৮৮৪

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা কিছু অভাবনীয়, তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, 'সেণ্ট্রিফ্যুগল'— … এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখি এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভাবিত করিতেছেন।

—পাগল, ১৯০৪

উপরের এই ছয়টি উদ্ধৃতির মধ্যে জৈববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, বিবর্তন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন শুধু নয়, হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে ব্যবহৃত মাদার টিংচারের উপমাও আছে। শারীরবিদ্যা এবং অনৈচ্ছিক বা involuntary ক্রিয়াদি এবং মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। যেমন—

আমাদের শরীরের মধ্যে কোথায় কোন্ যন্ত্র কিরূপে কাজ করিতেছে, তাহার কিছুই আমরা জানি না। একটুখানি যেথানে জানি, সেখানে অনেকখানিই জানি না। শরীরের সম্বন্ধে যাহা খাটে, মনের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই খাটে। আমাদের মনে যে কি আছে তাহা অতি যৎসামান্য পরিমাণে আমরা জানি মাত্র, যাহা জানি না তাহাই অগাধ। কিন্তু যাহা জানি না তাহাও যে আছে ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না।…

—ধর্ম : অচৈতন্য, ১৮৮৪

আমি কি জানি, বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক পরমাণু অহর্নিশি আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, এবং আমিও বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক পরমাণুকে অবিশ্রাম আকর্ষণ করিতেছি? কিন্তু জানি না বলিয়া কোন্ কাজটি বন্ধ রহিয়াছে!

—ধর্ম : বিস্মৃতি, ১৮৮৪

তার পর, ছোটর জন্য বড় পটভূমি, একটুখানির জন্য বৃহৎ আয়োজন— এ সবই সেই বৃহৎ ঐক্যের ছবিটি তাঁর মনে জাগিয়ে দিচ্ছে। এবং তার অতি সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে তাঁর 'একটি পুরাতন কথা' (১৮৮৪) নামক রচনায়। সবই পদার্থবিজ্ঞানের কথা—

বৃহৎ নিয়মে ক্ষুদ্র কাজ অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু সেই নিয়ম যদি বৃহৎ না হইত তবে তাহার দ্বারা ক্ষুদ্র কাজটুকুও অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। একটি পাকা আপেল ফল যে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িবে তাহার জন্য চরাচরব্যাপী ভারাকর্ষণ-শক্তির আবশ্যক— একটু ক্ষুদ্র পালে নৌকা চলিবে কিন্তু পৃথিবী-বেষ্টনকারী বাতাস চাই।···

বৃহত্ত্ব একটি মাত্র উদ্দেশ্যের মধ্যে বদ্ধ থাকে না, তাহার দ্বারা সহস্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সূর্যকিরণ উত্তাপ দেয়, আলোক দেয়, বর্ণ দেয়, জড় উদ্ভিদ পশুপাখি কীটপতঙ্গ সকলেরই উপর তাহার সহস্র প্রকারের প্রভাব কার্য করে।

এর পর রসায়ন থেকে নেওয়া একটি সুন্দর উপমা উদ্ধৃত করি—

একলা একজন মাত্র লোক কিছুই নহে।···সে অমিশ্র জলজনন বাষ্পের মত। যতক্ষণ জলজনন বাষ্প অমিশ্রভাবে থাকে, ততক্ষণ বায়ুর সঙ্গেও তাহার যে সম্পর্ক, জলের সঙ্গেও তাহার সেই সম্পর্ক।

—আত্মীয়ের বেড়া, ১৮৮২

জলজনন বাষ্প— হাইড্রোজেন গ্যাস। অক্সিজেনের সঙ্গে যৌগিক মিলনেই তবে এই গ্যাসের জলজনন নাম সার্থক হয়; নইলে হাইড্রোজেন এককভাবে মানুষের কাজে লাগার দিক দিয়ে মুখ্যভাবে বিশেষ সার্থকতা বহন করে না।

'তার্কিক' (১৮৮৩) নামক রচনা সমালোচকদের উদ্দেশে লেখা, কিন্তু সে রচনায় প্রধানতঃ বিবর্তনবাদ থেকে অনায়াসে উপমা গ্রহণ করা হয়েছে—

বুদ্ধিরাজ্যে Survival of the Fittest নিয়ম খুব ভালরূপে বজায় থাকে। এ কথাটা আমার ত ঠিক মনে হয় না।···

একটু ভাবিলেই দেখা যায়, আমরা কেবল কতকগুলি ঘটনাই দেখিতে বা জানিতে পাই, কোন্ কার্য-কারণের যোগ আমাদের চোখে পড়ে! ঈথর নামক সূক্ষ্ম পদার্থে ঢেউ উঠিলে আমরা যে আলো দেখিতে পাই, ইহার যুক্তি কি?

···এমন কি কার্যকারণশৃঙ্খলা আছে যাহার পদে পদে missing link নাই?

পদার্থবিদ্যার একটি বিভাগের সঙ্গে চিত্রশিল্পীদের পরিচয় রাখতে হয়— সে হচ্ছে দৃষ্টিবিজ্ঞান। Visual angle বা দৃষ্টিকোণ নামক একটি কথা আছে দৃষ্টিবিজ্ঞানে। এ থেকেই পার্সপেকটিভ কথাটি এসেছে ড্রইংএর ক্ষেত্রে। কাছের জিনিস দূরের জিনিস অপেক্ষা বড় দেখায়। দূরের জিনিস ক্রমে ছোট হতে হতে একটি বিন্দুতে গিয়ে মিলিয়ে যায়, অবশ্য কাছের ও দূরের সম-আকারের জিনিষের সম্পর্কেই এ কথা খাটে। দূরে যেখানে মিলিয়ে যায় তাকে ভি-পি বা ভ্যানিশিং পয়েন্ট বলা হয়। এই ভি-পির অবস্থান হচ্ছে দিগন্তরেখায়।

রবীন্দ্রনাথ পদার্থবিজ্ঞানের এই দৃষ্টিকোণই শুধু জানেন না, তার সঙ্গে চিত্রশিল্পের সম্পর্কের কথাটাও তাঁর বাল্যকালেই জানা হয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন—

আমার মতে, যাহারা একেবারে সত্যের চারিদিক দেখাইতে চায় তাহারা কোন দিকই ভাল করিয়া দেখাইতে পারে না।...

যখন চিত্রকর নিকটের গাছ বড় করিয়া আঁকে ও দূরের গাছ ছোট করিয়া আঁকে তখন তাহাতে এমন বুঝায় না যে বাস্তবিকই দূরের গাছগুলি আয়তনে ছোট। একজন যদি কোন ছবিতে সব গাছগুলি প্রায় সম-আয়তনে আঁকে, তবে তাহাতে সত্য বজায় থাকে বটে, কিন্তু সে ছবি আমাদের সত্য বলিয়া মনে হয় না।

—সমালোচনা (১৮৮৮), সত্যের অংশ

নিজরচিত কুণ্ডলিত লাঙ্গুল-সিংহাসনের উপর বসিয়া দূরবীক্ষণের উল্টা দিক দিয়া জগৎসংসারকে দেখিতেছে।

—বিজ্ঞতা, ১৮৮২

দূরবীনের উল্টো দিক দিয়ে দেখলে সব ছোট দেখায়, এ কথাটাও কবির অজানা নয়।

প্রায় প্রতি কথায় জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিভাগ থেকে এই সময়টাতে উপমা টেনে আনার কাজটি কত সহজে ঘটেছে! দৃষ্টিকোণজাত পরিপ্রেক্ষিতের সম্পর্ক, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পীর সঙ্গেই বেশি। এ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান শিক্ষালব্ধ। কারণ বাল্যকালে তিনি চিত্রবিদ্যা কিছু আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু ফোটোগ্রাফি সম্পর্কেও তাঁর ধারণা যে ভালই ছিল তারও প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন তাঁর একখানা চিঠিতে—

কারও কারও মন ফোটোগ্রাফের wet plateএর মতো, যে ছবিটা ওঠে সেটাকে তখনই ফুটিয়ে কাগজে না ছাপিয়ে নিলে নষ্ট হয়ে যায়।

—ছিন্নপত্র ৭১, ১৮৯৩

ফোটোগ্রাফ তুলতে ১৮৫০ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত প্লেটে কলোডিয়ন ব্যবহৃত হত আলোক-স্পর্শগ্রাহী বা sensitive রাসায়নিকের বাহনরূপে। প্লেটে এর প্রলেপ মাখিয়ে ভিজে অবস্থায় ফোটোগ্রাফ তুলে সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী রাসায়নিক ক্রিয়াদি দ্রুত শেষ না করলে চলত না। এর জন্য তাঁবু বয়ে নিয়ে বেড়াতে হত ডার্করুম তৈরির জন্য এবং তার মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্লেটে ভিজে প্রলেপ মাখিয়ে ফোটো তোলার উপযুক্ত করে নিতে হত। এ কাজটি ফোটোগ্রাফারকেই করতে হত। তখনকার দিনে এর সাজসরঞ্জাম ছিল প্রায় একটা মেরু-অভিযান চালানোর মতো।

ড্রাই প্লেট আবিষ্কৃত হয় ১৮৭১ সালে এবং প্রচার হতে আরও কয়েক বছর লাগে। রবীন্দ্রনাথের বারো বছরের যে ফোটোগ্রাফ দেখা যায় সেও ঐ ড্রাই প্লেটেই তোলা। এদেশে ভিজে প্লেট এসেছিল ১৮৫৭ সালে এবং তা শুধু সরকারী ফোটোগ্রাফ তোলার জন্য। সিপাহী বিদ্রোহের যাবতীয় ফোটোগ্রাফ ভিজে প্লেটে তোলা। আশ্চর্য এই যে ভিজে প্লেটের আবির্ভাব রবীন্দ্র-জন্মপূর্ব হলেও তার উপমাটা সার্থকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে মনের সম্পর্কে। আরও একটি জীববিজ্ঞান থেকে নেওয়া উপমা খুব সুন্দর বোধ হবে—

...স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ঐক্যই মনুষ্যত্বের চরম লক্ষ্য। নিম্নতম জীবশ্রেণীর মধ্যে

দেখা যায় তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিলেও, তাহাদিগকে দুই-চারি অংশে বিভক্ত করিলেও, কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু জীবগণ যতই উন্নতিলাভ করিয়াছে ততই তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে।

—পঞ্চভূত (১৮৯৭), পল্লীগ্রামে

এই-জাতীয় নিম্নতম একটি জীবের কথা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১০৫-এর সংখ্যায় সচিত্র বর্ণিত হয়েছিল, এটি পরে চারুপাঠের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর নাম পুরুভুজ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই রকম লেখা আছে—

এই কীটের এ প্রকার আশ্চর্য স্বভাব, যে ইহাকে কর্ত্তন করিয়া যত খণ্ড করা যায়, তাহার এক এক খণ্ড বৃদ্ধি হইয়া এক একটি নূতন পুরুভুজ হয়। বৃক্ষলতাদির কলম করিয়া রোপণ করিলে যে তাহা জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়, ইহা বহু কালাবধি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু প্রাণিবিশেষকে খণ্ড খণ্ড করিলে যে তাহার এক এক খণ্ড এক একটি প্রাণী হয়, ইহা কস্মিন্ কালে কাহারও বিদিত ছিল না। পরে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেম্বলি নামে এক সাহেব পুরুভুজের এই গুণ নিরূপণ করিয়া লোকদিগকে চমৎকৃত করিলেন।

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৫৩

স্টোরার ও ইউসিংগার লিখিত জেনারাল জুওলজি (ম্যাক্‌গ্র-হিল, ১৯৫৭) নামক বইতে হাইড্রা নামক প্রাণী সম্পর্কে লেখা আছে—

The ability of certain animals to restore or *regenerate* lost parts was first reported in 1744 by Trembley, an English naturalist, from studies on hydra. If a living specimen is cut across into two or more pieces, each will regenerate into a complete but smaller hydra.

ট্রেম্বলির আবিষ্কার (১৭৪০ অথবা ১৭৪৪ যাই হোক), এবং প্রাণীবিজ্ঞানের যা কিছু আবিষ্কার প্রায় সবই বাংলা ভাষায় তখন আলোচিত হয়েছে। প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, পরে চারুপাঠে এবং সেই সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও আলোচনার বিষয় রূপে। অতএব রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁর বাল্যকালেই পুরুভুজ সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা খুবই স্বাভাবিক।

বিজ্ঞানে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গের আক্রমণ

ইতিপূর্বে কবিরূপে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের পক্ষ নিয়ে তর্ক করতে দেখা গেছে তাঁর প্রায় একেবারে প্রথম বয়সের রচনায় ('কাব্যের অবস্থা-পরিবর্তন', ১৮৮১)। এর চার-পাঁচ বছর পরে তিনি অভিনয়-উপযোগী কয়েকটি ছোট ছোট নাটিকা রচনা করেন। হাস্যকৌতুক নামক বইতে সেগুলি সংকলিত হয়েছে (নাটিকাগুলি ১৮৮৫-৮৭এর মধ্যে রচিত)। কিন্তু নামে হাস্যকৌতুক হলেও এর কয়েকটিতে বিজ্ঞানের পক্ষ নিয়ে বেশ কঠিন ব্যঙ্গের আঘাত আছে।

মিথ্যা আর্য-অহংকারে স্ফীত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অথবা যাঁরা প্রাচীন যুগের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভক্তিবশত কোনো কোনো শিক্ষিত মহল আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যেই 'আধুনিক বিজ্ঞান কিছু না'

প্রমাণের জন্য হাস্যকর চেষ্টা করেছিলেন, আক্রমণ তাঁদের বিরুদ্ধেই। বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে এইভাবে বিজ্ঞানকে উড়িয়ে দেবার মধ্যে যে পরস্পরবিরোধিতা আছে, সে আবিষ্কারও রবীন্দ্রনাথই প্রথম করেন।

'আর্য ও অনার্য' নাটিকা থেকে এই ব্যঙ্গের নমুনা উদ্ধৃত করছি—

চিন্তামণি। য়ুরোপীয়েরা অতি নিকৃষ্ট জাতি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যদের তুলনায় তারা নিতান্ত মূর্খ— আমি প্রমাণ করে দেব। এখনো আর্যবংশীয়েরা তেল মাখবার পূর্বে অশ্বত্থামাকে স্মরণ করে ভূমিতে তিনবার তৈল নিক্ষেপ করেন। কেন করেন আপনি জানেন?

হরিহর। না।

চিন্তামণি। আপনি?

অদ্বৈত। না।

চিন্তামণি। আপনি জানেন?

প্রথম লেখক। না।

চিন্তামণি। না যদি জানেন তবে আপনারা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা কইতে যান কেন? হাই তোলবার সময় আর্যরা তুড়ি দেন কেন আপনারা কেউ জানেন?

সকলে। (সমস্বরে) আজ্ঞে, আমরা কেউ জানি নে।

চিন্তামণি। তবে? এই-যে আমাদের আর্য মেয়েরা বাতাস করতে করতে পাখা গায়ে লাগলে ভূমিতে একবার ঠেকায়, তার কারণ আপনারা কিছু জানেন?

সকলে। কিছু না!

চিন্তামণি। এই দেখুন দেখি! এই-সকল বিষয় কিছুমাত্র আলোচনা না করেই, অনুসন্ধান না করেই, আপনারা বলেন য়ুরোপীয় বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ! অথচ আর্য হাঁচে কেন, হাই তোলে কেন, তেল মাখে কেন, এ আপনারা কিছু জানেন না!

হরিহর। আচ্ছা মশায়, আপনিই বলুন। তেল মাখবার পূর্বে ভূমিতে তৈল নিক্ষেপ করবার কারণ কী?

চিন্তামণি। ম্যাগনেটিজম। আর কিছু নয়। ইংরাজিতে যাকে বলে ম্যাগনেটিজম।

হরিহর। (সবিস্ময়ে) আপনি ম্যাগনেটিজম সম্বন্ধে ইংরাজি বিজ্ঞানশাস্ত্র কিছু পড়েছেন?

চিন্তামণি। কিছু না। দরকার নেই। বিজ্ঞানশিক্ষা কিম্বা কোনো শিক্ষার জন্য ইংরেজি পড়বার কিছু প্রয়োজন নেই। আমাদের আর্যেরা কী বলেন? প্রাণশক্তি, কারণশক্তি এবং ধারণশক্তি এই তিন শক্তি আছে, তার উপরে তৈলের সারণশক্তি যোগ হয়ে ঠিক স্নানের অব্যবহিত পূর্বেই আমাদের শরীরের মধ্যে ভৌতিক কারণশক্তির উত্তেজনা হয়— এই তো ম্যাগনেটিজম।

এইভাবে চিন্তামণি হাজার রকম ব্যাপারকে বিশুদ্ধ ম্যাগনেটিজম দিয়ে ব্যাখ্যা করে গেল, অথচ ঐ বস্তুটি কি তার কিছুমাত্র ধারণা তার নেই। তার বলবার কথা হচ্ছে ম্যাগনেটিজম আমাদেরই আবিষ্কার। এবং অক্সিজেনও।

আমার মনে হয় এ দেশে ম্যাগনেটিজম ও ইলেকট্রিসিটির ধর্ম ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে প্রচারিত

হবার পর ম্যাগনেটিজমের রহস্যময় ক্ষমতার কথা জনসাধারণের মধ্যে কিছু প্রচারিত হয়, এবং যারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা তাদের যাবতীয় অর্থহীন অভ্যাসকে রহস্যময় ম্যাগনেটিজমের অস্পষ্ট ধারণার সাহায্যে অর্থপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করে। মাথার টিকিকেও বিদ্যুৎ-পরিবাহী-রূপে প্রচার করার কথা শোনা গেছে। আর শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও এরকম অপচেষ্টার কথা আমাদের জানা আছে। ভিয়েনার ডাক্তার মেসমের সম্মোহনবিদ্যার সাহায্যে কয়েকটি অসুখ আরোগ্য করে ১৭৭৪ সালে প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁরই নাম অনুযায়ী এই সম্মোহনবিদ্যার নাম হয় মেসমেরিজম। মেসমের ১৭৭৮ সালে প্যারিসে গিয়ে বেশ ভালোভাবে ব্যবসা জমিয়ে বসেন এবং তাঁর অনেক শিষ্য জুটে যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন সম্মোহনের সময় সম্মোহকের দেহ থেকে একজাতীয় চৌম্বকস্রোত সম্মোহিতের দেহে গিয়ে প্রবেশ করে। তাঁর এই তত্ত্ব বহুকাল লোকে বিশ্বাস করেছে। এই পদ্ধতির চিকিৎসায় বহু যন্ত্রপাতির দরকার হত, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কয়েকটি ম্যাগনেট ও রোগীর দেহের সঙ্গে ম্যাগনেট-সংযোজক অনেকগুলো তার।

এই মেসমেরিজম বা সম্মোহনের অন্যতম নাম অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম। বিজ্ঞানের বিচারে এই অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম একটি ধাপ্পা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এবং ১৮৮৮ সালে শিলাইদ থেকে লেখা একখানি চিঠিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

> গতকল্য এই মায়া-উপকূলে অনেকক্ষণ ধরে বিচরণ করে বোটে ফিরে গিয়ে দেখি—ছেলেরা ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ ফেরেন নি—আমি একখানি কেদারায় স্থির হয়ে বসলুম—Animal Magnetism নামক একখানা অত্যন্ত ঝাপসা subjectএর বই একটা বাতির ঝাপসা আলোতে বসে পড়তে আরম্ভ করলুম।
>
> —ছিন্নপত্র ১০, ১৮৮৮

মনে হয় সম্মোহনবিদ্যার সঙ্গে চৌম্বিক সম্পর্ক নিয়ে তখন আলোচনা ভালই চলছে। এইভাবে ম্যাগনেটিজম পদার্থবিদ্যার সীমানা ছেড়ে যেমন অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজমে পরিণত হয়েছিল, তেমনি তা আমাদের দেশেও বিজ্ঞানবিরোধীদের উদ্দেশ্যহীন অভ্যাসের ব্যাখ্যায় ত্রাতার কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে লেখা 'ঝাপসা' বিশেষণটি লক্ষণীয়। অর্থাৎ তিনি চেষ্টা করেও এ বস্তুর স্পষ্ট অর্থ বুঝতে পারেন নি, বোঝা সম্ভবও ছিল না।

'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭) নামক বইতে 'প্রত্নতত্ত্ব' রচনার উপশিরোনাম হচ্ছে 'প্রাচীন ভারতে গ্যালভানিক ব্যাটারি ছিল কি না ও অক্সিজেন বাষ্পের কি নাম ছিল।' মীমাংসা অতি সহজেই হয়ে গেছে—ঠিক ঐ ম্যাগনেটিজম। মীমাংসা করেছেন 'মধুসূদন শাস্ত্রী'। তাঁর প্রথম যুক্তি কীটে এবং আক্রমণকারী মুসলমানেরা মূল্যবান সব দলিল ধ্বংস না করলে সেসব যাবে কোথায়? দ্বিতীয় যুক্তি—প্রাচীন শাস্ত্রে একশত মুনিঋষির নাম আছে, তন্মধ্যে গব্বন মুনির নাম নেই কেন? ইত্যাদি।

প্রাচীন ভারতে সবই ছিল এই গ্রাম্য বিশ্বাস, বিজ্ঞানবার্তা এদেশে প্রবেশের পর থেকে অনেক লেখাপড়া-জানা লোকের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। এখনও যে একেবারে নেই এ কথা বলা যায় না।

প্রমাণহীন যুক্তির সাহায্যে একথা বহুবার বলা হয়েছে যে আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান, আসলে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের সামান্য একটু অংশের উদ্ধার মাত্র। আমার ধারণা আধুনিক বিজ্ঞানকে পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে বাংলা দেশে প্রথম গ্রহণ করেন সর্বসংস্কারমুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত। কিন্তু তাঁর একক প্রচারের সাধ্য কি নবোদ্‌গত অহমিকার বিরুদ্ধে যুক্তিসিদ্ধ মতের প্রতিষ্ঠা করে। মিথ্যা অহমিকার আস্ফালন রবীন্দ্রনাথের সময়ে প্রবলতর হয়েছিল এবং তার জন্যই এই ব্যঙ্গাস্ত্র। গ্যালভানিক ব্যাটারি অবশ্য বৈদ্যুতযুগের আরম্ভের ব্যাপার। ভোলটা যে তড়িৎ-জনন সেল তৈরি করেছিলেন লুইজি গালভানির প্রতি সম্মানবশত তাঁর ভোলটেইক সেল বা ব্যাটারিকে গ্যাল-ভানিক ব্যাটারিও বলা হয়ে থাকে।

'হাস্যকৌতুক' বইতে 'গুরুবাক্য' নামক একটি সুন্দর ব্যঙ্গ আছে। তাতে, ধাপ্পার মুখে আধুনিক শিক্ষিতেরাও কিভাবে সকল যুক্তি হারিয়ে গুরুর কাছে নতিস্বীকার করে তার একটি বর্ণনা আছে।

গুরুদেব শিরোমণির এক শিষ্যের হঠাৎ একসময় মনে হয় রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ু মারা গেল কেন। তার উত্তরে বিজ্ঞানের ছাত্র খগেন বলেছিল অস্ত্রাঘাতই তার কারণ।

শিরোমণি বললেন—

বটে! হাঃ হাঃ হাঃ, আধুনিক নব্যতন্ত্র কালেজের ছেলের মতোই উত্তর হয়েছে। শাস্ত্রচর্চা ছেড়ে বিজ্ঞান পড়ার ফলই এই। প্রশ্ন হল, জটায়ুর মৃত্যু হল কেন, উত্তর হল, অস্ত্রাঘাতে। এ কেমন হল জান? কাশীধামে বৃষ্টি হল আর খড়দহে পঙ্গপালে ধান খেলে। হা হা হাঃ।

এর পর শিরোমণি খগেন্দ্রকে বললেন অস্ত্রাঘাতে জটায়ুর মৃত্যু হল কেন এবং রক্তপিত্তে হল না কেন? তা ছাড়া যুদ্ধটা রাবণের সঙ্গে হল কেন, ভস্মলোচনের সঙ্গে হল না কেন? এবং রাবণের মৃত্যু হল না জটায়ুর মৃত্যু হল কেন?

গুরুদেবের শিষ্যরা খগেনকে কোণঠাসা করল—

কী হে খগেন্দ্র, একটা জবাব দাও-না। তোমাদের রস্কো সাহেব কী লেখেন?

অন্য এক শিষ্য প্রশ্ন করল—

তোমাদের টিণ্ডালই বা কী বলেন— রাবণের সঙ্গেই বা যুদ্ধ হয় কেন?

আরও একজন শিষ্য গুরুর অনুকরণে প্রশ্ন করল—

রক্তপিত্তে না মরে অস্ত্রাঘাতে মরবার জন্যেই বা তার এত মাথাব্যথা কেন? হক্‌সলি সাহেব কী মীমাংসা করেন শুনি!

খগেন্দ্র পরাভূত, স্তম্ভিত এবং বাক্যহীন।

এই ব্যঙ্গ-উদ্ধৃতিটির মধ্যে সে যুগের তিন বিভাগের তিনজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর নাম আছে।

অতএব বিজ্ঞান-শিক্ষিতের প্রতি বিদ্রূপবর্ষণে সমসাময়িক কালের বিজ্ঞানীদের নাম উল্লেখ যথাযথ হয়েছে।

এই তিনজনের একজন হচ্ছেন জুলিয়ান হাক্সলির পিতা টমাস হেনরি হাক্সলি (১৮২৫-৯৫), সুবিখ্যাত প্রাণী-বিজ্ঞানী। দ্বিতীয় জন হচ্ছেন জন্ টিনড্যাল (১৮২০-৯৩), পদার্থবিৎ। এঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির একখানির নাম "ফ্লোটিং ম্যাটার অভ দি এয়ার"— বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধূলা' নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই বই থেকেই নেওয়া। আর তৃতীয় জন হচ্ছেন সার্ হেন্‌রি এনফিল্‌ড রস্কো (১৮৩৩-১৯১৫), ইংরেজ রসায়নবিৎ। হাইডেলবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় থাকাকালীন ইনি তথাকার রসায়নের অধ্যাপক, বুনসেন বার্নারের উদ্ভাবনে প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত, রোবের্ট বিলহেলম বুনসেনের সঙ্গে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন এবং উভয়ে একত্র অনেককাল ধরে অনেক সফল গবেষণা চালান। ব্যঙ্গকাহিনীতে এঁদের নাম যারা করল, তারা বিজ্ঞানবিশ্বাসী নয়।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধার প্রমাণ এই সব ব্যঙ্গরচনার মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যুক্তিহীনতার বিরুদ্ধে এই অভিযান রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবনই প্রায় চালিয়েছেন। এবং বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাই তাঁকে একসময় কাব্য থেকে সরে এসে বিজ্ঞানের বই রচনায় প্রবৃত্ত করেছে। কিন্তু তার বহুদিন আগে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬) প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞানের প্রতি এদেশের লোকের আকর্ষণ কম এই দুঃখ প্রকাশ করাতে রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে যা বলেছিলেন তা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে—

> …বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের যেমন দেশ, তেমনই কাল, তেমনই পাত্র! এখানে সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন নামক একটা কল জুড়িয়া দিলেই যে বিজ্ঞান একদমে বাঁশি বাজাইয়া রেলগাড়ির মতো ছুটিতে থাকিবে, অত্যন্ত অন্ধ অনুরাগও এরূপ দুরাশা পোষণ করিতে পারে না।…বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়।…যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না তাহারা বিজ্ঞানের জন্য টাকা দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিষ্ফল। আপাতত মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলা দেশকে বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক, তাহা হইলেই বিজ্ঞানসভা সার্থক হইবে…
>
> —শিক্ষা, প্রসঙ্গকথা, ১৮৯৮

উপসংহার

উদ্ধৃতি আর বাড়াব না, আমার বক্তব্যও শেষ হল। আমার বিশ্বাস যা আমি বলতে চেয়েছি এতক্ষণে মোটামুটি তার একটা আভাস দিতে পেরেছি। আরও একটা কথা বলা দরকার। আমি দীর্ঘজীবী রবীন্দ্রনাথের জীবনের গোড়ার দিকটার কথাই বলেছি এবং সেটাই ছিল আমার লক্ষ্য। যে বুদ্ধিবৃত্ত শিক্ষার ভিত্তিতে তাঁর জীবনদর্শন গড়া তারই একটি দিক মাত্র এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হল।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যদিন পার হয়ে এসেছি। আজ বিজ্ঞানের জ্ঞান অভাবনীয়রূপে এগিয়ে গেছে এমন গর্ব করে থাকি। প্রতিদিন এগিয়ে চলেছে। বর্তমান যুগ মহাশূন্যে যাত্রার যুগ। এবং সে যাত্রায় হয়তো সফল হবে মানুষ। কিন্তু যে মহাজিজ্ঞাসা মানুষ তার জ্ঞানলাভের পর থেকে করে আসছে তার উত্তর আজও মেলে নি। বিশ্বসৃষ্টি হল কেমন করে, মহাশূন্যব্যাপী অনন্ত কোটি বিশ্বদ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশ্য কি, সার্থকতা কি, অমোঘ পরিবর্তনের স্রোতে কোথায় ভেসে চলেছে এরা, এবং পরমাশ্চর্য পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াতীত মননশক্তির সাহায্যে চিরজিজ্ঞাসু মানুষ এলো কেন, কি তার পরিণাম, এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। একমাত্র দর্শনের ঘাড়ে এর মীমাংসা ছেড়ে দেওয়ারও কোনো অর্থ হয় না। কারণ এ প্রশ্ন বিজ্ঞানীদেরও প্রশ্ন হওয়া উচিত, যদিও কোনো দিন তার উত্তর মিলবে কি না সন্দেহ।

তবু বিজ্ঞানীর ভাষায় বিস্ময় প্রকাশ নিষেধ। তার উদ্দেশ্য বুঝি। পাছে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে মাঝপথে সাধনা নষ্ট হয়। কিন্তু কবি সে ভয় করবেন কেন? তাঁর অনন্ত জিজ্ঞাসা, অনন্ত বিস্ময়। তাই রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সরল ভাষায়, এবং যে সরল ভাষায় প্রকাশ তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য, — স্বীকার ক'রে গেছেন—

আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

রবীন্দ্রনাথের পত্রধারা

শঙ্খ ঘোষ

জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে কবি লিখেছিলেন, 'কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও-দুটা একই বৃহৎ রচনার অঙ্গ।... কবির জীবন যেমন কাব্যকে প্রকাশ করে কাব্যও তেমনি কবির জীবনকে রচনা করিয়া চলে।' জীবনরচনার এই স্মরণীয় দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য না করলে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে আমরা হয়তো ভুল বুঝব।

যে-কোনো কবির নেপথ্যচারী ব্যক্তিটিকে জানতে আমাদের অসীম কৌতূহল। এই কৌতূহলের একটা দিক নিশ্চয় বৈজ্ঞানিক সত্যসন্ধান। কিন্তু এর আরও একটা দিক আছে যেখানে আমরা অসাধারণ মনীষাকে মিলিয়ে নিতে চাই সাধারণ স্তরে, সকৌতুকে দেখতে চাই তাঁর পতন-বন্ধুর জীবন এবং কখনো-বা সেই ঔৎসুক্য শালীনতার সীমা পর্যন্ত অতিক্রম করে।

কবিরচিত আত্মজীবনী, দিনলিপি বা পত্রাবলীর প্রতি তাই আমাদের উদ্‌গ্রীব আগ্রহ, কেননা আমরা ভাবি যে এই সব উপাদান থেকে আবিষ্কৃত হবে রোমাঞ্চকর তথ্যাবলী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমরা এই আপত্তি জানাই যে তিনি তাঁর জীবন সম্পর্কে স্বভাবতঃ গোপনচারী, মঞ্চের আলোয় তাঁর অসম্বৃত উপস্থাপনায় তিনি উৎসাহী নন। দিনলিপি তিনি লেখেন না, আত্মজীবনীতে তিনি সবই বলেন তাঁর নিভৃত অংশটুকু ছাড়া এবং পত্রাবলীতেও তিনি নিপুণরকমে প্রচ্ছন্ন। ফলে এই অভিযোগ প্রায় প্রচলিত যে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণগুলি অত্যন্ত সতর্ক, সুসজ্জিত, প্রায় 'সুরচিত কাব্যকথা'।

এই অভিযোগ বহির্বিচারে সত্য। কিন্তু তখন আমরা যেন ভুলে না যাই যে বহির্জীবন এবং অন্তর্জীবন দুইই যাঁর কাছে 'রচনা'র বিষয়, সেই জীবনশিল্পীর পক্ষে এইরকমই অনিবার্য ছিল। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনও তাঁর কাছে নেপথ্য নয়, যেমন আমরা সচরাচর ভাবি। যে-কবি তাঁর অঙ্গাবরণেও দেখতে পান শিল্পের উৎসার, শুনতে পান 'সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী', তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি তুচ্ছ আচরণ যে রচিত হবে সৌন্দর্যের আদর্শে, সে তো স্বাভাবিক। ফলে তাঁর জীবনকথায় সহজেই ফোটে 'বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ', তাঁর পত্রাবলীও কোনো বিচ্ছিন্ন উপাদান মাত্র না থেকে হয়ে ওঠে সৃজিত সৌন্দর্য।

চিঠিতে আমরা কী প্রত্যাশা করি? রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ সত্ত্বেও 'ভারহীন সহজের রস'কে চিঠির প্রধানতম রস বলে মনে করা যায় না। বিশ্বপ্রসিদ্ধ পত্রাবলীর অনেকাংশই তা হলে চিঠি নামের গৌরব থেকে বঞ্চিত হত এবং অল্পবয়সে তিনি ভালো চিঠি লিখতেন কবির এই স্বীকৃতিরও কোনো প্রমাণ মিলত না তা হলে। বস্তুতঃ, লেখক এবং প্রাপকের যুগল-উপস্থিতিই চিঠির প্রধানতম

রস সৃষ্টি করে। 'যে শোনে এবং যে বলে এই দুজনে মিলে তবে রচনা হয়'।[১] কিন্তু সে তো কবিতাপ্রসঙ্গেও সত্য। পার্থক্য এই যে, কবি যখন কবিতায় কথা বলেন তখন পাঠক তাঁর অভিপ্রেত শ্রোতামাত্র, শ্রোতা এবং বক্তার যতটুকু মিলন প্রয়োজন কবিতায় ততটাই মিলতে হয় — কিন্তু চিঠি যখন রচিত হয় তখন লেখকই এক-মাত্র বক্তা নন। তখন, বস্তুতঃ, সেই রচনা একরকম নাটকীয় একোক্তিতে পরিণত হয়। আর একোক্তির ধর্মই কি এই নয় যে অন্তরালবর্তী অন্য একটি অস্তিত্বের প্রত্যুক্তি-প্রবাহের দ্বারা তা অনেক পরিমাণে চালিত? অর্থাৎ চিঠি দাঁড়িয়ে আছে সংলাপের কিনারায়, কুয়াশাচ্ছন্ন অন্য কূলটি সবসময়ে স্পষ্ট দেখা যাবে না ভেবেই বরং পত্রলেখক অনেক সময়ে বিপন্ন বোধ করেন। তখন কীটসের কথা তাঁর মনে হতে পারে, যে-কীটস আক্ষেপ করেন এই বলে : 'One cannot yerk ye in the ribs, or lay hold of your button in writing'। এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াই তো চিঠির সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য, চিঠিতে তো দিতে পারা চাই লেখকের সবটুকু সেই প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব— 'a wink, or a nod, or a grin, or a purse of the lips, or a smile'। দিতে না পারবার এই আক্ষেপ, যদিও, কীটসের পক্ষে অনিবার্য ছিল না, কেননা তাঁর পত্রধারার অধিকাংশই এই আত্মপ্রক্ষেপ এবং যুগল-উপস্থিতির প্রত্যক্ষ উত্তাপে স্পন্দিত।

চিঠির এই রমণীয় বৈশিষ্ট্য আছে বলেই একই লেখকের রচনা ভিন্ন হয়ে যায় প্রাপকের ভিন্নতায়। সম্পর্কের ভঙ্গি যখন বদলায়, চিঠির ভঙ্গিও তখন পরিবর্তিত হতে বাধ্য। বিবিধ চরিত্রের সঙ্গে লেখকের সম্পর্কপ্রকৃতির অনুসন্ধান, চিঠিপ্রসঙ্গে, তাই খুব স্বাভাবিক। আর এই স্বাভাবিক অনুসন্ধানে অগ্রসর হলে আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই ব্যক্তিসম্পর্ক রচনা করতে উৎসাহী নন, প্রায়-কৃপণের মতো তিনি নিজেকে রাখেন নিভৃতে, কয়েকটি সূক্ষ্ম সুরচিত সূত্রের উপর নির্ভর করে তাঁর এই সম্পর্ক। ফলে ব্যক্তিভেদে পত্রভেদ তাঁর ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটে না। কারণ, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির কোনো সেতুবন্ধনের প্রক্রিয়া তাঁর নয়, জীবনের সঙ্গে জীবনের একটা দূর-সূত্রবন্ধন তাঁর অভিপ্রায়। দীর্ঘজীবনের পরিধিব্যাপী এত বিচিত্র জনসমাবেশ তাঁর নির্জনতাকে স্থির কেন্দ্র থেকে কিছুমাত্র সরিয়ে আনতে পেরেছিল কি? এত কোলাহলের মাঝখানে রেখেও কেন তাঁকে মনে হয় এত নিঃসঙ্গ? প্রায় বাল্যজীবন থেকে অবসানকাল পর্যন্ত কেন তাঁর যথার্থ বান্ধবের এমন স্বল্পতা? অথচ কেন এত অসংখ্য ব্যক্তি তাঁকে নিকটতম এবং সুন্দরতম অন্তরঙ্গতায় লাভ করেছেন বলে কল্পনা করেন? এ সমস্ত প্রশ্নেরই ঐ একমাত্র উত্তর বলে মনে হয়, তাঁর জীবনের শিল্পে এই বিস্তীর্ণ জনতা যতটা গৃহীত হয়েছে ততটাই আমরা দেখতে পাই— তাঁর নেপথ্যের স্পর্শ এতটাই কম পাওয়া যায় যে কখনো কখনো তাঁর সমস্ত আচরণকেই

১ ছিন্নপত্রাবলী, পৃ ৩৫৩

এমন-কি একটা সৌজন্যের নামান্তর বলে মনে হতে পারে, প্রচলিত জীবনচরিতকে হয়তো সেই-জন্যেই তিনি বিশ্বাস করেন না।

নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখবার এই সাধনা তাঁর কতদূর গিয়েছিল, তা বোঝা যায় কবিজায়াকে লিখিত পত্রাবলীতে। সাহিত্যসমাজে প্রায় উপেক্ষিত এই চিঠিগুলি যদিও অসাধারণ, এইখানে রবীন্দ্রনাথের এমন এক স্নিগ্ধমধুর প্রেমিক চিত্ত প্রকাশিত, অন্তরঙ্গতায় এবং পারিবারিকতায় যার তুলনা নিতান্ত সুলভ নয়— কিন্তু তবু এইখানেও, এই নিজস্বতম নির্জনতাতেও কখনো কখনো কবিকে দেখতে পাই রচনাশীল। আত্মগোপন— এমন-কি আত্মপীড়নের মধ্য দিয়ে নেপথ্যকে নির্জিত করে কবি যখন সেখানেও সেই প্রলোভনের ছবি আঁকেন, যার কাছে 'প্রতিদিনের সমস্ত দুঃখ নৈরাশ্য ক্ষুদ্র হয়ে যায়' বা 'যেখানে মানুষের আত্মার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই'[২] তখন আমরা যেন গোপনে তাঁর সেই উচ্চারণ ধ্বনিত হতে শুনি : পারিবারিক মানুষ এই দুইয়ের মাঝখানের প্রদোষান্ধকারের একটা জিনিস, আমার কাছে ও সুস্পষ্ট নয়।[৩] কিংবা অন্যত্র, 'আমার সম্পূর্ণ আমি কারও জন্য কোনো মার্জিন না রেখে সম্পূর্ণ নিজের রচনা বিস্তার করতে থাকে, অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার জিনিস নির্ভয়ে চারিদিকে বিছিয়ে দেয়।'[৪] এই মার্জিনের অভাবেই হয়তো বিভিন্ন প্রাপকের কাছে লিখিত তাঁর চিঠিতে প্রভেদ হয়ে আসে অত্যল্প।

আবার এরই ফলে, আঁদ্রে মোরোয়া যখন বলেন চিঠি দলিলমাত্র, তা কখনোই প্রমাণ নয়, সে কথা অন্য পত্রলেখকদের প্রসঙ্গে সত্য হলেও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে নয়। শেষজীবনের কিছু ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে রবীন্দ্রনাথের চিঠি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ, যতটা নিশ্চিত প্রমাণ তাঁর কবিতা স্বয়ং। তাকে দলিলমাত্র মনে করবার কোনো হেতু দেখি না, বিচিত্র বিভিন্ন উক্তি মিলিয়ে তার থেকে সত্য আবিষ্কারের কোনো পরিশ্রমের দরকার নেই, প্রায় যে-কোনো উক্তি তার নিজস্ব-মূল্যে গ্রাহ্য হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লেখকের চিঠিই তা নয়, কেননা মুহূর্তের প্রগল্‌ভতা, ঘটনাগত উত্তেজনা বা আত্মদ্বন্দ্ব অনেক সময়েই মধুসূদনের মতো কোনো লেখককে দিয়ে এমন কথা বলিয়ে নিতে পারে যার যথার্থ মূল্য কথার উপরিস্তরে নেই। জীবনে এবং চিন্তায় যে জটিল দ্বন্দ্ববিক্ষেপ এবং আত্মবিরোধ আছে চিঠিতে তার প্রকাশ প্রায় অনিবার্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীতে এই বিরোধের অভাব কখনো কখনো আমাদের ব্যাকুল করে। যদিও একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন : আজ দুপুরবেলায় একখানা চিঠিতে অনেক বৈরাগ্যের কথা লিখেছি, আবার সন্ধ্যার সময় আরেকখানা চিঠি লিখতে গিয়ে অনুরাগের কথা এসে পড়ল[৫]—

২ চিঠিপত্র ১, পৃ ২৯

৩ চিঠিপত্র ৫, পৃ ৪৩

৪ ছিন্নপত্রাবলী, পৃ ২৭৫

৫ ছিন্নপত্রাবলী, পৃ ৪১৪

কিন্তু তবু রবীন্দ্রকাব্যপাঠকের কাছে এ খুব জানা খবর যে এই উক্তিতে এমন-কি আপাতবিরোধও নেই— এ-দুয়ের সংগতি রচনা করেই তাঁর শিল্পাদর্শ রচিত। যে-জাতীয় অসংগতি থেকে সম্ভব হয় শাতোব্রিয়াঁর মতো কোনো ব্যক্তির পক্ষে একই দিনে তিনজন নারীকে সমান উত্তাপে প্রেমপত্র প্রেরণ করা কিংবা মধুসূদনের পক্ষে একবার জানানো যে লিরিক-রচনার চিন্তা অসহ্য এবং অন্যবার বুঝিয়ে দেওয়া যে লিরিকেই তাঁর যথার্থ প্রবণতা— রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেরকম অসংগতি বা বিরোধ আমরা কল্পনাই করতে পারি না।

তার অর্থ কি তবে এই যে তাঁর চিত্ত বিরোধবিহীন? কোনো শিল্পীর পক্ষেই এই নির্বিরোধ সম্ভব বা কাম্য নয়। কিন্তু সেই বিরোধের কোনো চিহ্ন তিনি তাঁর পত্রাবলীতে ব্যবহার করেন না এবং এইখানেই ফুটে ওঠে তাঁর ব্যক্তিসম্পর্কের শিল্পচেতনা। সাহিত্যে বা ব্যক্তিসম্পর্কে তিনি গোপন নেপথ্যের নগ্ন উদ্ঘাটনে বিশ্বাসী নন, পরিণত সুসম্পূর্ণ রূপই তাঁর প্রয়োজন। ফলে রচনার গোপন কারুঘর হিসেবে যদি তাঁর চিঠিগুলির দিকে তাকাই তো আমরা প্রায়ই ব্যর্থ হব। ছিন্নপত্রের নূতন যোজনাগুলির দ্বারাও খুব উল্লেখযোগ্য কোনো চারিত্রবদল সেইজন্য দেখতে পাই না, তাঁর অন্তর্বিরোধের কোনো প্রকাশ্য দাহ আমরা দেখতে পেতুম মাত্র সেই ক্ষেত্রে যদি কোনোদিন তাঁর কোনো গোপনচারিণী দিনলিপির জন্ম হত।[৬]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র— এমন-কি তাঁর ছিন্নপত্রও, ডায়েরিধর্মী নয়, যে কথা আমরা ভেবে থাকি। সম্বোধনসূচক কয়েকটি কথামাত্রের পুনর্যোজনাতেই— বব্, তুই, জানিস— ইত্যাদি পদের প্রয়োগমাত্রই পুরোনো ছিন্নপত্র যে নিমেষে নতুন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। যেন অন্ধকার ঘরের সব জিনিসেরই পুরোনো সন্নিবেশ থাকল, কেবল একটি দীপশিখায় তার নতুন উজ্জ্বল রূপ উঠল ফুটে, ঐ শব্দগুলি ছিন্নপত্রাবলীতে সেই আলোর কাজ করে, ইন্দিরাদেবীকে আমরা চোখের সামনে এখন প্রতিমুহূর্তে দেখি দীপ্যমান;— কিন্তু ঐ শব্দগুলির অভাবেও আমাদের বুঝতে ভুল হত না যে কোনো একটি উপলক্ষ সামনে বর্তমান, কথাগুলি কেবলই আত্মকথন নয়, অনেকটাই রচিত। যদি কেবলই আত্মকথন হত তবে আমরা সেই প্রত্যাশিত বিরোধ হয়তো দেখতে পেতাম এখানে। বিশ্লেষণে তিনি সাধারণভাবে উৎসাহী নন তা ঠিক, কিন্তু ছিন্নপত্রাবলীর রচনাকালেই কবি কি নিবিষ্টভাবে পড়ছিলেন না বাশ্‌কির্টসেভ্বা অথবা আমিয়েলের জর্নাল? এবং এর অন্ততঃ দ্বিতীয়টি প্রসঙ্গে তাঁর উৎসাহের প্রত্যক্ষ বর্ণনা চিঠিতে পাই, তাঁকে তিনি সর্বসাময়িক সঙ্গী বলে ভেবেছেন পর্যন্ত। তখন হয়তো এ-দুয়ের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন তুলনা

৬ 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র খসড়াতে এই দিনলিপির স্বভাব বর্তমান। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই ডায়েরি একজন 'যাত্রী'র এবং সেই যাত্রাও লেখকের নিজস্ব সমাজ-জীবনের বিপরীত এক জীবনাঙ্গনে। ফলে, বহির্বিষয় এবং তুলনামূলক সামাজিক চিন্তা এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। নিজেকে নিয়ে খেলা করবার অবসর এখানে যেন তুলনায় কম।

মনে গোপনেই জাগে। প্রকৃতিনিবিষ্টতায় দুই মানসিকতার সামান্য সাদৃশ্য ধরা পড়ে, কখনো-বা অধ্যাত্মবিভার আবিষ্কারে— কিন্তু আমিয়েলের পরম ব্যর্থতাবোধের বিক্ষিপ্ত মনঃসমীক্ষার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সার্থকতাস্নিগ্ধ প্রশান্ত উচ্চারণগুলির কতই-না ব্যবধান। দুই মনের বা দুই রীতির অবিকল সাদৃশ্য কে প্রত্যাশা করে? কিন্তু কবি-প্রিয় ঐ জর্নাল এবং ছিন্নপত্রের রচনারীতিগত মেরুপ্রমাণ দূরত্বের একটি মূল কারণ কি এই নয় যে ওটি ডায়েরি এবং এটি তা নয়?

এবং এই ব্যবধান ক্রমে আরও একটি সত্যে আমাদের পৌঁছে দেয়, তা এই যে ছিন্নপত্র বা সাধারণভাবে তাঁর পত্রাবলী মনীষানির্ভর নয়, অনুভবনির্ভর। অজিতকুমার বরং এই ভেবে তৃপ্তি বোধ করেন যে আমিয়েলের মতো কোনো চিন্তার শৈল ছিন্নপত্রের সোনার স্রোতকে রুদ্ধ করে দেয় নি। চিন্তার কোনো বিচিত্র বিক্ষেপে তাঁর পত্রাবলী আমাদের মনকে চঞ্চল করে না। যদিও সহসা তিনি লেখেন: এখানে এসে আমি এত এলিমেন্‌ট্‌স্‌ অব পলিটিক্স এবং প্রব্লেমস অব দি ফ্যুচার পড়ছি[৭]— কিন্তু তাঁর চিন্তানির্মাণে সেই পাঠ কীভাবে অংশ নেয়, তা আমরা জানতে পারি না, তাঁর সেই স্বগত চিন্তা নেই এখানে এবং যদিও তিনি পড়েন Caird's *Philosophical Essays* বা রামমোহনের গ্রন্থাবলী, কিন্তু তা আর-একবার স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয় যে যথার্থ অর্থে দার্শনিক তিনি কোনোদিনই হবেন না, তিনি নিগূঢ়-রূপেই ভাবুক। ফলে 'রামমোহনের মতো প্রখর বুদ্ধিমান্‌ও একজন বৈদান্তিক ছিলেন' এই কথাটাকে ঈষৎ লঘু চিন্তায় দু-চারবার খেলা করেই কথাটা তিনি ছেড়ে দেন এই বলে 'হয়তো কোন্‌দিন দেখব বৃদ্ধবয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি'।[৮]

উপরের ঐ কথাটি পরিহাস, এমন-কি ঐ পুরো চিঠিটিই লঘুতার আবেশে লেখা, কিন্তু একমাত্র কবিতা গান বা ঈষৎপরিমাণে ছবির প্রসঙ্গ ভিন্ন কখনোই কবিকে আমরা এর চেয়ে অনেক গভীর উচ্চারণ করতে শুনি না তাঁর চিঠিতে— যতক্ষণ পর্যন্ত-না তিনি যাত্রী বা রাশিয়ার চিঠিতে পৌঁছন। কিন্তু সে তো নামেই চিঠি, লর্ড ডাফরিনের Letters from High Latitudes যতটা চিঠি এ-ও ততটা, এ যে নিতান্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত তা দ্বিতীয়বার বলবার অপেক্ষা রাখে না। কিংবা কাদম্বিনী দেবী বা নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত পত্রাবলীতে তাঁর ভূমিকা প্রায় আচার্যের, তার আত্মিক যোগ হয়তো 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে। এবং ভাবলে কি বিস্ময় বোধ হয় না যে জগদীশচন্দ্র এবং প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে পত্রালাপেও হৃদয়াবেগ, ঘটনাক্রম বা স্বকাব্যবিশ্লেষণ যতটা প্রকাশিত, মনীষার ব্যবহার তত নয়। তখন, যে-গ্যেটের সঙ্গে তাঁর তুলনার কথা আমরা প্রায়ই ভাবি, তাঁর সঙ্গে এ-ক্ষেত্রেও একটা বড় প্রভেদ আমাদের লক্ষ্যে আসে। গ্যেটের প্রায় দশ হাজার চিঠির যতটা প্রকাশিত তারই মধ্যে আমরা যেমন দেখি সুচিন্তিত বিষয়ের বৈচিত্র্য, তেমনি বাগ্মিতার

৭ ছিন্নপত্রাবলী, পৃ ৯৪

৮ ছিন্নপত্রাবলী, পৃ ৩১৮

অবিরল প্রবাহ। কবিতা বা শিল্প বিষয়ে শিলার বা শ্লেগেলের সঙ্গে তাঁর পত্রবিনিময় যেমন সুখ্যাত, তেমনি দর্শন বিজ্ঞান বা নাট্যকলা প্রসঙ্গে তৎসাময়িক শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের সঙ্গে তাঁর অসংখ্য লিপি-ব্যবহার এখানে স্বভাবতঃ মনে পড়ে। গ্যেটের জার্মানি এবং রবীন্দ্রনাথের বাংলা মনীষীসম্পদে তুল্যমূল্য নয়, এ কথা মনে রাখলেও এই চিন্তা আমাদের আক্রমণ করে যে ছিন্নপত্রাবলী বা তাঁর অপরাপর পত্রধারা বিষয়ের বহুতায় এত স্বভাববিমুখ কেন। তাঁর নিজস্ব নির্জন চিন্তায় কবিতা বা গান ছাড়া আর কিছুরই অধিকার ছিল না, তাঁর সমস্ত সাহিত্যজীবন এ কথার নিশ্চিত প্রতিবাদ। কিন্তু মনে হয়, উক্ত চিন্তাবলীকে তিনি তাঁর অনুভবের জগতে নিয়ে আসেন নি, রেখেছেন মনীষার ঘরে, এবং তাঁর পত্রাবলীকে তিনি করে তুলতে চেয়েছেন হৃদয়াবেগে উজ্জ্বল, স্থির-শান্ত রচনায়, সৃষ্ট-শিল্পের মহিমায়। পারস্পরিক সম্পর্ককে তিনি ব্যবহারে বিক্ষিপ্ত বা মনীষায় বিচ্ছিন্ন না করে, তাকে করতে চেয়েছেন অনুভবের মায়ায় প্রসারিত। আর এই সম্পর্কের শিল্পসুষমাই রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীকে সচেতন পত্রশিল্পে পরিণত করেছে।

এমন-কি ছিন্নপত্রাবলীও সেই সচেতন শিল্পের অন্তর্গত। বরং এক হিসেবে পত্রধারার সবচেয়ে শিল্পিত রূপই ধরা পড়ে এইখানে। দেশগোচর হবে মনে জেনেও, কিংবা ঠিক সেইজন্যেই, তাঁর উত্তরজীবনের পত্রাবলীতে তিনি সেই স্বভাবসম্পূর্ণতা আনতে পারেন নি যা ছিন্নপত্রের চিঠিগুলির সঙ্গে তুলনীয়। পদ্মার নিবিড় সহযোগ এর একটা বড় কারণ, কিন্তু এইটেই একমাত্র কারণ নয়। এই পদ্মায় তিনি সর্বৈব মুক্তি পেয়েছিলেন বলে বারে বারে জানিয়েছেন: ঘরের মধ্যে আমার অন্তরাত্মার নিশ্বাস আর চরের মধ্যে তার প্রশ্বাস[৯]— কিন্তু নিশ্বাসপ্রশ্বাসের এই সহজ স্ফূর্তির পরেও এই একটি কথা বাকি থাকে যে চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল ইন্দিরাদেবীকে। এই চিঠিগুলির পত্ররস আমরা উপলব্ধি করতে পারব না যদি-না আমরা লক্ষ্য করি এর ফল্গুপ্রবাহে ইন্দিরাদেবীর অতিপ্রচ্ছন্ন এক ব্যক্তিত্ব যার সার্থক সমবায়ে এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গভীরতম সত্যের কথা বলতে পারেন, যা আর এক স্তর অতিক্রম করলেই কবিতায় পরিণত হবে। 'আমাদের সবচেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে দিতে পারি নে'। কিন্তু ইন্দিরাদেবীর এমন একটি 'অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে সত্য আপনি'[১০] তাঁর কাছে সহজে প্রকাশ হয়, জীবনের শিল্প-রূপায়ণে ইন্দিরাদেবীর সাহচর্য তাই হয়তো কবি সবচেয়ে কামনা করেন। ছিন্নপত্রের জীবন তাই জীবনের শিল্প, এর চিঠিগুলি তাই প্রতিদিনের সৌন্দর্যের অনুভব অক্লান্তভাবে প্রকাশ করে, আমরা কেবল তার দিকে তাকিয়ে ভাবতে পারি, হে ধরণী, কেন প্রতিদিন/তৃপ্তিহীন/একই লিপি পড়ো ফিরে ফিরে! এবং যদি আমরা তথ্যসঞ্চয়নের

৯ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পৃ ১২৭

১০ ছিন্নপত্রাবলী, পৃ ৩৫২

মন নিয়ে তার দুয়ারে যাই, বা থেমে থেমে একটি একটি করে প্রত্যেককে পৃথকভাবে আস্বাদ করতে চাই— তা হলে আমরা হয়তো ভুল করব, সেই ভুল আমাদের ক্লান্তও করে দিতে পারে, মনে জাগাতে পারে এই কথা যে একই লিপির এই বারংবার আবর্তনের কোনো প্রয়োজন ছিল না হয়তো— কিন্তু তখন সেই পাঠককে মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছে হবে সেই কথা যা এজরা পাউণ্ড বলেছিলেন গার্ডনার প্রসঙ্গে : You must see them not as you see stars on a flag but as you have seen stars in the heaven !

রবীন্দ্রনাথের সংগীত-রচনার সূচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

প্রতিভাবান ব্যক্তিদের বিশেষ করে যাঁরা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তাঁদের জীবনের কোনো-একটি ধারার বিচার-বিশ্লেষণ করা কঠিন। বনস্পতির মূল যেমন ভূমির অভ্যন্তরে অদৃশ্যভাবে রস সঞ্চয় ক'রে বনস্পতিকে পত্র-পুষ্প-ফল-পল্লবে বিকশিত করে, সেই মূলের কার্যকরতার পরিচয় পেতে হলে বিশেষ জ্ঞানের যেমন আবশ্যক হয়, প্রতিভাবান পুরুষদের জীবনের যে রূপ লোকচক্ষুর সামনে প্রতিভাত হয়, সেই রূপের মূল উৎসটি লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করে— তার পরিচয় পেতে হলে তেমনি বিশেষ ধ্যানধারণার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের সংগীত-রচনায় প্রেরণার মূল উৎসগুলির সঙ্গে পরিচিত না হলে সমগ্র রবীন্দ্রসংগীত-সৃষ্টির ধারা সম্বন্ধে ঠিক-ঠিক ধারণা করা সম্ভবপর নয়।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতজীবন গঠনে পোষণে ও বিকাশে দুটি বিষয় বিশেষ কার্যকর হয়েছিল, তার মধ্যে একটি হল পারিবারিক আবহাওয়া এবং অপরটি হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিশিষ্ট অভিভাবকত্ব। এই দুইয়ের মধ্যে শেষোক্তটি বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। বাল্যাবস্থা থেকে ক্রমশঃ পরিণত বয়স পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের জীবনধারা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দুজনের খুবই সামঞ্জস্য ছিল। দুটি উদ্‌ধৃতি দিলে আশা করি বিষয়টি পরিস্ফুটতর হবে—

বাড়ীতে মাস্টারের কাছে ইংরাজী পড়া আরম্ভ হইল। তখন জ্যোতিবাবুর অভিভাবক হইলেন, তাঁহার সেজদাদা (স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। হেমেন্দ্রবাবুর শিক্ষারীতিও সেকালের অনুরূপ অতি কঠোর ছিল। অষ্টপ্রহর ঘাড় গুঁজিয়া টেবিলে ঝুঁকিয়া পড়িতে হইত। মিছামিছি সময় নষ্ট হইবে বলিয়া, তিনি খেলিতেও ছুটি দিতেন না। যখন বাড়ীর অন্যান্য বালকগণকে খেলিতে দেখিতেন, তখন জ্যোতিবাবুর যে কি কষ্ট হইত, তাহা তাঁহার বর্ণনাতীত। তিনি ভাবিতেন, তিনি যেন জেলখানায় আছেন— সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নিকট অন্ধকার, জগতে যেন তিনি নিতান্ত একা, অবরুদ্ধ। মুক্তির জন্য তাঁহার প্রাণ ছটফট করিত।[১]

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের বাল্যপ্রকৃতিতে দেখা যায়—

মাস্টারমশায় মিট্‌মিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট্‌ বুক। প্রথমে উঠত হাই, তার পর আসত ঘুম, তার পর চলত চোখ-রগড়ানি। বারবার শুনতে হত, মাস্টারমশায়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি

টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা ব'লে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মুরুখ্যু হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না।[২]

এই ইস্কুলে উৎপাত কিছুই ছিল না, তবু হাজার হইলেও ইহা ইস্কুল। ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মতো— ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বড়ো বাক্স। কোথাও কোনো সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভালো মন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিস আছে, বিদ্যালয় হইতে সে-চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত। সেইজন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সংকীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত— অতএব, ইস্কুলের সঙ্গে আমার সেই পালাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না।[৩]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনের প্রকৃতিতেই এই স্কুল-পলায়নের ইচ্ছার সামঞ্জস্য ছিল। এ তো একটা দিক মাত্র। পরবর্তী জীবনে চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্যে ও গুণাবলীর বিকাশেও এই দুই ভ্রাতার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিভাত হয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা এগারো বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। বয়সের এই পার্থক্যের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের কেবল শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন পরম রবীন্দ্র-সুহৃদ্ এবং সব চেয়ে বড়ো কথা হল এই যে রবীন্দ্র-চরিত্রের গুণাবলীর বিকাশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধান পথপ্রদর্শক, উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-বনস্পতির পল্লবায়নে প্রতিভাবান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেভাবে বনস্পতির মূলের ন্যায় রস-সঞ্চার করেছেন স্বেচ্ছায় ও আনন্দে আত্মত্যাগ স্বীকার করেও, তার তুলনা খুব কমই মেলে। রবীন্দ্রনাথও মুক্ত-কণ্ঠে সে-কথা স্বীকার করেছেন—

তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না; তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সংগীতের অবিরলবিগলিত ঝরনা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে; তখন নবযৌবনে নব নব উদ্যম নূতন নূতন কৌতূহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে; তখন সকল জিনিসই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনেই হয় না; তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি— আমার সেই কুড়িবছরের বয়সটাতে এমনি করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই-যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দাম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা।··· এমনি করিয়া ভিতরে বাহিরে সকল দিকেই সমস্ত বিপদের সম্ভাবনার মধ্যেও তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন; কোনো বিধিবিধানকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই এবং আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে তিনি সংকোচমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।[৪]

২ ছেলেবেলা
৩ জীবনস্মৃতি
৪ জীবনস্মৃতি

সংগীতের ক্ষেত্রে কি ভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের চিত্তবৃত্তিকে সংকোচমুক্ত করেছিলেন সে-প্রসঙ্গ অবশ্যই আলোচনার যোগ্য। তৎপূর্বে ও তৎসহ আর-একটি বিষয় জানা আবশ্যক, সেটি হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংগীত-গুণপনা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন অসাধারণ সংগীত-গুণী— একাধারে সংগীত-শিল্পী, সংগীত-শাস্ত্রবিদ্ ও সংগীতে উদারমনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। একই ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটি গুণের সমাবেশ খুব কদাচিৎ ঘটে। ভারতবর্ষের সংগীতের ক্ষেত্রে প্রাচীন যুগে কলাকার ও শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন একই ব্যক্তি। যিনি গান পরিবেশন করতেন তিনিই গানের তত্ত্ব ও তথ্য -সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করতেন। সেজন্য শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষ গায়নক্রিয়ায় কোনো গরমিল ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগে এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। তখন দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলাকার ও শাস্ত্রবিদ্ পৃথক ব্যক্তি— যার ফলে ক্রমশঃ নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে থাকে। তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে প্রাচীন যুগেও সংগীতের ক্ষেত্রে উদারমনোভাবাপন্ন ব্যক্তির সন্ধান কমই মেলে— একমাত্র নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি ছাড়া আর কেউ ছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। এ স্থলে ভরতমুনির নাম উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে সম্ভবতঃ একমাত্র তিনিই বলেছেন— আমার শাস্ত্রকে আমি সম্পূর্ণ করে যাচ্ছি না, আমার পরবর্তী সুযোগ্য উত্তরসাধকরা এই শাস্ত্রে আরও তত্ত্ব ও তথ্য যোগ করতে পারবেন। বাস্তবিক পক্ষে সংগীতের মৌলিক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংগীতশিক্ষার তথ্য, সংগীতসংগ্রহের আগ্রহ ও সুররক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়াস, আকারমাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির উন্নয়ন ও প্রচার, লয়নির্দেশের নূতন প্রণালীর উদ্ভাবনা, সংগীতরচনার ধারা এবং নাটকরচনার তথ্য গভীর ভাবে বিচারবিশ্লেষণ করলে সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণত্ব সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকে না।

এ কথা অনেকেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ কোনো ওস্তাদের কাছে দীর্ঘকাল শিক্ষানবিসি করেন নি। প্রকৃত অর্থে শিক্ষানবিসি তিনি করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধীনে, অবশ্য ভিন্ন পদ্ধতিতে ও উদ্দেশ্যে। কবির কথাতেই বলি—

এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।[৫]

এ স্থলে একটু প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া আবশ্যক। আমাদের বিশ্বাস, সাংগীতিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা পিয়ানো-বাদনের সাহায্যে ধ্বনির (সুরের) পরীক্ষা। কেননা এই পরীক্ষার ফলের প্রভাব জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজের গানগুলিতে যেমন বর্তেছে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গানগুলিতেও তেমনি বর্তেছে— তা স্থূলভাবেই হোক বা সূক্ষ্মভাবেই হোক। কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে বললে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। 'স্বর' শব্দটি আমরা দুই অর্থে ব্যবহার করি—

৫ জীবনস্মৃতি

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ও সংগীতের ক্ষেত্রে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বর নয়টি[৬]— অ, ই, উ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ। আ, ঈ, ঊ ধর্তব্য নয়, কারণ সেগুলি হ্রস্বস্বরের দ্বিত্বমাত্র। এই স্বরগুলি স্বতন্ত্রভাবে বা ব্যঞ্জনের সঙ্গে মিলিতভাবে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য গঠন ক'রে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। আবার সংগীতের ক্ষেত্রেও প্রাচীন ষড়্জ গ্রামে স্বর নয়টি[৭]— ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, অন্তর গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ ও কাকলী নিষাদ। এই স্বরগুলিও বিভিন্নভাবে মিলিত হয়ে বিভিন্ন স্বর-বিন্যাস ও সুর গঠন করে এবং তদনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। এই উভয় প্রকার স্বরাবলীর প্রত্যেকটি এক-একটি বিশেষ ভাবের বাহক। যে গানে সাহিত্যের স্বরাবলীর ভাব ও সংগীতের স্বরাবলীর ভাব সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মিলিত হয় সে গানই সার্থক। রবীন্দ্রসংগীতে এই সমন্বয় ঘটেছে যেজন্য রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুরের মিলিত 'অর্ধনারীশ্বর'-রূপের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই রূপ-সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকটে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-নবিসির যুগে যখন 'পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন'—

আমি [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ] যেমনি একটি সুর-রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা [অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ] সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান-রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন।··· রবি কিন্তু বরাবর শান্তভাবেই ভাবাবেশে রচনা করিতেন।[৮]

রবীন্দ্রসংগীতে ভাবের উপলব্ধি ও ভাবের প্রকাশ যে কত প্রয়োজনীয়, বোদ্ধা ব্যক্তিমাত্রই তা স্বীকার করবেন। আমাদের প্রাচীন যুগের সংগীতের উদ্দেশ্যও ছিল তাই। মধ্যযুগে অনেক ক্ষেত্রে এ ধারণার স্খলন হয়েছে। বর্তমানে কোনো কোনো সংগীতাভিমানী ব্যক্তি কোনো কোনো রবীন্দ্র-সংগীতের সুর প্রচলিত কোনো বিশেষ রাগ-রূপের সঙ্গে মিলছে না দেখে বিভ্রান্ত বোধ করেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসংগীতের সুর বিচারবিশ্লেষণ করলে সদুত্তর পাবেন।

ভারতবর্ষের সংগীতের ক্ষেত্রে ধ্রুবপদ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ভাব-প্রকাশের দিক থেকে বিচারে ধ্রুবপদ ঐতিহ্যবাহী সংগীতধারা। 'এক দিকে তার গভীরতা, আর-এক দিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা'ই এই সংগীত-ধারার বৈশিষ্ট্য। বাংলা দেশে বাংলা ধ্রুবপদ-অঙ্গের গান রচনা ও প্রবর্তনার প্রধান কৃতিত্ব মহাত্মা রামমোহন রায়ের। রামমোহন-পরবর্তী যুগে বহু রচয়িতা ধ্রুবপদ-অঙ্গের গান রচনা দ্বারা বাংলা গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার মধ্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের সংগীতরচয়িতাগণের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করার যোগ্য, বিশেষ করে সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও

৬ আদি স্বর তিনটি : অ ই উ

৭ আদি স্বর তিনটি : ষড়্জ, ঋষভ ও গান্ধার

৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি

রবীন্দ্রনাথের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব ধ্রুবপদের প্রায় সবই ভগবদ্‌বিষয়ক এবং সুর বহু ক্ষেত্রে পুরোবর্তী কোনো-না-কোনো হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদের সুরের আদর্শে যোজিত। প্রসঙ্গত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্য—

ইহাদের [যদু ভট্ট প্রভৃতির] গান ভাঙ্গিয়া, তখন আমি এবং বড় দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলাম। কি সৌখীন কি পেশাদার কোনও গায়কের কোনও গান ভাল লাগিলেই, অমনি সেটি টুকিয়া লইয়া, আমরা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে বসিতাম। এইরূপে ব্রহ্মসঙ্গীতে অনেক বড় বড় ওস্তাদী সুর ও তাল প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গলায় সঙ্গীতের উন্নতি এমনি করিয়াই হইয়াছে।[৯]

রবীন্দ্রনাথও তাঁর দাদাদের অনুসৃত এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর রচিত হিন্দিগান ভাঙা ধ্রুবপদ-অঙ্গের গানের সংখ্যা অল্প নয়। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ -কৃত ধ্রুবপদ-অঙ্গের গানগুলি তুলনামূলক ভাবে আলোচনা করলে কয়েকটি বিশেষ সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। উভয় রচয়িতারই মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধ্রুবপদ-অঙ্গের গান আছে যার সুর-গঠনে খুব মিল আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত চৌতালের ও গৌড়মল্লার রাগের 'গাও রে পরব্রহ্মের মহিমা' গানটি উল্লেখ করা যায়। এ গানটির স্থায়ী অংশের স্বরলিপি দেওয়া গেল :

॥
II সা -সধা । -া া । -া ধা । ধপা -ধা । -র্সা র্সর্সা । -র্সাঃ -ধঃ I
গা ০ ০ ০ ০ ও রে ০ ০ পর ০ ০

I ধা -র্সা । -র্সা ধা । -ণপা পমা । ধাপ পা । -াম মা । -া -া I
ব্র ০ ০ হ্মে ০০ র০ ম হি ০ মা ০ ০

I মগা পমা । পমা মপা । -া -াম । মা -া । -জ্ঞা মরা । -মা -া I
ত্রি০ ভু০ ব০ ন ০ ০ চ ০ ০ রা০ ০ ০

I রা -া । -াস সা । -া সা । সা সা । -া সা । সা রা I
চ ০ ০ র ০ তি নি হে ০ স বা র

I রমা -া । -া মজ্ঞা । -া -া । জ্ঞমা -া । -রা -সন্‌া । -রাস সা II[১০]
প্রা ০ ০ ণ০ ০ ০ দা ০ ০ ০০ ০ তা

---

৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি

১০ ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২

তুলনামূলকভাবে একই রাগ-তালে 'ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা' রবীন্দ্রসংগীতটি উল্লেখযোগ্য। এ গানটির স্থায়ী অংশের স্বরলিপি এইরূপ :

II র্সা -র্সধা । ধা ধপা । -পধা -র্সর্সা । র্সা র্সা । -:নঃ নধা । -র্সর্সা ধা I
ঢা ০ কো রে ০ ০ মু খ ০ চ ন্ দ্র

I পা -া । -া -া । ধা পা । মা -া । মা পা । মপা মপা I
মা ০ ০ ০ জ ল দে ০ বি হ গে রা

I -মা -জ্ঞা । মজ্ঞা -া । জ্ঞমা রা । -া সা । -া -া । -া -া I
০ ০ থা ০ মো থা ০ মো ০ ০ ০ ০

I সা সা । রা রা । গা গা । গা -মা । রা রা । -:সঃ সা II[১১]
আঁ ধা রে কাঁ দো গো তু ০ মি থ ০০ রা

উভয় গানেরই অন্তরা সঞ্চারী আভোগ অংশেও সুরের উক্তরূপ সামঞ্জস্য আছে। পূর্বেই বলা হয়েছে এরূপ গানের সংখ্যা খুব কম। তা ছাড়া উভয় রচয়িতার কতকগুলি গান আছে যার সুর-গঠনে যথেষ্ট সামঞ্জস্য না থাকলেও উভয়ের সুর-যোজনার মেজাজে যে সামঞ্জস্য আছে তা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত 'ঢিমাতেতালা'র 'হে অন্তরযামী ত্রাহি' ও রবীন্দ্রনাথ-রচিত মধ্যমান তালের 'এ পরবাসে রবে কে' টপ্পা-অঙ্গের গান দুটির সুর তুলনা করলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। উভয় ক্ষেত্রে উল্লিখিত রাগ সিন্ধু।

জ্যোতিরিন্দ্র-সংগীত ॥

র্সা -ণা II ধপা -মজ্ঞা -জ্ঞা রসা I
হে ০ অ০ ০০ ন্ তর

I ন্সরজ্ঞা রা -া -া । -া রজ্ঞমজ্ঞা -রসন্া সা । -া -া ররা মমা । পা -া -া মণা I
যা০০০ মী ০ ০ ০ ত্রা০০০ ০০০ হি ০ ০ তুমি বিনা মো ০ র্ কে০

I ধা -া -া ধর্ণর্সণধা । -পধা -া মপণধা -পমপা । রমজ্ঞরা -সরা র্সা -ণা II[১২]
হ ০ ০ আ০০০০ ০০ র্ না০০০ ০০০ হি০০০ ০০ "হে ০"

১১ স্বরবিতান ৪৭

১২ ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১

তুলনীয় রবীন্দ্রসংগীত ॥

[সরমা -পধণা -র্সণধা-ণা]

II র্সণধা -ণা -া -া । ণধপা মজ্ঞা -া -া । -রজ্ঞা -মজ্ঞরা -জ্ঞা -া । -াঃ -রঃ সন্া সা I
এ০০ ০ ০ ০ প০র বা০ ০ ০ ০০ ০০০ ০ ০ ০ ০ সে০ র

॥

I রা -মজ্ঞা রা -া । -া রজ্ঞা -মপমা -জ্ঞরা । -জ্ঞা -া -া -রা । -সন্া -সা -া -া I
বে ০ কে ০ ০ হা০ ০০০ ০০ ০ ০ ০ ০

I সা রা মা মা । পা -া -া মগা । মা -ণা ধা -া । -া -ণধা -পধণা -র্সণধা I
কে র বে এ স ০ ঙ্ শ০ য়ে ০ স ০ ০ ০০ ০০০ ০০০

I -ণা -া ধা পা । -া -া -া -ধপা । মপা -ধপমা -পা -া । রজ্ঞা -মজ্ঞা -রসা -রা I [ ] I[১৩]...
০ ন্ তা পে ০ ০ ০ ০০ শো০ ০০০ ০ ০ কে০ ০০ ০০ ০

আবার অন্য দিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংগৃহীত ও স্বরলিপিবদ্ধ মূল হিন্দিগান ভেঙেও রবীন্দ্রনাথ কিছু ধ্রুবপদ-অঙ্গের গান রচনা করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খাতায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিখিত স্বরলিপি ও হিন্দি কথার অংশের নীচে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে 'হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে', 'মন জানে মনোমোহন আইল', 'হিয়া কাঁপিছে সুখে কি দুখে' ইত্যাদি গানের ও সুরের সন্ধান মেলে। ধ্রুবপদ-অঙ্গের গানের তুলনায় উভয় রচয়িতার খেয়াল-অঙ্গের ও টপ্পা অঙ্গের গানের সংখ্যা খুব কম হলেও একই পরিপ্রেক্ষিতে সে-সব গান সম্বন্ধেও আলোচনা করা চলে। এই সব গানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে গান রচনার ক্ষেত্রে, গানের সুরযোজনার ক্ষেত্রে উভয় রচয়িতার মন একরূপ হলেও মেজাজ আলাদা। রবীন্দ্রনাথের গান রসে ও বৈচিত্র্যে অধিকতর সমৃদ্ধ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন—

ইহার [দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গান-ভাঙা পর্বের] পরেই শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের আমল। তাঁহার অসামান্য কবি-প্রতিভা এখন ব্রহ্মসঙ্গীতকে প্রায় পূর্ণতায় পৌছাইয়া দিয়াছে। নানা সুর, নানা ভাব, নানা ছন্দ, নানা তাল, ব্রহ্মসঙ্গীতে আজ তাঁহারই দেওয়া। তাঁহার বীণা এখনও নীরব হয় নাই।[১৪]

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে হয়। কি জ্যোতিরিন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে, কি রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হল এই যে এই-সব গানে বর্তমান

১৩ স্বরবিতান ৮

১৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি

যুগে রাগ-সংগীতের ক্ষেত্রে প্রচলিত অলংকরণের বাহুল্য বর্জন। স্পষ্টতঃ মনে হয় এ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর-পরিবারের তৎ-সমসাময়িক অন্যান্য সংগীতরচয়িতাগণের উপর গায়ক বিষ্ণুর কিছু প্রভাব আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি অনুধাবন করলে এ সম্বন্ধে ধারণা বদ্ধমূল হয়—

বিষ্ণুর গানের একটা বিশেষত্ব ছিল। ওস্তাদেরা যেমন রাগিণীতে তান-অলঙ্কারেরই প্রাধান্য দেন, বিষ্ণু তেমন কিছু করিতেন না। তিনি অল্পস্বল্প তান দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত না। ইহা ছাড়া, গানের কথার যে একটা মূল্য আছে, সেটিও বিষ্ণুর গানে পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত হইত। সকলেই গানের সুর ও গৎ দুইই সহজে বুঝিতে পারিত। বিষ্ণু ধ্রুপদ খেয়ালই বেশী গাহিতেন।[১৫]

প্রসঙ্গতঃ যদু ভট্টের নামও উল্লেখ করতে হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উক্তিতে পাই—

যদু ভট্টও হিন্দি গান রচনা করিতেন। তাঁহার গানের সুর-বিন্যাসে যথেষ্ট নিপুণতা এবং একটা মৌলিকতা ছিল।[১৫]

অলংকারের বাহুল্য বর্জন বাংলা গানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যে-সব গান কাব্যধর্মী, যে-সব গানে কথা ও সুর মিলিতভাবে ভাবপ্রকাশের দায়িত্ব বহন করে সে-সব গানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল গানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অলংকার ব্যবহার করলেই ভাবের ঘনত্ব তরল হয়ে যায় ও গান রসের সীমানা লঙ্ঘন করে।

অন্যান্য গানের প্রসঙ্গে আসা যাক। 'স্বরলিপি-গীতিমালা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত স্বরলিপি-সম্বলিত একখানি মূল্যবান গ্রন্থ— ১৩০৪ সালে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে জ্যোতিরিন্দ্র-সংগীতের স্বরলিপি যেমন আছে, অন্যান্য সংগীতরচয়িতাগণের গানের স্বরলিপিও আছে— তার মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপির সংখ্যাই সর্বাধিক।[১৬]

'স্বরলিপি-গীতিমালা'র অন্তর্ভুক্ত যে-সকল জ্যোতিরিন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি এখন পর্যন্ত আর-কোনো পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হয় নি, পরবর্তী আলোচনার সুবিধার্থে সেই গানগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল—

১৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি

১৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতগুলির অধিকাংশের স্বরলিপি কাঙ্গালীচরণ সেন -কৃত 'ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি' (১-৬ ভাগ) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এই দুখানি গ্রন্থই বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এই দুই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রসংগীতগুলির স্বরলিপি বিশ্বভারতী স্বরলিপি-গ্রন্থমালার বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি'র অন্তর্ভুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতগুলির স্বরলিপি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নূতন 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি' গ্রন্থমালার বিভিন্ন খণ্ডে ক্রমশ প্রকাশ করছেন।

স্ব র লি পি - গী তি মা লা :

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত গান

তালিকা ১

চরণে বাজে আহা কি মধুর। ভূপালী। কাওয়ালি
প্রেমের কথা আর বোলো না। ঝিঁঝিট। কাওয়ালি
কৈ এলো কৈ এলো সে আর। ভৈরব। কাওয়ালি
কি সুধা ওই মদির নয়নে। কেদারা। মধ্যমান
আহা কি রূপ হেরিনু। কেদারা। মধ্যমান
কোয়েলিয়া মাতোয়ারা আনন্দে। গান্ধারী-তোড়ী। মধ্যমান
ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখী। সিন্ধুকাফি। মধ্যমান
বল্ আমায় কি হয়েছে। দেশ। কাওয়ালি
সব সখি মিলে গাও। বাহার। ঢিমা তেতালা
কেন প্রিয়ে অকারণে দাও। ইমন্। কাওয়ালি
পায়ে পায়ে বাজে রে। ইমন্। কাওয়ালি
শ্যাম আমার নিশিদিন রয়েছে। ছায়ানট্। তেওট্
মরি হায় কি শোভা, আঁখি জুড়ায়। বেহাগড়া। একতালা
কি সুন্দর প্রভাত রে। জোয়ানপুরী-টোড়ী। একতালা
মধ্যাহ্ন বেলা ঝাঁ ঝাঁ করে। মধুমাধবী সারঙ্গ। ঢিমা তেতালা
আহা কিঁ চাঁদিনী রাত হের লো। ভূপালী। কাওয়ালি
কেমনে যাবো বলো গৃহমাঝে। কামোদ। ধামার
ও সখি, আমার কথা তায় বোলো না। কামোদ। তেওট্
প্রাণ বড় ব্যাকুল হল। ছায়ানট্। ঢিমা তেতালা
মঙ্গলধ্বনি কর লো, আইল গৃহে। ইমন্-পুরিয়া। কাওয়ালি
আর কেন সে কথা তোলো। বেহাগ। ঢিমা তেতালা
মন চুরি করিল মধুর কটাক্ষে। বারোয়াঁ পিলু। ঝাঁপতাল
আর কি তারে পাব। খাম্বাজ। মধ্যমান
কি হবে এ জীবনে। ইমন্। আড়াঠেকা
ম্লান মুখ কেন বল প্রিয়ে। সুরট। তেওট্
সে যে এসেছে লো সে যে এসেছে। শ্যাম। একতালা
কি করি স্বজনি সে বিনে কি হবে। লুম্ ঝিঁঝিট্। ঠুংরি
মুরলী কি গুণ জানে ভাবি তাই। যোগিয়া। কাওয়ালি
সে প্রেম কোথা রে এখন। ঝিঁঝিট্-খাম্বাজ। খেমটা

প্রসঙ্গতঃ আর-একটি তালিকা সংকলন করতে হয় যে তালিকার গানগুলির কথা-রচনা রবীন্দ্রনাথের ও সুর-যোজনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বলে স্বরলিপি-গীতিমালায় উল্লেখ আছে—

তালিকা ২

সখা হে কি দিয়ে আমি তুষিব। মিশ্র বেলাওল। তাল ফেরতা
সমুখেতে বহিছে তটিনী। মিশ্র সিন্ধু। কাওয়ালি
খুলে দে তরণী খুলে দে তোরা। বাহার। একতাল।
ভাসিয়ে দে তরী তবে[১৭]। জয়জয়ন্তী। কাওয়ালি
হা সখি ও আদরে। মিশ্র সিন্ধু। কাওয়ালি
সেই তো বসন্ত ফিরে এল। বাহার। কাওয়ালি
গেল গো ফিরিল না। গৌড়মল্লার। কাওয়ালি
না সজনি না। আসোয়ারী। কাওয়ালি
সহে না যাতনা দিবস গণিয়া। বেহাগ। কাওয়ালি
হল না লো হল না সই। হাম্বীর। কাওয়ালি
হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর। খাম্বাজ। একতাল।
বল দেখি সখি লো। বেহাগ। কাওয়ালি
দাঁড়াও মাথা খাও যেয়ো না। দেশ। কাওয়ালি
ও কি সখা মুছ আঁখি। বেলাওল। কাওয়ালি
প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন। বেহাগ। কাওয়ালি
দে লো সখি দে পরাইয়ে গলে। দেশ। কাওয়ালি
কে যেতেছিস আয় রে হেথা। মিশ্র বাগেশ্রী। খেমটা
সকলি ফুরাইল যামিনী পোহাইল। টোড়ী। কাওয়ালি
নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়। মিশ্র। মধ্যমান
নিমেষের তবে সরমে বাধিল। সিন্ধু। কাওয়ালি

এই দুই তালিকার গানের সুর ছন্দ তাল নিবিষ্ট মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় এইসব গানে সুরপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সুরকারের মেজাজটি একরূপ। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই সুরযোজনার ধারায় বিশেষ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। বিশেষ করে উভয় তালিকায় একই রাগের গান-গুলির সুর-গঠনের ধারা লক্ষ্য করলে বিষয়টি অধিকতর পরিস্ফুট হবে। যেমন প্রথম তালিকার অন্তর্ভুক্ত 'সব সখি মিলে গাও' এবং দ্বিতীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত 'সেই তো বসন্ত ফিরে এল' গান। দুটি গানই বাহার রাগের। সূচনার সুর এইরূপ—

---

১৭ কথা : শ্রী জ্যো। সুরকারের নামোল্লেখহীন।
শ্রী র

জ্যোতিরিন্দ্রসংগীত ॥

II ধণা পা মা মা । পধা -পমপা মজ্ঞা -মা I
সং ব স খি মিং ০০০ লেং ০

I ণধা -ণধা -ণা -া । র্সা -া -া -া । র্সা -া -া -া । ণধা -ণধা ণা র্সা I
গাং ০০ ০ ও রে ০ ০ ০ গা ০ ০ ও রেং ০০ স বে

ণা -ধা ধা ণধা । -ণা পপা মা পা । মা মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞমা । রা -া সা -া I
এ ই বি লাং ০ সঅ ল স স র স বং স ন্ তে ০

I সমা -া মা -া । পা পা পা পা । পা -র্সা -া র্সা । ণর্সা -া ণা -ধা I
অদ্ ০ রে ০ বাঁ শ রী ম ধু ০ ০ র বাং ০ জে ০

I ণা -া ণা -া । ণা -া -র্সা -া । র্সা ণর্রা -া র্সা । র্সা র্সা ণধা ণা I
ধ ০ রে ০ তা ০ ০ ন্ বি হ ঙ্ গ স বে কং ত

I র্সা র্সা র্মর্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্মর্জ্ঞর্মা র্রা র্সা র্সা ।···
ল লি ত বি চিং০ ত্র স্ব রে

তুলনীয় রবীন্দ্রসংগীত ॥

II { ধা -ণধা পা -া । ধা ধণা পা -া । মা গমা রা সা । সা সমা মা মা I
সে ০ই তো ০ ব সন্ ত ০ ফি রেং এ ল হৃ দ য়ে র

I মা পা মগা মা । মগা -া -া -া । -ধা -া -া -ধণধা । পা -র্সণা র্সা -ণধা } I
ব সন্ তং কু রাং ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০য়্ হা ০য়্ রে ০০

I { ধা ণা ণা ণর্সা । র্সা -া -া -া । -া -া -া -া } । র্সণা র্সা র্রা র্রা । র্সা র্রা র্সা র্সা I
স ব ম রুং ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০য়্ ম ল য় অ নি ল এ সে

I পা পণা পা পা । মা পা মা রগরা । সা -া -া -া । সা -র্সণা র্সা -ণধা II···
কেঁ দে শে ষে ফি রে চ লেং০ যা ০ ০ য়্ হা ০য়্ রে ০০

এই ছুটি গানের সুর পর্যবেক্ষণ করলে সুরযোজনার ধারার একটি সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। স্বরলিপি-গীতিমালার উল্লেখ অনুযায়ী যেহেতু এই গানগুলিতে সুর-যোজনা একই ব্যক্তির অর্থাৎ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সেজন্য এরূপ সামঞ্জস্য থাকা স্বাভাবিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বরলিপি-গীতিমালায় উল্লিখিত যে-সব গানের কথা ও সুর উভয়ই রবীন্দ্রনাথের, সে-সব গানের সুর-গঠনের শৈলী ও ধারা কিরূপ সে-সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে। তদুদ্দেশ্যে ওই গানগুলির একটি বিস্তারিত তালিকা[১৮] সংকলন করে আলোচনার কয়েকটি মাত্র সূত্র উপস্থাপিত করব :

তালিকা ৩

* ১. হা কে বলে দেবে সে ভালোবাসে। পিলু। কাওয়ালি
* ২. পুরানো সেই দিনের কথা। স্কচ্-ভূপালী। একতালা
* ৩. ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে। স্কচ্-কেদারা। কাওয়ালি।
৪. বলি গো সজনি যেয়ো না। খট। একতালা
৫. আয় তবে সহচরি হাতে হাতে। ছায়ানট। কাওয়ালি
৬. দেখে যা দেখে যা দেখে যা লো। কালাংড়া-সোহিনী। একতাল
* ৭. আয় লো সজনি সবে। মল্লার। কাওয়ালি
৮. বলি ও আমার গোলাপবালা। বেহাগ। খেমটা
* ৯. ও কি কথা বল সখি। দেশ-খাম্বাজ। কাওয়ালি
১০. ওগো শোনো কে বাজায়। বেহাগ। আড়খেমটা
১১. আমি নিশি নিশি কত রচিব। ভৈরবী। একতালা
১২. মা আমার কেন তোরে। ভূপালী। কাওয়ালি
১৩. কথা কোস্ নে লো রাই। ভৈরবী। আড়খেমটা
১৪. আজ তোমারে দেখতে এলেম। মিশ্র-সিন্ধু। আড়খেমটা
১৫. মা একবার দাঁড়া গো হেরি। ভৈরবী। মধ্যমান
১৬. দুজনে দেখা হল মধু যামিনী রে। বেহাগ। আড়খেমটা
১৭. ওগো এত প্রেম আশা। ঝিঁঝিট। একতালা
১৮. হেলাফেলা সারাবেলা। মিশ্র বাহার-বারোঁয়া। আড়খেমটা
১৯. তুমি কোন্ কাননের ফুল। মিশ্র বারোঁয়া-পিলু। আড়খেমটা
২০. ওই জানালার কাছে বসে আছে। মিশ্র খাম্বাজ। একতালা
২১. ধীরি ধীরি প্রাণে আমার। বেহাগ্ড়া। ঝাঁপতাল
২২. ঝিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে। মল্লার। কাওয়ালি
২৩. দেখ ঐ কে এসেছে। সিন্ধু-খাম্বাজ। খেমটা
২৪. ও কেন ভালোবাসা জানাতে আসে। পিলু। খেমটা
২৫. ভালোবাসিলে যদি সে। কালাংড়া। একতালা

১৮ এই তালিকাটি দীর্ঘ হলেও আলোচ্য বিষয়ে ভবিষ্যতের বিশদ গবেষণার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে পরিগণিত হবে আশা করি।

২৬. বনে এমন ফুল ফুটেছে। খাম্বাজ। আড়খেমটা
২৭. কেন রে চাস ফিরে ফিরে। ভৈরবী। আড়খেমটা
২৮. মনে রয়ে গেল মনের কথা। বেহাগ্ড়া। ঝাঁপতাল
২৯. বুঝি বেলা বহে যায়। মূলতান। আড়খেমটা
৩০. ও কেন চুরি করে চায়। বেহাগ। আড়খেমটা
৩১. আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে। বেহাগ। আড়খেমটা
৩২. যোগী হে কে তুমি। কেদারা। একতালা
৩৩. আঁধার শাখা উজল করি। গৌড়-সারং। ঝাঁপতাল
৩৪. কেহ কারে মন বোঝে না। সিন্ধু-কাফি। একতালা
৩৫. বাঁশরি বাজাতে চাহি। সিন্ধু-কাফি। কাওয়ালি
৩৬. মরি লো মরি আমায়। মিশ্র-পূরবী। একতালা
৩৭. অলি বার বার ফিরে যায়। মিশ্র সিন্ধু। একতালা
*৩৮. গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে। ঝিঁঝিট। একতালা
৩৯. সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি। ইমন কল্যাণ। একতালা
৪০. আমারে কর তোমার বীণা। খাম্বাজ। একতালা
৪১. সখী আমারি দুয়ারে কেন আসিল। হাম্বীর-কেদারা। কাওয়ালি
৪২. এখনো তারে চোখে দেখি নি। ইমন্। কাওয়ালি
৪৩. আজ আসবে শ্যাম গোকুলে। সিন্ধু-খাম্বাজ। খেমটা
৪৪. আজ সখি মুহু মুহু। বেহাগ। ঝাঁপতাল
৪৫. আমার পরান যাহা চায়। মিশ্র কানাড়া। ঢিমাতেতালা
৪৬. আজি শরত-তপনে প্রভাত স্বপনে। যোগিয়া-বিভাস। একতালা
৪৭. আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি। গৌরী। তাল ফেরতা
৪৮. সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে। মিশ্র। কাওয়ালি
৪৯. আমি জেনে শুনে বিষ করেছি। মল্লার। তেওরা
৫০. আজি আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে। মূলতান। ঢিমাতেতালা
৫১. এস' এস' বসন্ত ধরাতলে। মিশ্র বসন্ত। ঢিমেতেতালা
৫২. ঐ কে গো হেসে চায়। মিশ্র হাম্বীর। ঢিমেতেতালা
৫৩. প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। জিলফ। তেওরা
৫৪. ওলো রেখে দে সখী রেখে দে। খাম্বাজ। একতালা
৫৫. ওকে বলো সখী বলো। বেহাগ। আড়খেমটা
*৫৬. আহা আজি এ বসন্তে। আইরিশ-বেলাওল। ঢিমাতেতালা
৫৭. প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে। মিশ্র বিভাস। ঢিমাতেতালা ও ঝাঁপতাল
৫৮. ভালোবেসে দুখ সেও সুখ। মূলতান। একতালা
৫৯. এ তো খেলা নয়, খেলা নয়। সফর্দা। ঢিমাতেতালা

৬০. সুখে আছি সুখে আছি। মিশ্র ঝিঁঝিট। একতালা
৬১. ভালোবেসে যদি সুখ নাহি। কাফি। কাওয়ালি
৬২. এসেছি গো এসেছি। পিলু। খেমটা
৬৩. তবু মনে রেখো। কীর্তনের সুর। একতালা
৬৪. কে যাবি পারে, ওগো তোরা। মিশ্র। কাওয়ালি
*৬৫. গহন ঘন ছাইল। মিশ্র মল্লার। কাওয়ালি
৬৬. ওই মধুর মুখ জাগে মনে। মিশ্র ভৈরবী। একতালা
৬৭. সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি। মিশ্র কানাড়া। ঢিমাতেতালা
৬৮. সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল। সিন্ধু-কাফি। ঢিমাতেতালা
*৭৯. ফিরায়ো না মুখখানি। হাম্বীর। কাওয়ালি
*৮০. গহন ঘন বনে পিয়াল। হাম্বীর। চৌতাল
৮১. আমার পরান লয়ে। কানাড়া। মধ্যমান
৮২. দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ। জয়জয়ন্তী। ঝাঁপতাল
৮৩ দিবস রজনী আমি যেন কার। মিশ্র সিন্ধু। একতালা
৮৪. আর কেন আর কেন। ভৈরবী। ঢিমাতেতালা
৮৫. আমি চিনি গো চিনি তোমারে। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ। আড়খেমটা
৮৬ ওলো সই, ওলো সই। মিশ্র বিভাস। আড়খেমটা
৮৭. চিত্ত পিপাসিত রে। খাম্বাজ। ঝাঁপতাল
৮৮. আহা জাগি পোহালো বিভাবরী। মিশ্র রামকেলী। কাওয়ালি
৮৯. মধুর মধুর ধ্বনি বাজে। ইমন-ভূপালী। কাওয়ালি
৯০. একি আকুলতা ভুবনে। বাহার। ঠুংরী
৯১. তোমার গোপন কথাটি। মিশ্র। আড়খেমটা
৯২. তবে শেষ করে দাও শেষ গান। মিশ্র সিন্ধু। কাওয়ালি
৯৩. তুমি যেয়ো না এখনি। ভৈরবী। কাওয়ালি
৯৪. সে আসে ধীরে। দেশ। একতালা
৯৫. হৃদয়ের একূল ওকূল। মিশ্র বিভাস। আড়খেমটা
*৯৬. বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে। শঙ্করাভরণ। ঝাঁপতাল ও কাওয়ালি
৯৭. কত কথা তারে ছিল বলিতে। মিশ্র কালাংড়া। কাওয়ালি
৯৮. বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে। পূরবী। একতালা
৯৯. ঝর ঝর বরিষে বারিধারা। মল্লার। ঢিমাতেতালা
১০০. পুষ্পবনে পুষ্প নাহি। ললিত-কালাংড়া। আড়খেমটা
১০১. কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়। ভৈরবী। একতালা
১০২. এমন দিনে তারে বলা যায়। দেশ-মল্লার। রূপক
১০৩. সখী বহে গেল বেলা। বেলাওল-ভূপালী। একতালা

*১০৪. কোথা ছিলি সজনি লো। মিশ্র ভৈরবী। কাওয়ালি
১০৫. যদি আসে তবে কেন যেতে চায়। মিশ্র মল্লার। একতালা
*১০৬. সখা সাধিতে সাধাতে কত সুখ।[১] গৌড়সারং। খেমটা

তা ছাড়া বিদ্যাপতি-রচিত 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' (মল্লার। ঝম্পক) এবং গোবিন্দদাস-রচিত 'সুন্দরি রাধে আওয়ে বনি' (ভৈরবী। কাওয়ালি) গানের রবীন্দ্র-যোজিত সুরের স্বরলিপিও স্বরলিপি-গীতিমালার অন্তর্ভুক্ত ছিল। * চিহ্নিত গানগুলিতে সুরকারের নামের উল্লেখ নেই। তা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে ওই গানগুলির সুর পুরোবর্তী অন্য কোনো গানের সুরের আদর্শে রচিত। পূর্বে বাহার রাগের দুটি গানের আংশিক স্বরলিপি সহ যে আলোচনা করা হয়েছে তার অনুবৃত্তি স্বরূপে এই তালিকার ওই রাগেরই 'এ কি আকুলতা ভুবনে' গানটির উল্লেখ করা যায়। এই গানটির সুর-গঠনের বৈশিষ্ট্যে উল্লিখিত গানগুলির তুলনায় কতক কতক স্বাতন্ত্র্য আছে। এই স্বাতন্ত্র্য রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তামূলক।

তৃতীয় তালিকার গানগুলির সুর বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এই তালিকার অল্পসংখ্যক কিছু গানের সুরে পূর্ব-পূর্ব তালিকায় উল্লিখিত গানের সুরের অল্পবিস্তর প্রভাব থাকলেও অধিকাংশ গানের সুরে রবীন্দ্রনাথের নবনব-উন্মেষশালিনী প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। সে-স্বাক্ষর সুরকারের স্বাধীনতার স্বাক্ষর। এই শেষোক্ত তালিকার অধিকাংশ গানে প্রচলিত সুর তথা রাগের প্রয়োগ হয়েছে, তার মধ্যে ভৈরবী রাগের প্রয়োগ হয়েছে সর্বাপেক্ষা বেশি। ১১, ১৩, ১৫, ২৭, ৬৬ (মিশ্র), ৮৪, ৯৩ ও ১০১ -সংখ্যক গান ভৈরবী রাগের। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী বলতেন, রবীন্দ্রনাথ ভৈরবী রাগ-সিদ্ধ ছিলেন। তার প্রমাণ এ ক্ষেত্রে যেমন আছে, সমগ্র রবীন্দ্রসংগীত-সৃষ্টিতেও তেমনি বিদ্যমান। গানগুলি একই রচয়িতার রচনা হলেও ১১, ১৩, ১৫, ২৭ ও ৬৬ -সংখ্যক গানের সঙ্গে ৮৪, ৯৩ ও ১০১ -সংখ্যক গানের ক্ষেত্রে সুর-প্রয়োগের দিক থেকে, সুর-গঠনের বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতার দিক থেকে সুরকারের মেজাজের পার্থক্য আছে। আবার ৮৪, ৯৩, ও ১০১ -সংখ্যক গানের সুরের সঙ্গে যদি 'সার্থক জনম আমার', 'বন্ধু রহো রহো সাথে', 'পথ চেয়ে যে কেটে গেল' ইত্যাদি ভৈরবী রাগের গানগুলির সুর তুলনা করা যায় তা হলেও সুরকারের মেজাজের পার্থক্য তেমনি অনুভূত হবে। তার কারণ কী? তার কারণ এই যে, স্বরবিন্যাসের গঠনবৈচিত্র্যে ও প্রয়োগবৈচিত্র্যে একই রাগের বিচিত্র ধ্বনি-রূপ বা আবহাওয়া (atmosphere) উৎপন্ন করা যায়। ব্যক্তিভেদে গঠন ও প্রয়োগের ধারায় পার্থক্য তো হয়ই। তা ছাড়া একই সুরকারের ক্ষেত্রেও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয়— আর যদি তার সঙ্গে প্রতিভা-তুলির স্পর্শ লাগে তা হলে তো কথাই নেই। রবীন্দ্রসংগীতে সংখ্যার বিপুলতার জন্য, বিষয়বস্তুর বিচিত্রতার জন্য ও দীর্ঘকালব্যাপী রচনার জন্য, প্রতিভা-তুলির স্পর্শে এই স্বাতন্ত্র্যের

১৯ কথা: শ্রীর ও গ্র[ন্থকার]

সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক বহুব্যবহৃত বেহাগ, খাম্বাজ, ইমন্, ঝিঁঝিট ইত্যাদি রাগ-প্রয়োগের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়। তা ছাড়া মিশ্র রাগ বা রাগ-মিশ্রণের প্রশ্নও আসে। তিনটি তালিকাতেই কতকগুলি মিশ্র রাগের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে তৃতীয় তালিকার ৪৬-সংখ্যক 'আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে' যোগিয়া-বিভাস রাগের গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, যোগিয়া ও শুদ্ধ স্বরযুক্ত বিভাস ভিন্ন প্রকৃতির রাগ। এ দুটি রাগের মিশ্রণ যে খুব কৃতিত্বসূচক এবং এই গানটিতে যে তা কৃতিত্বের সহিত করা হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের গানে এই রাগমিশ্রণের নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্য ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

তাল-ব্যবহারের দিক থেকে প্রথম ও তৃতীয় তালিকার গানে ব্যবহৃত তালের সংখ্যায় ও প্রকারে কিছুটা সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু দ্বিতীয় তালিকার অর্থাৎ স্বরলিপি-গীতিমালা অনুযায়ী যে গানগুলির কথা রবীন্দ্রনাথের ও সুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সেই তালিকার গানগুলিতে অপেক্ষাকৃত সহজ তাল ব্যবহৃত হয়েছে বেশি। এ থেকে কি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না, যেহেতু সেকালটা রবীন্দ্রনাথের সংগীত-রচনার প্রারম্ভকাল সেজন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে এই গীতগুচ্ছে সহজ তাল ও সাবলীল ছন্দ ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করেছিলেন?

অতঃপর গীতিনাট্যের প্রসঙ্গে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথের তিনখানি গীতিনাট্যের মধ্যে কালমৃগয়া ও বাল্মীকিপ্রতিভার সুরে বিশেষ সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু মায়ার খেলা সে তুলনায় স্বতন্ত্র। পূর্বে স্বরলিপি-গীতিমালার যে তিনটি তালিকা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকায় তিনটি গীতিনাট্যেরই অল্পসংখ্যক গান আছে। অর্থাৎ তিনটি গীতিনাট্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অল্পবিস্তর প্রভাব আছে। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন—

বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যে-উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে-উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্বমূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানাপ্রকার কথা কহিতেছে, এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথা যোজনার চেষ্টা করিতাম।[২০]

বাল্মীকিপ্রতিভা বা কালমৃগয়ার সুরগুলি বিশ্লেষণ করলে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও বলেছেন—

---

২০ জীবনস্মৃতি

স্বর্ণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য এবং সঙ্গীতচর্চ্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ থাকিত। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম রচনা "কালমৃগয়া" গীতিনাট্য এবং তাঁহার দ্বিতীয় রচনা "বাল্মীকি-প্রতিভা" গীতিনাট্যেও উক্তরূপে রচিত সুরের, অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল।[২১]

তা ছাড়া, পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধ্বনির (সুরের) পরীক্ষা সম্বন্ধে যা আলোচনা করা হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতেও উক্ত গীতিনাট্যের সুরগুলি বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য। এই বিবেচনায় মায়ার খেলার সুরে অবশ্যই স্বাতন্ত্র্য আছে। তাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কতকটা প্রভাব থাকলেও, বিশেষ করে কোনো কোনো বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত 'মানময়ী' নাটকের সঙ্গে সামান্য মিল থাকলেও মায়ার খেলার ক্ষেত্রে সুরকার রবীন্দ্রনাথের মন ও মেজাজ স্বতন্ত্র। কবিও বলেছেন—

ইহার অনেককাল পরে 'মায়ার খেলা' বলিয়া আর-একটি গীতনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, 'মায়ার খেলা' যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত ছিল।[২২]

রবীন্দ্রনাথের এরূপ 'গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত' হওয়ার বিষয়টি রবীন্দ্রসংগীতের সুর-বিচারের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। 'শিক্ষানবিসি' পর্বেই এই অবস্থার সূচনা হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের সংগীত-রচনার সূচনায় অন্যান্য সংগীত-গুণীদের, বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অল্পবিস্তর প্রভাব থাকলেও, সেই পর্বেই তাঁর সুর-রচনা ও সুর-যোজনায় স্বকীয় প্রতিভা বিকশিত হতে আরম্ভ করেছিল। তার প্রমাণস্বরূপে পূর্বোল্লিখিত তৃতীয় তালিকার অনেক গান ও তৎসমসাময়িক কালে রচিত অন্যান্য বহু গানের উল্লেখ করা যায়। তৎপরবর্তীকালে বিশেষতঃ গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি -পর্বে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন সুরকাররূপে অধিকতর প্রতিভাত এবং তারও পরে ক্রমশঃ কাব্য ও সুরের ধ্বনির এক অতি উচ্চ ও দুরধিগম্য মিলনলোকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

২১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি

২২ জীবনস্মৃতি

রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

চিন্তার স্বরূপ

বিবিধ কলার সংগঠন এবং শ্রীবৃদ্ধি চিন্তার ফল। এর মূলে রয়েছে প্রতিভাসম্পন্ন স্রষ্টার পরিকল্পনা। এই যে পরিকল্পনা, এই যে বিন্যাস, একেই বলে চিন্তা। সেই বিষয়কেই আমরা মামুলি বলি যার মধ্যে চিন্তার কোনো প্রস্ফুরণ নেই। চিন্তা আছে বলেই মানুষের সৃষ্টিতে এত বৈচিত্র্য।

আমাদের সংগীতে একদা বহু বৈচিত্র্য ছিল, কিন্তু ক্রমে চিন্তার অভাবে সেই সব বৈচিত্র্য গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হল। এই গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে যাঁরা নূতন পথে অভিযান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেই অগ্রণীদের অগ্রবর্তী। সংগীত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এবং চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বহু রচনায় কথাবার্তায় বক্তৃতায় এবং চিঠিপত্রে। তারই একটি উদ্‌ধৃত করি যেখানে তাঁর আদর্শগুলি স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে—

আজ সন্ধ্যার সময় একজন ভদ্রলোক এলেন, তাঁর কাছ থেকে বেহালায় পারসিক সংগীত শুনলুম। একটি স্বর বাজালেন আমাদের ভৈরোঁ রামকেলির সঙ্গে প্রায় তার কোনো তফাত নেই। এমন দরদ দিয়ে বাজালেন, তানগুলি পদে পদে এমন বিচিত্র অথচ সংযত ও সুমিত যে আমার মনের মধ্যে মাধুর্য নিবিড় হয়ে উঠল। বোঝা গেল ইনি ওস্তাদ কিন্তু ব্যবসাদার নন। ব্যবসাদারিতে নৈপুণ্য বাড়ে কিন্তু বেদনাবোধ কমে যায়, ময়রা যে কারণে সন্দেশের রুচি হারায়। আমাদের দেশের গাইয়ে-বাজিয়েরা কিছুতেই মনে রাখে না যে আর্টের প্রধান তত্ত্ব তার পরিমিতি। কেননা রূপকে সুব্যক্ত করাই তার কাজ। বিহিত সীমার দ্বারা রূপ সত্য হয়, সেই সীমা ছাড়িয়ে অতিকৃতিই বিকৃতি। মানুষের নাক যদি আপন মর্যাদা পেরিয়ে হাতির শুঁড় হওয়ার দিকে এগোতে থাকে, তার ঘাড়টা যদি জিরাফের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য মরীয়া হয়ে মেতে ওঠে, তা হলে সেই আতিশয্যে বস্তুগৌরব, রূপগৌরব বাড়ে না। সাধারণত আমাদের সংগীতের আসরে এই অতিকায় আতিশয্য মত্ত করীর মতো নামে পদ্মবনে। তার তানগুলো অনেক স্থলে সামান্য একটু আধটু হেরফের করা পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাতে স্তূপ বাড়ে রূপ নষ্ট হয়। তন্বী রূপসীকে হাজার পাকে জড়িয়ে ঘাগরা এবং ওড়না পরাবার মতো। সেই ওড়না বহুমূল্য হতে পারে তবু রূপকে অতিক্রম করার স্পর্ধা তাকে মানায় না। এরকম অদ্ভুত রুচিবিকারের কারণ এই যে, ওস্তাদেরা স্থির করে রেখেছেন সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য সমগ্র গানটিকে তার আপন সুষমায় প্রকাশ করা নয়, রাগরাগিণীকেই বীরবিক্রমে আলোড়িত ফেনিল করে তোলা— সংগীতের ইমারতটিকে আপন ভিত্তিতে সুসংযমে দাঁড় করানো নয়, ইটকাঠ-চুনসুরকিকে কণ্ঠকামানের মুখে সগর্জনে বর্ষণ করা। ভুলে যায় সুবিহিত সমাপ্তির মধ্যেই আর্টের পর্যাপ্তি। গান যে বানায় আর গান যে করে, উভয়ের মধ্যে যদি-বা

দরদের যোগ থাকে তবু সৃষ্টিশক্তির সাম্য থাকা সচরাচর সম্ভবপর নয়। বিধাতা তাঁর জীবসৃষ্টিতে নিজে কেবল যদি কঙ্কালের কাঠামোটুকু খাড়া করেই ছুটি নিতেন, যার তার উপর ভার থাকত সেই কঙ্কালে যত খুশি মেদমাংস চড়াবার, নিশ্চয়ই তাতে অনাসৃষ্টি ঘটত। অথচ, আমাদের দেশে গায়ক কথায় কথায় রচয়িতার অধিকার নিয়ে থাকে, তখন সে সৃষ্টিকর্তার কাঁধের উপর চড়ে ব্যায়ামকর্তার বাহাদুরি প্রচার করে। উত্তরে কেউ বলতে পারেন ভালো তা লাগে। কিন্তু পেটুকের ভালো লাগা আর রসিকের ভালো লাগা এক নয়। কী ভালো লাগে তাই নিয়ে তর্ক। যে ময়রা রসগোল্লা তৈরি করে মিষ্টান্নের সঙ্গে যথাপরিমিত রস সে নিজেই জুগিয়ে দেয়। পরিবেষণকর্তা মিষ্টান্ন গড়তে পারে না কিন্তু দেদার চিনির রস ঢেলে দেওয়া তার পক্ষে সহজ। সেই চিনির রস ভালো লাগে অনেকের, তা হোক গে, তবু সেই ভালো লাগাতেই আর্টের যথার্থ যাচাই নয়।

—পারস্যে

এর মধ্যেই সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আদর্শগুলি পাওয়া যায়। সেগুলি হচ্ছে এই—

১. সংগীতের তানবিস্তার হবে বিচিত্র যথা সংযত ও সুমিত।

২. আর্টের অন্যতম তত্ত্ব তার পরিমিতি।

৩. সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য সমগ্র গানটিকে তার আপন সুষমায় প্রকাশ করা।

৪. সুবিহিত সমাপ্তির মধ্যেই আর্টের পরিসমাপ্তি।

এই বিষয়গুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বহু পত্রেও আলোচনা করেছেন। সুর ও সঙ্গতি গ্রন্থে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্রাবলীতে তার পরিচয় মিলবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করে বলেছেন—

আয়তন যতই আয়ত হোক্ তবু আর্টের অন্তর্নিহিত মাত্রার শাসনে তাকে সংযত হতে হবে তবেই সে সৃষ্টির কোঠায় উঠবে।

শতদলের উপর আর একটা পাপড়ি চাপানো চলবে না। সে আপন সম্পূর্ণতার মধ্যে থেমেচে বলেই সে অপরিসীম।

আর বেশি কাজ নেই— কথাটাই আর্টের অন্তরের কথা ইত্যাদি।

রাগসংগীত

তানবিস্তারের প্রয়োগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই সংযমরক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু তানবিস্তারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এরকম অনুমান করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। আমাদের সংগীতে তান এবং বিস্তার— এ দুটি দুর্লভ সুযোগ এবং এ দুটিকে যাতে সুলভ করে না তোলা হয় রবীন্দ্রনাথ সেই সাবধানবাণীই বারবার উচ্চারণ করেছেন।

রাগসংগীতে রবীন্দ্রনাথের যা অভিপ্রেত ছিল তা হচ্ছে পুনরুক্তি-বর্জন। যেহেতু তান এবং বিস্তারের সুযোগ আছে সেহেতু সংগীতকে অনাবশ্যক স্ফীত করে তোলাকে তিনি শিল্পজ্ঞানের অভাব বলে মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত যে কত যুক্তিযুক্ত তা আজকাল যাঁরা আসরে তবলার সঙ্গে সেতার-সরোদের লড়াই শোনেন তাঁরাই বুঝতে পারেন। যেটুকু ভালো লাগে
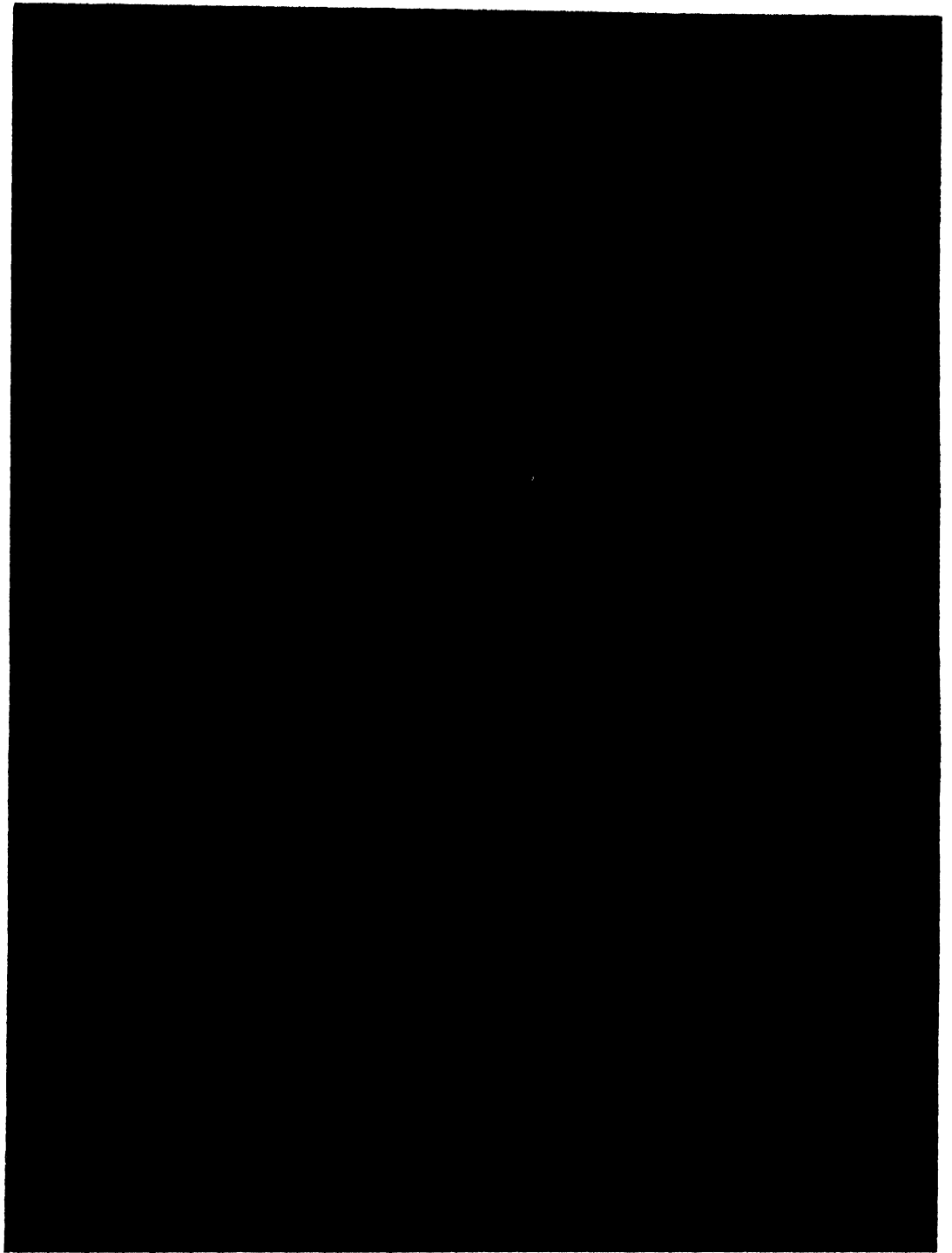
'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি' শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তার সময় বেশি নয়— তার মধ্যেই শিল্পীরা তাঁদের স্বকীয়তাকে নানা বৈচিত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তার পরেই যা আসে তা ওই তিন তাল এক ফাঁকের পুনরাবৃত্তি। ওস্তাদমহলে এইরকম ঘটে বলেই রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখেছিলেন—

এস্থলে অত্যন্ত সহজ কথাটা এই, যিনি পারলেন রূপ দিতে তাঁকে আর্টিস্ট হিসাবে বলব ধন্য, যিনি পারলেন না, কেবল উপাদানটাকে নিয়ে তুলো ধুনতে লাগলেন তাঁকে গীতবিদ্যাবিশারদ বলতে পারি কিন্তু আর্টিস্ট বলতে পারি নে— অর্থাৎ তাঁকে ওস্তাদ বলতে পারি কিন্তু কালোয়াৎ বলতে পারব না। কালোয়াৎ অর্থাৎ কলাবৎ। কলা শব্দের মধ্যেই আছে সীমাবদ্ধতার তত্ত্ব, সেই সীমা যেটা রূপেরই সীমা।

এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 'কলা শব্দের মধ্যেই আছে সীমাবদ্ধতার তত্ত্ব।' এই সীমাকে অবহেলার সঙ্গে অতিক্রম করতে কৃতিত্ব নেই। যতটুকু সময়ে রূপটি ফুটে ওঠে সেইটুকুতেই রূপকার সার্থক হয়ে ওঠেন। একজন শিল্পী যদি আধঘণ্টা ধরে সংগীতের সার্থক রূপ প্রদান করেন তবে সেই আধঘণ্টার মূল্য কি কম? তার বেশি আর তাঁর পক্ষে দরকার নেই, শ্রোতাদের পক্ষেও নয়।

বস্তুতঃ সংগীত সম্বন্ধে এই চিন্তাই আমাদের ভারতীয় সংগীতের চিন্তা। বড় বড় শাস্ত্র রচিত হয়েছে এই সীমা যাতে লজ্বিত না হয় সেই কারণে। আলাপের কথাই ধরা যাক। আলাপ, যাতে শিল্পীর অনেক স্বাধীনতা আছে, আচার্যেরা তাকেও সীমায়িত করবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। ধ্রুপদীদের মধ্যে এই ধরণের সংযত আলাপের রীতি ছিল যা আজও শিল্পীসম্প্রদায়ের কোনো কোনো বংশে প্রচলিত আছে। আলাপের বিধিও শাস্ত্রে এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যাতে রাগের রূপটি যথাযথভাবে ফুটে ওঠে। যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি আলাপের জের টানাও প্রাচীন আচার্যদের অনুমোদিত ছিল না। সংগীতের অনাবশ্যক বিস্তৃতি প্রধানতঃ ওস্তাদি সম্পর্কে ভুল ধারণার ফল। শিল্পীর রুচি প্রকৃত শিক্ষায় পরিমার্জিত হলে আপনা থেকেই প্রকাশভঙ্গী সংযত হয়ে থাকে, আর তা না হলে যা হয় তা অশিক্ষিতপটুত্ব। কতকগুলো কৌশল আয়ত্ত হলে এই জাতীয় সংগীতপটুরা মনে করেন সংগীতের এইটাই সার বস্তু এবং বারবার একই কৌশলের মার-প্যাঁচ দেখিয়ে তাঁরা কৃতিত্বের দাবি করে থাকেন। আমাদের সংগীত যখন আচার্য পণ্ডিতদের অধিকার থেকে স্খলিত হয়ে পড়ল নানা কারণে তখন যারা কেবলমাত্র কিছু গাইতে জানত তারাই আচার্য হয়ে উঠল। ফলে, তাদের যতটুকু জানা এবং চিন্তা তাই দিয়ে তারা সংগীতকে গড়ে তুলতে চাইল। ওস্তাদির বর্তমান অবস্থা এরই পরিণতি। সংগীত অনেকটা অভ্যাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই পরিস্থিতিতে এক বস্তুর পুনরাবৃত্তি স্বাভাবিক।

অপরপক্ষে যাঁরা প্রকৃত চিন্তাশীল এবং যুক্তিপ্রণোদিত চিন্তায় আস্থাবান তাঁরা আর্ট বলতে এমন এক বস্তু বোঝেন যার নির্দিষ্ট রূপ আছে। এলোমেলো কতকগুলি সাংগীতিক প্রক্রিয়াকেই তাঁরা সংগীতের সার্থক শর্ত বলে মানতে রাজি নন। ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ছিল এমনি নিটোল একটি বস্তুর যাতে বৈচিত্র্য থাকবে কিন্তু বাহুল্য থাকবে না, ভাব থাকবে

কিন্তু তা উচ্ছ্বাসে ফেনিল হয়ে উঠবে না, যার একটি সুসংগঠিত নিজস্ব রূপ থাকবে কিন্তু অতিরিক্ত বিন্যাসে জটিল হয়ে পড়বে না। রবীন্দ্রনাথের নিজের সংগীতসৃষ্টিতেও একই লক্ষণ বর্তমান। কিন্তু তাঁর এই উদ্দেশ্য অনেক ওস্তাদপন্থীর বুদ্ধিতে ধরা পড়ে নি যার ফলে রবীন্দ্রনাথের গান বহুলভাবেই বিকৃত হয়েছে। 'যদি বারণ কর তবে গাহিব না' গানটি একদা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের মূল সুরের ছায়ামাত্র নিয়ে অনেক গায়কগায়িকা তান বিস্তার করে এ গানটি গাইতেন। এতে গানের সংযত আবেদনটুকুর কোনো মূল্যই থাকত না এবং গানটি হয়ে উঠত একটি মামুলি খেয়াল। আর-একটি গান ধরা যাক—

ও যে মানে না মানা,
আঁখি ফিরাইলে বলে না না না।

এ গানটি এমনভাবে রচিত যে অতিরিক্ত তানকর্তবের সুযোগই অল্প অথচ এ গানটিতেও তানের ফুলঝুরি ছোটানো হত। ফলে, আড়-খেমটার চালে ছোট ছোট কাজগুলিতে যে আবেদন প্রকাশ পেত তার সৌন্দর্য ঢালা তানের খরস্রোতে একেবারে ভেসে যেত। 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো যত' গানটিরও দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেছি। এমন-কি 'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে ডাক দিয়ে সে যায়' গানটিকে দাদরায় তানবিস্তার যোগ করে গাইতে শোনা গেছে। মাত্র কয়েকটি গানের উল্লেখ করা গেল। রবীন্দ্রনাথের আরও বহু গানই এমন তানবিস্তারের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছে।

রূপের যেখানে বিকৃতি সেখানে আর্টের অবমাননা না ঘটে পারে না। যাঁরা বলেন এই তান-কর্তবের বাহুল্যই আমাদের সংগীতের বৈশিষ্ট্য তাঁদের চিন্তায় গোলমাল আছে। তান এবং বিস্তার— বস্তু হিসাবে দুটিই সুন্দর কিন্তু প্রয়োজন যতটুকু তার বেশি এতটুকু হলেই তা সংগীতকে অবিন্যস্ত করতে চায়। ভারতীয় সংগীতের সত্যিকার পরিচয় কোথা থেকে গ্রহণ করব এ প্রশ্ন যদি ওঠে তাহলে এ কথা স্পষ্টই বলব যে তথাকথিত ঘরোয়ানাসম্ভূত ওস্তাদদের কাছ থেকে তা নিতে যাব না। কতকগুলি প্রক্রিয়া বা টেকনিকই যাঁদের সম্বল তাঁদের কাছে সে সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা যেতে পারে কিন্তু তাঁরা আর যাই হোন সংগীতকলার আলংকারিক নন। অতএব চিন্তার ব্যাপারে তাঁদের দ্বারস্থ হবার কোনো আবশ্যকতা দেখি না। চিন্তার অভাবে মোগল আমল থেকেই এই মহাভ্রম করা হয়েছে এবং কেবলমাত্র কৌশলপারংগমকেই চিন্তানায়কের আসনে বসানো হয়েছে। চার শ বছরেরও অধিক হল এঁরা যা বলছেন তাকেই আমরা সংগীতের তত্ত্ব বলে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এ ভ্রম আজ করলে চলবে না। আজ প্রকৃত শাস্ত্র অনেক অংশে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা থেকে আমাদের সংগীতচিন্তা কি ছিল তাও উদ্ঘাটিত হওয়া উচিত।

ওস্তাদমহলের অবজ্ঞার ফলে কিরকম ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে কথাপ্রসঙ্গে তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কিছুকাল পূর্বে যাঁরা ধ্রুপদের চর্চা করতেন তাঁরা ধ্রুপদ সম্বন্ধে এমন আভাস

দিতেন যাতে সকলের ধারণা হত ধ্রুপদ মুনিঋষিদের সৃষ্টি, খাঁটি মার্গসংগীত। অথচ আসলে ধ্রুপদ মার্গসংগীত নয়— প্রাচীন হলেও তা একপ্রকার দেশী সংগীত ছাড়া আর কিছু নয়। এর কৌলীন্য নিশ্চয়ই ছিল এবং ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এর বহুতর বিকাশও ঘটেছিল। তার পরে যখন ধ্রুবসংগীতের বিলীয়মান পদ্ধতিকে নিয়ে রাজা মানের তত্ত্বাবধানে ধ্রুবপদ সংঘটিত হল তখন প্রাক্তন বহুবিধ ধ্রুবসংগীতের পরিচয় আর কাউকে জানতে দেওয়া হল না। এ বিষয়ে নায়ক বখশু, মাছু এবং ভাম্নু ছিলেন রাজা মানের সহায়। এঁদের নাম দেখে মনে হয় নায়ক উপাধি সত্ত্বেও এঁরা উৎকৃষ্ট গায়ক ছাড়া আর কিছু ছিলেন না। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ধ্রুবসংগীতের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এঁদের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না, আর যেটুকু তাঁরা জানতেন সেটুকুও প্রচার করে তাঁদের জ্ঞানটুকু জনসমাজে বিতরণ করবার উদ্দেশ্য তাঁদের আদৌ ছিল না। আসলে রাজা মানের আমলে ধ্রুবপদ্ধতির যাঁরা চিন্তানায়ক তাঁরা বিদগ্ধ ব্যক্তি— কেবলমাত্র ওস্তাদ হিসাবে তাঁরা তাঁদের স্বাক্ষর রেখে যেতে চান নি, ওস্তাদদের তাঁরা চাতুর্যের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছিলেন। এইভাবে ধ্রুবসংগীতের আসল পরিচয় বিলুপ্ত হল এবং নবপ্রচারিত ধ্রুবপদকে আড়ম্বর সহকারে নবপদে অভিষিক্ত করা হল। এমনিভাবে সংগীতের আসল পরিচয়কে নানাভাবেই গোপন করা হয়েছে এবং নতুন পরিচয় স্থাপন করা হয়েছে।

তানকর্তবের কথা বলছিলাম। বর্তমান তানকর্তবের যে রূপ তাকে ভারতীয় সংগীতে খুব অল্প প্রাধান্যই দেওয়া হয়েছে। তার কারণ বিশ্লেষণ করা কর্তব্য। ভারতীয় সংগীতে মূর্ছনার প্রাধান্য রয়েছে, বিস্তারও সমর্থিত হয়েছে, কিন্তু বর্তমান তান অর্থাৎ দ্রুত স্বরসঞ্চালনদ্বারা অনুষ্ঠিত সুর-কর্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় নি। এমন-কি অতীতের তানের সংজ্ঞার সঙ্গে বর্তমান তানের সংজ্ঞার মিল নেই। এই ভুল পরিচয়ও ওস্তাদপরম্পরাই প্রচারিত হয়েছে। বর্তমান তানের রীতিকে প্রশ্রয় না দেবার কারণ এই তানের কোনো স্পষ্ট রূপ নেই যা মূর্ছনার আছে। শাস্ত্রানুসারে সাতটি স্বরের ক্রমিক আরোহণ এবং অবরোহণ হচ্ছে মূর্ছনা। এর থেকে স্বরাদির বিলোপ ঘটালে সেই মূর্ছনা তানে পরিণত হত। এতে প্রকাশের বৈচিত্র্য ঘটে। প্রাচীন তানও মূর্ছনার প্রকারভেদ মাত্র। এই বিচিত্র মূর্ছনাগুলি এমনভাবে রাগসংগীতে নির্দিষ্ট হত যাতে এদের রূপগুলি স্পষ্ট বোঝা যেত এবং রাগের আবেদন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠত। কালক্রমে মূর্ছনার এই নির্দিষ্ট রীতির পরিবর্তন হল এবং দ্রুততানের ব্যবহার প্রবর্তিত হল। এর কারণ হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটি স্বরের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে একটি মূর্ছনার প্রকাশ নেহাত সহজ নয়— এর বদলে দ্রুততান অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এতে ভুল ধরা পড়বার সম্ভাবনাও অল্প। এই দ্রুততানে কণ্ঠক্রীড়ার একটা আনন্দও আছে। ওস্তাদরা এই কণ্ঠক্রীড়াকেই অবলম্বন করলেন কিন্তু চিন্তার অভাববশতঃ সংযত মূর্ছনার প্রয়োগে সে সংগঠনক্রিয়াটি সার্থক হয়ে ওঠে সেদিকে তাঁদের লক্ষ্য রইল না। এর ফলে আমাদের সংগীত ক্রমেই সুসংগঠিত রূপ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ধ্রুপদ ব্যতীত অপর রাগসংগীত যেভাবে গাওয়া হয় তাকে সুবিন্যস্ত বলা চলে না। এদের একটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে অথচ

সুপরিকল্পিত রূপ নেই। এই সৌন্দর্য ভালো লাগে কিন্তু সংগঠন-পরিকল্পনার অভাবটা মনকে পীড়িতও করে। এই অসুবিহিত বস্তু যা সংগঠনপারিপাট্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারত তার অভাবকে মোচন করবার জন্য তানের পর তান করে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তান জিনিসটা অত্যন্ত দ্রুতভাবে সম্পাদিত হওয়ায় স্বরগুলি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এবং এইরকম একটা স্তূপীকৃত স্বর-উচ্চারণ বারবার অনুষ্ঠিত হলে তা একঘেয়ে হতে বাধ্য। দ্রুততানের ব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করলেই তা সংযত এবং সুমিত সংগীতকে উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে আকর্ষণ করবে যা আর্টের প্রধান তত্ত্ব পরিমিতির বিরোধী। অতএব শাস্ত্রীয় যুক্তি অনুসারেই যদি চিন্তা করা যায় তাহলেও রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তার সারবত্তা সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। একই কারণে পূর্ববর্তী চিন্তানায়কদের এ যুগের চিন্তানায়কের মতের মিল ছিল।

কাব্যসংগীত

রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য সমগ্র গানটিকে তার আপন সুষমায় প্রকাশ করা। এই আপন সুষমা কি ভাবে প্রস্ফুটিত হবে সেইটি শিল্পীর চিন্তার বিষয়। সেই বিকাশই সর্বোত্তম হয় যা সুনিয়মিত অথচ জ্ঞাপকতায় শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ এই পন্থাই অবলম্বন করেছেন। একদা বাংলার সুরকারগণের মধ্যে একটা চেষ্টা দেখা গিয়েছিল যাতে সুরের স্বল্প অথচ নিপুণ স্পর্শে গানটি প্রকাশের সার্থকতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, কালী মির্জা প্রভৃতি সেকালের সবাইকার গানেই এই চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সুরবোধ এঁদের কারও অল্প ছিল না, নিজেরাও ভালো গাইয়ে ছিলেন কিন্তু গানবাজনার বেলায় সংযম পছন্দ করতেন। এর ফলে বাংলা গানের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্থাপিত হয়েছিল যা লিরিক হিসাবে যেমন সুন্দর গীত হিসাবেও তেমনি উপভোগ্য। চার লাইনের গান যদি অল্পকালের মধ্যে শেষ হয়ে যায় তাতে কারও আপত্তি ছিল না কিন্তু গান যেন গানের অর্থকে জ্ঞাপন করে এই ছিল তাঁদের আদর্শ। পূর্বে যে গানটির উল্লেখ করেছি তার উদাহরণই আর একবার দেওয়া যাক। 'ও যে মানে না মানা, আঁখি ফিরাইলে বলে না না না'— এই শেষের তিনটি 'না' রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সুরের স্পর্শটুকুতে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতেই মন ভরে ওঠে— আর বেশি কিছু কাজ বাহুল্য মাত্র। অতএব ওস্তাদের কণ্ঠে এ গানের 'না' যখন প্রচুর তানে লীলায়িত হতে থাকে তখন কেবলমাত্র ওস্তাদি ছাড়া আর কিছুই ফুটে ওঠে না। 'আজ মধুরে মিশাবি মধু পরানবঁধু'— এই কথাটি সুরে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাই যথেষ্ট। বহু তানবিস্তারেও এর বেশি কিছু ফুটবে না। এ সংযম বাংলার সুরকারদের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া— বহু ওস্তাদি গানে তাঁরা যে সার্থকতা লাভ করেন নি তা লাভ করেছিলেন এই সংযম থেকে। কিন্তু এঁরা ছাড়াও বাংলা দেশে ওস্তাদ ছিলেন এবং এখনো আছেন। তাঁদের কণ্ঠে 'ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসি নে'র মত গান একঘণ্টাব্যাপী গমকতান, সাপটতান ইত্যাদিতে কিভাবে দলিত হত এবং আজও হয় যাঁদের তা

শোনবার দুর্ভাগ্য হয়েছে তাঁরাই জানেন। সুরকার তখনই সার্থক হন যখন তিনি সুরের ভিতর দিয়ে কাব্য এবং ভাবকে সম্পূর্ণ করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন কিন্তু ওস্তাদের অন্য পন্থা। তিনি বাঁধা সুরকে বিপর্যস্ত করে, বাঁধা ছন্দকে এলোমেলো করে, এক সময় মনে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বেন। এই আদর্শ স্থাপনের জন্যই কি এত শাস্ত্র রচনা করা হয়েছে এত চিন্তা হয়েছে শত শত বৎসর ধরে। নিয়ম ভাঙার মধ্যেই যদি বাহাদুরি থাকে তাহলে এত যত্নে নিয়ম বাঁধা হল কেন।

যে-কোনো গীতকে আপন সুষমায় প্রকাশ করতে হলে একটা ভারসাম্য বা ব্যালান্স দরকার। উপযুক্ত তানবিস্তারেও আপত্তি উঠবে না যদি এই সামঞ্জস্য থাকে। এ শুধু কাব্য-সংগীতের বেলাতেই নয় সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, নইলে সংগতি থাকে না। অথচ, গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করা প্রয়োজন। বাঁধা পথ ধরেই যদি চলা যায় তাহলে নতুন সৃষ্টি হয় না। এই বাঁধা পথের যে নিয়ম অবশ্য পালন করতে হবে, তাকে উপেক্ষা না করে উচ্ছৃঙ্খলতাকে পরিহার করে যিনি একটি স্টাইলের অর্থাৎ নব্যরীতির প্রবর্তন করতে পারেন তিনিই চিন্তাশীল শিল্পী।

বাংলার সংগীতে টপ্পা, আড়খেমটা চালের গান এইরকম নতুন সৃষ্টি। হিন্দুস্থানী গানে কথা অল্প, জ্ঞানবিস্তার বেশি। পুরোনো বাংলা গানে কথাও কম তানবিস্তারও বেশি নয় কিন্তু জ্ঞাপকতা অনেক বেশি। হিন্দুস্থানী গানে লিরিকের দিকে তেমন মনোযোগ দেখা যায় না কিন্তু বাংলা গানে লিরিকের বিশেষ তাৎপর্য আছে—

কেন ভুরু ধনু টান হানিবে কি বাণ
কুরঙ্গ বধিতে বুঝি করিছ সন্ধান।
শুন গো তোমারে কহি
আমি তো কুরঙ্গ নহি
কেবল আমার বদনে কুরঙ্গ নয়ান।

এ গান বহুকাল পূর্বে রাধামোহন সেনের লেখা। এর সুর মূলতান অর্থাৎ আজকালকার ভীমপলশ্রী। এ গানের ভাষা থেকে বোঝা যায় কাব্যের স্থান এখানে কত বড়। আমাদের সংগীতে এই যে কাব্যসংগীতের আন্দোলন— এইখানেই চিন্তাশীলতার প্রকাশ। সেই চিরাচরিত রীতিতে কেবলমাত্র বাঁধাধরা সুরতালের ছককে অতিক্রম করে আরও বড় আর্টের চিন্তা দেখা দিয়েছে এই সব রচনায়।

আশ্চর্যের বিষয়, এই চিন্তা গায়কসমাজকে সাধারণভাবে প্রভাবিত করে নি। তাঁদের আকর্ষণ করেছিল বোলতান, সাপটতান, জমজমা ইত্যাদি; আর এইসব প্রক্রিয়া মধ্যমান, আড়াঠেকা, যৎ প্রভৃতি তালে বেশ একটা কসরতের ব্যাপার হয়ে উঠল। অথচ বোলতান, সাপটতান এবং জমজমা— এই কর্তব্যগুলিতে আকুতির বিশেষ প্রকাশ ঘটে থাকে যদি সাবধানে সম্পাদন করা যায়। পরিমিতির সাবধানতা ওস্তাদদের আদর্শের বাইরে— তাই যাঁরা গলাবাজি

আর অঙ্ককষার ব্যাপারে পাকা তাঁরাই হলেন ওস্তাদ গাইয়ে। এ অঙ্কও সামান্য অঙ্ক। তালের মারপ্যাঁচ দেখানো খুব কঠিন নয় কিছু অভ্যাসের ব্যাপার মাত্র। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বাংলা গানও গতানুগতিক এক ধরণের ওস্তাদি গান হয়ে পড়ল। ওস্তাদমহলের বাইরে যাঁরা রইলেন তাঁরা এই সব গানের প্রকৃত মূল্যায়নে সমর্থ হয়েছিলেন এবং নূতন রচনায় উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছিলেন। এই নূতন ধারার প্রবর্তকদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং তার পরেই এলেন রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ রচয়িতাগণ। অক্ষয় চৌধুরীর গানগুলিতে যাঁরা সুর দিয়েছিলেন তাঁদেরও নূতনত্বের অগ্রদূত বলে স্বীকার করতে হয়।

পুরোনো বাংলা গানের আর্টকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উপভোগ করেছিলেন এবং তাঁর নিজের রচনাতেও এই আর্টের প্রয়োগ বিচিত্রভাবে করেছেন। 'হেলাফেলা সারা বেলা এ কি খেলা আপন মনে'— এটি আড়খেমটা চালের গান। এই ধরণের গানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছোট ছোট সুরের টুকরোয় মনের অনেকখানি উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করা। এর একটি বিশেষ ছন্দ আছে যাতে মনের আবেগও অনেকখানি ফুটে ওঠে। এই জাতীয় গান প্রায়ই ছোট হত এবং এতে সঞ্চারী যোজিত হত না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক আড়খেমটা চালের গানে মনোহর সঞ্চারী রচনা করেছেন। 'ও কেন চুরি করে চায়' বা 'দুজনে দেখা হল মধুযামিনী রে'— এই ধরণের গানের সঞ্চারীগুলি অতুলনীয়। বস্তুতঃ বাংলা গানে রবীন্দ্রসংগীতের মত উত্তম সঞ্চারী আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমাদের সংগীতের সঞ্চারী মহামূল্যবান অংশ কেননা সঞ্চারীযুক্ত গানে প্রকাশের বৈচিত্র্য যেমন পরিলক্ষিত হয় তেমনি চারটি কলির যোজনায় গানের আকৃতিও সম্পূর্ণতায় সার্থক হয়ে থাকে।

বাংলার পুরোনো গানগুলি যেমন রবীন্দ্রনাথকে তাদের জ্ঞাপকতা, মাধুর্য, সংযত উচ্ছ্বাস এবং আবেগ দিয়ে আকর্ষণ করেছিল তেমনি সংগঠন এবং 'ডিগ্‌নিটি'র দিক থেকে তাঁকে আকর্ষণ করেছিল ধ্রুপদ। প্রচুর হিন্দী ধ্রুপদ ভেঙে তিনি গান রচনা করেছেন। এই হিন্দীভাঙা গানগুলির মধ্যে তাঁর নির্মাণের পদ্ধতি সম্পর্কীয় গভীর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এমন একটিও হিন্দীভাঙা গান তাঁর রচনায় পাওয়া যাবে না যার রূপ, সংগঠন অথবা তানের দিক থেকে কোন বিশেষত্ব নেই এবং যার মধ্যে কোথাও অসংগতি বা অসম্পূর্ণতা আছে। এমন-কি যেখানে দুটি কলিতে গানটি সমাপ্ত হয়েছে সেখানেও গানটি সঞ্চারী ব্যতিরেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। হিন্দী গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতের সেই উদ্দেশ্যের পরিচয় পেয়েছিলেন যা গীতকে আপন সুষমায় প্রকাশের জন্য নিয়োজিত। দুন চৌদুন বাঁট প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট তাল অনুসরণ করে এই গানগুলি গাইলে সংগীতের এমন একটি মহিমা প্রকাশ পায় যা সরল, স্নিগ্ধ এবং মনোরম। রবীন্দ্রনাথ তালের বৈচিত্র্য বিশেষ পছন্দ করতেন। বিভিন্ন তালের বৈশিষ্ট্য তাঁকে বিচিত্র সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর মত এত তালফেরতাও আর কারও রচনায় পাওয়া যায় না। তাঁর নৃত্যনাট্যগুলিও তালবৈচিত্র্যে অনেকাংশে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

তাল ও ছন্দ

তাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট চিন্তাও ছিল। সংগীতে কবিতার ছন্দ অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। আমাদের গানে তালের গতিপ্রকৃতি এমনভাবে নির্দিষ্ট যে তার থেকে এতটুকু বিচ্যুতি গায়নসমাজে স্বীকৃত হয় না। এই ব্যবস্থার যে পরিবর্তন হতে পারে না রবীন্দ্রনাথ এটা বিশ্বাস করতেন না। তিনি কবিতার বিভিন্ন ছন্দ গানে আরোপ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে গানেও নানাভাবে ছন্দ নির্দিষ্ট করা সম্ভব। তাঁর 'সংগীতের মুক্তি' নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত হয়েছে। সংগীতের ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তার সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের চিন্তাধারার যথেষ্ট মিল আছে। একদা বহু সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ছন্দকে গানে রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছিল। সেকালকার কাব্যসংগীত প্রবন্ধগীতি নামে পরিচিত। বহু 'প্রবন্ধ' আছে যা ছন্দের বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। তোটক, দণ্ডক, পজ্ঝটিকা প্রভৃতি ছন্দ সংগীতেও প্রাধান্য অর্জন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে কবিতার যে-কোনো ছন্দই সংগীতে স্বীকার করা হত এবং এ বিষয়ে বহু পরীক্ষাও করা হত। ভরতোত্তর সর্বাগ্রগণ্য চিন্তানায়ক শার্ঙ্গদেব তাঁর প্রবন্ধাধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ অপর মতের অনুসরণ ব্যতিরেকেই সংগীতে ছন্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত মত ব্যক্ত করেছেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বহুতর ছন্দের ব্যবহার ছিল বলেই সংগীতে ছন্দপ্রয়োগের পরিকল্পনা হয়েছিল। বাংলা গানেও সেই নিয়মে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। বিস্তর পরীক্ষার পর শাস্ত্রকারগণ সংগীতে কাব্যের ছন্দকে স্বীকার করে নিয়েছেন। যে গান কাব্যসংগীত তা স্বভাবতই অতিমাত্রায় কাব্যধর্মী এবং কাব্যের ছন্দরক্ষণপূর্বক গাইলে তা থেকে যে রস এবং আনন্দ পাওয়া যায় তা নিছক কাব্য-পঠনের চেয়ে বেশি। আমাদের সংগীতাচার্যগণ একই গীতে তাল এবং কাব্যের ছন্দ— উভয়ের যে-কোনোটির প্রয়োগই সমর্থন করেছেন। ধরা যাক যদি কেউ মেঘদূতের কোনো অংশ গাইতে চান তবে তিনি ইচ্ছা করলে মন্দাক্রান্তা ছন্দে তাঁর গীতানুষ্ঠান করতে পারেন; কিন্তু যদি তিনি সংগীতের কোনো নির্দিষ্ট তালে উক্ত গীতানুষ্ঠান করতে চান তাহলে তিনি বিধি অনুসারে সেই তালের প্রয়োগও করতে পারেন। এইভাবে বহু প্রবন্ধে যেমন ছন্দ নির্দিষ্ট করা আছে তেমন তালও নির্দিষ্ট হয়েছে। দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। অতএব নবমাত্রিক ছন্দে যখন 'ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমরা মরে পথ ভুলে' গানটি গাওয়া হচ্ছে তখন সেটি যে শাস্ত্রদ্বারা অসমর্থিত তা নয়— কেননা নবমাত্রিক ছন্দের শাসনদ্বারাই গানটির শৃঙ্খলা রক্ষিত হচ্ছে। এই অনুযায়ী ঠেকার পরিকল্পনা করে নিলে আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না। দক্ষিণ-ভারতে এইরকম বিভিন্ন কাব্যছন্দে নানা গানের প্রচলন এখনো আছে। দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীতে বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগে সংগীতের পূর্ণতায় ব্যতিক্রম ঘটে না। এই কারণেই এ অঞ্চলে বহুতর ছন্দকে তালের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। বিস্তর পরীক্ষার পর শাস্ত্রকারগণ সংগীতে বারো মাত্রা এবং ষোলো মাত্রার প্রাধান্যই বিশেষভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। তালের সম্পূর্ণতা বিচারে এবং তানবিস্তারের

সুবিধার পক্ষে এই দুটি তালই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এতদ্ব্যতীত বহু তালের উদ্ভাবন করা হয়েছে যার মধ্যে বিষমপদী তালের অভাব নেই। বিষমপদীরও একটা সংগতি বর্তমান যা ঝাঁপ বা তেওরায় পাওয়া যায়। কাব্যসংগীতে কাব্যের বিভিন্ন ছন্দে এইরকম একটা সংগীত আছে যা সংগীতকে সার্থকতায় উত্তীর্ণ করে। দেশী গীতে বৈচিত্র্যের সর্বপ্রকার উপায়কেই শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করেছেন— তাঁদের চিন্তার সঙ্গেও স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তার গভীর মিল রয়েছে।

রোমান্টিকতা

রবীন্দ্রনাথের সংগীতপ্রয়াসকে রক্ষণশীল বা ক্লাসিসিস্ট বলা যাবে, না, নব্যতান্ত্রিক অর্থাৎ রোমান্টিক বলা যাবে, তা নিয়ে অনেকের মনে দ্বন্দ্ব আছে। রবীন্দ্রসংগীতে এমন উদাহরণ যথেষ্ট আছে যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে রক্ষণশীল মনে করা যায় কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে সম্যকভাবে দেখলে তিনি যে রোমান্টিক এটাই স্বীকার করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে রোমান্টিক বলেই মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'সংগীতের মুক্তি' থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি—

চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে-হিল্লোল তুলেছিল সে একটি শাস্ত্রছাড়া ব্যাপার। তাতে মানুষের মুক্তি-পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হল। সেই অবস্থায় মানুষ কেবল স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সরলভাবে সৃষ্টি করে। এই জন্য সেদিন কাব্যে ও সংগীতে বাঙালি আত্মপ্রকাশ করতে বসল। তখন পয়ার ত্রিপদীর বাঁধা ছন্দে প্রচলিত বাঁধা কাহিনী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা আর চলল না। বাঁধন ভাঙল— সেই বাঁধন বস্তুত প্রণয় নয় তা সৃষ্টির উদ্যম। আকাশে নীহারিকার যে ব্যাপকতা তার একটা অপরূপ মহিমা আছে। কিন্তু সৃষ্টির অভিব্যক্তি এই ব্যাপকতায় নয়। প্রত্যেক তারা আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র হয়ে নক্ষত্রলোকের বিরাট ঐক্যকে যখন বিচিত্র করে তোলে তখন তাতেই সৃষ্টির পরিণতি। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কাব্যেই সেই বৈচিত্র্যচেষ্টা প্রথম দেখতে পাই। সাহিত্যে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্যমকেই ইংরেজিতে রোমান্টিক মুভমেন্ট বলে।

এই স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা কেবল কাব্যছন্দের মধ্যে নয় সংগীতেও দেখা দিল। সেই উদ্যমের মুখে কালোয়াতি গান আর টিঁকল না। তখন সংগীত এমন সকল সুর খুঁজতে লাগল যা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়। তাই সেদিন বৈষ্ণবধর্ম শাস্ত্রিক পণ্ডিতের কাছে যেমন অবজ্ঞা পেয়েছিল ওস্তাদীর কাছে কীর্তনগানের তেমনই অনাদর ঘটেছে।

আজ নতুন যুগের সোনার কাঠি আমাদের অলস মনকে ছুঁয়েছে। কেবল ভোগে আর আমাদের তৃপ্তি নেই, আমাদের আত্মপ্রকাশ চাই। সাহিত্যে তার পরিচয় পেয়েছি। আমাদের নূতন নাগরিক চিত্রকলাও পুরাতন রীতির আবরণ কেটে আত্মপ্রকাশের বৈচিত্র্যের দিকে উদ্যত। অর্থাৎ স্পষ্টই দেখছি আমরা পৌরাণিক যুগের বেড়ার বাইরে এলেম। আমাদের সামনে এখন জীবনের বিচিত্র পথ উদ্ঘাটিত। নূতন নূতন উদ্ভাবনের মুখে আমরা চলব। আমাদের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন চিত্রকলা সবই আজ অচলতার বাঁধন হতে ছাড়া পেয়েছে। এখন আমাদের সংগীতও যদি এই বিশ্বযাত্রার তালে তাল রেখে না চলে তবে ওর আর উদ্ধার নেই।

এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ সংগীতরচনায় যে পথ অবলম্বন করেছিলেন

তা রোমান্টিক পন্থা। কিন্তু নূতন নূতন উদ্ভাবনের মুখে চলতে গিয়ে তিনি পুরাতনকে অস্বীকার করেন নি বা আঘাত করেন নি। রবীন্দ্রসংগীতের নূতনত্ব একটা খাপছাড়া নূতনত্ব নয়, বিশেষ সুচিন্তিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত সৃষ্টি যার একটা কৌলীন্য আছে অথচ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্পূর্ণ স্বকীয়। নৃত্যনাট্যগুলিতেও তিনি সাধারণ নিয়ম পালন করেন নি। সমস্ত কৃত্রিমতা, নাটকীয় জাঁকজমক পরিহার করেছেন। ইংরেজিতে যাকে 'শো' বলে সেই প্রদর্শনীর আয়োজনও তাঁর নৃত্যনাট্যে নেই কিন্তু তাঁর আইডিয়াটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে দৃশ্যের পর দৃশ্যে। ইচ্ছা করলে নৃত্যনাট্যের ভাষা সর্বত্রই তিনি নিখুঁত কাব্যে সুসজ্জিত করে রাখতে পারতেন কিন্তু তা করেন নি। নৃত্যনাট্যের অনেক অংশ প্রায় গদ্যের আকারে আছে অথচ সংগীত হিসাবে সব মিলিয়ে এ একটা নতুন আর্ট। নৃত্যনাট্যে দুটি চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়— একটি সরল সুন্দর সংগীতকলার পরিচয় স্থাপন অপরটি বর্ণনাত্মক বস্তুকে সুরে রসে প্রত্যক্ষীভূত করা। নৃত্যনাট্য সম্পর্কীয় চিন্তাতেও বিষয়বস্তুকে আপন সুষমায় প্রকাশ করবার প্রচেষ্টাই প্রধানতঃ লক্ষ্যগোচর হয়। নৃত্যনাট্যের গদ্যাংশের সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অপর গদ্যগানের প্রভেদ আছে। একটিতে বর্ণনার প্রয়োজনকে মেটাতে হয়েছে অপরটিতে গদ্যকে লিরিকের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। নৃত্যনাট্যে সংগীতকলার এই যে আত্মপ্রকাশ এও প্রধানতঃ রোমান্টিক।

গীতকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবেই আত্মগত। সমস্ত রোমান্টিক রচয়িতারই এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। চিন্তার স্বকীয়ত্বকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তাঁরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাও একান্তভাবেই তাঁদের নিজস্ব। এই আত্মলীনতা সত্ত্বেও তাঁদের সৃষ্টির আবেদন বিশ্বজনীন। রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগপদ্ধতিতে সম্পূর্ণ বাঙালী কিন্তু যে ভাবটি যেখানে প্রকাশ করেছেন তা সব জাতির মনকে আকৃষ্ট করবে। রবীন্দ্রসংগীতকে যদি অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায় তাহলে তার প্রকাশভঙ্গীর মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা শক্ত এবং এই ভঙ্গীটি না ফুটলে রবীন্দ্রসংগীতের সৌন্দর্যের পরিচয়ও পুরোপুরি পাওয়া যাবে না। বিদেশী অথবা অবাঙালীকে রবীন্দ্রসংগীতের রসগ্রহণ করতে গেলে বাংলা শিখতে হবে, বাংলা ভাষার নমনীয়তার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, তাহলেই রবীন্দ্রসংগীতের যে আবেদন বিশ্বমনকে আকৃষ্ট করে তা অনুভব করা যাবে। রবীন্দ্রনাথ যদি সনাতন পন্থায় তাঁর গানকে ধ্রুপদ খেয়াল বা সাধারণ রাগসংগীতের বেশে সাজিয়ে দিতেন তাহলে অবাঙালির পক্ষে রসগ্রহণে বাধা হত না কিন্তু সে-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গান হিন্দী গানেরই দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে দাঁড়াত। কোনো কোনো রোমান্টিক রচয়িতা আছেন যাঁদের গানে প্রচলিত রাগসংগীতের স্টাইল থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচয়ের অভাবে তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুভব করা সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ অতুলপ্রসাদের নাম উল্লেখ করা যায়। রাগসংগীতের প্রচলিত রীতি অতুলপ্রসাদ বিশেষভাবে অনুসরণ করেছিলেন কিন্তু গানে তাঁর একান্ত আপন ভঙ্গীটি এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে অতুলপ্রসাদকে অনুভব এবং বিচার করা কঠিন।

কাব্যসংগীত এবং রাগসংগীতের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। রাগসংগীত দুএকটি কথাকে অবলম্বন করে আপনার মহিমায় তার ভিতর থেকে একটি অনির্বচনীয় ভাব প্রকাশ করতে পারে। একটা বাংলা রাগসংগীতের বিষয়বস্তু ধরা যাক—

সখি, আমি তাড়াতাড়ি যেতে পারছি না। কাঁটায় আমার কাপড় আটকে গেছে। তাকে যতই ছাড়াতে যাচ্ছি ততই আরও কাঁটায় জড়িয়ে পড়ছি। ফাগুনের বাতাসে আমার কেশ-বেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর কোথা থেকে একটা কোকিল এসে কুহু কুহু করে ডাকছে।

এই যে একটা আকস্মিক বাধার বিপত্তি যার বসন্তসমাগমে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবার ব্যাকুলতা— রাগসংগীতে নানাভাবে তাকে গভীর ক'রে প্রকাশ করছে সুরকে অবলম্বন ক'রে। সেই সুরটি সবার উপযোগী এবং প্রত্যেক শিল্পী তাঁর ব্যক্তিত্বকে তাঁর আবেগকে এই সুর-বিস্তারের মধ্যেই খানিকটা আলাদাভাবে ফুটিয়ে তোলেন। কাব্যসংগীতের স্বরূপ ভিন্ন—

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
　　চাঁদ ওঠে নি সিন্ধুপারে
হে অজানা তোমায় তবে
জেনেছিলেম অনুভবে
গানে তোমার পরশখানি
　　বেজেছিল প্রাণের তারে।

এই গানের আবেদন রাগসংগীতের পদ্ধতিতে প্রকাশ পায় নি। ভাষা আর সুরের যে চমৎকার মিল রয়েছে এ রচনায় সেই মিল সুরকারের নিজস্ব অনুভূতির ইঙ্গিতে সাধিত হয়েছে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি রোমান্টিক। তাঁর সংগীতে তিনি এমন সব সুর খুঁজেছেন যা তাঁর হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করেছে, রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অপর রোমান্টিক সুরকারগণও এ চেষ্টা করেছেন, যথা অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দিলীপ-কুমার এবং হিমাংশুকুমার। বাংলার সংগীতে রোমান্টিক আন্দোলন নানা দিক দিয়ে বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ সংগীতে বহু সমস্যা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। প্রয়োগকলাতেও তাঁর যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল। এই দুটিতেই রবীন্দ্রনাথ বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ তাঁর আইডিয়ার জন্য, তাঁর চিন্তার জন্য— যে চিন্তা আনন্দ, রস এবং অনুভূতির মধ্যে সুন্দরের সন্ধান দিয়েছে। আলংকারিক বহু তর্কের পর স্থির করেছেন রসাত্মক বাক্যই কাব্য। রবীন্দ্রনাথের সংগীতকে সর্বতোভাবে বিচার করবার পর আমরা বলতে পারি রসাত্মক গীতই যে কাব্যসংগীত— এর যাথার্থ্যও তিনি সার্থকভাবে প্রমাণ করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য

বিমলচন্দ্র সিংহ

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে এমন একটি রস আছে যা রবীন্দ্রসাহিত্যেও দুর্লভ। এগুলির মধ্যে কবিতা আছে কিন্তু সেটি কাহিনীর অনুবর্তী, গান আছে কিন্তু কাহিনী ও নৃত্যকে ছেড়ে সে গান চলে না, আবার নৃত্য আছে কিন্তু কাহিনী ও গানের সঙ্গে তার সংযোগ সম্পূর্ণ। এর মধ্যে নৃত্য, নাট্য এবং কাব্যের ত্রিবেণীসংগম ঘটেছে, তার মধ্যে এ তিনটিই সমান অপরিহার্য হওয়ার ফলে এর কোন্ অঙ্গটি প্রধান সে কথা বলা কঠিন। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। এ-কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখির প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।

এর মধ্যে লক্ষণীয় এই যে কবিতা, সুর এবং নাচ এর মধ্যে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত, কোনোটিই অপরটির সঙ্গে অবিযুক্তভাবে আলোচনীয় নয়।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির গোড়ার কথা এইটিই। রবীন্দ্রসাহিত্যে কাব্য, সুর এবং নৃত্যের সম্মিলন অভূতপূর্ব নয়, কিন্তু এখানে কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। কবিতা, গান বা নাচের আলোচনা করতে হলে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এগুলি একই রস প্রকাশ করতে চাইলেও এদের ভঙ্গীটা অনেক সময় বিভিন্ন, এদের আবেদনের এবং রসপ্রকাশের কৌশল এক নয়। কবিতার মধ্যে ভাষার কৌশল অপ্রধান নয়, বরং সেইটিই প্রধান, কিন্তু গানের মধ্যে ভাষাই প্রধানতম এ কথা বলা চলে না। বরং কথা ও সুরের সংঘর্ষ গীতরচয়িতাদের চিরন্তন সমস্যা। মহৎ প্রতিভা ছাড়া এই দুইয়ের সুষ্ঠু সম্মিলন সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি কবিতা হিসেবেও বড়, এমন-কি অনেক সময় তাদের মধ্যে যে একটি নতুন আস্বাদ মেলে তা তাঁর কবিতাতেও অনেক সময় মেলে না— এ কেবল রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু সাধারণতঃ এ রকম সম্মিলন ঘটা কঠিন। তার কারণ আছে। কথা ও সুরের আবেদনের ভঙ্গীটা এক নয়। কথার সঙ্গে নানা স্মৃতি জড়িয়ে থাকে, স্থানকালপাত্রভেদে একই কথার বিভিন্ন অর্থ। সংস্কৃত আলংকারিকরা শব্দের এই ক্ষমতাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন, অভিধা, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা ও তার মধ্যে জাতি গুণ ক্রিয়া দ্রব্য প্রভৃতি বিভাগ এই হতেই উদ্ভূত। কিন্তু এর গোড়ার কথাটি এই যে,

কথার এক-একটি সামাজিক-ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে এবং সেই স্মৃতিতে কিছু পরিমাণে সামান্য থাকলেও ব্যক্তিভেদে বিশেষত্বও তার মধ্যে আছে। সেই কারণেই কথা নিয়ে খেলানো চলে, বাচক অর্থ হতে কত ধ্বনি কত ব্যঞ্জনা কত ইঙ্গিত ফুটে ওঠে এবং শব্দালংকার ও অর্থালংকার তার সহায়তা করে। সে হিসেবে আমরা শব্দের তিনটি প্রধান সম্পত্তির সন্ধান পাই। প্রথমতঃ, তার দুটি প্রধান দিক। একটি বস্তুগত, একটি ব্যক্তিগত। বস্তুগত দিক দিয়ে তার একটি স্থায়ী অর্থ আছে। যেমন 'পর্বত' বললে পাথরওয়ালা উঁচু জায়গা বোঝায়। এইখানে তার প্রথম প্রতীকিতা। আমাদের স্মৃতিতে পর্বতের যে ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে আছে সেইটিকে মনে করিয়ে দেবার জন্য 'পর্বত' কথাটিই যথেষ্ট। অর্থাৎ পর্বতের স্মৃতির প্রতীক হচ্ছে 'পর্বত' শব্দটি। এই বস্তুগত দিকটি বোঝাতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, শব্দের অর্থ বাস্তবিক কোনো বিশেষ ব্যক্তি নয়, শব্দের দ্বারা কেবল জাতিই সূচিত হয়।[১] যেমন 'পর্বত' শব্দে কোনো বিশেষ পর্বত সূচিত হয় না, পর্বত জাতিই সূচিত হয়। শব্দের এই বস্তুগত দিকটি দরকারী নিশ্চয়ই, কিন্তু সবটা নয়। সুতরাং তার ব্যক্তিগত দিকটিও অস্বীকার করা চলে না। এইটি অনুভূতির দিক। একই শব্দের অর্থ বিভিন্ন লোকের কাছে এক নয়। হিমালয়ের অধিবাসীর মনে পর্বত যে চিত্র জাগায়, সমতলবাসীর মনে সে চিত্র জাগায় না। অবশ্য তাদের মধ্যে অনুভূতিসামান্য আছেই, তা না হলে কথাটির প্রতীকধর্মিতা লোপ পেত, কিন্তু তবুও দুই ক্ষেত্রেই ও-শব্দটির অর্থ যে অবিকল এক এমন কথা বলা চলে না।

এ দুটিই শব্দের প্রাথমিক সম্পত্তি। এই দুটি সম্পত্তি স্বীকার করলে শব্দের আর-একটি সম্পত্তি চোখে পড়ে। সেটি হচ্ছে শব্দের এই দুটি দিক নিয়ে খেলানো, এবং তার ফলে একটি নতুন রস জমিয়ে তোলা। বিভিন্ন শব্দে ব্যক্তিগত ও বস্তুগত দিক সমান নয়, কোনো শব্দে ব্যক্তিগত দিকটিই বেশি, কোনোটিতে বস্তুগত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুভূতি, অর্থাৎ 'আমি', বড়— কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা নয়। একটি উদাহরণ হতে এ কথাটা স্পষ্ট হয়—

১ কাব্যপ্রকাশকার বলেছেন "সংকেতিতশ্চতুর্ভেদো জাত্যাদির্জাতিরেব বা ॥" ২।৮ ॥ "হিমপয়ঃশঙ্খাদ্যাশ্রয়েষু পরমার্থতো ভিন্নেষু শুক্লাদিষু যদ্‌বশেন শুক্লঃ শুক্ল ইত্যাদ্যভিন্নাভিধানপ্রত্যয়োৎপত্তিস্তৎছুক্লত্বাদি সামান্যম্, গুড়তণ্ডুলাদিপাকাদিষ্বেবমেব পাকাদিত্বম্, বালবৃদ্ধশুকাদ্যুদীরিতেষু ডিংথাদিশব্দেষু চ প্রতিক্ষণং ভিদ্যমানেষু ডিংথাদ্যর্থেষু বা ডিংথাদ্যস্তীতি সর্বেষাং শব্দানাং জাতিরেব প্রবৃত্তিনিমিত্তম্ ইত্যন্যে।" শব্দ সাধারণতঃ জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্যে বিভক্ত। এঁদের মতে গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য সব কয়টিরই প্রবৃত্তি জাতিতে। যেমন হিম, পয়ঃ বা শঙ্খে যে শুক্লতা আছে সেগুলি পরমার্থতঃ ভিন্ন হলেও যে কারণে শুক্ল শুক্ল সেটি (অর্থাৎ শুক্লত্ব) একই এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সমান। তেমনি গুড়ের পাক আর তণ্ডুলের পাকের মধ্যেও পাকাদিত্ব সমান। আর বালক, বৃদ্ধ ও শুক-পক্ষী যদিও কারও নাম (ডিংথ) বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করে তাহলেও তার মধ্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ডিংথাদি আছে। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জাতিই আসল বক্তব্য। প্রথমটি গুণ, দ্বিতীয়টি ক্রিয়া এবং তৃতীয়টি দ্রব্য বা নামের উদাহরণ। এ মত কাব্যপ্রকাশকার গ্রহণ করেন নি, বস্তুতঃ এ মত গ্রহণীয়ও নয়, তবুও কৌতূহলজনক।

'পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণ-খেলা' শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

তার পর থেকে দেখছি য়ুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার 'পরে বিশ্বাস হারিয়েছে. আজ সে স্পর্ধা করে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করতে উদ্যত।

এই বাক্যের মধ্যে 'দেখছি' 'শুভবুদ্ধি' 'বিশ্বাস' 'স্পর্ধা' 'কল্যাণ' 'আদর্শ' প্রভৃতি শব্দগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত দিকটি যত বড় 'আপনার 'পরে' 'আজ' 'করে' 'করতে' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে সেটি তত বড় নেই, যদিও উভয় ক্ষেত্রেই উভয় দিক বর্তমান, তাদের কোনোটির উপস্থিতিই একেবারে অস্বীকার করা চলে না।

এ কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, কথা ও সুরের পার্থক্যের মূল এইখানে। শব্দের ব্যক্তিগত দিকটির চরম নিদর্শন সুর। অস্বীকার করা চলে না যে সুরের সাহায্যে ভাব-বিনিময় সম্ভব, কিন্তু তার মধ্যে বস্তুগত ভিত্তি প্রায় নেইই। তার সামাজিক-ঐতিহাসিক স্মৃতি প্রবল নয়। সুরের কতকগুলি স্মৃতি দীর্ঘকালের অভ্যাসে অনেক সময় গড়ে ওঠে, দরবারী কানাড়া অনেক সময়ই রাত্রির সংস্কার জাগায়, ও-সুরের ভঙ্গীও অবশ্য তার সহায়ক। কিন্তু এ সংস্কার কথার সংস্কারের মতো সুদূরপ্রসারী এবং দৃঢ় নয়। সাদা বোঝাতে কালো কথাটার ব্যবহার বিপরীত লক্ষণার ক্ষেত্র ছাড়া সম্ভবতঃ অচল, কিন্তু সকালবেলাতেও দরবারী কানাড়ার মতো বিরাট গভীর রাগ খানিকটা ভালো লাগেই। টোড়ী বিরহের রাগিণী, অন্ততঃ ওস্তাদদের মনের সংস্কার সেই রকম, কিন্তু কোমলতা ছাড়া সকালবেলার সঙ্গে তার সংযোগসূত্র কি, বিরহের মধ্য দিয়ে সেটি সম্ভব কিনা, খুঁজে পাই না। গানের সংস্কারবোধের আলোচনায় আরও একটি কথা মনে পড়ে। কোনো কোনো ওস্তাদের বিশ্বাস, সুরের আসল রূপটি ধরা পড়ে শুধু আলাপেই, তানে দূন-চৌদুনে নয়। সে হিসেবে টোড়ীর বিলাপ কেবল আলাপেই ধরা পড়বে, উৎসাহোদ্দীপক তানে নয়। এও একটি সংস্কারের কথা, যা সকলের পক্ষে সমান সত্য নয়। সুতরাং গানেও সংস্কার আছে, কিন্তু তার প্রভাব কথার সংস্কারের মতো নয়। কবিতার 'আমি'র চেয়েও গানের 'আমি' সাধারণতঃ বড়। এমন কবিতা আছে, যার মধ্যে কবির চেয়ে কুশীলবেরাই চোখে পড়ে বেশি। এ কথা গীতিকবিতার বেলাতেও খাটে। কিন্তু গানের বেলা এ কথা অনেক সময়ই অচল, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের গানে।

কথা ও সুরের এই বৈশিষ্ট্য অনুভব করলে আরও একটি বৃহত্তর সমস্যা উঠে পড়ে। শব্দের মধ্যে যেমন ব্যক্তি ও বস্তুর খেলা আছে, শব্দসমষ্টির মধ্যে সে খেলা আরও বিচিত্র এবং গভীর। গল্প উপন্যাস ও কবিতার প্রধান পার্থক্য এইখানে। এদের মধ্যে পাঠকসমাজের অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম মিলনভূমি সব সময়েই আছে, তা না হলে সাহিত্যরচনাই সম্ভব হত না। কিন্তু তবুও গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে সাধারণতঃ বস্তু বড়, পাঠক ও রচয়িতা যেন দর্শক হিসেবে সেই চলচ্ছবি দেখছেন। এর ব্যতিক্রম নেই তা নয়, কিন্তু সাধারণতঃ এই কথাই প্রযোজ্য। 'অমিত রায় ব্যারিস্টার।' এ কথাটির মধ্যে যে-পরিমাণ তথ্য আছে 'তোমারেই আমি ভালোবাসিয়াছি শতযুগে শতবার'— এর মধ্যে 'আমি' তার চেয়ে বড়। 'অমিত রায় ব্যারিস্টার'— এ কথাটি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ বলতে

পারত না, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত সুপরিস্ফুট, কিন্তু তবু সেই ব্যক্তিত্ব ধ্বনিত হয়েছে ব্যক্ত হয় নি। রসসৃষ্টির উপায়টা তফাত, ঝোঁকটা অন্য জায়গায়।

সুতরাং এই নৃত্যনাট্যগুলির প্রধান সমস্যা এই বিভিন্ন আঙ্গিকগুলির কিভাবে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে, এই বিভিন্ন ভঙ্গীর আবেদনগুলি কি উপায়ে একটি নূতনতর এবং বিচিত্রতর রস জমাতে পারে। বিভিন্ন আঙ্গিকগুলি স্বকীয় বিশেষত্ব ছাড়বে না, অথচ তারা পরস্পরবিরোধী না হয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত হয়ে একটি নতুন রসসৃষ্টির সহায়তা করবে— এইটিই এগুলির বড় সমস্যা। কিভাবে এই সমন্বয় ঘটল এবং তার ফলে কি ধরণের নতুন রস জমল, তার সার্থকতা একালের পটভূমিকার কতদূর, এই প্রসঙ্গে সেই কথাগুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

২

প্রথমে কাব্যরূপের দিক হতে কথাটি আলোচ্য। চিত্রাঙ্গদা কবিতা ও চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য তুলনা করলে কয়েকটি মৌলিক প্রভেদ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কবিতা চিত্রাঙ্গদার মধ্যে যে মহোচ্ছ্বাস আছে নৃত্যনাট্যে তা নেই, এখানে সব সময়েই একটি অদৃশ্য বাঁধন আছে। সে কারণে দীর্ঘ স্বগতোক্তি বা প্রায় স্বগতোক্তির প্রয়োজন নৃত্যনাট্যে হয় নি, সেখানে প্রকাশভঙ্গী আরও সংক্ষিপ্ত অথচ আরও তীব্র। এই সংক্ষিপ্ত ও তীব্রতার সহায়তা করেছে গান। কবিতায় চিত্রাঙ্গদার আক্ষেপ দীর্ঘায়িত—

শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল—
'ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।'
পুরুষের ব্রহ্মচর্য!
ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিনু টলাতে।
তুমি জানো, মীনকেতু কত ঋষি-মুনি
করিয়াছে বিসর্জন, নারীপদতলে
চিরার্জিত তপস্যার ফল। ক্ষত্রিয়ের
ব্রহ্মচর্য! গৃহে গিয়ে ভাঙিয়ে ফেলিনু
ধনুঃশর যাহা কিছু ছিল; কিণাঙ্কিত
এ কঠিন বাহু— ছিল যা গর্বের ধন
এতকাল মোর— লাঞ্ছনা করিনু তারে
নিষ্ফল আক্রোশ ভরে। এতদিন পরে
বুঝিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি বৃথা বিদ্যা যত।

অবলার কোমল মৃণালবাহু দুটি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল।
ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণ তনুলতা
পরাবলম্বিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্যবল, তপস্যার
তেজ!

কিন্তু নৃত্যনাট্যের ভঙ্গী সম্পূর্ণ অন্য। সেখানে সুর ও নৃত্য থাকার ফলে এই দীর্ঘ উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন হয় নি। মাত্র কয়েকটি লাইন—

অর্জুন। ক্ষমা করো আমায়,
বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে,
ব্রহ্মচারী ব্রতধারী। [প্রস্থান
চিত্রাঙ্গদা। হায় হায় নারীরে করেছি ব্যর্থ
দীর্ঘকাল জীবনে আমার।
ধিক্ ধনুঃশর
ধিক্ বাহুবল।
মুহূর্তের অশ্রুবন্যাবেগে
ভাসায়ে দিল যে মোর পৌরুষ-সাধনা।
অকৃতার্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাসে
বসন্তেরে করিল ব্যাকুল॥
(গান) রোদনভরা এ বসন্ত···

যে ভিড়-করে-আসা শব্দসমারোহ, যে উপমাঝংকার রবীন্দ্রকাব্যের একান্ত নিজস্ব লক্ষণ, সেই লক্ষণ এখানে পরিবর্জিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তীব্রতার অভাব ঘটে নি, বরং তা আরও বেড়েছে। এটি সম্ভব হল এই আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে, নৃত্যনাট্যের বিশিষ্টতায়। চিত্রাঙ্গদায় তবুও কবিতা ও নৃত্যনাট্যে অনেক পার্থক্য আছে, সেখানে কবিতার অনেক অংশ নৃত্যনাট্যে পরিবর্জিত বা পরিবর্ধিত, ঘটনা-সংস্থানেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শ্যামার মধ্যে কবিকর্ম আরও চমৎকার। কবিতার সঙ্গে নৃত্যনাট্যের বাহ্য প্রভেদ সেখানে আরও কম। কবিতার পঙক্তিগুলি বহুসময়েই নৃত্যনাট্যে সম্পূর্ণ আসন লাভ করেছে। কিন্তু এত সাদৃশ্য বজায় থাকা সত্ত্বেও আসলে আকাশপাতাল পার্থক্য ঘটেছে। কবিতায় শ্যামার আক্ষেপোক্তি লক্ষণীয়—

সহসা শিহরি'
কাঁপিয়া কহিল শ্যামা, 'আহা মরি মরি

মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী ক'রে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে। শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্‌গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে।'

নৃত্যনাট্যে এই পঙক্তিগুলিই ব্যবহৃত, কিন্তু তবুও তাদের ভঙ্গী আলাদা।

শ্যামা। আহা মরি মরি
মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে
চোরের মতন কঠিন শৃঙ্খলে।
শীঘ্র যা লো সহচরী, যা লো যা লো,
বল্‌গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে।

পঙক্তিগুলি প্রায় একই আছে কিন্তু ঠিক এক নেই। মাঝামাঝি ভেঙে দেওয়ার ফলে পংক্তিগুলির সে রুদ্ধশ্বাস প্রবহমাণতা নেই, বরং চড়া সুরের সঙ্গে নীচু সুরের সম্মিলন আছে। 'মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নতদর্শন,'-এর যুক্তাক্ষরের জমক ও ঝংকারের পর 'যা লো যা লো, বল্‌গে'—এর ঘরোয়া সুর একটি বিচিত্র রসের সৃষ্টি করে যা কবিতায় দুর্লভ। সে হিসেবে নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার নিম্নোদ্ধৃত অংশটি বিশেষ লক্ষণীয়—

আজি পূর্ণিমা রাতে জাগিছে চন্দ্রমা
বকুলকুঞ্জ
দক্ষিণ বাতাসে দুলিছে কাঁপিছে
থর থর মৃদু মর্মরি'।
নৃত্যপরা বনাঙ্গনা বনাঙ্গনে সঞ্চরে
চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মঞ্জীর তার গুঞ্জরে।
দিস্ নে মধুরাতি বৃথা বহিয়ে
উদাসিনী হায় রে।
চন্দ্রকরে অভিষিক্ত নিশীথে ঝিল্লিমুখর বনছায়ে
তন্দ্রাহারা পিকবিরহ-কাকলীকূজিত দক্ষিণ বায়ে
মালঞ্চ মোর ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো,
কিংশুক-শাখা চঞ্চল হোলো দুলে দুলে দুলে গো।

প্রথম কয়েক পঙক্তির ঠাস্‌বুনানির পর 'দিস্ নে মধুরাতি বৃথা বহিয়ে' হতে আর-একটি সুরের আরম্ভ, তেমনি 'চন্দ্রকরে অভিষিক্ত' প্রভৃতি সমাসবদ্ধ দীর্ঘ সংস্কৃত লাইনগুলির পর 'মালঞ্চ মোর

ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো' হতে আর-একটি সুর আরম্ভ হল। এই রকম বিচিত্রতা পদে পদে। ভাবের একটানা স্রোত নেই, আপনহারা বন্যা নেই, আছে তরঙ্গের নৃত্য, সেইসঙ্গে নৃত্যের তরঙ্গ, আছে ওঠাপড়া। এই বিচিত্রতায় নতুন রস জমছে, যার সন্ধান কবিতায় মেলে না। এ কথা আরও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। উপরে উদ্ধৃত লাইনগুলির পর দইওয়ালা ও চুড়িওয়ালার গান আছে। সে গান আবার আরও অন্য ভঙ্গীর—

চুড়িওয়ালা। ওগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে,
এসো এসো দেখো চেয়ে,
এনেছি কাঁকনজোড়া
সোনালি তারে মোড়া।

এর শব্দঝংকার এবং ভঙ্গী অপর লাইনগুলি হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এমন-কি 'মালঞ্চ মোর ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো'— এর মধ্যে যে সুর আছে চুড়িওয়ালার গানের সুর তা নয়। আবার অপমানিতা প্রকৃতির গান এগুলি হতে সম্পূর্ণ আলাদা। তার মধ্যে যে গভীর ক্ষোভ এবং মনুষ্যত্বের অপমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আভাস আছে, নিরলংকার গাম্ভীর্য এবং স্পষ্ট উক্তি ছাড়া তা ফুটত না। মিল নেই, মিলের আভাস আছে মাত্র—

যে আমারে পাঠাল এই
অপমানের অন্ধকারে
পূজিব না পূজিব না সেই দেবতারে পূজিব না।
কেন দিব ফুল, কেন দিব ফুল,
কেন দিব ফুল তারে
যে আমার চিরজীবন
রেখে দিল এই ধিক্কারে।

গভীর অনুভূতি স্পষ্ট উক্তির সাহায্যে প্রকাশিত, তার জন্য ব্যঞ্জনা-লক্ষণার সাহায্য নিতে হয় নি—

যে আমারে দিয়েছে ডাক,
বচনহারা আমাকে দিয়েছে বাক,
যে আমারি জেনেছে নাম,
ওগো তারি নামখানি
মোর হৃদয়ে থাক্।

লাইনগুলি ঝংকৃত নয়, কঠোর বাঁধন নেই, অলংকার প্রায় অনুপস্থিত— কিন্তু বক্তব্যের ঋজুতায় এবং সুরের দোলায় এরা বহু দূরে এগিয়ে গেল— এরা সহজেই আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে—

আঁধার যবে পাঠায় ডাক মৌন ইশারায়
যেমন আসে কালপুরুষ সন্ধ্যাকাশে
তেমনি তুমি এসো এসো।

সুদূর হিমগিরির শিখরে
মন্ত্র যবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ
প্রখর তাপে কঠিন ঘন তুষার গলায়ে
বন্যাধারা যেমন নেমে আসে,
তেমনি তুমি এসো তুমি
এসো এসো।

এর প্রত্যেকটির ভঙ্গী স্বতন্ত্র। নানা সুরের সম্মিলন আছে কিন্তু একতন্ত্রীর চড়া সুর নেই। নানা বিচিত্র পর্যায়, নানা বিভিন্ন স্তর, নানা প্রকাশভঙ্গী, ছন্দের মৃদু বা তীব্র দোলা, অলংকারের প্রাচুর্য বা অনুপস্থিতি— এগুলির সমবায়ে যে রস সৃষ্টি হয় সে রস কবিতার রস নয়, সে রস অন্য।

এর মধ্যে সেই কারণে নাটকের দাবি যথেষ্ট মিটবার অবকাশ আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সংলাপ নাটকের অন্যতম অঙ্গ। বিভিন্ন পাত্রপাত্রী বা বিভিন্ন স্তরের পাত্রপাত্রী এক ধরণের কথাবার্তা বলে না, সংস্কৃত নাটকেও কোনো কোনো চরিত্র সংস্কৃতে বা কোনো কোনো চরিত্র প্রাকৃতে কথা বলার নিয়ম আছে। কবিতায় এ কৌশলটির ব্যবহার কঠিন। রবীন্দ্রনাথের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র মতো একটি নাটকীয় কবিতাতেও এ কৌশল ফোটে নি। রানী এবং পরিচারিকাদের কথাবার্তায় খুব বেশি স্তরবৈচিত্র্যের আভাস মেলে না, ফলে তার মধ্যে একটানা প্রবাহ আছে কিন্তু গভীর স্পন্দন নেই, হৃদয়ের রুদ্ধ প্রতীক্ষা এবং উদ্বেল উচ্ছ্বাস এ দুয়ের সংমিশ্রণ নেই। ফলে তার সার্থকতা এর মতো গভীর নয়। কাব্যনাট্য একটি বিশেষ জাতের নাটক না হয়ে শুধু নাটকীয় কবিতা হলেই কাব্যরস ও নাট্যরসের সুষ্ঠু সমন্বয় এবং অভিনব প্রকাশ হবে এ আশা দুরাশা। আসলে দুটির সংমিশ্রণ চাই, তা না হলে উভয়তই ক্ষতি, লাভের সম্ভাবনা প্রায় নেইই। নৃত্যনাট্যগুলির গোড়ার কথা এই যে, সেগুলির মধ্যে শুধু সংমিশ্রণ নেই একটি নতুন সৃষ্টি আছে। সেই কারণেই তার মধ্যে যে রস সৃষ্ট হল সে রসের আস্বাদ বিচিত্র, বহু রসের ঘন সন্নিবেশে একটি নতুন রস গড়ে উঠেছে।

এই বিচিত্রতা অকারণ নয়। পূর্বে কথা ও সুরের যে বিভিন্নধর্মিতার উল্লেখ করেছি, তা হতে বোঝা যায় যে, কবিতা, গান ও কাহিনীর সমন্বয় ঘটানো সহজ নয়, তার সঙ্গে সার্থক নৃত্যের যোগাযোগ আরও দুরূহ। এইখানেই নাট্যরূপের প্রয়োজনীয়তা ধরা পড়ে। কবিতা বা গানের একমুখীনতা নাটকের পক্ষে সাধারণতঃ স্বাভাবিক নয়। প্রতীকী নাটকের কথা ছেড়ে দিলে সাধারণতঃ নাটকে ঐ বিচিত্র রসগুলির সম্মেলন ঘটে থাকে, সেইটিতেই নাটকের সার্থকতা। বরং একটি সংহতিবোধের মধ্যে নানা বিচিত্রতার সৃষ্টিতেই নাটকের বৈশিষ্ট্য। নাটকের সাফল্য, সেই কারণে, নির্ভর করে সংলাপ গান কবিতা ইত্যাদির সুষ্ঠু সমাবেশের উপর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে নাট্য রচিত হল তার প্রধান উপকরণ গান ও কবিতা। পূর্বেই এ কথা বলবার চেষ্টা করেছি যে গান ও কবিতায় 'আমি' অনেক সময়েই বড়ো, নাটকের মতো কুশীলবদের প্রাধান্য সেখানে

অপ্রতিহত নয়। সুতরাং গান বা কবিতার সাহায্যে নাটক রচনার অন্যতম বিপদ এই যে, গান বা কবিতার আবেদনভঙ্গীর সঙ্গে নাটকের রসসৃষ্টির কৌশলের সংঘাত বাধতে পারে। সংস্কৃত আলংকারিকের ভাষায়, এখানে গান-কবিতা ও নাটক উপসর্জনীকৃত স্বার্থ না হলে দুয়েরই ক্ষতির সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের প্রধানতম কৃতিত্ব এইখানেই। এর মধ্যে নাট্যরস এবং কাব্যরস এবং গান এমনভাবে স্বার্থ বর্জন করেছে যে ক্ষতির বদলে প্রত্যেকটিই একটি নতুন সম্ভাবনায় প্রাণবান হয়ে উঠেছে। এদের প্রত্যেকটিতে একটি নতুন ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

কিছুদিন হতে আমাদের সমাজে যে হাওয়াবদল ঘটেছে তার ফলে ক্রমশঃ রবীন্দ্রকাব্যেরও সুরবদল হয়েছে। এই সুরবদলের গোড়ার কথাটি হচ্ছে ক্রমিক বন্ধনমুক্তি। এই বন্ধন ভাষার বন্ধন, ভাবের বন্ধন, ছন্দের বন্ধন। বলা বাহুল্য, ভাষা বা ভাব বা ছন্দ তখনই বন্ধন যখন তারা কাব্যের প্রাণসারকে প্রকাশ করার বদলে ঢাকতে চায়। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকের পরিবর্তন ভঙ্গীপরিবর্তন সেইজন্য দরকার হয়ে পড়ে। তীব্র ঝংকৃত মহোচ্ছ্বসিত কবিতার পালা কাটবার পর রবীন্দ্রকাব্যে একটি নিবিড় মৃদু মাধুর্যের যুগ এসেছিল— যার পরাকাষ্ঠা গীতাঞ্জলির যুগে। এর পর বলাকার যুগে নতুন ছন্দ ও বাঁধনভাঙা লাইনের প্রয়োজন ঘটেছিল। কিন্তু ক্রমশঃ রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে শুধু ছন্দ বা পঙক্তির নতুন ব্যবহারই যথেষ্ট নয়, আরও মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। এই কারণেই গদ্যকাব্যের শুরু। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।

কিন্তু তার জন্য—

গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে।

লক্ষ্য করার বিষয়, এই সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন দূর করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ দুটি কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। যেমন 'পুনশ্চে' দেখি, কতকগুলি কবিতার মধ্যে সহজ মানুষের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, তাদের সুখদুঃখের একটা মানবিক কিন্তু ঝংকারহীন বর্ণনা দেবার চেষ্টা আছে। 'কোপাই' 'খোয়াই' 'দেখা' 'শেষদান' প্রভৃতি কবিতা এই পর্যায়ের। কিন্তু এ ছাড়া অন্য এক ধরণের কবিতার সন্ধান মেলে যেগুলির মধ্যে নাটকীয়ত্ব বা নাটকীয় কথাবস্তুর প্রাধান্য। যেমন, 'ক্যামেলিয়া' 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' 'প্রথম পূজা' প্রভৃতি। নাটকীয়ত্বের আড়ালে কবি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চান। কিন্তু সেখানে তাঁর এ চেষ্টা সফল হয় নি তার দ্বিবিধ প্রমাণ আছে। এগুলির দীর্ঘ অলংকার অনেক সময়ই ইঙ্গিত করে যে কবির মনের কথার সঙ্গে বলার ভঙ্গীর মিল নেই। পরে কবি চিহ্ন-মেলানো গদ্যকাব্য আর লেখেন নি, ফলে তাঁর শেষ কাব্য-গ্রন্থগুলিতে একটি নতুন ঐতিহ্যের সন্ধান মিলল যার মধ্যে একালের হাওয়া অত্যন্ত সুন্দর ভাবেই প্রকাশিত, অথচ তার মধ্যে ব্যঙ্গ্যের চেয়ে বাচ্যই প্রধান, কুশীলবদের পরিবর্তে কবিই স্বয়ং

উপস্থিত। কিন্তু নৃত্যনাট্যগুলিতে ঠিক এর বিপরীত ঐতিহ্যের সন্ধান মেলে। সেখানে নাটকীয়তারই প্রাধান্য স্থাপিত হল। তার সহায়তার জন্য কবিতাই উপসর্জনীকৃত স্বার্থ। যে পঙক্তি ভাঙার কৌশল বলাকায় প্রথম ব্যবহৃত সেই কৌশলটি এখানে আরও বিস্তৃত। সেইসঙ্গে ভাবের পুরোৎপীড় না থাকায় এবং নানা স্তর নানা রস এবং নানা ভঙ্গীর ঘন সম্মিলন ঘটায় কাব্যরস নাট্যরসের বিরোধিতা করার বদলে নাট্যরসের সহায়তা করে, নাট্যরসকে উদ্বুদ্ধ করে। এইটি রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের আর-একটি বৈশিষ্ট্য। এর রসবোধ অখণ্ড। অর্থাৎ, সুরের রস, নাচের রস এবং কবিতার রস পাশাপাশি চলে না, ওগুলির জড়িয়ে-যাওয়া অবস্থা, কে কার সহায়ক বলা কঠিন। এ রকম পরিপূর্ণ সংহতির মধ্যে ওগুলিকে মেলানো রবীন্দ্রপ্রতিভার বিস্ময়কর সৃষ্টি।

শুধু যে কবিতার দিক হতেই ঐ কথাগুলি বলা চলে তা নয়। রবীন্দ্রসংগীত সুরে যে বিচিত্রতা এনেছে এই নৃত্যনাট্যগুলিতে তারও প্রকাশ মেলে। আর নৃত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ না হয়েও বলা চলে, এর মধ্যে যেমন এক দিকে শুধু কৌশল দেখাবার উগ্র চেষ্টা নেই অন্য দিকে তেমনি শুধু বাঁধনকে অস্বীকার করার চেষ্টাও নেই। এই সম্মিলনের ফলে যে নতুন ঐতিহ্য স্থাপিত হল একালের পটভূমিকায় সেটি একটি গভীরতর সার্থকতা বহন করে।

৩

কিছুকাল হতে দেখা যাচ্ছে, কাব্যনাট্যের প্রচলন ক্রমবর্ধমান। ইংরেজী সাহিত্যেও এমন নাটক রচিত হচ্ছে যার মধ্যে নাট্যরূপ ফোটাবার জন্য উপসর্জনীকৃত স্বার্থ কবিতারই শরণাপন্ন হয়েছে। সে হিসেবে এগুলি প্রচলিত নাট্যাদর্শের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল বিদ্রোহ। কিন্তু এই কথাটিই যথেষ্ট নয়। কি কারণ ঘটল যে কবিতা-নাটকেই এ যুগের কথা প্রকাশ পেল, কবিতা ও নাটকের এই সংমিশ্রণের ফলে কি নতুন সমস্যার সমাধান হল ? টি. এস. এলিয়টের ধারণা—

The most useful poetry, socially, would be one which could cut across all the present stratifications of public taste— stratifications which are perhaps a sign of social disintegration. The ideal medium for poetry, to my mind, and the most direct means of social 'usefulness' of poetry, is the theatre. In a play of Shakespeare you get several levels of significance. For the simplest auditors there is the plot, for the more thoughtful the character and conflict of character, for the more literary the words and phrasing, for the more musically sensitive the rhythm, and for auditors of greater sensitiveness and understanding a meaning which reveals itself gradually. And I do not believe that the classification of audience is so clear-cut as this ; but rather that the sensitiveness of every auditor is acted upon by all these elements at once, though in different degrees of consciousness.

যুগে যুগে দেখা গেছে সাহিত্য ও সমাজের পারস্পরিক সংযোগের ফলে বিভিন্ন হাওয়ায় বিভিন্ন সুর বাজে। যে যুগের সামাজিক পরিবেশের ফলে কবি বেশি আত্মমুখীন সে যুগে তিনি

এমন আঙ্গিক খোঁজেন যার মধ্যে ব্যক্তিক দিকটাই বেশি, এমন-কি এমন শব্দও খোঁজেন যার মধ্যে বস্তু অপ্রধান। যেমন, রোমান্টিক যুগে কবিদের সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের মিল ছিল না। সুতরাং তাঁদের পলায়নী বৃত্তি এ দিক দিয়ে বোঝা সহজ। আরও লক্ষ্য করা যায়, সাহিত্যের বিভিন্ন রূপায়ণের মধ্যে কাব্যের উপরই প্রধান ঝোঁক পড়ল, কেননা কাব্যে বস্তুর বন্ধন অপেক্ষাকৃত কম। আবার সেই কাব্যের মধ্যেই অধিকাংশই স্বকীয় অভিজ্ঞতা স্বকীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বর্ণনা, 'আমি'-ময় কাব্যের প্রাধান্য। সেই 'আমি'-ময় কাব্যের সাহায্য করল ছন্দের ঝংকার, অর্থাৎ সুর, যার মধ্যে বস্তুর ভার সবচেয়ে কম। সে কারণে, রোমান্টিক কাব্য রোমান্টিক বলেই এই চিহ্নগুলি থাকবে এ কথা যথেষ্ট নয়। এর পিছনের মানস সংঘাত পর্যন্ত না পৌঁছলে এর আসল স্বরূপ বোঝা যাবে না। তেমনই, একালে ছন্দোবদ্ধ নাটক প্রসার লাভ করছে এটি আকস্মিক নয়। এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে বর্তমান কালে রুচিবোধ বহুবিভক্ত। দেখা যাচ্ছে, শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে আমরা যেমন অগ্রসর হয়ে চলেছি তেমনি তার আস্বাদ ক্রমশই বহুজনলভ্য থাকছে না। এক দিকে যেমন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে নতুন নতুন উদ্ভাবন চলেছে সেগুলির রসগ্রহণের জন্য তেমনি অন্য দিকে বিশেষ জ্ঞান ও বিশেষ শিক্ষার দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই বিশেষ জ্ঞান ও বিশেষ শিক্ষার সুযোগ ক্রমশঃ মুষ্টিমেয় বিদগ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হতে চলেছে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে ব্যবধান ক্রমবর্ধমান। কোনো সমালোচকের ভাষায় একালের সভ্যতার প্রধানতম লক্ষণ mass education কিন্তু minority culture। ফলে আমাদের মধ্যে স্তরবিভাগ বেড়ে উঠেছে, অনুভূতিসামান্যের অভাবে সকল স্তরে সংস্কৃতির একটি সাধারণ মাত্রা বজায় নেই। সহজ বুদ্ধি এবং সহজ সংস্কার নিয়ে সাহিত্যের রস সম্পূর্ণ গ্রহণ করা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায়, শুধু সমষ্টি ও ব্যষ্টি, বস্তু ও ব্যক্তির সুষ্ঠুতম সমন্বয় নয়, নানা লোকের মনে যে অভিজ্ঞতাপার্থক্য, রুচিবিভেদ ও স্তরবৈষম্য আছে তার শ্রেষ্ঠ সমাধান এই কাব্যনাট্যে। পশ্চিমী কাব্যনাট্যে বহু সময় দেখা যায় এই সমন্বয় হয় নি, ফলে ছন্দ ফাঁপানো, সহজ কথা সহজে বলা চলে না। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও পশ্চিমে নতুন প্রতিভার উদয় হচ্ছে, কিন্তু এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি অদ্ভুত সৃষ্টি। আর রবীন্দ্রনাথ এগুলিতে উত্তরোত্তর উন্নতি করেছেন। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা তবু দীর্ঘ— তার মধ্যে কিছু ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ আছে। অর্জুনের প্রথম-দর্শনে চিত্রাঙ্গদার উচ্ছ্বাস, আত্ম-উদ্দীপনার গান, নূতন-রূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদার উক্তি— এগুলি পরবর্তী নৃত্যনাট্যগুলিতে নেই। নূতন কান্তির উত্তেজনায় নৃত্য চণ্ডালিকা বা শ্যামায় সম্ভব নয়, সেখানে সুর আরও গভীর আরও ঋজু। শ্যামা এদিক হতে আরও সংহত আরও তীব্র, কিন্তু তবু তার মধ্যেও একটি দুর্বলতা আছে। নাট্যের সঙ্গে সুর নৃত্য ও কাব্যের এই রকম সংমিশ্রণের ফলে এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে এর মধ্যে 'রিয়ালিস্টিক' নাট্যকলা অপরিহার্য নয়— এর ভঙ্গীটা স্বতন্ত্র। এ ক্ষেত্রে তরবারি-হস্তে উত্তীয়ের ঘাতকের নৃত্য এবং উত্তীয়কে হত্যা আমাদের পীড়া দেয়। এখানে এ রস সমগ্র নাটকটির সঙ্গে মেলে নি।

মনের কথা এখানে বস্তুর দ্বারাই সম্পূর্ণ ধ্বনিত হয়, হৃদয়ের রহস্য এখানে সুরের ও নৃত্যের সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্টতই ব্যক্ত, সেখানে বস্তুর আবরণ নেই। কিন্তু তবুও 'রিয়ালিস্টিক' পদ্ধতি অনুসারে এখানে হত্যা দেখাতেই হবে— তাতে রসবোধ সম্ভবতঃ ব্যাহত। চণ্ডালিকায় এ রকম কোনো স্খলনের সন্ধান নেই। ফলে যেটি সৃষ্টি হল তা নাটকীয় কবিতা নয়, কবিতায় নাটকও নয়— এ একটি সম্পূর্ণ নতুন জিনিস। রুচিবৈষম্য ও স্তরবিভেদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কবিতায় নাটকে গানে নানান বাঁধন ভাঙার চেষ্টা করছি, নানা উদ্ভাবনের চেষ্টা করছি — কিন্তু এগুলিকে নতুন করে ভেঙে নতুন ঐতিহ্যে মিলিত করা রবীন্দ্রনাথেরই কীর্তি। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার অনুকরণ হয়েছে, অন্যান্য রচনার অনুকরণ হয়েছে, কিন্তু এগুলির অনুকরণ হয় নি। আসলে এর অনুকরণ সম্ভব নয়, কেননা যেটি রবীন্দ্রপ্রতিভায় সম্ভব হয়েছিল, আমাদের সে তুঙ্গশিখরে পৌঁছতে আরও অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। সেই কারণে ভবিষ্যৎ সাহিত্যের স্বরূপ বুঝবার জন্য, ভবিষ্যতের দিকে এগোবার জন্য, এই নৃত্যনাট্য-গুলির গভীরতর সার্থকতা বোঝার প্রয়োজন ঘটেছে। তাতে হয়তো আমরা অন্য ধরণের সমন্বয়ে উপস্থিত হতে পারি, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও, অন্বয়মুখে বা ব্যতিরেকমুখে, এগুলির দিক্ নির্দেশ অবিস্মরণীয়।

কবির সংস্পর্শে

শ্রীসাহানা দেবী

আমি তখন ছোট। বয়সটা ঠিক মনে নেই। তবে মনে ছাপ পড়বার বয়স হয়েছে। মনে আছে, রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি একদিন আমার মামার (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের) বাড়িতে। তাঁর আসবার কথা ছিল বিকেলে, কিছু পড়বেন শুনেছিলাম। গাড়ি তাঁকে আনতে গিয়েছিল। আমরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমাদের বাড়ির গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম গাড়ি ঢুকলেই দেখতে পাব তাই। প্রথম দেখার সে কি আগ্রহ এবং কৌতূহল তখন মনে। তিনি যে একজন অসামান্য কেউ, তা সেই বয়সেই বুঝে নিয়েছিলাম। সকলেই দেখতাম গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতেন। কাজেই আমাদেরও তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা ক্রমে বেড়েই চলেছিল। ভাবছিলাম দূর থেকে প্রথমে তাঁকে কি ভাবে দেখা যাবে, শেষে গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখাই স্থির করলাম। বেশ স্পষ্ট মনে আছে গেট দিয়ে গাড়িটা ঢুকল, রবীন্দ্রনাথকে দেখা যাচ্ছে বসে আছেন। গাড়িটা ছিল পাল্‌কি গাড়ি, আর ঘোড়া ছিল পাট্‌কিলে রঙের তেজী একটা ঘোড়া— সওয়ারী গাড়িতে উঠবার জন্যে গাড়ির পা-দানে পা রাখতে না রাখতেই সে সবেগে ছুটতে আরম্ভ করে দিত ঘাড় বেঁকিয়ে। মামাবাবু, মা, মাসিমা (অমলা দাশ নামে তিনি তখন সুপরিচিতা) ওঁরা গিয়ে কবিকে নামিয়ে নিয়ে এলেন। শুনেছি কবি একবার মাসিমাকে বলেছিলেন, 'অমলা, তোমাদের এই ঘোড়ার গাড়িটিতে চড়তে পারা একটা ব্যাপার। ভালো করে চড়বার আগেই ঘোড়া ছুটতে শুরু করে দেয়। সে এক মহাতটস্থ অবস্থায় উঠে পড়ার পালা সারতে হয় দেখলুম।' তিনি উপরে এলে তাঁকে সামনাসামনি দেখবার সুযোগ পেলাম— কি সুন্দর চেহারা, কোথায় যেন যিশুখৃস্টের আদল আসে— গৌরবর্ণ, লম্বা, দোহারা চোখ নাক মুখ সব যেন দেখবার মত। দেখলে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কালো চুল সিঁথি দিয়ে ভাগ করা, কপালের দু পাশে একটু করে ঘোরানো। দাড়ি গোঁফ সবই কালো। দাড়ি অনেকটা ফ্রেঞ্চকাট্। কালো ফিতে বাঁধা স্প্রিঙের টেপা চশমা নাকে, ফিতেটি গলায় ঝোলানো। একে ওই সুন্দর চেহারা, তার উপর সাদা ধুতিপাঞ্জাবির সঙ্গে কালো ফিতেয় বাঁধা চশমাজোড়াটি, মনে আছে, এমন সুন্দর মানিয়েছিল। সেই আমার রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখা— জীবনের একটি অবিস্মরণীয় দিন। আমার শিশুমনের উপর প্রথম রেখাপাত। পরে তিনি আরও কতবারই এসেছেন। বেশির ভাগ দেখতাম উনি কিছু পড়তেন। ওঁর পড়া এত ভালো ছিল যে মা, মামাবাবু, মাসিমারা সকলে পরম আগ্রহে মুগ্ধ হয়ে বসে শুনতেন। একবার 'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু' এই গানটি সবে লিখে নিয়ে এসেছিলেন পড়ে শোনাবার জন্যে। কত পড়াই তখন

থেকে তাঁর শুনে এসেছি— শুধু মামার বাড়িতেই নয়, কত জায়গায়, কত অনুষ্ঠানে, কত ঘরোয়া বৈঠকে শুনেছি ওঁর পড়া। নাটোরের রাজবাড়িতেও প্রায়ই হত এই বৈঠক। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ ছিলেন কাব্য-সাহিত্য-সংগীতসুরসিক, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা। আমাদের অতুলদাও (অতুলপ্রসাদ সেন) সেখানে উপস্থিত থাকতেন। আসর সে সময়ে খুব জমত। সেখানেই প্রথম শুনেছিলাম 'দেবতার গ্রাস'। ছোট ছিলাম— পরে বুঝেছিলাম তার আসল অর্থ। কবির মুখে 'দেবতার গ্রাস' যে একবার শুনেছে সেই জানে সে কি অভিজ্ঞতা! কতবার যে শুনেছি তবু কোনো কালেই তা পুরানো হত না। কানে বাজে—

শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা।
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা।

মন প্রাণ সব যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেত তাঁর সেই মর্মস্পর্শী আবৃত্তির সুরে—

'মাসি' বলি ফুকারিয়া মিলালো বালক···

মনে আছে ছোটবেলায় 'সোনার তরী' যখন পড়তেন মুগ্ধ হয়ে বসে থাকতাম যদিও তার মানে তখন কিছুই বুঝতে পারতাম না। পড়ার মধ্যে এমন একটা কিছু থাকত যা আমাদের মনকে আটকে রেখে দিত, নড়তে দিত না, তার মানে না বুঝলেও।

আমার মামার বাড়িতে প্রায়ই ওঁকে 'গান্ধারীর আবেদন' পড়তে হত, ওটি আমার মামার বিশেষ প্রিয় ছিল। অনেকক্ষণ ধরে চলত কবির কিছু-না-কিছু পড়ে শোনানো। তাঁর সঙ্গে মামাবাবুর শুধু কাব্যসাহিত্য এসব আলোচনাই চলত না, নানান বিষয়েই আলোচনা হত— দেশের অবস্থা, তার নানা সমস্যার কথা সবই থাকত। মাসিমাকে দেখতাম খুব উৎসাহিত হয়ে উঠতে যখন কবি গানবাজনা বা অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বিশেষভাবে বলতেন। ঘরোয়া কথাবার্তাও তাঁর সঙ্গে কবির বিস্তর হত। ছোট ছিলাম, সব বুঝতাম না, তবু কাছে বসে থাকতে ইচ্ছে করত, ভালো লাগত তাঁর সান্নিধ্য তাঁর সঙ্গ।

ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে আমাদের পরিবারের সকলের কবে থেকে যে ঘনিষ্ঠতার শুরু তা আমার জানা নেই। মায়ের মুখে শুনেছি 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি' গানটি তাঁর বিবাহোপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজে গেয়েছিলেন। তখন কবির গলা এত জোর ছিল, শুনেছি বড় প্যাণ্ডেলের শেষ পর্যন্ত তাঁর গলা পৌঁছত অনায়াসে। আমরা যখন তাঁর গান শুনেছি তখন গলার জোর অনেক কমে এসেছে। আস্তেই বেশির ভাগ গাইতেন, ঠিক গলা ছেড়ে গান গাইতে বিশেষ বড় একটা শুনি নি।

ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল আমার মাসিমার। কবি তাঁকে নিজের মেয়ের মতনই স্নেহ করতেন। মাসিমা রবীন্দ্রনাথকে 'রবিকাকা' বলে ডাকতেন। আর তাঁর ছেলেমেয়েরা মাসিমাকে ডাকত 'অমলাদিদি' ব'লে। কবি প্রায়ই তাঁকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে

নিয়ে গিয়ে রাখতেন। শিলাইদহে কবি যখন সপরিবারে বাস করতেন তখন মাসিমাও ওঁদের সঙ্গে প্রায়ই থাকতেন। সুবিখ্যাত গায়ক রাধিকা গোস্বামীকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গানও শিখিয়েছিলেন। মাসিমার গান শুনতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তখনকার দিনে মাসিমার সুকণ্ঠের খুব নাম ছিল। তাঁর গলা চড়ত তারা সপ্তকের ধৈবত পর্যন্ত। আর তানের দানা ছিল পরিষ্কার। তাই কবি তাঁর কণ্ঠের জন্যে হিন্দী টপ্পার গান ভেঙে বাংলায় কথা বসিয়ে দিতেন। তার মধ্যে এই দুটি গান মাসিমার মুখে শুনতাম— 'কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে' আর 'এ পরবাসে রবে কে হায়'। পরে নহবত থেকে তোলা মাসিমার কণ্ঠে ভীমপলশ্রী রাগের একটি সুর শুনে কবি তাইতে কথা বসিয়ে দেন, এই গানটি হচ্ছে 'দিন ফুরাল হে সংসারী', যে গান মাসিমা ছাড়া আর কেউ জানত না। পরে অবশ্য গানটি আমি মাসিমার কাছে শিখি। কবিপত্নীর সঙ্গেই ছিল মাসিমার সবচেয়ে বেশি ভাব। তাঁকে 'কাকীমা' ব'লে ডাকতেন। এই দুই সখীর একত্র বসে অন্তরঙ্গ ভাবে গল্পালাপাদির একটি চিত্র আছে রবীন্দ্রনাথের গানে, গানটি হচ্ছে—

ওলো সই, ওলো সই,
আমার ইচ্ছে করে তোদের মতো মনের কথা কই।
ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি
কোণে ব'সে কানাকানি
কভু হেসে কভু কেঁদে চেয়ে বসে রই।

এ গানটির কথা মাসিমার মুখেই শুনেছি আর গানটিও তাঁকে অনেকবার গাইতে শুনেছি। তিনিই আমাকে প্রথম রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'রবিকাকা, আমাদের এই মেয়েটির গান শুনবে?' মনে আছে মাসিমার কাছে শেখা এই গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলাম—

ঘুরে ফিরে এমনি করে ছড়িয়ে দে রে ফাগের রাশি
লালে লাল হব রে ভাই রাঙা হবে মোহনবাঁশি।

এটা যে কার রচিত গান তা আজও জানি না। পরে রবীন্দ্রনাথ যখনই আমার মামার বাড়িতে আসতেন, মাসিমার কাছে খোঁজ নিতেন— 'কোথায় অমলা, তোমাদের সেই মেয়েটি কোথায়, কি খবর তার?' মাসিমা আমাকে এনে হাজির করতেন। তিনি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে মধুর হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন একবার, 'তুমি কার কাছে গান শেখ?' আমি বলেছিলাম, 'আমার মাসিমার কাছে।' মনে আছে উনি পর পর জিজ্ঞেস করে চলতেন— এ গানটা জানো, সে গানটা জানো— আমি তার মধ্যে যে যে গান জানতাম তখনই গেয়ে শোনাতাম, আর না জানলে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিতাম যে জানি না। আমি গান গাইতে এত ভালোবাসতাম যে আমাদের বাড়িতে কেউ এলে আমি তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম কখন তারা আমায় গান গাইতে বলবে। বললে তখনই বিনা আপত্তিতে শুরু করতাম গাইতে। রবীন্দ্রনাথের কাছেও এ রকম অনেকবার করেছি। উনি আসবেন আগে থেকে জানতে পারলে নিজেই গিয়ে

হাজির হতাম ওঁর কাছে আর নীরব আগ্রহে তাকিয়ে থাকতাম একবার ওঁর গাইতে বলার অপেক্ষায়। তিনি কিন্তু খুব উপভোগ করতেন আমার গাইবার এহেন শখ ও উৎসাহ দেখে।

২

রবীন্দ্রনাথের কথা লিখতে গেলে আমার গানের কথাও তার মধ্যে এসে যায়। তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধই গান নিয়ে। তিনি ভালোবাসতেন আমার গান শুনতে আর আমিও কি যে গভীর তৃপ্তি পেতাম তাঁকে গান শুনিয়ে। তাঁকে গান শুনিয়ে যে তৃপ্তি পেয়েছি এমন আর কোথাও পেয়েছি বলে মনে করতে পারি না। ছোট থেকেই আমি একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম ওঁকে গান শোনাবার। বড় আনন্দ হত। ওঁর কাছে গেলে কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনার চেয়ে গানই হ'ত বেশি। আমার গানকে তিনি যে-চোখে দেখেছিলেন ও গ্রহণ করেছিলেন, সে যে আমার কত বড় গৌরব! তিনিই তার মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন তাকে স্নেহ দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে আদর দিয়ে দরদ দিয়ে, আর এমন জায়গায় স্থান দিয়ে! আজ এ কথা লিখবার মধ্যে তাই আত্মপ্রচারের অহংকার থাকলেও কৃতজ্ঞতার প্রণতিও রয়েছে। যা কারও কাছে পাই নি তা-ই তাঁর কাছে পেয়েছিলাম এ কথা আমি ভুলতে পারি না।

আমার যখন আন্দাজ বারো বছর বয়েস তখন রবীন্দ্রনাথ আমার মাকে লিখে নিজে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠিয়ে দেন আমাকে গান শেখাবার জন্যে। তিনি হচ্ছেন বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গায়কবংশের বংশধর শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই। তাঁর কাছে আমি স্বরলিপি করতে এবং স্বরলিপি দেখে গাইতে শিখি।

আমার তখন বছর পনেরো বয়স হবে, আমি প্রথম গান করি রবীন্দ্রনাথদের জোড়াসাঁকোর পুরানো বাড়িতে মাঘোৎসবের উৎসবসভায়। সেদিন ওঁদের বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা এই উৎসব উপলক্ষ্যে খুব ভিড় হত। বাড়ির ভিতরদিককার মস্তবড় উঠোনটি এই অনুষ্ঠানের জন্যে খুব সুন্দর করে সাজানো হত। সেবারে উঠোনের শেষে একদিকে হয়েছিল উপাসনার বেদী রচনা, তারই ঠিক উল্টোদিকের শেষে বিরাট দরদালান, সেখানে মেয়েদের বসবার জায়গা বেদীর দিকে মুখ ক'রে। ছেলেরা সব বসেছিলেন উঠোনটি জুড়ে। সেই বেদীর উপর দেখেছিলাম মাঝখানে রবীন্দ্রনাথকে বসে আচার্যের বেশে শুভ্র গরদের ধুতিচাদর পরিধানে— ঠিক যেন প্রাচীন ঋষির মত লাগছিল। তাঁর দুপাশে দুজন বসেছিলেন ঐরকম শুভ্র বস্ত্র পরিধানে, যতদূর মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্তোত্র মন্ত্র ইত্যাদি বলছিলেন। ভারি সুন্দর শোনাচ্ছিল। এই সংস্কৃত স্তোত্রমন্ত্রপাঠ শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সেই প্রথম শুনি অমন জিনিস। বৈদিক যুগের ঋষিদের মন্ত্রপাঠ সম্বন্ধে বই পড়ে আমাদের যে ধারণা হয়, এ যেন সেই রকম, এমন শুভ্র সুন্দর। সকলের সম্মিলিত বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত স্তোত্রপাঠ এমন একটা ধ্বনিগাম্ভীর্যের সৃষ্টি করেছিল! সেই বেদীর একপাশে দিনুদা বসেছিলেন শান্তিনিকেতনের

ছাত্রদের নিয়ে। এই ছাত্ররাই দিনুদার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নূতন-রচিত অনেক গান কোরাসে গেয়ে আমাদের মাতিয়ে দিয়েছিল। এখনও মনে পড়ে 'নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে,' 'অসীম ধন তো আছে,' 'আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে,' 'তোমারি নাম বলব,' 'নয় এ মধুর খেলা' এই সব গানগুলির কথা— ছেলেদের কণ্ঠে যে কি ফুটেছিল! আমি গান করেছিলাম মেয়েরা যেদিকে বসেছিলেন তাদের মাঝখানে, উঠোনে নামবার সিঁড়িতে জায়গা করা হয়েছিল। সেইখানে বিবিমাসিমা (ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী) টেবিল হারমোনিয়ম বাজিয়েছিলেন আর আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দুটো গান করি— 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে,' আর— 'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে।'

১৯১১ সালেই মনে হচ্ছে, আমি প্রথম যাই শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে। আমরা অনেকে ছিলাম। আমার বড় এক বোন ছিলেন আমার সঙ্গে। সার্ নীলরতনের বড় দুই মেয়ে, ভাগ্নী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মেয়েরা, আমার পিসতুতো দুই বোন, তার মধ্যে একজন হচ্ছেন সুকুমার রায়ের স্ত্রী সুপ্রভা দেবী, তখনও তাঁর বিয়ে হয় নি— এই সব আমরা দল ক'রে গিয়েছিলাম। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল নিচু বাংলায়— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি, তিনি সে সময়ে সেখানে ছিলেন না। ওখানেই আমাদের খাবার দিয়ে যেত শান্তিনিকেতনের ছেলেরা। তখন শান্তিনিকেতনে শুধু ছাত্রদের থাকবার ব্যবস্থাই ছিল ; ছাত্রীদের সমাগম তখনও হয় নি। বোলপুর স্টেশন থেকে গোরুর গাড়িতে তখন যেতে হত আশ্রমে, আর নইলে হেঁটে, এ ছাড়া অন্য কোনো যানবাহনের বন্দোবস্ত ছিল না। খুব ভোরে বেশ অন্ধকার থাকতে ট্রেন এসে দাঁড়াল বোলপুর স্টেশনে। লণ্ঠনের আলোতে সব জিনিসপত্র দেখে শুনে নিয়ে সকলে গিয়ে উঠলাম গোরুর গাড়িতে। মাঠের পর মাঠ, আর কিছুই বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। মনে আছে, তখন মনে হয়েছিল—স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতন কি দূর!—যাই হোক অন্ধকার থাকতে থাকতেই নিচু বাংলায় এসে গাড়ি থামল, আমাদের কয়েকজন মেয়েকে ওখানেই নামিয়ে দিয়ে গেল। বেশ আলো হবার পর অনেকে আমরা বের হলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। পথেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমরা সকলে প্রণাম করতেই সকলকেই আলাদা করে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন আমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না বা কিছু দরকার আছে কি না। পরে বললেন, 'আজ রাত্রে আমাদের "রাজা" অভিনয় আছে জান তো?' জানতাম, তাই সকলেই বললাম, 'হ্যাঁ, জানি।' চলতে চলতেই ওঁর সঙ্গে অল্প দু-চারটে কথা হল। ওঁর মুখেই শোনা গেল বিকেলে মাঠে ছেলেদের খেলা আছে। মনে হল উনি যেন একটু ব্যস্ত, অতিথি-অভ্যাগতদের সব ব্যবস্থার জন্যে। তখনকার শান্তিনিকেতন তো এখানকার মত সুবৃহৎ ব্যাপার ছিল না। কয়েকখানা কুটির দূরে দূরে, দু-চারটে পাকা বাড়ি হয়তো। বেশির ভাগই খোড়ো চালের ঘর— ছাত্রাবাস, গুরুপল্লীর বাড়িগুলি সবই খোড়ো চালের ছিল। তখন স্থানাভাব যথেষ্ট থাকায় এই সব উৎসবাদির সময়ে অতিথিসৎকারের আয়োজনের ব্যাপারে নানা বিষয়ে

অনেক কিছুই ওঁকেই ভাবতে ও করতে হত। বিকেলের দিকে গেলাম খেলা দেখতে। আমরা যাচ্ছি, দেখি কবিও যাচ্ছেন ওই দিকেই। কবি উপস্থিত হলে খেলা আরম্ভ হল। সকলেই কবিকে প্রণাম করে খেলায় নামল। নানারকম খেলা দেখা গেল— দৌড় ঝাঁপ ফুটবল ইত্যাদি অনেক কিছু। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে তৈরি হচ্ছি অভিনয় দেখতে যাবার জন্যে। সকলেরই আমাদের বিশেষ আগ্রহ অভিনয় দেখার। রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের কথা এত শুনেছি। এখানেও দেখলাম সেই খড়ের চালের ঘর। স্টেজ ইত্যাদি সেরকম কিছুই নেই। দৃশ্য বা 'সিন' কিছুই দেখলাম না। উঁচুমতন একটু জায়গা সেইখানেই হল অভিনয়, শুধু নটরাজের মূর্তি আঁকা একটা 'ড্রপসিন' ঝুলছে দেখলাম। আর আমরা সেই ঘরের মাটিতে বসে দেখলাম অভিনয়। রবীন্দ্রনাথ করলেন 'রাজা'র পার্ট। দৃশ্যতঃ তাঁকে দেখা গেল না। অলক্ষ্যে রইলেন বটে কিন্তু রাজাকে চিনে নিতে আমাদের দেরি হল না। আমার এক মামা শ্রীসুধীরঞ্জন দাস— পরে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও এখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য— সেজেছিলেন 'সুদর্শনা'। ভালো করেছিলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী হয়েছিলেন 'সুরঙ্গমা'। তাঁর 'বিরহ মধুর হল আজি' গানটি মনে পড়ে। দিনুদা হয়েছিলেন 'ঠাকুরদা'। মনে আছে, কালিঝুলিমাখা কতগুলো কাপড়ের টুকরো পোশাকের সঙ্গে এখানে ওখানে ঝুলিয়ে দিনুদার গাইতে গাইতে প্রবেশ—

তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই—

সে যে কী ভালোই লেগেছিল, এমন নতুন ধরণের আর অদ্ভুত মনে হয়েছিল। রাত্রে ভরামনে বাড়ি ফিরে এলাম। পরের দিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি ছিলেন তখন 'দেহলি'তে। ছোট পাকা বাড়ি। উপরে বোধকরি একখানাই ঘর। সেইখানেই উনি থাকতেন। রাশীকৃত বইএর স্তূপের মধ্যে লেখার সরঞ্জাম নিয়ে তিনি বসেছেন লিখতে। লেখায় ব্যস্ত বলে আমরা তাঁর বিশেষ সময় নিলাম না। ঘরে ঢুকে তাঁকে প্রণাম করে চলে আসছিলাম। তিনি ডেকে আমাদের সকলের সঙ্গেই হেসে কথা বললেন। হাস্যপরিহাসও ওইটুকু সময়ের মধ্যে যতটুকু করা সম্ভব তা করতে ছাড়লেন না।

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেই আমার ডাক পড়ত জোড়াসাঁকোয় ওঁদের বাড়িতে। যেবার দিনুদা ওঁর সঙ্গে আসতেন সেবার বেশির ভাগ দিনুদাই গান শেখাতেন, যদিও কবি সেখানে উপস্থিত থাকতেন। কখনও তিনিও সঙ্গে সঙ্গে গাইতেন। দিনুদা না এলে উনি নিজেই শেখাতেন। একবার খুব মজার একটা ব্যাপার হয়েছিল। দিনুদা কলকাতা এসেই টেলিফোনে ডেকে বললেন, 'ঝুনু, চলে এস, অনেক নতুন গান আছে।' আমি তো ছট্‌ফট্ করছি যাবার জন্যে। এদিকে মুশকিল, গাড়িও কিছুতেই জোগাড় করে ওঠা গেল না। ভবানীপুর থেকে জোড়াসাঁকো তো কম দূরের পথ নয়— আমি আছি মামার বাড়ি রসা রোডে, আর ওঁরা জোড়াসাঁকোয়। গাড়ি নেই। তর সইছে না। তখন আমার মামার আপিসঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই টেলিফোন যোগে চোদ্দটা

গান শিখে নেওয়া গেল ! দিনুদা জোড়াসাঁকো থেকে টেলিফোনে গাইছেন আর আমি ভবানীপুর রসা রোডে টেলিফোন ধরে গান শিখছি— সে ভারি মজা ! কবি তো শুনে অবাক ! এই কথা যে কত লোককে উনি পরে বলেছিলেন— 'এমন গানপাগলা আমি আর কোনো মেয়েকে দেখলুম না।' আমাকেও একবার বলেছিলেন, 'তোমাকেই দেখলুম যে সংসার থেকেও গান তোমার কাছে এত প্রিয়। মেয়েদের মধ্যে এটা কমই দেখা যায়। তারা সংসার করতে বড্ড ভালোবাসে।'

গাড়ি থাকলে গাড়ি প্রায়ই এসে হাজির হত যেখানে যেখানে কবি উঠতেন সেখান থেকে। একদিন রানী মহলানবিশদের আলিপুরের বাড়ি থেকে হঠাৎ মোটর এসে হাজির— যেতে হবে। আমি তখন থাকি বিডন স্ট্রীটে, রানীরা আলিপুরে— দিলাম পাড়ি। তবে মোটরে দূরত্বের কষ্ট নেই, চট করে পৌঁছে গেলাম। আমি যে এত শীগগির গিয়ে পৌঁছব কবি তা ভাবেন নি। গিয়ে প্রণাম করতেই অবাক হয়ে সহাস্যে বললেন, 'আরে, তুমি এসে গেছ ? এই তো এখনই আমি রানীকে বলছিলুম তোমায় আনিয়ে নিতে পারলে হত। এরই মধ্যে এত শীগগির গাড়ি গিয়ে আবার তোমায় নিয়েও এল ? রানী তো দেখছি বেশ করিতকর্মা মেয়ে।' বলে রানীর দিকে একবার তাকাতেই সে বললে, 'ঝুনু আজ এখানেই খাবে ও সারাদিন থাকবে। সন্ধ্যেবেলা ওকে বাড়ি পৌঁছে দিলেই হবে।' উনি হেসে মজা করে বললেন, 'ঝুনু তোমার এই ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে তো ?' রানী বললে, 'ঝুনুর মতামত আবার কে শুনছে ? ওর বাড়িতে ফোন করে দিয়েছি, সন্ধ্যায় ফিরবে।' কবি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'কি, পারলে না বুঝি ওর সঙ্গে ?' আমি বললাম, 'পারবার চেষ্টাও করি নি, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেয় আত্মসমর্পণ করেছি।' গলা নামিয়ে একটু যেন চাপা সুরে আর মুখে হাসিহাসি ভাব নিয়ে বললেন, 'ব্যাপারখানা কি বলো তো ? গান শিখবার অনেক সময় পাওয়া যাবে ?' বললাম, 'সেই জন্যেই তো।' উনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'তাই বলো, এইবারে বোঝা গেল তোমার মতলবখানা।' বলে হাসতে লাগলেন। রানী টপ করে বললে, 'আর আমার মতলবখানার মধ্যে দেখলেন তো, স্বার্থের লেশমাত্র নেই ?' আমাকে কবি বললেন, 'তা হলে আর সময় নষ্ট করা কেন, চলো, গান নিয়ে বসা যাক, অনেক গান আছে।' গিয়ে বসলাম। ওঁরও গান শেখানোয় ক্লান্তি নেই আর আমারও নেই শ্রান্তি গান শেখায়। এইবার এই গানগুলি শিখেছিলাম— 'অলকে কুসুম না দিয়ো,' 'না না গো না', 'জয়যাত্রায় যাও গো', 'না ব'লে যায় পাছে সে।' পরে খাবার সময় হতে উঠে পড়া গেল। খাওয়াদাওয়ার পরে কবি চলে গেলেন ওঁর ঘরে বিশ্রাম করতে। বিকেলে চা-পর্বের পরে রবীন্দ্রনাথ আবার আমাকে নিয়ে বসলেন গান শেখাতে। সবেমাত্র 'গান আমার যায় ভেসে যায়' গানটি শিখেছি আর অনেক লোক এলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে। বাধ্য হয়েই ওঁকে গান ফেলে উঠতে হল। যাবার সময় বললেন, 'দেখছ তো, আমাদের কত অনিচ্ছার সঙ্গে পদে পদে যুঝতে হয় !' আমি বললাম, 'আমি কেন কিছুতেই যা ইচ্ছে হয় না, তা করতে পারি না ?' উনি বললেন, 'পার না নয়, করতে চাও না তাই। তার কারণ তুমি দেখতে চাও না তোমার

অনিচ্ছাটা কেন আসে, কোথা থেকে আসে, বা তার কারণ কি।' মনে আছে কথাগুলো তখন মনে খুব দাগ কেটেছিল।

৩

এই সময়ে তাঁর গানের বিরুদ্ধে সমালোচনায় কেউ কেউ তাঁকে আঘাত করেন তাঁর সংগীতে সুরের দীনতা দেখিয়ে। আঘাত তিনি নীরবেই গ্রহণ করতেন, ফিরে আঘাত দিতে তাঁকে দেখি নি। তাঁর অসাধারণ মার্জিত রুচিতে তা বাধত। সে সময়ে একদিন আমাকে বলেছিলেন— গলার সে স্বরটি আজো যেন শুনতে পাই— 'পদ্ম ফুল আর জুঁই ফুলের তুলনা চলে না। ছুটো সম্পুর্ণ ছুই জিনিস। পদ্ম ফুল বড়, জুঁই ফুল ছোট। এই বড় পদ্ম ফুলের সৌন্দর্য বা তার সব গুণের অধিকারী না হলেও ছোট জুঁই ফুল তার আপন সুগন্ধ বুকে নিয়ে আপনার সুকুমার সৌন্দর্যে আপনি বিকশিত। আমার গানকে আমি মনে করি এই ছোট জুঁই ফুল। কোনো ফুলকেই, সে পদ্ম ফুলই হোক আর জুঁই ফুলই হোক, টেনে তুলে ছিঁড়ে বা বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে তার বিকশিত রূপের যথার্থ সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না। সেই সৌন্দর্য ধরা পড়ে চোখের অন্য দৃষ্টি নিয়ে, চেতনার অন্য এক স্পর্শে। অঙ্গচ্ছেদ ক'রে তার আঙ্গিক তত্ত্বের কথা জানা যেতে পারে হয়তো, কিন্তু মেলে না তার সত্তাকে, মেলে না তার স্বরূপবিকাশের পূর্ণতর পরিচয়। পাওয়া যেতে পারে স্থূলকে, পাওয়া যায় না সূক্ষ্মকে ; দেখা যায় বাহিরকে, দেখা যায় না ভিতরকে। তাই বাহিরের সৌন্দর্য ধরা পড়লেও ধরা পড়ে না কিসে তাকে সুন্দর করে তুলছে, তাকে রূপ দিচ্ছে, ফুটিয়ে তুলছে, ধরে আছে ভিতর থেকে। এই জিনিসটির স্পর্শ না পেলে আসল জিনিসটির কাছে পৌঁছনো যায় না, পরিচয় পাওয়া হয় না আসলের। যাচাই করার অভিরুচি নিয়ে অনুসন্ধান করলে জানা যায় না সত্যকে, সম্ভব হয় না তার মূল্য জানা।' এই সময়ে মনে আছে তিনি ওই গানটি লেখেন— 'গান আমার যায় ভেসে যায়।'

একবার কোনো এক বিখ্যাত ওস্তাদের গান শুনে এসে আমাকে লিখেছিলেন—

আশ্চর্য তার সাধনা, কণ্ঠে মাধুর্য আছে, যেমন তেমন ক'রে সুর খেলাতে এবং সুরে মোচড় দিতে তার অসাধারণ নৈপুণ্য। একে ভালো বলতে বাধ্য কিন্তু ভালো লাগতে নয়। সংগীত যখন রূপঘনিষ্ঠ প্রাণবান দেহ নয় তখন তার অঙ্গসীমাকে মানাই চাই। তখন তাকে যত খুশি টেনে বাড়ানো, ছেঁটে কমানো, তাকে আছড়ানো মোচড়ানো কলাতত্ত্ববিরোধী। পুরুভুজজাতীয় আদিম জীব অবয়বহীন, ইংরেজীতে যাকে বলে amorphous, তাকে দুখানা করলেও যা সাতখানা করলেও তা। পূর্ণ অভিব্যক্ত জীবে এই অত্যাচার খাটে না। তার স্বভাবসীমাকে কিছুদূর অতিক্রম করা চলে, কিন্তু বেশিদূর নয়। এইজন্যে —র গানকে কান তারিফ করলেও মন স্বীকার করছিল না। যারা ওস্তাদি নেশাগ্রস্ত তাদের এই কলাতত্ত্বের সহজ কথা বুঝিয়ে দেওয়া শক্ত। কেননা নেশার সীমা নেই, ভোজের আছে। 'ঢাল ঢাল্ সুরা আরো আরো ঢাল্' এটাকে মাৎলামি ব'লে হাসতে পারি, কিন্তু দই ক্ষীর সন্দেশের বেলা যথাস্থানে থামার দ্বারাই তাকে সম্মান দেওয়া হয়, না থামলেই সেটা

বীভৎস হয়ে ওঠে। —যে জাতীয় গান গায় শারীরিক ক্লান্তি ছাড়া তার থামবার এমন কোনোই সুবিহিত প্রেরণা নেই যা তার অন্তর্নিহিত। তাতে —কে অপরাধী করি নে এইজাতীয় সংগীতকেই করি। —র গাহনাতে কেবল যে সাধনার পরিচয় আছে তা নয়, বিধিদত্ত ক্ষমতারও পরিচয় আছে যা অধিকাংশ ওস্তাদের নেই। কিন্তু ততঃ কিম্, এই শক্তি ভুলবাহন নিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। নন্দনবনে যে অপ্সরার যোগ্য স্থান ছিল সুন্দরবনে তার মান বাঁচানো সহজ হয় না।

৪

আমি তখন কাশীতে থাকি। কোন্ সাল মনে নেই— আমি ১৯১৭ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত কাশীতে ছিলাম, এরই মধ্যে কোনো সময়ে হবে, শুনলাম কবি এসেছেন কাশীতে। আছেন কাশীর মহারাজার অতিথি হয়ে ক্যান্টন্‌মেন্টে তাঁরই 'নন্দেশ্বর প্যালেসে'। অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী মহাশয় আমায় কবির আসবার খবরটি জানিয়ে যান। তখন ক্যান্টন্‌মেন্টের দিকে ক্যাপ্টেন জ্যোতিলাল সেন সপরিবারে ছিলেন। জ্যোতিলাল বাবুর স্ত্রী শ্রীবেলা সেন ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমরা সকলে মিলে কবির সঙ্গে রাত্রে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখি ফণীবাবু ও তাঁর মেয়েরাও সেখানে রয়েছেন। কবিকে প্রণাম করতেই তিনি আমায় বললেন, 'কেমন আছ ঝুনু, শরীর খুব খারাপ শুনেছিলাম?' বললাম, 'হ্যাঁ, খুব অসুখ গেল, এখন ভালোই আছি।' বললেন, 'আমি আসবার আগে তোমাকে খবর দিতে পারি নি। তবে জানতাম তুমি খবর পেয়ে যাবেই।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ফণীবাবু আমায় আপনার আসবার খবর দিয়ে এসেছিলেন, তখন থেকেই আপনার কাছে কখন আসব তাই ভাবছিলাম।' বললেন ছেলেমানুষের মত, 'কি সুন্দর বাড়ি দেখেছ? তার পর, গানটান কর আজকাল? না, সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছ?' বললাম, 'গানের তৃষা আমার কোনোকালেই যাবার নয়। আমার মা বলতেন, ওর গান যাবে যেদিন ওর প্রাণ যাবে দেহ ছেড়ে।' কবি বললেন, 'যাক, শুনে খুশি হলুম যে তোমার গান শেখার মন আছে। এক তোমাকেই দেখলুম বিয়ে করেও গান ছাড় নি। তোমাদের মেয়েদের হয় বিয়ে নয় গান, দুটোর মাঝামাঝি কিছু নেই।' শুনে সকলেই হাসলাম ওঁর বলার ধরণে। আবার বললেন, 'কাশী তোমার কেমন লাগছে? সঙ্গীসাথী জুটেছে কি?' বললাম, 'মন্দ নয়। তবে মন এখনো বসে নি। থেকে থেকেই কলকাতা যেতে ইচ্ছে করে।' অমনি বলে উঠলেন— চোখের সে ভাবই অন্য— 'গানের লোভে? এক কাজ করো ঝুনু, তুমি চলে এসো আমাদের শান্তিনিকেতনে তোমার স্বামীকে নিয়ে। তিনি সেখানে ডাক্তারি করবেন আর তুমি আমাদের তোমার গানে ভরে দেবে।' অসহায়ের হাসি হেসে চুপ করে রইলাম।

মনে পড়ে যাচ্ছে পরে আমার জীবনে একটা মস্ত সংকটের দিনে তাঁর পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখেছিলাম আর তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তার কথা। সে চিঠির খানিকটা এইখানে উদ্ধৃত ক'রে দেবার বাসনা সংবরণ করতে পারলাম না—

কল্যাণীয়াসু

ঝুনু, তোমার চিঠিখানি পড়ে মন ব্যথিত হয়েছে। তোমার বেদনা যে কত কঠিন আর তোমার অবস্থা যে কত শোচনীয় তা বেশ বুঝতে পারচি। এই সময়ে দেশে যদি থাকতুম তাহলে আমার দ্বারা তোমার এই সংকটের প্রতিকার যা-কিছু সম্ভব তা আমি চেষ্টা করতুম।...

ইতিমধ্যে বিশেষভাবে শান্ত হয়ে থেকো। লোকনিন্দাকে অবজ্ঞা করবার উত্তেজনায় তাকে অনাবশ্যক কারণে প্রবল ক'রে তুলো না।

তোমাকে আমাদের ঘরের মেয়ের মতই অন্তরের সঙ্গে স্নেহ ক'রে থাকি নিশ্চয়ই তা তুমি জানো। তোমার অমলা মাসি কতকাল আমার ঘরেই তো মানুষ হয়েচেন। যদি কোনোদিন তোমার তেমন প্রয়োজনই ঘটে তাহলে আমার কাছে আসতে লেশমাত্র সংকোচ বোধ কোরো না। এও তুমি জানো গানের ক্ষুধা আমার মনে কত প্রবল— যদি আমারই ঘরের পাশে তুমি কোনোদিন বাসা বেঁধে থাকো তাহলে আমার দিনগুলি তোমার কণ্ঠস্বরে মধুর হয়ে উঠবে— আর আমার পথহারা গানগুলিও দিনের পর দিন তোমার মধ্যে আশ্রয় পেতে পারবে। সুতরাং মনে রেখো তুমি আমার কাছে থাকলে তুমি আমার কাজে থাকবে— তাতে তোমার ঋণ বাড়বে না। যদিও অকৃত্রিম স্নেহের সম্বন্ধে আত্মসম্মানের ক্ষুণ্ণতা ঘটে না তবু এ ক্ষেত্রে শুধু আমার স্নেহের যোগে না, তোমার নিজের স্বাভাবিক শক্তির গুণেও আমার উপর তোমার জোর দাবী চলতে পারবে।...

মনের সঙ্গে কামনা করচি সমস্ত জঞ্জাল যেন কেটে যায়। সমাজে নিজের স্থান সংকীর্ণ হয়ে উঠলে নানাদিক থেকে নানা দুঃখ ও অসুবিধা ঘটে তার থেকে তুমি রক্ষা পাও সর্বান্তঃকরণে এই আমি ইচ্ছা করি। তোমার সরল চিত্তের মধ্যে সুখী হবার স্বাভাবিক শক্তি আছে তারি জোরে সাংসারিক সকল আঘাতের উপরে তুমি জয়ী হতে পারবে তাতে আমার সন্দেহ নেই। দেশে ফিরে গিয়ে ভালো ক'রে সকল কথার আলোচনা করা যাবে।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাশীতে মহারাজার বাড়িতে বসে সে সময়ে এই গানগুলি কবির কাছে শিখেছিলাম— 'জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে', 'গানের ভিতর দিয়ে যখন', 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়', 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই'। পরদিন তিনি এলেন ফণীবাবুর বাড়ি, সেখানে গিয়েছিলাম, ফণীবাবুর বাড়ি ছিল আমার বাড়ির খুব কাছেই। হেঁটেই যাওয়া-আসা করা চলত। তাঁর তৃতীয়া কন্যা রানু (এখন লেডি রানু মুখার্জি) ছিল কবির খুবই ভক্ত। কবি তাকে খুব স্নেহ করতেন। খুব মজা করতেন তাকে নিয়ে। ছোট্ট মেয়ে ছিল রানু। কবিকে 'ভানুদা' বলে ডাকত। যেতেই কবি বললেন, 'এস ঝুনু, তোমার জন্যে অনেক গান তৈরি করে রেখেছি।' মনটা খুব খুশী হয়ে গেল। গিয়ে বসলাম পায়ের কাছে। শেখালেন একের পর এক— 'সুর ভুলে যে ঘুরে বেড়াই', 'কেন রে এই দুয়ারটুকু', 'আকাশ জুড়ে শুনিনু', 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান', 'কবে তুমি আসবে বলে', আর 'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়' এই গানগুলি।

তার পরের দিনও কবি ফণীবাবুর বাড়ি এসে আমায় ডেকে পাঠান। গেলাম উৎফুল্ল হয়ে। কাছে যেতে বললেন, 'পরীক্ষা দাও ঝুনু, কি গান শিখলে।' হেসে বললাম, 'বেশ, শুনুন।' বলে গাইলাম সব গানগুলি, অর্থাৎ এগারোটি গান দুদিনে যা শিখেছিলাম। শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'Full marks!' মনে পড়ে ওঁর খুশিতে উদ্ভাসিত হাসিভরা সেই মুখচোখের ভাব, সেই তাকাবার ভঙ্গী। আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ঝুনু, তোমায় গান শিখিয়ে বাস্তবিক আনন্দ আছে। আহা, তোমায় যদি সে রকম কাছে পেতুম তো কত গান যে শেখাতুম মনের সাধে!' ওঁর অতখানি প্রশংসা পেয়ে আমিও যেন নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। বার বার ঘুরে ফিরেই কবি ওই কথা প্রকাশ করতেন। আমার বড় সংকোচ হত। কতবার বলেছেন, 'তুমি জান না তোমার মুখে আমার গানে আমি কি শুনি। আমি ভুলতে পারি না তোমার গান।' শুনে বিব্রত বোধ করতাম, যদিও আনন্দের তরঙ্গ উঠত ভিতরে, কৃতজ্ঞ অন্তরে প্রণাম করে মনে মনে বলতাম— আমিও ভুলতে পারি না আমার গানকে তুমি কত ভালোবাসা দিয়ে কোথায় তুলে নিয়েছ।

এইখানে ওঁর একখানা চিঠি তুলে দিচ্ছি যদিও অনেক পরের লেখা, আমি পণ্ডিচেরী আসবার দশ বছর পরে পেয়েছিলাম চিঠিখানা।

কল্যাণীয়াসু

তোমার ছবিসমেত তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। ছবির আদিম দেহরূপিণীকে পেলে আরো খুশি হতুম। বোধ হয় ঘটে উঠবে না, কারণ মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেচে, তার উপরে দেখতে দেখতে ভাঙন ধরেছে দেহে। সম্প্রতি ভাগ্যদেবী আমার চোখের মাথা খাবার ভয় দেখাচ্চে। চিঠিপত্র পড়ায় পরের দৃষ্টি ব্যবহার করতে হচ্চে। দৃষ্টিক্ষীণতা সবচেয়ে বড় কারাদণ্ড। নালিশ করে লাভ নেই। আপিলের আদালত বন্ধ।...

হাসির গান পূর্বেই শুনেছি। ওর গলা মৃদু কিন্তু মধুর। ভয় হয় পাছে ওর নিজের গলার স্বাভাবিক দরদ কোনো শিক্ষিত ভঙ্গীর দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। যাদের গলায় সুরের বিধিদত্ত বিশেষত্ব আছে তাদের পক্ষে এটা লোকসান।

সেদিন —র গান অনেকগুলি ও অনেকক্ষণ ধরে শুনেছি। কণ্ঠে ওর শিক্ষা আছে, জোর আছে, মাধুর্য আছে, আমার মনে হয় তার সঙ্গে একটা কিছু আছে যেটা সহজ নয়। প্রতিভার সৃষ্টিতে যে স্বত-উৎসারিত অনায়াসে লীলা থাকে তার উপরে বাহিরের হস্তক্ষেপ দেখলে দুঃখ বোধ করি।

'হে ক্ষণিকের অতিথি' মণ্টু সেদিন গেয়েছিল— সুরের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটায় নি। তার মধ্যে ও যে ধাক্কা লাগিয়েছিল সেটাতে গানের ভাবের চেয়ে ভঙ্গী প্রবল হয়ে উঠেছিল। দেখলুম শ্রোতাদের ভালো লাগল। গানের প্রকাশ সম্বন্ধে গায়কের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অগত্যা মানতেই হবে— অর্থাৎ গানের দ্বারা গায়ক নিজের অনুমোদিত একটা বিশেষ ভাবের ব্যাখ্যা করে— সে ব্যাখ্যা রচয়িতার অন্তরের সঙ্গে না মিলতেও পারে— গায়ক তো গ্রামোফোন নয়। তুমি যখন আমার গান করো শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে— সে গানে যতখানি আমি আছি ততখানি ঝুনুও আছে— এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে সেটার জন্যে রচয়িতার

সাগ্রহ প্রতীক্ষা আছে। আমি যদি সেকালের সম্রাট হতুম তাহলে তোমাকে বন্দিনী করে আনতুম লড়াই করে কেননা তোমার কণ্ঠের জন্যে আমার গানের একান্ত প্রয়োজন আছে।

মণ্টুকে আমি স্নেহ করি, তার প্রাণশক্তি ও মননশক্তিকে তারিফ করি— তাকে কাছে পেয়ে খুশি হয়েছি। ইতি। ৪।৮।৩৮

স্নেহাসক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

তখন কাশীর বাস উঠিয়ে সবে কলকাতা এসেছি ১৯২৩এর গোড়ায়। 'বসন্ত'-উৎসবে গাইবার জন্যে ডাক পড়ল। এই উৎসবে আমি ও চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত দুজনেই কয়েকটা করে 'সোলো' গান করি। চিত্রলেখা গেয়েছিলেন 'আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে', 'ও চাঁদ তোমায় দোলা দেবে' আর 'না যেয়ো না যেয়ো না গো।' আমাকে দিয়েছিলেন 'ও আমার চাঁদের আলো', 'যদি তারে নাই চিনি গো', 'শুকনো পাতা কে যে ছড়ায়', 'খেলার সাথী বিদায়দ্বার খোলো' আর 'যাওয়া-আসারই এ কি খেলা।' শেষের এই গান দুটির বিষয় একটু বলবার আছে। আমার মুখে নানাকাজওয়ালা হিন্দী গান শুনতে কবি খুব ভালোবাসতেন। আমিও প্রায়ই ওঁর কাছে গেলে এটা ওটা যা জানতাম গাইতাম। অমনিতর দুটি হিন্দী গান সে সময় একদিন আমি গাই কবির কাছে বসে। শুনেই কবি বললেন, 'রোসো রোসো, আমি কথা বসিয়ে দিচ্ছি।' আমি গাইতে লাগলাম আর উনি তখনই-তখনই কথা বসাতে লাগলেন। কি তাড়াতাড়ি যে শেষ করলেন কথা বসানো! আর বললেন, 'এ দুটি গানও তাহলে তোমাকে 'বসন্ত'-উৎসবে গাইতে হবে, কেমন রাজি তো?' আমিও খুশি হয়েই সম্মত হলাম। হিন্দী গান দুটি হচ্ছে 'মহারাজা কেওয়ারিয়া খোলো' (এটি আমি অতুলদার কাছে শিখি) আর 'প্রেম ডগরিয়া মে ন করো।' 'মহারাজা কেওয়ারিয়া' ভেঙে করলেন 'খেলার সাথী' আর 'প্রেম ডগরিয়া' ভেঙে করলেন 'যাওয়া-আসারই এ কি খেলা।' দুঃখের বিষয় আমি শেষের গানটির অন্তরা এখন আর কিছুতেই মনে আনতে পারছি না, অথচ আস্থায়ীর দুটি লাইন পরিষ্কার মনে আছে। 'বসন্ত'-উৎসবে দ্বিতীয় রাত্রে দেখা গেল চিত্রলেখা আসতে পারেন নি। কবি আমাকে দিয়ে তার গানগুলিও গাওয়ালেন। বললেন, 'ভাগ্যে ঝুনু, তুমি সব গানগুলিই শিখেছিলে!'

'বসন্ত'-উৎসবে ঠিক অভিনয়ের কিছু ছিল না। মুখ্যতঃ ছিল গান আর কবির পাঠ। গান বেশির ভাগই ছিল কোরাস গান দিনুদার নেতৃত্বে। তা ছাড়া আমাদের কয়েকটা 'সোলো' গান ছিল। কবি বসেছিলেন স্টেজের একদিকে— একটু উঁচুতে ওঁর জন্যে খুব সুন্দর করে আসন সাজানো হয়েছিল। দিনুদা বসেছিলেন তাঁর কোরাসের দলবল নিয়ে স্টেজের মাঝখানে

মেজেতে। সব গানের সঙ্গেই দিনুদা এসরাজ বাজিয়েছিলেন। আমাদের সোলো গানের সঙ্গেও। দিনুদার এসরাজটি ছিল একটা বিরাট জিনিস। এই বিরাট এসরাজটি দিনুদার বিরাট দেহের উপর টেনে নিয়ে কাঁধে যন্ত্রটিকে হেলিয়ে দিয়ে যখন বসতেন বাজাতে তখন তা হত দেখবার মত! দেখে কবি একদিন হেসে বলেছিলেন, 'দিনু, ওটা তোরই হাতে মানিয়েছে ভালো!' দিনুদা ও আমরা সবাই হেসে উঠেছিলাম। সত্যি এতবড় এসরাজ আমি জন্মেও আর দেখি নি। আমার আর চিত্রলেখার বসবার জন্যেও একটু উঁচু জায়গা ছিল, দিনুদার গানের দলের ঠিক পিছনেই। আমরা দুজনে পাশাপাশি বসে যার যখন যে গানের সময় হচ্ছিল গাইছিলাম। আমাকে মাঝখানে স্টেজ থেকে একবার বেরিয়ে এসে আবার 'বসন্ত'র সঙ্গে প্রবেশ করতে হয়েছিল 'তোমার বাস কোথা যে পথিক' গানটির সঙ্গে। 'বসন্ত'র হয়ে গানও আমাকে করতে হয়েছিল, 'খেলার সাথী' গানটি 'বসন্ত'রই গান। কোরাস গান সব শান্তিনিকেতনের ছাত্রীরা করেছিল দিনুদার সঙ্গে। অনেকের সম্মিলিত গান দিনুদার নেতৃত্বে যা শুনেছি অমন ভালো কোরাস গান আর কখনো শুনি নি। দিনুদা একাই ছিলেন এক শ। কি গলা! যেন গভীর অতল থেকে গম্ভীর ধ্বনি উঠত। রবীন্দ্রনাথের গান দিনুদার কণ্ঠে যেন মূর্ত হয়ে উঠত। অমন রবীন্দ্রসংগীত আমি আর শুনি নি। রবীন্দ্রসংগীত বলতে কি বোঝায় তা দিনুদার মুখে একবার শুনলেই কারও বুঝতে বাকি থাকত না। আমরা— যারা এই সংগীতের পরিবেশে মানুষ, যাদের সংগীতপিপাসাই পুষ্ট হয়েছে রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে মাতৃদুগ্ধে সন্তান যেমন পুষ্ট হয়-- অভ্যস্ত ছিলাম সেই রকম রবীন্দ্রসংগীতে।

৬

এখনকার রবীন্দ্রসংগীত শুনে তাই আমাদের মন ভরে না। মনে হয় তাতে কি যেন পাই না, কি যেন হয় না, কি যেন নেই, কি যেন হারিয়ে গেছে কোথায়। রবীন্দ্রসংগীতের এখনকার পরিণতি দেখে দুঃখ বোধ করি এইজন্যে যে যা উনি দিয়ে গিয়েছিলেন তা আর নেই, বদলে গেছে অনেকটা। সেই ভালোর দিকে না মন্দর দিকে তা আমার আলোচনার বিষয় নয়। আমি শুধু বলতে চাইছি, যে গান উনি দিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের, আমরা তাকে রক্ষা করতে পারি নি, পারি নি রাখতে তার অবিমিশ্র বিশুদ্ধতা। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ তো কম চেষ্টা করেন নি, এখনও কত চেষ্টা করছেন তাকে ধরে রাখবার, স্বস্থানে রাখবার স্বরলিপি ক'রে, নিয়মকানুনের আটঘাট বেঁধে, প্রতি পদে সাবধানতার আগল দিয়ে নিরাপদ করতে, এবং তাকে নিরাপদে রাখতে। তবু থাকছে না যে, এইটে দেখা যাচ্ছে। তার কারণ কি? এক হতে পারে হয়তো এই যে, সংগীত সম্বন্ধে এ যুগের গায়কদের পছন্দ যাচ্ছে বদলে, কাজেই তার ধারাও যাচ্ছে পাল্টে। হাল আমলের যে নূতন সংগীতধারা 'আধুনিক সংগীত' বলে গড়ে উঠছে, তার যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায় হাল আমলের নূতন গায়কসম্প্রদায়ের অনেকের মধ্যে। জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক তারা যে সেদিকে চলেছে এটা বললে বোধ হয় নিতান্ত

ভুল বলা হবে না। এখনকার রবীন্দ্রসংগীতেও এরই ছোঁয়াচ হয়তো বা লেগে থাকবে, এবং এও সম্ভব হতে পারে যে এরই প্রভাবে এখনকার রবীন্দ্রসংগীতধারা তার মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই হয়তো তার গতি আজ এ পরিণতির দিকে চলেছে, আর তার মধ্যে এসেছে এ পরিবর্তন। রবীন্দ্রসংগীতের মূল ধারা কি তা এক কথায় বলা কঠিন। তবু বলা চলে, তাঁর কথা সুর ও ভাব এমন ভাবে পরস্পর আশ্রিত, এমন নিবিড় ভাবে এক হয়ে মিশে থাকে যে কোনোটাই কোনোটাকে ছাপিয়ে ওঠে না বা একটা থেকে আর-একটা প্রবল বা প্রধান হয়ে ওঠে না। রবীন্দ্রসংগীত মূর্ত হয়ে ওঠে তখনই যখন সেই সংগীতসত্তার মধ্যে কথা সুর ও ভাব সব এক হয়ে লীন হয়ে গিয়ে গায়কের গানে প্রকাশিত হয় আর গায়ক নিজেও হয়ে যান তার সঙ্গে এক। 'এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে,' যে স্পর্শ ফুটে ওঠে, তাই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রচিত গান, রবীন্দ্রসংগীত বলে যা আমরা জানি।— শুধু রবীন্দ্রসংগীতেই নয়, সব সংগীতেরই আছে একটি বিশিষ্ট ধারা। গায়ককে তার অনুসরণ করে চলতে হয়, তবেই সে পায় তাকে, দিতে পারে তার যথার্থ পরিচয়। কোনো বড় সৃষ্টি হতে পারে না যদি-না আর্টিস্ট তার আর্টের অতীত যা তার সঙ্গে এক হয়ে তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিতে পারে— এ নইলে পূর্ণতর রূপ বা পরিচয় দেওয়া অথবা পাওয়া কোনোটাই সম্ভব নয়। সব আর্টের ক্ষেত্রেই এই হল গোড়াকার কথা।

এখন যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত করেন তাঁরা সকলেই বেশ সুকণ্ঠ, সুকণ্ঠী। তাঁদের গলা আমাদের দিনের চেয়ে অনেক বেশি তৈরি, আর ক্ষমতাও যথেষ্ট। তবু তাঁদের অনেকের মুখে সব সময় রবীন্দ্র-সংগীত তেমন ফোটে না, আসল রূপটি পাওয়া যায় না। যাঁরা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বা দিনেন্দ্রনাথের কাছে শিখেছেন তাঁদের কথা আমি বলছি না। যাঁদের কথা বলছি তাঁরা হয়তো সাধারণতঃ স্বরলিপি দেখে, বা কারও কাছে শুনে শেখেন, অথবা এমন কারও কাছে শেখেন রবীন্দ্রসংগীতের আসল জিনিসটির পরিচয় যাঁর ঠিক জানা নেই। অথচ সুর হয়তো ঠিকই থাকে। সেজন্যে ঠিক সুরে গাইলেই যে তা সব সময় রবীন্দ্রসংগীত হয়, তা নয়। এও দেখা গেছে কারও কণ্ঠে মূল সুর থেকে সুরের হয়তো এক-আধটুকু ব্যতিক্রম হয়েছে, কিন্তু তবু তা রবীন্দ্রসংগীত ঠিকই হয়েছে।

আমরা যদিও সুর সম্বন্ধে একটু বেশি কড়াকড়ি করে থাকি, রবীন্দ্রনাথ নিজে তা করতেন বলে। কিন্তু সুরই সব নয়, তার বেশি আরও কিছু আছে। সুরের যে এত তারতম্য আজকাল ঘটেছে তার জন্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বোধ করি ছিলেন কতকটা দায়ী। কেননা তিনি অনেক সময়, সুর ভুলেই হোক বা সুর বদলাবার জন্যেই হোক দেখা গেছে একই গান সব সময়েই ঠিক একই সুরে সকলকে শেখান নি। অনেক সময় তার তারতম্য ঘটেছে, যদিও তা খুবই সামান্য হত। এত গান তিনি রচনা করেছেন যে, সব হুবহু মনে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেইজন্যে তাঁর গানের কোন্ সুরটা ঠিক এ নিয়ে তর্ক চিরকালই থেকে যাবে। তার পর ক্রমে এর গলা থেকে ওর গলায় একটু একটু করে বদলাতে বদলাতে আজ সুরের দিক দিয়ে আমাদের সঙ্গে এখনকার গানের অনেক অমিল দেখতে পাই। এখানে এসে অনেক রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী আমাকে

রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়েছেন। কোনো গানেই, আমরা যা জানি তা পাই নি। এতটা পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ কখনোই করতে পারেন না, কেননা তিনি নিজে তাঁর সুর সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। ভুল যা হয়ে যেত তা তাঁর অসতর্কতার জন্যে অন্ততঃ নয়, এটা বলা যায়। তিনি কাজে কর্মে সব-কিছুতেই অত্যন্ত সতর্ক মানুষ ছিলেন, অসতর্কতাবশতঃ কিছু করা তাঁর স্বভাবেই ছিল না। শুধু তাই নয়, যাদের তিনি গান শেখাতেন তাদের চেতনার মধ্যেও ঢুকিয়ে দিতেন ভুল সুর সম্বন্ধে সতর্কতা। তাই মনে হয় মানুষের মুখে মুখেও বেশ খানিকটা বদলে গিয়ে থাকবে। যাই হোক এটা ঠিক যে তাঁর গানে সুরের পরিবর্তন ঘটানো তিনি খুবই অপছন্দ করতেন। তাঁর একটি চিঠিতে তিনি শেষটা অগত্যা স্বীকার করেছিলেন গানে গায়কের স্বাধীনতার অধিকার, কিন্তু সেটা তিনি মেনে নিয়েছিলেন অগত্যা হিসেবেই, অন্তরের সঙ্গে নয়, অন্তরের অনুমোদন যে তাতে খুব ছিল তা নয়। যে-মূর্তি তাঁর নিজের গড়া তার উপর 'বাহিরের হস্তক্ষেপ' দেখলে তিনি বেদনা বোধ করতেন, এ আমি জানি। অনেক সময় আমরা তর্ক করি সুর নিয়ে, সুরের দিকটায় একটু বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি, ভাবি সুরটা ঠিক হলেই হল বুঝি। কিন্তু তা তো নয়। সুর হল তাঁর সংগীতের বাইরের রূপ কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়, মনে রাখতে হবে তা ধারণ করে আছে ভিতরের আসল পদার্থকে। সেজন্যে শুধু সুর ঠিক হলেই সব হল না, সেই আসল পদার্থ বা তার অন্তরের নির্যাস তাতে ধরা পড়ল কি না সেইটেই হল আসল কথা, বড় কথা। এইটিই সেই যাচাই করবার কষ্টিপাথর যার স্পর্শে ধরা পড়ে কোন্‌টা রবীন্দ্রসংগীত আর কোন্‌টা নয়।

অনেককে বলতে শুনেছি— সুর হুবহু তুলে, অবিকল সেই ঢঙে, সেইভাবে গাওয়া হল শুধু অনুকরণ। আমার মতে অনুকরণ হয় তখনই যখন গায়ক নিজেকে তার মধ্যে দিতে পারে না, তার সঙ্গে এক হয়ে তার ভিতরকে বাইরে এনে সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয় না। চলে শুধু যন্ত্রের মত প্রাণহীন। পায় না রস, পায় না প্রেরণা। মূল প্রেরণার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারা বা একীভূত করতে পারাটা একটা শিক্ষা, একটা সাধনা।

স্বরলিপি দেখে গান তোলার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তবে তাতে সুবিধা অসুবিধা দুই আছে। গায়কের মনে রাখতে হবে যে স্বরলিপি ষোল আনা দিতে পারে না। যতটুকু সে দিতে পারে ততটুকুকে যদি 'সব' বলে ধরে নেওয়া যায় তবেই মুশকিল। গায়ককে দিতে হয় অনেকখানি—স্বরলিপিতে যা পাওয়া যায় না তার সবটাই। তাতে তার দায়িত্ব আছে। যাঁর গান তোলা হয় সেই সংগীতস্রষ্টার নিজস্ব ধারা রীতিনীতি ভাবভঙ্গী সবের সঙ্গেই তার থাকা দরকার পূর্ণ পরিচয়, তবেই স্বরলিপি দেখে গান তোলা ঠিক হয়, সার্থক হয় এই প্রচেষ্টা— নইলে বাকি থেকে যায় অনেকটা, আর বাদ পড়ে যায় গানের অনেকখানি। স্বরলিপি অনেক-কিছু দিতে পারে কিন্তু দিতে পারে না গাহনার নির্দেশ, দিতে পারে না ভাবের, সুরের আলোছায়ার বা সূক্ষ্ম কিছুর স্পর্শ, দিতে পারে না প্রাণের স্পন্দন, আসল রূপের পরিচয়, আর দিতে পারে না সুরের অতীত সেই

সোনার কাঠির স্পর্শ যাতে গান হয়ে ওঠে গান আর যথার্থরূপে ফুটে ওঠে তার সত্তা। তবু স্বরলিপির প্রয়োজন আছে, খুবই মূল্য আছে এর, কেননা সুরকে সে ধরে রাখতে সক্ষম হয় অনাগত কালের জন্যে আর ভুলে-যাওয়া সুরকে সে ধরিয়ে দিতে পারে— এই হল তার প্রধান কাজ।— সংগীত এমনি জিনিস যার বিষয় কিছু বলতে চাইলে মনে হয় গেয়ে দেখাতে পারলে কাজ হত, শুধু বলে বোঝাতে গেলে ফল হয় না বিশেষ কিছু।

৭

একবার 'অরূপ রতন' কলকাতায় হয়— আমাকে সুরঙ্গমার গানগুলি কবি গাইয়েছিলেন— 'আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে', 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না', 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী', 'এখনো গেল না আঁধার', 'বাহিরে ভুল ভাঙবে যখন', 'ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর', 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে।' সেবারে 'সুদর্শনা' হয়েছিল রাণু (এখন লেডি রাণু মুখার্জি)। 'অরূপ রতনে'র কথা বিশেষ কিছু মনে নেই আমার, তার মধ্যে আমার জীবনে যা অবিস্মরণীয় তা এই যে এই 'অরূপ রতনে' রবীন্দ্রনাথ আমায় অভিনয় করতে শিখিয়েছিলেন। সামান্য অভিনয়ই আমার ছিল। বিশেষ করে মনে আছে, একটি মালা হাতে করে, হাতের কবজিটি সামান্য ঘুরিয়ে কেমন করে রাখতে হবে একটি থালায়, তা উনি কি সুন্দর করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। হাতটিকে ধরে ধরে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, বলেছিলেন, 'হাতটা এত শক্ত করে টেনে রাখো কেন, বেশ স্বচ্ছন্দে সহজভাবে ভালো করে বার করে মেলে দাও।' উনি হাতটিকে বার করতেন কি সুন্দর করে, না দেখলে বুঝতেই পারতাম না, তার পর সেই কবজি ঘুরিয়ে মালাটি রাখবার দৃশ্য— সে যে কি সুন্দর, দেখবার মত! এই একটা সামান্য ব্যাপারকে যে কত সুন্দর করে করা যায় তা প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম তাঁর কাছে এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে।

একবার বোলপুর গিয়েছিলাম বেড়াতে। সেবার রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুরুলে। রথীদা প্রতিমাদি সঙ্গে ছিলেন। আমরা একদল শান্তিনিকেতন থেকে পায়ে হেঁটেই চললাম গান গাইতে গাইতে সুরুলের রাঙামাটি-বিছানো পথে। বিশেষ করে 'গ্রামছাড়া এই রাঙামাটির পথ' গানটি সেই পথযাত্রায় কি যে আনন্দ দিয়েছিল! ফিরবার পথেও মনে আছে, তখন চাঁদের আলোয় ভরে গেছে চারিদিক, মাঠের মধ্যে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লাম কয়েকজন। আর গান ধরলাম, 'জাগে নাথ জ্যোৎস্নারাতে'— ভরা জ্যোৎস্নায় বেহাগের অন্তরস্পর্শী মধুর সুর খোলা মাঠে স্তব্ধ নির্জন রাতে যেন কি এক আবেশের সৃষ্টি করেছিল। তার পরেও গেয়েছিলাম— 'তোমারি মধুর রূপে।' চাঁদের আলোয় এমনি পর পর অনেক গান প্রাণ ভরে গেয়ে খুব আনন্দ করে বাড়ি ফিরলাম অনেক রাতে। শান্তিনিকেতনে গেলে একটা খুব মজা লাগত যে, কে আমরা কখন কোথায় যাচ্ছি তার কোনো হিসেবনিকেশ বা কৈফিয়ত কারও কাছে দিতে হত

না, এমন-কি নিজেদের দলের কাছেও না। যার যখন যেখানে ইচ্ছে চলে যাচ্ছি, বেশ একটা বেপরোয়া ভাব— স্বাধীনতার একটা অনাস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করা যেত।

সুরুলে সেদিন সারাদিন আমরা যেন আবেশের মধ্যে ছিলাম। খুব আনন্দে সকাল থেকে সন্ধ্যা কাটল। ওখানে পৌঁছেই পুকুরে গিয়ে স্নান করতে নামা গেল। স্নান সেরে দোতলায় এসে দেখি বসবার ঘরে কবি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'কি ঝুনু, তুমি নাকি পুকুরে গিয়ে নেমেছিলে? তোমার উৎসাহ তো দেখছি শুধু গানেই নয় সবেতেই সমান।' আমি বললাম, 'সাঁতার কাটতে যে ভীষণ ভালো লাগে, উঠতে ইচ্ছে করে না জল থেকে।' বললেন, 'সাঁতারও তোমার জানা আছে বুঝি? কোথায় শিখলে?' আমি বললাম, 'কেন, আমার মামার বাড়িতে মস্ত পুকুর আছে, আমরা পুকুরে নেমে খুব ঝাঁপাঝাঁপি করতাম। এখনও সুবিধে পেলেই করি।' কবি রঙ্গ করে বললেন, 'তুমি এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেছ।' আমি ওঁর দিকে তাকালাম। ওঁর কি মনে হল, তখনই আবার বললেন, 'কি, তোমার আপত্তি হচ্ছে কথাটায়? তাহলে তো আরও প্রমাণ হচ্ছে তুমি কত ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষেরাই এ কথায় আপত্তি করে, কেননা তারা কেবলই বড় হতে চায়— এইটেই তাদের সাইকলজি। তুমি লক্ষ্য করে দেখো, বয়স যাদের হয়েছে তাদের বয়স কম দেখায় বললে তারা কি রকম খুশি হয়!" বলেই তাঁর স্বভাবসুলভ দৃষ্টি আর ভঙ্গী নিয়ে তাকালেন। আমি বললাম, 'সেটা তো বোকামি।' শুনে উনি খুব হাসলেন বললেন, 'ছেলেমানুষি, কিন্তু বোকামি নয়, ভুল কোরো না। তার মধ্যে বেশ একটা সহজ সজীব সরসতা, একটা সারল্য আছে যার মধ্যে বুদ্ধির কোনো অভাব নেই।' ওঁকে দিয়ে আরও কথা বলানোর জন্যেই আমি উত্তরে বললাম, 'আপনিই তো লক্ষ্মীর পরীক্ষায় লিখেছেন—

ও জিনিস বেশি সরল হলে
নির্বুদ্ধি তো তারেই বলে।'

'তুমি আবার সেটি মনে করে রেখেছ? তুমি তো সাংঘাতিক মেয়ে দেখছি, আমারই কথা দিয়ে আমায় কোণঠাসা করবার চেষ্টা?' বলে কবি খুব হাসতে লাগলেন, আমরাও যোগ দিলাম। আবার আগের কথায় ফিরে এসে বললেন, 'বহু বুদ্ধিমান জ্ঞানীগুণীর মধ্যেও অনেক ছেলেমানুষি দেখা যায়, তাদের তো তুমি বোকা বলতে পার না, বরং তাকে তুমি তাদের খেয়াল বলতে পার।' যাই হোক কবি তো আমাদের গান শেখাতে আরম্ভ করলেন। ওখানে দিনুদাও বসেছিলেন। সার্ নীলরতন সরকার মহাশয়ের মেয়েরা কেউ কেউ ছিলেন আমাদের এই দলে। কবি গান গাইলেন, দিনুদাও গাইলেন, আমি আর অরুন্ধতী দেবীও (সার নীলরতনের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীঅরুন্ধতী দেবী, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী) করলাম। গাইতে গাইতে কোথাও সংশয় হলেই কবি দিনুদার দিকে চোখ তুলে একরকম করে তাকাচ্ছিলেন আর দিনুদা গেয়ে ওঁর সংশয় মিটিয়ে

দিচ্ছিলেন। সুরুলে এইখানে এই ঘরে বসে দিনুদার কাছে আমি 'কী রাগিণী বাজালে' আর 'আমার পরান লয়ে' এই দুটি গান শিখি। কবিও বসে শুনছিলেন। সার নীলরতনের বড় মেয়ে বেবুদি (শ্রীনলিনী দেবী, শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসুর পত্নী) কবিকে বললেন, 'ঝুনু খুব সুন্দর কীর্তন গায়।' তিনি বললেন, 'তাই নাকি, আমাকে শোনাবে তো?' আমি গাইলাম কীর্তন। শুনে বললেন, 'কোথায় শিখলে তুমি এ গান?' বললাম, 'পান্নাবাঈএর রেকর্ড থেকে। তাছাড়া আমার মামার ওখানে খুব কীর্তন হয়, অনেক শুনেছি এঁদের সকলের কীর্তন।' দেখলাম কীর্তন উনি ভালোবাসেন। বললেন, 'অবনদের বাড়িতে প্রায়ই হত পালাকীর্তন।' কীর্তন সম্বন্ধে আমি একদিন কথা তুলেছিলাম ওঁর মতামত একটু বিস্তারিত জানবার জন্যে। উনি বেশ সুন্দর করে বলছিলেন, 'কীর্তন জিনিসটা আমাদের বাংলাদেশের একেবারে নিজস্ব অমূল্য সম্পদ। এর মধ্যে ধার-করা কোথাও কিছু নেই। সবটাই তার সম্পূর্ণ নিজের সৃষ্টি। সুরধারা, ভাবধারা, তালের ধারা, গাইবার প্রণালী, পদ্ধতি, ভঙ্গী সব নতুন, তার গঠনও নতুন। কীর্তন গঠিত ভিন্ন উপাদানে যার মূল উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রেম ভক্তি ও তার রসমাধুর্যের লীলায়িত প্রকাশ। সেজন্যে কীর্তনকে বলা হয় আধ্যাত্মিক সংগীত। কীর্তন আবার অনেক রকমের আছে। নানা শ্রেণীর নানা শাখাপ্রশাখা। তাদের আবার নানা ধারা ও প্রতি ধারার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কীর্তন বেশ একটা বিরাট ব্যাপার, ছোটখাটো একটা কিছু নয়।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাদের হিন্দুস্থানী সংগীতের সমপর্যায়ে পড়ে? বিরাটত্বে?' বললেন, 'অমন করে কি বলা যায়? তবে কীর্তন ভাবলেই একটা বেশ বড়-কিছু মনের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাংগীতিক মূল্যে দেখা যায় এতে রয়েছে সুরের ঐশ্বর্য যত, তালেরও তত, আর ভাবৈশ্বর্যের তো কথাই নেই। সংগীতজগতে এর দান বড় কম নয়। এই যে কীর্তনের পালা এই পালা জিনিসটাই তো একটা নতুন জিনিস, এ রকম ড্রামাটিক সংগীত আমাদের দেশেও আগে ছিল না। কীর্তন সবাই গাইতে পারে না। এর জন্যে একটি বিশেষ ভাবের গলার প্রয়োজন।'

৮

১৯২৬ সালে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলাম এ সময়ে গিয়ে তাঁর কাছে যদি থাকতে পারতাম। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনে তিনি আমার থাকবার বন্দোবস্ত করে এই চিঠি লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়াসু,

ঝুনু, তোমার এখানে আসার বাধা নেই। আমার বাড়ির পাশেই যে বাংলা ঘর আছে তার চালের অবস্থা শোচনীয়। অর্থাৎ শীতের সময় কাজ চলে যাবে— কিন্তু ঝড়বৃষ্টির আবির্ভাব হলে ভিতরে বাইরে বিশেষ ভেদ থাকবে না। চালটা যে মেরামৎ করে দেব সে ভরটুকুও সইবে না— হয় মানুষে নয় দৈবে ওটা সরিয়ে দিলে তারপরে আগাগোড়া নতুন করে বানাতে হবে। আপাততঃ সে সম্ভাবনা নেই— চৈত্রমাসের পূর্বে আশা করি

তার প্রয়োজন নেই। সমস্ত আশ্রমে আর একটিও বাড়ি খালি নেই। যাই হোক এখন সময় ভালো— খোলা আকাশ বাতাস আর আলোর অভাব হবে না। একজন অনুচরী ও অনুচর সঙ্গে এনো— তোমার পথ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করবার জন্যে একটুখানি জায়গা পাওয়া যাবে। বৌমা, কমল, এঁরা তোমার যত্ন করতে ত্রুটি করবেন না। কখনো কখনো কাজে কর্মে আশ্রম থেকে আমাদের অন্তর্ধান করতে হয়— তোমার কেউ সঙ্গিনী থাকলে সেই রকম অরাজকতার সময় ক্ষতি হবে না। আশা করি শরীর বিশেষ খারাপ হয় নি। ইতি ২৬ পৌষ ১৩৩৩

শুভানুধ্যায়ী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সে সময় শান্তিনিকেতনে কবির পাশের বাড়িতে ছিলাম প্রায় তিন মাস। কোনোদিনও ভুলতে পারব না আমার জন্যে রবীন্দ্রনাথ তখন কি করেছিলেন। আমি অসুস্থ হয়ে যেভাবে ওঁর কাছে গিয়ে পড়ি আর উনিও যে কি ভাবে আমায় তুলে নিয়েছিলেন, স্থান দিয়েছিলেন অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও, সাড়া দিয়েছিলেন আমার ডাকে। আমার জন্যে ওঁকে কম মুশকিলে পড়তে হয় নি। সে সময় তাঁর কত যত্ন পেয়েছি, কত স্নেহ। তাঁর মধুর সুকোমল স্পর্শ তখন আমাকে নবজীবন দান করেছিল। বার বার ঘুরে ফিরে দিনের মধ্যে কতবার আমাকে দেখতে আসতেন। তাপ দেখতেন কপালে হাত দিয়ে। আর কিসে ভালো হয়ে উঠব তার জন্যে কতই-না ভাবতেন, কত উদ্বিগ্নই হতেন আমার জীবনের কথা ভেবে। হোমিওপ্যাথি ওষুধ এনে খাওয়াতেন। হোমিওপ্যাথিতে ওঁর খুব বিশ্বাস দেখেছি। প্রতিমাদি, কমল বোঠান (দিনুদার স্ত্রী) এঁরা সে সময় আমাকে ঘিরে রেখেছিলেন তাঁদের যত্নে আদরে। প্রতিমাদি তো রোজ আমার খাবার সময় নিজে উপস্থিত থেকে খাওয়াতেন। তাঁদেরই রান্নাবাড়িতে আমার পথ্য তৈরি করাতেন নিজে সব দেখে। এঁদের ঋণ কোনো জন্মেই শোধ দেবার নয়।

একদিন মনে আছে বসে ছিলাম খাটে, সন্ধ্যের একটু আগে হবে, কবি এলেন দেখতে, কপালে হাত দিয়ে বললেন, 'আজকে মনে হচ্ছে জ্বরটা নেই।' আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, কি বুঝলেন জানি না। আস্তে আস্তে পাশে এসে স্নেহভরে পিঠে হাতটি রাখলেন, দৃষ্টি তখন দূর দিগন্তের পানে— ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, 'শেষরাত্রির নিবিড় ঘন অন্ধকার থেকে আসে ভোরের আলো। যখন মনে হয় চারিদিকে যেন অকূল সমুদ্র, কূল কোথাও নেই, তখনই দেখা যায় কূল। আমরা যখন হাল ছেড়ে দিই তিনি তখন হাল তুলে নেন। যে অভিজ্ঞতা তোমার হল এ অভিজ্ঞতা জীবনে কমই আসে। বিশেষ ভাবে তোমাদের জীবনে সেটার সুযোগ কমই আসে। তোমাদের চারিদিকে এত বাঁধাবাঁধি যে, সে সুযোগ যদি কখনো আসেও তো ঝড়ের মত সব যেন ভেঙে দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়।' আমি বললাম 'আমারই তো তাই, দেখুন-না যেন সব ভেঙে, যেখানে যা ছিল খসিয়ে তবে ঠাণ্ডা হল। কিন্তু এর মধ্যে আমি যে নির্দেশ যে পথ পেয়েছি তারই আনন্দে ও তৃপ্তিতে আমি এখন চলেছি। যাত্রা আমার থামবে

কোথায় জানি না, জানতে ইচ্ছেও করে না। চলার আনন্দ পেয়েছি তাই চলছি। আমার জীবনে এ অভিজ্ঞতা যে হল, আমি যে এই সংকটময় পথের ভিতর দিয়ে অটল সংকল্প নিয়ে চলতে পারছি, এতেই আমার আনন্দ, এই আমার দুঃখের পুরস্কার। তাই সত্যিকারের দুঃখ আজ আমার কিছু নেই।' তিনি বললেন, 'এটাই তোমার মুক্তির আনন্দ। এতদিন তোমার ভয় ছিল, সুনামের আকাঙ্ক্ষা ছিল, চারিদিকের বন্ধন ছিল। ঝড় উঠবার আগেই মানুষকে একটা আতঙ্কে কাবু করে দেয়। কিন্তু যখন দুঃসময় আসে, দেখা যায় তখন তার ভিতর আত্মসমর্পণ করেই মুক্তির জন্যে মানুষ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখন ভয় আর তার থাকে না। মুক্তির আলোর মধ্যে নিজেকে মুক্ত দেখে আনন্দ বোধ করে। তোমারও আজ সেই আনন্দ। তুমি জানতে যে বন্ধন তোমায় এতদিন বেঁধে রেখেছিল সেটা মিথ্যা, তোমার জীবনে জাগবার পথে সে বন্ধন তোমার বাধা, ক্রমাগতই তোমায় টেনে আটকে রাখছিল। সে সব মিথ্যা জেনেও, ভয়ের আশ্রিত তুমি সেই মিথ্যার কাছেই নিজেকে আহুতি দিয়ে চলেছিলে— সময় এল, তোমার মধ্যে যা সত্য তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—"আর নয়"। তখন তোমার হল জাগরণ। সত্যের আলোকে তখন নিজেকে দেখলে— সাহসে ভর করে উঠেছ, তাই দেখলে যে-বন্ধন যে-সম্বন্ধ মিথ্যা তা খসে পড়ল। যা সত্য তাই রয়ে গেল। তাই তোমার আনন্দ আজ সেই মুক্তির আনন্দ, সত্যের জয়ের আনন্দ— মিথ্যার জঞ্জাল তোমার সব ঘুচে গিয়েছে, তোমার মধ্যে যা সত্য তাই মূর্ত হয়ে উঠেছে।'— তাঁর এই গভীর কথাগুলির মধ্যে কি যে তখন পেয়েছিলাম! এই কথোপকথন আমার একটি বন্ধুকে পত্রে আমি তখনই বসে লিখেছিলাম। সেই চিঠিখানা আজও ছিন্ন অবস্থায় আমারই কাছে পড়ে রয়েছে দেখলাম। তার থেকে লিখে দিলাম।

কবি ছিলেন তাঁর 'কোণার্ক' বলে ছোট একতলা একটি বাড়িতে। আমি তাঁর পাশের যে বাড়িতে ছিলাম তা একেবারে ওঁর বাড়ির গায়ে লাগা বললেই হয়। ওঁদের বাড়িতে ওঁরা কথাবার্তা কইলে আমি শুনতে পেতাম আমার ঘরে বসে, এতই কাছে। কবি প্রায়ই গলা-খাঁকারি দিতেন শুনতাম, তাঁর উপস্থিতিটা নানাভাবে সর্বদাই অনুভব করা যেত। মনে হত তিনি কাছেই রয়েছেন। যখনি শুনতাম কবি গুন্‌গুন্ করে গাইছেন তখনই বুঝতাম তিনি নতুন গান বাঁধছেন। গান রচনা করবার সময় দেখেছি গুন্‌গুন্ করে গেয়ে গেয়ে উনি গান রচনা করতেন, ওই ভাবে গাইতে গাইতে একই সঙ্গে এসে যেত ওঁর কথা ও সুর; কবির মুখেও এ কথা শুনেছি। আর, সময়-অসময় নেই, যখন দিনুদাকে তাঁর বাড়ির দিক থেকে কবির বাড়ির দিকে হন্‌হন্ করে আসতে দেখা যেত তখন বুঝতে বাকি থাকত না যে কবির কোনো নতুন গান তৈরি হয়েছে তা শিখে নেবার জন্যে দিনুদার ডাক পড়েছে। আমার বাড়ি থেকে দিনুদাদের বাড়ি পরিষ্কার দেখা যেত। উনি যখনই আসতেন আমি দেখতে পেতাম। ওঁর বাড়িটা একটু দূরে ছিল, কিন্তু মাঠের মাঝখানে খোলা জায়গার উপর মাত্র ওই একখানা বাড়িই ওইদিকে থাকায়, দূর থেকে

পথরেখা সমেত বাড়িখানি ছবির মত দেখাত। আমি কোনোদিন একটু ভালো বোধ করলে কবির বাড়িতে তাঁর কাছে গিয়ে বসতাম। একদিন আমি সবে গিয়েছি, দেখি দিনুদা এসে হাজির। বুঝলাম ব্যাপারটা কি। অধীর আগ্রহে কবির মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কবি বললেন, 'আজ একটা নৃত্যসংগীত রচনা করা গেল, এই সবে শেষ করলুম।' বলে সদ্য-রচিত 'নৃত্যের তালে তালে, হে নটরাজ' গানটি গেয়ে আমাদের শোনালেন। অসম্ভব ভালো লাগল আমাদের গানটি, সকলেই উচ্ছ্বসিত, দিনুদার চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। কবির মুখে গানটি শুনেই আমার কেমন মনে এল— এই গানটির চারটি স্তবক চার রকম তালে বসালে নাচ বেশ জমবে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ বলে ফেললাম, 'আপনার এই নৃত্যসংগীতের চারটি স্ট্যাঞ্জা চার রকম তালে বসালে কেমন হয়?' দেখলাম ওঁর বেশ পছন্দ হয়েছে কথাটা, উনি দিনুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার তো মনে হয় বেশ ভালোই হবে— কি বলিস রে?' দিনুদাও সাগ্রহে অনুমোদন করলেন। কবি গানের চারটি স্তবকের চার রকম তাল করে দিলেন। আমরা যখন এই গান শিখি তখন 'নমো নমো নমো, তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম' এই অংশটি ছিল না, এটা ছাড়াই আমরা তখন গেয়েছি। পরে কবি এই অংশটা জুড়ে দিয়েছিলেন।

এ সময়ে শান্তিনিকেতনে নটীর পূজার রিহার্সাল চলছে। কলকাতায় হবার কথা শীগগীরই। শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর বড় মেয়ে গৌরী সেজেছিল নটী শ্রীমতী। তখন নাচের টেক্‌নিক্ এত আয়ত্ত হয় নি এদের কারও। কিন্তু টেক্‌নিক্ না জেনেও গৌরী নাচের মধ্যে দিয়ে যে ভক্তিরস ফুটিয়ে তুলেছিল তার তুলনা নেই। তেমন আর আজও চোখে পড়ল না। সমস্ত ভিতরকে সে বাইরে সামনে বের করে এনেছিল, ফুটিয়ে তুলেছিল নাচের অপরূপ ভঙ্গিমার মধ্যে। গৌরীর সে নাচ যারা দেখেছিল তারা বোধ হয় জীবনেও তা ভুলতে পারবে না। আমি তো আজও পারি নি। অভিনয়ের জন্যে কলকাতা যাবার আগে কবি শান্তিনিকেতনে একবার নটীর পূজা করিয়ে নিলেন, তাই দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো নমো হে নমো' গানটির সঙ্গে গৌরীর সে অপূর্ব নাচের ভাবব্যঞ্জনায় সকলেই সমভাবে অভিভূত হয়েছিল নয়নে জল নিয়ে, সে ভুলবার নয়।

আমার শান্তিনিকেতনে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে এল। ওখান থেকে কবির সঙ্গেই আমি যাত্রা করলাম, বোধ করি ১৯২৭ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে। কবি নেমে গেলেন কাশীতে, আমি গেলাম সোজা লক্ষ্ণৌএর দিকে ভাওয়ালীর পথে। কবি যেখানেই থাকতেন সেখান থেকেই আমার খবর নিতেন সদাসর্বদাই। শিলং থেকে লেখা তাঁর একটি চিঠি এখানে তুলে দিচ্ছি—

কল্যাণীয়াসু

তোমার ওজন কমে যাচ্ছে শুনে খুসি হলুম না। কিসের তোমার স্যানিটেরিয়ম! ওর চেয়ে আমাদের সেই ভাঙা খোড়ো চালের ঘরে যে ছিলে ভালো। কিন্তু সে ঘরটারও ওজন প্রতিদিন তোমারই মতো কমে আসচে— ঝড়বাদলে তার স্বল্পাবশিষ্ট চালের খড়গুলোর পরে দস্যুবৃত্তি করচে— তার ছিদ্রসংখ্যা ক্রমশই বেড়ে উঠল।

বিচিত্রার কাছ থেকে দক্ষিণা পেয়েছ বলে ভারি অহংকার হয়েচে দেখচি— মনে রেখো আমিও কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পেয়ে থাকি— অতএব তোমার যতই উন্নতি হোক আমাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে উঠতে পারো নি। কিন্তু তবু চেষ্টা করতে ছেড়ো না।

আমি খুব শীঘ্রই আবার সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্যে প্রস্তুত— এবার যাচ্চি পূবের মুখে— প্রথমে মালয় উপদ্বীপে গিয়ে যাব জাভায়। তোমার খবর আবার কতদিনে পাব তা জানি নে। যদি নভেম্বরে ছাড়া পাও তবে আশা করি তার আগে ফিরে আসব।

একটা উপন্যাস লিখতে বসেছি— এখনো উপন্যাস লেখবার বয়স আছে কি না সন্দেহ— অন্তত জীবনে উপন্যাস ঘটবার আশা নেই— সেই কারণেই কলমেও তার স্রোতে বাধা পড়ে। এখন উচিত শান্তিশতক বাংলায় তর্জমা করা। ইতি ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাওয়ালী থেকে ফিরে আসবার পর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় নি পণ্ডিচেরী চলে আসবার আগে। এখানে সমুদ্রবক্ষে ইউরোপগামী একটি ফরাসী জাহাজে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। ১৯৩০ সালে ফেব্রুয়ারি কি মার্চ মাসে। তিনি যাচ্ছিলেন ইউরোপে। সঙ্গে ছিলেন রথীদা, প্রতিমাদি, পুপু (নন্দিনী), অমিয় চক্রবর্তী ও তাঁর পত্নী হৈমন্তী। জাহাজে সেদিন ওঁদের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়েছিলাম। আমি প্রতিমাদির কেবিনে তাঁর কাছেই বেশি সময় ছিলাম।

পণ্ডিচেরী চলে আসবার কথা তাঁকে যখন চিঠি লিখে জানাই, তিনি পত্রোত্তরে যে চিঠি লেখেন তার খানিকটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পড়ে বিশেষ আনন্দ বোধ করচি। জীবনে চরম সার্থকতার প্রবর্তনা বাইরের উপদেশ থেকে হয় না, শুভমুহূর্তে ভিতর থেকেই জেগে ওঠে। তোমার চিত্তের মধ্যে সহসা সেই উদ্বোধন যে এসেচে এ তোমার পরম সৌভাগ্য। তাছাড়া তুমি যে সাধনার ক্ষেত্র ও সাধনার সহায় পেয়েচ সেও তোমার দুর্লভ সুযোগ। এই সুযোগ তোমার জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করুক এই আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।
৩ পৌষ ১৩৩৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর-একটা মজার অথচ চমৎকার উপভোগ্য চিঠি তুলে দিচ্ছি। বাংলা দেশে থাকতে তিনি

কথা দিয়েছিলেন তাঁর একটা কাটাকুটিওয়ালা কবিতার খাতা আমাকে দেবেন। এখানে এসে সেই কথা স্মরণ করিয়ে তাঁকে চিঠি লিখি। এই সেই চিঠির উত্তর—

কল্যাণীয়াস্থ

তোমাকে আমার কাটাকুটিওয়ালা কবিতার আস্ত খাতা দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এ কথা আমি অস্বীকার করব। বলচি নে তুমি মিছে কথা বলচ— আমার বক্তব্য এই যে প্রতিশ্রুতি শব্দটা আপেক্ষিক। এক-সময়ে ওটা সত্য ছিল, এখন আর সত্য নয়। প্রথম কথা প্রতিশ্রুতিটা স্মরণে নেই, দ্বিতীয়ত সে খাতাগুলোর অস্তিত্ব নেই। একদা সে সব খাতা যারা হস্তগত করেচে তারা তোমার কাছে আমার প্রাগৈতিহাসিক প্রতিশ্রুতির খাতিরে ফিরে দেবে না। তারা যে কে তাও মনে নেই। বর্তমানের খাতাগুলো বিশ্বভারতীর ভাণ্ডার অধিকার করে নিয়েছে। আজকাল নিজে যা উৎপন্ন করি সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অধিকারবর্জিত। তুমি যদি নিকটে থাকতে তাহলে তাজা লেখা হাতে হাতে কেড়ে নিতে পারতে। বিশেষত তোমার গানের অনুসরণ যদি করত তোমার দাবী, তাহলে আইন-কানুন সমস্ত অগ্রাহ্য করতুম। দূরত্বের অনেক অসুবিধা আছে— প্রথমত জবরদস্তিতে হাজার মাইলের ব্যবধান পড়লে সেটা দুর্বল হয় দ্বিতীয়ত গানের গলা পৌঁছয় না এতদূরে। তুমি বুদ্ধিমতী সুবিবেচক, আমার যুক্তিগুলি আলোচনা করে তোমার আবেদন প্রত্যাহরণ কর— যদি নাও কর তাহলেও ফলের তারতম্য হবে কি না সন্দেহ আছে।— তোমার বইয়ের জন্যে যে গানগুলি চাও নিয়ো, দরখাস্ত তোমার হয়ে আমিই করব। রেকর্ড পাঠাবার কথা রথীকে জানাব।

তোমাকে দেখবার এবং তোমার গান শোনবার জন্যে ঔৎসুক্য প্রায় মনে জাগে— কিন্তু যেখানে উভয় পক্ষই পর্বত, কেউই মহম্মদ নয় সেখানে সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ দৈবাধীনে— হয়তো হবে কোনো এক সময়ে। পণ্ডিচেরীতে যাবার প্রস্তাব করলে, আত্মীয়স্বজনেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, তাদের ভয়, যাত্রী পাছে ন পুনরাবর্ততে। ইতি ৮ আষাঢ় ১৩৪৩

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাটাকুটিওয়ালা একটি খাতা আমাকে তিনি পাঠিয়ে দেন এই চিঠি লেখার পরই।

১৯৩৫ কি ৩৬ সালে ঠিক মনে নেই, একবার নাচগানের দলবল নিয়ে প্রতিমাদিদের বিলেত যাবার কথা হয়। সে সময় প্রতিমাদি আমাকে লেখেন তাঁদের সেই দলে আমাকেও তাঁরা নিয়ে যেতে চান গানের জন্যে। কিন্তু আমার পক্ষে তখন পণ্ডিচেরী ছেড়ে যাওয়া যে সম্ভব নয় এ কথা জানিয়ে কবিকে চিঠি লিখি। তার উত্তরে এই মধুর চিঠিখানি তাঁর এইখানে তুলে দিলাম—

কল্যাণীয়াস্থ

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি, আরো অনেক বেশি খুসি হতুম যদি সাক্ষাৎ তোমাকে কাছে পেতুম। বিশেষত আজ দোলপূর্ণিমার দিন। আমাদের এখানে বসন্তপূর্ণিমা, এই আনন্দের উৎসবে তোমার নির্বাসিত মধুকণ্ঠের জন্যে বেদনা জেগে উঠল। আর কোনোদিনই কি তোমার সুরের সঙ্গে আমার গানের মিলন হবে না? হয়তো অবকাশ হতেও পারে কিন্তু আমার আয়ু যে সীমায় এসে ঠেকেছে সেখানে পিছনের দিকেই স্মৃতির আসন সুবিস্তীর্ণ, সামনে আশার স্থান সংকীর্ণ।— বৌমা তোমাকে ধরবার চেষ্টায় ছিলেন আমি তা জানতুম

না— কিন্তু তাঁদের বিলেত যাবার সংকল্প বোধ হয় ব্যর্থ হবে। সকলের চেয়ে অসম্ভব উপলক্ষ্যে তিনি তোমাকে হরণের চেষ্টায় ছিলেন, সহজ হাওয়ায় যে ফুল বিচলিত হয় না তাকে ঝড়ের হাওয়ায় উড়িয়ে নেওয়া অসাধ্য নয় এই কথাটাই বোধ হয় তাঁর মনে ছিল।— কাল আমাদের নৃত্যনাট্য হবে, তুমি যদি দেখতে নিশ্চয় তুমিও খুসি হতে আমরাও হতুম। দোলপূর্ণিমা ১৩৪৩

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ

আজ সারাদেশ জুড়ে চলেছে তাঁর স্মৃতিমহোৎসব। সবাই দিচ্ছে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, তাঁকে স্মরণ করছে— যারা জানে না তারাও, যারা জানে তারাও, যারা তাঁকে কাছে পায় নি তারাও, যারা তাঁকে কাছে পেয়ে হারিয়েছে তারাও।

আমি পেয়েছিলাম তাঁকে আমার জীবনপ্রভাতে প্রভাতসূর্যের আলোর মতন।

স্মৃতিকুসুমের এই অর্ঘ্য দিয়ে আজ আমি তাঁর স্মৃতিতর্পণ করি।

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

কবিকে দার্শনিক বলিলে কবির জাত যাইবে। আবার কেহ বলিবেন উহাতে দার্শনিকেরও কৌলীন্য খর্ব হইবে। কবি ভাবের মানুষ, তাঁহাকে তত্ত্বদর্শীর কোঠায় বসাইবে কোন্ বুদ্ধিতে? আর তত্ত্বদর্শীই বা তাঁহার সঙ্গ কেন করিবেন? কাব্য ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। উহাদের অভেদ কল্পনায় উভয়েরই প্রত্যবায়।

এই যুক্তিকে বলিব বৈয়াকরণের যুক্তি। এ কথা আলংকারিক বলিতে পারেন, শাব্দিক বলিতে পারেন। কিন্তু সাধারণভাবে বলিব ইহা বৈয়াকরণের কথা। বৈয়াকরণ শব্দের যথার্থ প্রয়োগ শিখাইয়া ভাষার বিশুদ্ধি সম্পাদন করেন। কিন্তু বৈয়াকরণ বড় কড়া মানুষ। তুমি যদি একটি শব্দের দুই বস্তুর আত্মীয়তা বুঝাইতে চাও বৈয়াকরণ আপত্তি তুলিবেন। তিনি দুই বস্তুর জন্য দুই শব্দ আদেশ করিবেন। তুমি সিদ্ধ শব্দবিবেকের আদেশ অমান্য করিবে কি সাহসে? ফলে তোমার কথা শুদ্ধ হয়, কিন্তু মনের কথা বলা হয় না। যদি বলি রবীন্দ্রনাথ মুনি বা ঋষি বা দার্শনিক তবে ঐ ঐ শব্দের অপব্যবহারের জন্য নিন্দিত হইব। কিন্তু আমার মনের কথা বলা হইবে। দেখিতেছি শব্দ লইয়া একটু যথেচ্ছাচার না করিলে সকল কথা বলা হয় না।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে শিবনাথ শাস্ত্রী এ বিষয়ে একটি সরল কথা সবল ভাষায় বলিয়াছিলেন। কবির ঋষিত্ব প্রসঙ্গে তিনি লিখিলেন—

> ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের চারিদিকে অতীন্দ্রিয় অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানের ছায়ামণ্ডলের ন্যায় একটা অসীম প্রেমের ছায়ামণ্ডলও রহিয়াছে। সেই প্রেম যেন ঐ খণ্ড অংশকে বুকে ধরিয়া, জোড়া দিয়া, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড করিয়া রহিয়াছে। জগৎকে সৌন্দর্য্যের আলয় করিয়াছে। কবি এই গূঢ় সৌন্দর্য্যকে সাক্ষাৎভাবে দেখেন ইহাই তাঁহার কবিত্ব। সাক্ষাৎ দর্শন বিষয়ে ঋষি ও কবি দুই সমান।[১]

আজ যদি বলি কবি ঋষি আর রবীন্দ্রনাথ ঋষি তাহা হইলে আমাদের মনে নানা দ্বিধার উৎপত্তি হয়—

প্রথমতঃ, এমন কথা বড় প্রাচীন ভাবের কথা বলিয়া মনে হইবে। মুনি ঋষি প্রভৃতি প্রাচীন-কালের জীব। উহারা কি করিতেন, কি বলিতেন, তাহা লইয়া পণ্ডিত গবেষণা করিয়া থাকেন। উহারা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সে-সব আর এ যুগে কে বুঝিবে?

দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথকে ঋষি-কবি বলিলে তাঁহাকে একেবারে হিন্দুকবি বলিয়া ধরিতে হয়,

১ ঋষিত্ব ও কবিত্ব। ভারতী, বৈশাখ ১৩০৭ পৃ ৫৩

হিন্দুধর্মের কবি বলিয়া চিহ্নিত করিতে হয়। ইহাতে কাব্য বা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতাদোষ প্রবেশ করিবে। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমতাও এই বিচারে ক্ষুণ্ণ হইবে।

তৃতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলি কি অর্থে? ঋষি বলি কাহাকে, না, যিনি শাস্ত্রকৃদাচার্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক উপন্যাস প্রভৃতিকে শাস্ত্র বলিতে পারি না। মুনি বলি কাহাকে, না, যিনি

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

রবীন্দ্রনাথকে এমন পুরুষোত্তম বলিয়া কয়জন স্বীকার করিবেন?

কিন্তু এত জানিয়াও বলিতে হয় রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে হইলে তাঁহার ঋষিত্ব বুঝিতে হইবে। তাঁহার প্রতিভার মহত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে তাঁহার দার্শনিকতার মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে। বলিবে এই বিচার সমালোচনার রীতিবিরুদ্ধ। অথবা ইহা কাব্যবিচারের বহির্ভূত। তবে সমালোচনা বা কাব্যবিচার লইয়া কি করিব? যদি উহার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সার্থকতা না বুঝিতে পারিলাম বা না বলিতে পারিলাম তবে উহা বর্জন করাই শ্রেয়।

রবীন্দ্রনাথকে দার্শনিক বলিলে দার্শনিক পণ্ডিত বলিবেন যে দার্শনিকের চিন্তাশক্তি বা চিন্তা-প্রণালী রবীন্দ্রনাথের ছিল না। যে প্রকার বিচারশক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞতা থাকিলে দার্শনিকের মর্যাদা লাভ করা যায় তাহা কবির রচনায় দেখি না। অর্থাৎ দার্শনিক হইতে হইলে প্রচণ্ড চিন্তাশক্তি ও প্রচণ্ড তর্কশক্তির প্রয়োজন। এখানে জিজ্ঞাসা করিতে পারি দার্শনিক শব্দের এই অর্থ কে করিলেন? শব্দটি অবশ্য সংস্কৃতে নাই। কিন্তু যে দর্শন শব্দ হইতে আমরা দার্শনিক শব্দটি বানাইয়া লইয়াছি তাহার অর্থ কি? মেদিনীতে দেখি দর্শন শব্দের অর্থ বুদ্ধি, ধর্ম, উপলব্ধি ইত্যাদি। অমরকোষ বলেন, 'নির্বর্ণন্তু নিধ্যানং দর্শনালোকনেক্ষণম্' অর্থাৎ নির্বর্ণন (যেমন নিরুক্তি অথবা নির্বচনম্), নিধ্যান, দর্শন, আলোকন, ঈক্ষণ। এই অর্থে যিনি বিশেষভাবে দেখিলেন, বুঝিলেন, চিন্তা করিলেন, তিনি দার্শনিক। কিন্তু দার্শনিকের জ্ঞান বা তাঁহার উচ্চারিত বাক্য যে তর্কসিদ্ধ হইতে হইবে এ কথা কোথায় পাইলাম? বরঞ্চ দেখিতেছি শ্রেষ্ঠ দর্শন মাত্রেই শ্রুতি বা আপ্তবাক্য অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রকটিত সত্য বলিয়া গৃহীত। বেদাদি শাস্ত্র প্রত্যাদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার দোষাদোষ বিচার না করিয়া আমরা উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতে অভ্যস্ত। আমরা তর্কের সাহায্যে উহার দোষগুণ বিচার করি না কেন— না, উহা শুনিয়া ও বুঝিয়া আমাদের এই প্রতীতি জন্মে যে উহা ঋষিপ্রোক্ত। যেমন শ্রেষ্ঠ রচনায় ব্যাকরণের নিয়মবহির্ভূত প্রয়োগ দেখিয়া আমরা বলি উহা সিদ্ধ কেননা উহা আর্ষপ্রয়োগ।

ব্রহ্মসূত্রের একটি সূত্র (২।১।১১) প্রসঙ্গে শংকর এই তর্কনিরপেক্ষ শাস্ত্র বা দর্শন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বুঝি শ্রেষ্ঠ দর্শন মাত্রেই ঋষিজনের উপলব্ধি—

ইতশ্চ নাগমগম্যেঽর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যং, যস্মান্নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধ…নাস্তর্কা অপ্রতিষ্ঠাতাঃ সম্ভবন্ত্যুৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ। তথা হি— কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাস্তদন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যং সমাশ্রয়িতুম্। পুরুষমপি বৈশ্বরূপ্যাৎ। ইত্যাদি।[২]

যে বস্তু শাস্ত্রগম্য তর্কদ্বারা তাহার খণ্ডন অসম্ভব। তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত। মানুষের বুদ্ধি অপ্রতিষ্ঠিত এবং সেই বুদ্ধিপ্রভব তর্কও তাহা হইলে অপ্রতিষ্ঠিত। ইহার অর্থ এই বুঝিলাম, যে তত্ত্ব আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী তাহা তর্কবুদ্ধিপ্রসূত হইতে পারে না। ইহা যেমন বেদান্তের কথা তেমন বৈশেষিক বা সাংখ্যের কথা। বৈশেষিক বলেন, 'আর্ষং সিদ্ধ দর্শনঞ্চ ধর্মেভ্যঃ'। সাংখ্য বলেন, 'তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তবচনাৎ সিদ্ধম্' অর্থাৎ অনুমান যাহা দেখাইতে পারে না আপ্তবচনের দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য এই আপ্তবচন কাহার বচন— ঋষিবাক্যের ঋষির? আমাদের শাস্ত্রমতে ঋষিবাক্য শ্রুতির বাক্য অর্থাৎ ইহা দৈববাণী, কোনো ঋষি ইহা শ্রবণ করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। ঋগ্‌বেদের ঋষি মন্ত্রকর্তা নন, তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা— প্রকৃতপক্ষে ইহা অপৌরুষেয়। ঋষি শাস্ত্রকৃৎ এই অর্থে যে তিনি তাঁহার পরম পবিত্র বিমুক্ত মন দ্বারা ঈশ্বরের কথা ঈশ্বরের ইচ্ছায় মানুষের গোচরে আনিতে পারিয়াছেন। প্রচলিত মতে এই ঋষি প্রাচীনকালের মানুষ। পরবর্তীকালের জ্ঞানী মহৎ মানুষকে ঋষিপ্রতিম অর্থে ঋষি বলিতে পার কিন্তু তিনি যথার্থ ঋষি নহেন।

এই মতে শাস্ত্র বলিতে যাহা বুঝি তাহা প্রাচীনকালেই প্রণীত হইয়াছে। নূতন করিয়া আর শাস্ত্র রচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই শাস্ত্রের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতে পারে, উহাকে সমাজের প্রত্যেক স্তরে উপস্থিত করিবার জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইতে পারে। এই ব্যাখ্যাকার ঋষিতুল্য মানুষ, কিন্তু তিনি ঋষি নন। এখন আর ঈশ্বর তাঁহার কথা কাহারও মুখ দিয়া বলান না।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে কোনো এক যুগে ঈশ্বর তাঁহার বাণী নির্বাচিত মানুষের মধ্য দিয়া প্রচার করেন আর কোনো যুগে করেন না ইহা কোনোক্রমে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। ঈশ্বরের সকল কথা বলা হইয়া গিয়াছে, মানুষের অগ্রসরের পথ প্রাচীনকাল হইতে সুনির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এমন কথা অবিশ্বাস্য। দুই হাজার বৎসরের পূর্বের জ্ঞান একমাত্র জ্ঞান, নূতন জ্ঞান অসম্ভব এ কথা যিনি বলিবেন তিনি মনুষ্যসমাজের গতি বা উন্নতি বা অগ্রসরে বিশ্বাস করেন না।

যাঁহারা শাস্ত্রকে গতিশীল মনে করেন তাঁহারা আবার উহাকে ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন না। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—

আমি কোন ধর্মকে ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করি না। ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি আছে ইহাই স্বীকার করি।[৩]

---

২ কালীবর বেদান্তবাগীশ, বেদান্তদর্শনম্, ২খ, পৃ ৪৬

৩ দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, পৃ ২১৩

বঙ্কিম ঋগ্বেদের মন্ত্রকে ঋষিপ্রণীত বলিতে চান, ঋষিদৃষ্ট বলিতে পারেন না। ইহাতে বঙ্কিমের যুক্তিনিষ্ঠা ও সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাই সত্য। কিন্তু ইহাতে দুই শ্রেণীর সাহিত্যের বিভিন্নতা বুঝিতে পারি না। অবশ্য এমন কথা বলা যাইতে পারে যে আমরা যাহা-কিছু পড়ি তাহা সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি, কেননা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের সৃষ্টি। অপর পক্ষে ভালো মন্দ উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট কাব্যও মানুষের সৃষ্টি বলিয়াই আমরা দেখিতেছি। কিন্তু উপনিষদ্‌কারের প্রতিভা আর দাশরথি রায়ের প্রতিভা একই বস্তুর মহৎ ও সাধারণ প্রকাশ কি করিয়া বলি? উপনিষদের মন্ত্র পড়িয়া এই বিশ্বাস জন্মে যে ইহা ঐশীশক্তিসম্ভূত। দাশরথি রায়ের পাঁচালী পড়িয়া বুঝি ইহা সাধারণ মানুষের সৃষ্টি। এমন-কি মহৎ উপন্যাস উৎকৃষ্ট কবিতা পড়িয়া বুঝি যে ইহা বড় প্রতিভার সৃষ্টি, কিন্তু ইহা ঈশ্বরাদিষ্ট ঋষিদৃষ্ট মন্ত্র নহে।

রবীন্দ্রনাথকে ঋষি এই অর্থে দার্শনিক বলিয়া গণ্য করিতে হইলে অবশ্য শুধু ইহা বলিলেই হইবে না যে ঋষি ঈশ্বরপ্রণোদিত বক্তা। রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলিতে হইলে বিশ্বাস করিতে হইবে যে এ যুগেও ঋষির আবির্ভাব হইতে পারে। আধুনিক যুগে ঋষির আবির্ভাব হইয়াছে বলিতে পারি কোন্ অবস্থায়?— যখন বুঝিব আমাদের মধ্যে এমন একজনের আবির্ভাব হইয়াছে যিনি আমাদের সকল কথাই বলিয়াছেন, আমাদের মূল সমস্যার সমাধান করিয়াছেন, আমাদের চিন্তার অস্পষ্টতা দূর করিয়াছেন, আমাদের মধ্যে সমাজবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগের নানা রীতি নানা নীতির সংঘাতের মধ্যে আমাদের একটি সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান দিয়াছেন, আমাদের প্রত্যেক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের পথে লইয়া আসিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া দিতেছেন, সর্বোপরি আমাদের ক্লান্ত অবসন্ন দেহমনে নূতন বলের সঞ্চার করিয়া দিয়া আমাদের ঈশ্বরমুখী করিতে প্রয়াস করিতেছেন। যদি কেহ তাঁহার রচনার দ্বারা এই মহৎ ও বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিব সে রচনাবলী একটি সমগ্র শাস্ত্র আর বলিব সেই শাস্ত্রকার ঈশ্বরাদিষ্ট।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে এমন মন্ত্রদ্রষ্টার আবির্ভাব হইল, তিনি আশি বৎসর কাল আমাদের মধ্যে বিরাজ করিলেন, তাঁহার শত শত গান সহস্র সহস্র কণ্ঠে দেশে প্রচারিত হইল, তাঁহার কবিতা গল্প নাটক উপন্যাস প্রবন্ধ দেশের লোক কত আগ্রহে পড়িল, কিন্তু তাহাতে দেশের এমন একটা কি হইল? আমাদের মধ্যে কয়জন চিন্তাশীল ধর্মনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ তাঁহাদের সকল কর্মশক্তি মননশক্তি সমাজের কল্যাণে নিযুক্ত করিয়াছেন? কিন্তু ঋষির কথা ছাড়িয়া দিলাম। ঈশ্বরের অবতারের আবির্ভাবে মনুষ্যসমাজের ব্যাপক ও দীর্ঘকালস্থায়ী উন্নতি হইয়াছে ইতিহাস বলে না। শ্রীকৃষ্ণ মুসা যীশু পৃথিবীকে ভগবানের রাজ্যে পরিণত করেন নাই। আর ভগবান তো কোনো অবতার বা ঋষির সাহায্য না লইয়া মুহূর্তের ইচ্ছায় সমস্ত পৃথিবীতে ধর্মবোধের বান ডাকাইয়া দিতে পারেন। একদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া আবিষ্কার করিতাম আমি বিনয় ও মানবপ্রেমে আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছি; রাজপথে আসিয়া দেখিতাম প্রত্যেক পথিক প্রত্যেক

পথিককে ডাকিয়া কোল দিতেছেন। কিন্তু, ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তার পর মনুষ্যত্বও যদি তিনিই সৃষ্টি করেন তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কলের পুতুলের মত চালাইয়া তাঁহার আনন্দ নাই। সৃষ্টির এই রহস্যের কথা রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন আর কেহ তেমন বলিয়াছেন কি না জানি না—

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।

অবিদ্যার অন্ধকারের কথা মুণ্ডকোপনিষদেও বড় সুন্দর কথিত হইয়াছে—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ।
জাঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

অজ্ঞানে অবস্থিত মুগ্ধ ব্যক্তিরা 'আমরাই ধীমান্ ও আমরা সর্ববিষয় জানিয়াছি' এইরূপে আপনাকে সম্মানার্হ মনে করিয়া অনর্থপরম্পরায় পীড়িত হইতে হইতে অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে থাকে।

উপনিষদের ঋষি অজ্ঞানের অন্ধকারের কথা বলিলেন। এ কথা যথার্থ। কিন্তু আধুনিক কালের ঋষি যাহা বলিলেন তাহা মহৎ। তিনি অনুভব করিলেন এই অন্ধকারের মধ্যেই ঈশ্বরের আসন। সমস্ত মনুষ্যসমাজের হৃদয় জ্ঞানের আলোকে ভাসিয়া গেলে ব্রহ্মাণ্ডের বিলোপ হইবে। যিনি ঋষি তিনি মাত্র 'একটি জ্যোতির রেখা'ই ধরিতে পারেন। বহু অন্ধকার হইলে তবে আলোর দর্শন মিলে। কখনও বুঝি 'আপনি থাক আলোর পিছনে'। আবার কখনও 'আপনি পড়ি আলোর পিছনে'। ঋষির আবির্ভাবে অজ্ঞানের অন্ধকার কোনো যুগে দূর হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলি, কেননা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতবাসীর সকল ভাব সকল চিন্তা সকল আদর্শ তাঁহার ন্যায় কেহ এমন করিয়া উজ্জ্বল করিয়া ধরেন নাই। আবার ভারতবাসীর সকল কথা সমস্ত মনুষ্যসমাজের আসল কথার সঙ্গে এমনভাবে মিলাইয়া দেন নাই। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ যুগপ্রবর্তক ঋষি। এই দেশে রবীন্দ্রনাথ হইতে বড় ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছে, বড় শাস্ত্রব্যাখ্যাতার আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীর জীবনের সকল বিভাগের সকল কথার এমন সমগ্র প্রকাশ আর কাহারও মধ্যে হয় নাই।

এখন বিচার করিতে হইবে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোন্ ক্ষণে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ঋষির আবির্ভাব। সেই ক্ষণে আমাদের সামাজিক জীবনের কি দশা তাহা দ্বিজেন্দ্রনাথ বড় পরিষ্কার বুঝিয়াছেন—

আমাদের দেশ একটা প্রকাণ্ড রথ; তার সারথি হচ্ছে সেকেলে শাস্ত্র, আর অশ্ব হচ্ছে লোকাচার।

সারথিটি বার্ধক্যের বশতাধীনে এমনি অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছেন যে, তিনি অশ্বকে চালান না অশ্ব তাঁহাকে চালায় — তাহা বলা কঠিন! তাতে আবার সারথিও দশগণ্ডা, অশ্বও দশগণ্ডা; অশ্ব— নানা প্রদেশের নানা বিরোধী লোকাচার, সারথি নানা মুনির নানা বিরোধী শাস্ত্র; সারথিদিগের হাতের রাস আল্‌গা হইয়া লট্‌পট্‌ করিতেছে …রথের এই গতিরোধ অপ্রতীকার্য দেখিয়া আরোহীদিগের (অর্থাৎ ভারতবাসীদিগের) মনোরথেরও গতিরোধ হইয়া আসিতেছে— তাঁহাদের আশা ভরসা সকলি লোপ পাইয়া আসিতেছে।[৪]

রবীন্দ্রনাথ একটি বিধান দিয়া বা একখানি উপদেশগ্রন্থ লিখিয়া নূতন সমাজ গড়িবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সারাজীবন তিনি তাঁহার কর্ম চিন্তা ও সাহিত্যসৃষ্টির দ্বারা আমাদের সার্থকতর ও মহত্তর জীবনের সন্ধান দিয়াছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে কোনো একজন কবি তাঁহার দেশের ও তাঁহার কালের জন্য এমন বৃহৎ কাজ করেন নাই।

এখন দেখা যাক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিভা ও তাঁহার প্রয়োগ সম্বন্ধে কি চিন্তা করিতেন। কাব্যের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম সার্থক জিজ্ঞাসা ভারতীতে (১২৮৮ বৈশাখ) প্রকাশিত 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' নামক প্রবন্ধে[৫] কবিতার বস্তু কি এই মূল প্রশ্নের উত্তরে কবি লিখিলেন—

আমাদের দুইটি জগৎ আছে। এক জগতে আমরা বাস করি, আর এক অদৃশ্য জগৎ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে। সে জগতের নাম আদর্শ জগৎ।… সেই আদর্শ জগতের জন্য, ভাবের জগতের জন্যই কবিতাকে নিযুক্ত করা হউক।… কবিতার সমস্তই দূরের দ্রব্য, আমরা তাহার আভাস মাত্র পাই, কিয়দংশ মাত্র দেখিতে পারি।

ইহার ঠিক ছয়মাস পরে 'অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরাজ কবি' প্রবন্ধে[৬] কবি কাব্য ও ধর্ম-দর্শনের সম্পর্ক সম্বন্ধে বলিতেছেন—

জগৎ ও পরমাত্মা একই কি না ইহা লইয়া আমাদের ভারতবর্ষীয় কবি ও দার্শনিকের অনেক আলোচনা হইয়াছে। পরিশেষে আমাদের দেশে অদ্বৈতবাদ মতেরই জয়লাভ হইয়াছে।… সম্প্রতি ইংলণ্ডে কবিগণ অদ্বৈতবাদের প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন এবং এতদিনে খৃষ্টধর্মের যথার্থ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, প্রচার করিবার ভার দার্শনিকদের নহে; কবিদের।

কবি সার সত্যের প্রচারক এবং এই অর্থে মহৎ কাব্য শাস্ত্রবিশেষ। ভারতীতে এই প্রবন্ধ প্রকাশের কিঞ্চদধিক দশ বৎসর পর তিনি লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়কে লেখেন—

মানুষের প্রবাহ হুহু করে চলে যাচ্ছে, তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাকবে না কেবল সাহিত্যে থাকবে। সংগীতে চিত্রে বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এইজন্যই সাহিত্যের এত আদর। এইজন্যই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার… আমার বলা উচিত ছিল, লেখকের নিজস্ব নয়, মনুষ্যত্ব প্রকাশ সাহিত্যের উদ্দেশ্য… লেখক উপলক্ষ্য মাত্র। মনুষ্যই উদ্দেশ্য।[৭]

৪ নানা চিন্তা

৫ রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃ ১১০

৬ ভারতী, ১২৮৮ অগ্রহায়ণ

৭ সাধনা, ১২৯৯

এই মনুষ্যত্বের ধারক ও বাহক যে সাহিত্য তাহাতে তর্কাশ্রিত জ্ঞান নাই। তাহা সর্বৈব ভাববস্তু। লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লিখিত পত্রের দশ বৎসর পরে কবি লিখিলেন—

এইজন্য সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।··· জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়।[৮]

রবীন্দ্রনাথকে অনেকে সৌন্দর্যের উপাসক বলিয়া একেবারে বিলাতী aesthete করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে নীতিবোধ ছাড়া সৌন্দর্যবোধ নাই।

নীতিপণ্ডিতেরা জগতের প্রয়োজনের দিক হইতে নীতি-উপদেশ দিয়া মঙ্গল প্রচার করিতে চেষ্টা করেন এবং করিয়া মঙ্গলকে তাহার অনির্বচনীয় সৌন্দর্যমূর্তিতে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকেন।[৯]

এই প্রবন্ধের শেষে কবি লিখিলেন—

সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে— রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি। তিনিই রস ; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।

এই রস তর্কের পথে মিলিবে না—

সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলেই অলংকার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হল সাহিত্যের।[১০]

তত্ত্ব তাহা হইলে দুইভাবে উপস্থিত করা যাইতে পারে ; উহা তর্ক দ্বারা উপস্থিত করা যাইতে পারে অথবা ভাবের দ্বারা উপস্থিত করা যাইতে পারে। তর্ক তত্ত্বকে আমাদের বুদ্ধির কাছে প্রমাণিত করে। ভাবময় শব্দ তত্ত্বকে আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে। তর্কের তত্ত্ব মস্তিষ্কের বস্তু, ভাবের তত্ত্ব আমাদের সমগ্র সত্তার বস্তু। কবি তাহা হইলে ভাবের মানুষ হইয়া তত্ত্বদর্শী হইলেন।

কাব্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কবি যে কথা তাঁহার প্রবন্ধে বলিয়াছেন তাঁহার বহু কবিতায়ও তিনি সেই কথাই বলিয়াছেন—

তুমি যখন গান গাহিতে বল'
  গর্ব আমার ভ'রে ওঠে বুকে ;
দুই আঁখি মোর করে ছলছল
  নিমেষহারা চেয়ে তোমার মুখে।
কঠিন কটু যা আছে মোর প্রাণে
গলিতে চায় অমৃতময় গানে,

৮ সাহিত্যের সামগ্রী, 'সাহিত্য'
৯ সৌন্দর্যবোধ, 'সাহিত্য'
১০ সাহিত্যধর্ম, 'সাহিত্যের পথে'

সব সাধনা আরাধনা মম
উড়িতে চায় পাখির মতো সুখে।[১১]

অথবা

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে, প্রভু, মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।[১২]

কবি অনুভব করিয়াছেন যে তাঁহার কথা তাঁহার অন্তর্যামীর কথা—

আমার এ গান ছেড়েছে তার
সকল অলংকার,
তোমার কাছে রাখে নি আর
সাজের অহংকার।
অলংকার যে মাঝে পড়ে
মিলনেতে আড়াল করে,
তোমার কথা ঢাকে যে তার
মুখর ঝংকার।[১৩]

অথবা

তোমারি ঐ অমৃতপরশে
আমার হিয়াখানি
হারালো সীমা, বিপুল হরষে
উথলি' উঠে বাণী।[১৪]

অথবা

গাব তোমার সুরে
দাও সে বীণাযন্ত্র।
শুনব তোমার বাণী
দাও সে অমর মন্ত্র।[১৫]

১১
১২ গীতাঞ্জলি
১৩ গীতাঞ্জলি
১৪ গীতিমাল্য
১৫ গীতিমাল্য

ঋগ্‌বেদের ঋষি যজ্ঞকালে অগ্নিকেই যজ্ঞের পুরোহিত এবং দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ বলিতেন (১।১।১)। উপনিষদ্ বলেন ব্রহ্ম বাক্যেরও বাক্য (কেন ১।২)। কিন্তু এই দুই যুগের ঋষির মধ্যে এক বড় পার্থক্য বর্তমান। ঋগ্‌বেদের ঋষি দেবতাকে সম্বোধন করিলেন, তাঁহার সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। উপনিষদের ঋষি অত সহজে ব্রহ্মকে সম্বোধন করিতে পারে না। উপনিষদের কথা— ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইবে। এই আমি ব্রহ্মকে লাভ করিলাম, আনন্দে ডুবিলাম এমন কথা কোনো উপনিষদের ঋষি বলেন নাই। উপনিষদ পড়িয়া বুঝিব ব্রহ্মলাভে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে সেখানে ভেদবুদ্ধি থাকে না, বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় এমন কোনো ভাবের সৃষ্টি হয় না—

> ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
> তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥[১৬]

রবীন্দ্রনাথ যে মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন তাহার কথা ভিন্ন। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গ অনুভব করিয়াছেন—

> আছ আমার হৃদয় আছ ভরে,
> এখন তুমি যা খুশি তাই করো।
> এমনি যদি বিরাজ' অন্তরে
> বাহির হতে সকলি মোর হরো।[১৭]

এখানে বলিতে পার কবি উপনিষদের ব্রহ্মকে বড় সহজলভ্য ঈশ্বর বানাইয়া বড় তরল ভক্তিতে মাতিয়াছেন। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন তিনি বলিবেন রবীন্দ্রনাথের অন্তর্যামী উপনিষদের ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সহজলভ্য নন। তিনি কখনও বলেন এই তোমাকে দেখিলাম, বা তোমার আভাস পাইলাম; আবার কখনও বলেন, তোমার দেখা পাইলাম না—

> যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু,
> এবার এ জীবনে
> তবে তোমায় আমি পাই নি যেন
> সে কথা রয় মনে।[১৮]

১৬ মুণ্ডক, ২।২।১০

১৭ গীতাঞ্জলি

১৮ গীতাঞ্জলি

অথবা

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে ;
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

তবু বলিব উপনিষদের ঋষির ব্রহ্মোপাসনার আর রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মোপাসনায় একটি বড় প্রভেদ বর্তমান। উপনিষদের ব্রহ্মের শক্তিতে সমস্ত চরাচর স্পন্দিত। কিন্তু তিনি তাঁহার সৃষ্টি ব্যতিরেকেও সম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর জীবের সংসর্গ কামনা করেন—

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।
কত কালের সকাল-সাঁঝে
তোমার চরণধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয়মাঝে
গেছে আমায় ডেকে।[১৯]

অথবা

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আস।[২০]

উপনিষদের কবি ব্রহ্মলাভের পর জগৎসংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন। গীতাঞ্জলির কবি জগৎ-সংসারের মধ্যে ব্রহ্মাস্বাদ লাভ করিতে সক্ষম।

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে।
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন 'পরে
বাঁধা সবার কাছে।[২১]

এইখানে গীতাঞ্জলি অধ্যাত্মসাধনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। ইংরেজি গীতাঞ্জলির প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী বলিয়াছেন—

---

১৯ গীতাঞ্জলি
২০ গীতাঞ্জলি
২১ গীতাঞ্জলি

আমরা দেখিলাম যে, গীতাঞ্জলির হিরণ্ময় পাত্রখানি অতীন্দ্রিয়লোকের অনির্বচনীয় রসে পূর্ণমান এবং য়েট্স্, টম্পসন প্রভৃতি আধুনিক কোনো কবির কাব্যের পেয়ালা সেই রসে এমন ভরপুর নহে বলিয়া গীতাঞ্জলি সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া আদৃত হইয়াছে।[২১]

বস্তুতঃ গীতাঞ্জলি আধ্যাত্মিক কাব্য হিসাবে ভারতীয় সাহিত্যেও অতুলনীয়। মধ্যযুগের সাধকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। মধ্যযুগের সাধক ব্রহ্মকে দুর্জ্ঞেয় করিয়া রাখেন নাই। তিনি যেমন ভগবানকে পাইয়া বলিয়াছেন, আমি পাইয়াছি। কবীরের গানে আছে—

কবীর জব হম্ গাবতে তব্ ব্রহ্ম জানা নাহি।
অব ব্রহ্ম দিলমে দেখিয়া গাবন কু কছু নাহি॥

আমি কবীর যখন গান করিতাম তখন ব্রহ্মকে জানিতাম না, এখন ব্রহ্মকে হৃদয়ে পাইয়াছি, এখন আমার আর গানের প্রয়োজন নাই।

রবীন্দ্রনাথে পাই—

এবার নীরব করে দাও হে তোমার
মুখর কবিরে।…
বহুদিনের বাক্যরাশি
এক নিমেষে যাবে ভাসি,
একলা বসে শুনব বাঁশি
অকূল তিমিরে।[২২]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিবেন না যে ঈশ্বরকে পাইলে সমস্ত সংগীত থামিয়া যায়। কবির ঈশ্বরও কবি এবং গীতসুধায় তাঁহার আবির্ভাব। কবীরও ধর্মগঠনের জন্য সন্ন্যাস লইবেন না, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গুহায় বসিয়া যোগ করিবেন না—

আঁখ ন মূদু কান ন রুধুঁ, কায়াকষ্ট্ ন ধারূঁ।
খুলে নয়ন মৈঁ হঁস হঁস দেখুঁ সুন্দর রূপ নেহারূঁ॥

আমি আঁখি বন্ধ করিব না, কানও বন্ধ করিব না, কায়াকষ্টও করিব না; নয়ন খুলিয়া আমি কেবল হাসিয়া হাসিয়া দেখিব (ঈশ্বরের) সুন্দরের রূপ।

নানকের ভজনেও এই ভাব—

কাননে কাননে শ্যামলে শ্যামল, পর্বতে পর্বতে উন্নত উন্নত,
নদীতে নদীতে চঞ্চল চঞ্চল, সাগরে সাগরে গম্ভীর হে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।

---

২১ রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১০৫-৬

২২ গীতাঞ্জলি

চন্দ্র সূর্য জ্বালে নির্মল দীপ— তব জগমন্দির উজল করে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।[২৩]

মীরাবাঈ বর্ষার শব্দে গিরিধারীর গান শুনিতে পান—

ননৃহী ননৃহী বূঁদন মেহা বরসে,
শীতল পবন সোহাবন-কী।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর,
আনন্দমঙ্গল গাবন-কী॥

কিন্তু এখানেও মধ্যযুগের সাধক ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি প্রভেদ বড় স্পষ্ট। কবীর নিসর্গ-সৌন্দর্যে ঈশ্বরের সৌন্দর্য দেখিতে পান। যিনি শাস্ত্রনিরপেক্ষ আনুষ্ঠানিকধর্মাচরণ-নিরপেক্ষ ভক্তিসাধনার প্রচারক তিনি সর্বত্র ঈশ্বরের আভাস পাইবেন। রবীন্দ্রনাথ মানুষের সকল কর্মে, সকল চিন্তায়, ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষায়, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষায়, সমস্ত মনুষ্যসমাজের অগ্রসরের পথে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন—

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে!
দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।[২৪]

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরানুভূতির ব্যাপ্তি ও বিচিত্র গতি মধ্যযুগের ধর্মসাহিত্যে পাইব না। এমন গভীর ভাবের এমন বিস্তার আর কোনো কাব্যে আছে বলিয়া জানি না—

নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে
বাঁধিবে এমনি প্রেমে। প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে···
নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।[২৪]

রবীন্দ্রনাথকে গভীর ভক্তিভাবের কবি বলিলাম। আবার বলিলাম এই ভক্তি মধ্যযুগের সাধকের ঈশ্বরপ্রেম হইতে ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যে মহত্তর। কিন্তু এ কথা বলিয়া একজন চিন্তাশীল সদ্বিদ্বান সমালোচকের বিপক্ষতা করিয়া বসিলাম। 'বিপিনচন্দ্র পাল বলিলেন—

রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির বিস্তৃতিতে ও অনুভাব্য বিষয়ের বিচিত্রতাতে যতটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, অন্যদিকে সেই পরিমাণে তাঁহার রসানুভূতির গভীরতা ও বাস্তবতা বৈষ্ণবকবিদিগের অপেক্ষা হীন বলিয়াই মনে হয়।

২৩ রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ। গীতবিতান, পৃ ৮২৩

২৪ উৎসর্গ

বৈষ্ণবকবিগণ কেবল কবি ছিলেন না, অতি উচ্চ অধিকারের সাধকও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও ধর্ম উপাসনা প্রবল। সাধকের আকাঙ্ক্ষাও বহুদিন হইতে জন্মিয়াছে। আপনার অলৌকিক কবিপ্রতিভার স্ফুরণেই তিনি জীবনের সার্থকতা লাভ হইল মনে করেন না। ধর্মকে এবং ব্রহ্মকে না পাইলে, তাঁর সকলি বিফল ও ব্যর্থ হইয়া গেল,— রবীন্দ্রনাথের এ ভাবটা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু বৈষ্ণবকবিদিগের সাধনায় এমন একটা বস্তুতন্ত্রতা ছিল, আমাদের এই নবীনযুগের প্রযুক্ত সাধনায় যে বস্তুতন্ত্রতা নাই।[২৫]

এই কথাই বিপিনচন্দ্র অন্যত্র গীতাঞ্জলি-প্রসঙ্গে লিখিলেন—

These are the outpourings of his religious intutions. And as such they lack that clarity of inner vision and that firm grasp of spiritual reality, with which their Bengalee readers are familiar in their old Vaishnava and Shakta poets... Rabindranath's theism is more closely allied to Hebrew and unitarian Christian theism, which is really the inevitable logic of Protestant Christianity than to true Hindu theism, the highest expression of which is to be found in our Vaishnava and Shakta schools.[২৬]

ইহা এক অদ্ভুত কথা বলিয়া মনে হয়। যদি ঈশ্বরপ্রীতির প্রকৃতি বিচার করিয়া একান্তই তাহার কুলজি প্রস্তুত করাইতে হয় তাহা হইলে দেখি রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রীতি হিন্দুকুলের ঈশ্বরপ্রীতি। এ কথা সত্য যে বহু খৃস্টধর্মাবলম্বী ইউরোপীয় পাঠক গীতাঞ্জলিতে Book of Psalmsএর ভাব লক্ষ করিয়াছেন। টাইম্‌স্‌ লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট (৭ নভেম্বর ১৯১২) গীতাঞ্জলির সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন—

As we read his pieces we seem to be reading the psalms of a David of our own times.

ইহার চারিমাস পরে এজরা পাউণ্ড ফর্টনাইটলি রিভিউতে (মার্চ ১৯১৩) প্রকাশিত গীতাঞ্জলির এক সমালোচনায় লেখেন যে তিনি

the same sort of common sense in the first part of the New Testament, the same happiness in some on the psalms

পাইয়াছেন। কিন্তু যে ভ্রম বিদেশীর পক্ষে স্বাভাবিক তাহা বাঙালীর পক্ষে বড় অদ্ভুত। ডেভিড ঈশ্বরমুখী, ডেভিড ঈশ্বরপরায়ণ, ডেভিড ঈশ্বরে আস্থাবান। কিন্তু ডেভিড ঈশ্বরপ্রেমিক নন। ডেভিডের একটি গানের কয়েকটি লাইন পড়িলেই বুঝিব তাঁহার ঈশ্বরমুখিতার প্রকৃতি কি—

Arise, O Lord ; save me, O my God :
For Thou hast smitten all my enemies upon the cheek bone ;
Thou hast broken the truth of the wicked.[২৭]

২৫ চরিতকথা ২য় সংস্করণ ১৩৩১ পৃ ১৯০-১৯১

২৬ *Character Sketches*, 1957, p. 120

২৭ *The Book of Psalms* ৩

ডেভিডের ঈশ্বর শিষ্টের পালন করেন, দুষ্টের বিনাশ করেন। তিনি রাজ্যেশ্বরের রাজ্যেশ্বর, রাজা ও তাহার রাজ্যের রক্ষক। তাঁহাকে ডাকিতে হয়, তাঁহার জন্য পাগল হইতে হয় না। তিনি ভক্তকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত, ভক্তের সঙ্গ করিবার জন্য ব্যগ্র নন। Book of Psalmsএর ১৫০টি গানের মধ্যে ৭৩টি অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক ডেভিডের রচনা। এই গানসমূহের পরিবেশ কথা ভাব যে কোন্ যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তুল্য তাহা বুঝিলাম না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ হিব্রুসাহিত্যবিদ Robert Lowth ডেভিডের গান সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

In the sixty-third Psalm, the royal prophet, supposed to be then in exile in the wilderness, expresses most elegantly the sentiment of tenderness and love.[২৮]

কিন্তু এই tenderness and love মূলে পালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা। ডেভিডের ঈশ্বর দাক্ষিণ্যের ঈশ্বর, ক্ষমার ঈশ্বর। সে ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলিতে হয় না—

দোসর ওগো, দোসর আমার, দাও-না দেখা—
সময় হল, একার সাথে মিলুক একা।
নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতের বেলায়
অনেক দিনের দূরের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়—
তোমায় আমায় নতুন পালা হোক-না এবার
হাতে হাতে দেবার নেবার।[২৯]

ভক্তির এই বিচিত্র প্রকাশ বাইবেল গ্রন্থে নাই। খৃস্টধর্মাবলম্বী ধর্মসাধক গীতাঞ্জলির ঈশ্বরপ্রেমের দ্বারা মুগ্ধ হইবে। তিনি পণ্ডিত ও উদার ধর্মপ্রচারক হইলে এই দুই ধর্মসাধনার ঐক্য দেখাইয়া গ্রন্থও রচনা করিবেন। যে সুইডিশ অ্যাকাডেমির যে সমিতি রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করিলেন সেই সমিতির অন্যতম সদস্য উপ্‌সালার প্রধান গীর্জার ধর্মযাজক নাথাম সোডারব্লম ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের সঙ্গে খৃষ্টীয় ধর্মের তুলনা করিয়া গ্রন্থ লেখেন। তাঁহার নিমন্ত্রণে কবি উপ্‌সালার প্রধান গীর্জায় বক্তৃতা করেন। ইহা ধর্মসাধকের উদারতার সুন্দর দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইহাতে দুই ধর্মের যথার্থ ঐক্য প্রতিপন্ন হইল না।

ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টীয় ধর্মমতের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মমতের ঐক্য থাকিতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার সঙ্গে তাঁহার ঐক্য কোথায়? ইউনিটেরিয়ান একেশ্বরবাদী, রবীন্দ্রনাথও একেশ্বরবাদী। কিন্তু এই ঐক্য আমাদের আলোচনায় বড় স্থূল। তবে নিউ টেস্টামেন্টের দুঃখের ভগবান ভারতীয় কবির হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। খৃস্টধর্মের পাপ, পাপক্ষয় ও মুক্তির যে তত্ত্ব তাহা রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনায় নাই। রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাব যে খৃষ্টীয় ধর্মভাব হইতে ভিন্ন তাহা বড় সুন্দর ও সরল ভাষায় বলিয়াছিলেন নরওয়ের প্রসিদ্ধ লেখক জন বোয়ার—

২৮. *Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrew*, ৪র্থ সংস্করণ ১৮৩৯, পৃ ২৮৪

২৯ পূরবী

He is India bringing to Europe a new divine symbol, not the Cross, butt he Lotus.[৩০]

ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি আমাদের হৃদয়ে যেমন এক গভীর ঈশ্বরভক্তির সৃষ্টি করে, পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো ধর্মাবতারের কোনো অবস্থার ছবি তাহা করে না। ঐ ক্রুশ ঈশ্বরের মানব-প্রেমের এক ঐতিহাসিক নিদর্শন। তবু বলিব যে সেণ্ট পল যে ধর্মপ্রচার করিয়াছেন তাহার সঙ্গে গীতাঞ্জলির ধর্মভাবের বড় প্রভেদ।

য়িহুদী ধর্ম ও খৃস্টধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারি—

য়িহুদির জিহোবা এককালে মুখ্যত য়িহুদি জাতিরই পক্ষপাতী দেবতা ছিলেন। তিনি কী রকম নিষ্ঠুর, ঈর্ষাপরায়ণ ও বলিপ্রিয় দেবতা ছিলেন তা ওল্ড টেস্টামেণ্ট্ পড়লেই বোঝা যায়। সেই দেবতা ক্রমশ য়িহুদি সাধুঋষিদের বাণীতে এবং অবশেষে যিশুখৃস্টের উপদেশে সর্বমানবের প্রেমের দেবতা হয়ে প্রকাশ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে আজও যে দুই বিরুদ্ধভাব জড়িয়ে আছে তা লৌকিক ব্যবহারে স্পষ্ট দেখতে পাই।[৩১]

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যিশুকে মহাপুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন এবং ১৯১০ সালে শান্তিনিকেতনে তাঁহার আবির্ভাবের দিবস উপলক্ষে উৎসবের প্রবর্তন করেন।

বিপিনচন্দ্র পালের মূল বক্তব্য এই যে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রেমের বিস্তৃতি আছে, বৈচিত্র্য আছে কিন্তু বৈষ্ণব বা শাক্ত সাধকের গভীরতা তাহাতে নাই। যিনি বৈষ্ণব পদাবলী বা শাক্ত পদাবলী পড়িয়া বা শুনিয়া ভক্তিরসে ডুবিয়াছেন তিনি যদি গীতাঞ্জলির গানে অত রস না পান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি তিনি উপনিষদ্ পড়িয়া ঐরূপ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছেন কি না।—

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥[৩২]

নয়নের দ্বারা যাঁহাকে কেহ দেখে না, কিন্তু যাহার প্রভাবে লোকে নয়নসমূহকে উদ্ভাসিত করে, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান ; কিন্তু এই যাঁহাকে অনাত্ম বলিয়া উপাসনা করা হয়, তাঁহাকে নহে।

এই শ্লোক অদ্বৈতবাদের এক শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। ইহা ধর্মজ্ঞানের শেষ সীমা। কিন্তু এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়া কে কাঁদিয়াছে ?

ইহার পর পড়িয়া দেখ—

সখি কহবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল
তিয়াসে পরান যায় ॥[৩৩]

ইহা পড়িলে হৃদয় আর্দ্র হয় ; খোলকরতালের সঙ্গে শুনিলে নয়ন আর্দ্র হয়।

---

৩০ *The Golden Book of Tagore*, ১৯৩১ পৃ ৪০

৩১ কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৩১৮

৩২ কেন, ১।৭

৩৩ দ্বিজ চণ্ডীদাস, শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৩য় গ, পৃ ৬৬

তারপর পড়িয়া দেখ প্রসাদী গান—

দেখি মা, ক্যামন ক'রে, আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা।
এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো, খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা,
বৎস পাছে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা।

এ কথাতেও মজিয়া যাই। আর ভগবান ভক্তকে খোঁজেন এ ভাব রবীন্দ্রনাথেও দেখিয়াছি বহু কবিতায়। কিন্তু বৈষ্ণব কবি ও শাক্ত কবিকে বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ হইতে আরও গভীর বলিলেন কেন? উপনিষদ্ হইতে রামপ্রসাদ পর্যন্ত সকল সাধকেরই তত্ত্ব এক। ভারতীয় ভক্তিসাধনের মূলে বেদান্তের তত্ত্ব। সকলেরই এক তত্ত্ব, এক অনুভূতি। বৈষ্ণব কবি ও শাক্ত কবি যে আমাদের হিন্দুচিত্তকে এমনভাবে অভিভূত করে তাহার কারণ এই দুই শ্রেণীর কবিই পুরাণাশ্রয়ী ভক্তি-সাধনের ধারা অবলম্বনে তাঁহাদের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা যে ইষ্টদেবতার কথা বলিতেছেন তিনি শুধু সগুণ ঈশ্বর নন, তাঁহার মূর্তি বহু শতাব্দীর সংস্কারের, বিগ্রহ, আখ্যান ও পূজা-অর্চনার প্রভাবে আমাদের কল্পনায় সুপ্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই ভাব হয়, কেননা তিনি শুধু সগুণ ঈশ্বর নন, তিনি ঐতিহাসিক পুরুষ। আর তাঁহার লীলাসমূহ, প্রচলিত আখ্যানসমূহও এই ভক্তিভাবকে পরিপুষ্ট করে। অপরপক্ষে শাক্ত সাধকের শ্যামামায়ের কল্পনাও বহুকালের অর্চনার অভ্যাসে যেন বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব ও শাক্ত কবির যিনি ভক্তির পাত্র তাহাকে আমরা যেন প্রায় দেখিয়াছি; তিনি পরিচিত এবং স্পষ্ট। উপনিষদের ব্রহ্ম এখানে সগুণ এবং সাকার হইয়া উঠিয়াছেন। এবং যিনি সগুণ এবং সাকার তিনি সহজেই ভক্তহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন। বৈষ্ণব কবি এই স্পষ্ট মূর্তির উর্ধ্বে উঠিয়া কোনো অদৃশ্য সত্তার অন্বেষণে আমাদের মনকে প্রেরণ করেন না। বরং তাঁহার কৃষ্ণরূপের বর্ণনায় আমরা এমন বিমুগ্ধ হই যে উহার পশ্চাতে কোনো অরূপের সন্ধানের আর প্রবৃত্তি হয় না।

রামপ্রসাদ রসে ডুবিয়া তত্ত্ব ভোলেন না—

প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি, ও ভয়কে মাথে ধরেছি,
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি॥

রবীন্দ্রনাথ ভক্তিসাধনকে সম্পূর্ণভাবে পৌরাণিক ধর্মের রূপ কল্পনা হইতে বিযুক্ত করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষি ঋগ্‌বেদের ধর্ম হইতে যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ও শাক্ত কবির ভক্তিভাব হইতে ততদূর অগ্রসর হইয়াছেন। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ আর পরবর্তীকালের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ আর মধ্যযুগের ভক্তি রবীন্দ্রনাথে মিলিয়া এক নূতন রূপ পাইয়াছে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের দর্শন এবং এই অর্থে তাঁহাকে ঈশ্বরাদিষ্ট মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও উপলব্ধি করিয়াছেন যে তিনি প্রচলিত অর্থে ধর্মপ্রচারক না হইলেও তাঁহার মধ্যে একটি বিশিষ্ট ধর্মবোধের উন্মেষ হইতেছে—

ঠিক যাকে সাধারণ ধর্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, বলতে পারি নে। কিন্তু মনের ভিতরে ক্রমে ক্রমে যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠেচে তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো একটি নির্দিষ্ট মত নয়, এ একটি নিগূঢ় চেতনা একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব, আমার সুখ দুঃখ, অন্তর বাহির, বিশ্বাস আচরণ সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শাস্ত্রে যা লেখে, তার সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবনটাকে যে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব, সেই আমার চরম সত্য।[৩৪]

বঙ্গভাষার লেখক (১৩১১) গ্রন্থে প্রকাশিত এই আত্মপরিচয়মূলক প্রবন্ধে তিনি আরও যাহা বলিয়াছেন যদি তাহার মর্ম বুঝিতে পারি আমরা তাঁহার ঋষিত্বের স্বরূপ বুঝিতে পারিব—

তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোনো অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে— সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধিমন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ আমার অনাদি অতীত আর অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে।

কবি যেদিন এ কথা বলেন সেদিন আমাদের বুদ্ধি পাকিয়া গিয়াছে ; আমার এই ঋষিবাক্যকে দাম্ভিকের প্রলাপ বলিয়া উপহাস করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়িয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল—

রবিবাবুকে বিশেষ তীব্রভাষায় তিরস্কার করিয়া একখানা পত্র লেখেন ও তাহাতে তিনি জানিতে চাহেন যে, যথার্থই সেই আত্মজীবনীর মর্মানুসারে রবিবাবু তাঁহার সকল রচনা সম্পর্কেই divine inspiration (ঐশ্বরিক অনুপ্রাণনা) দাবি করেন নাকি ; এবং করিলে, বস্তুতঃ তিনি উহার কি ভাবে ব্যাখ্যা করিতে চাহেন।[৩৫]

এ বড় বুদ্ধির কথা। তার পর এই অর্ধ শতাব্দী পরে আমাদের বুদ্ধি আরও কত বেশি প্রখর হইয়াছে। আমরা আরও কত বেশি বুঝিতেছি। তবু বলিব, যাঁহার হিন্দু আধ্যাত্মিকতার সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানও হইয়াছে তিনি বলিবেন উপনিষদের ঋষি যেমন ঋষি রবীন্দ্রনাথও তেমনি একজন ঋষি।

রবীন্দ্রনাথকে ঋষি-কবি বলিলে তাঁহার গভীর ধর্মভাবের ও তাঁহার প্রকাশের কথাই বলা হইল। আর যদি বলি তিনি দার্শনিক তাহা হইলে ইহা বলা হইল যে তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা আবার পরিচ্ছন্ন চিন্তার সাহায্যে আমাদের বুদ্ধির গোচর করিয়া দিয়াছেন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে 'ধর্ম', ও শান্তিনিকেতন গ্রন্থের ১-১১ ভাগ ১৯০৯ জানুয়ারি হইতে ১৯১০ আগস্টের মধ্যে কুড়ি মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ যে কথা গীতাঞ্জলির গানে কাব্যরূপে প্রকাশিত তাহারই তত্ত্ব শান্তিনিকেতন উপদেশমালায়

৩৪ আত্মপরিচয়, পৃ ১১

৩৫ দেবকুমার রায় চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৩২৪, পৃ ৪৭৬

গদ্যে ব্যাখ্যাত। কবি রবীন্দ্রনাথ চিন্তাশীল ধর্মজ্ঞ দার্শনিককে আড়াল করিয়াছেন। আর এই কালের বাঙালির গানে যত আসক্তি, যোগ-ধ্যান-জ্ঞানে তত নয়। তাহা না হইলে রবীন্দ্রনাথ যে এ যুগে গীতায় উক্ত কর্মযোগের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। কথিত হয় যিনি শাস্ত্রের প্রচণ্ড ভাষ্যকার তিনি খুব কঠিন বস্তু সরল এবং অল্প কথায় বুঝাইতে পারেন। এখন দেখা যাক কর্মযোগ সম্বন্ধে কবি কি ভাষায় কি বলিলেন। শান্তিনিকেতন গ্রন্থের প্রথম ভাগে তিনি বলিলেন—

অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলেই কর্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার জন্মে—নইলে কর্মের সঙ্গে জড়ীভূত হয়ে আমরা কর্মেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়ি, আমরা কর্মী হই নে······ অতএব সংসারকে লাভ করতে হলে আমাদের সংসারের বাইরে যেতে হবে এবং কর্মকে সাধন করতে গেলে আসক্তি পরিহার করে আমাদের কর্ম করতে হবে··· যদি কর্মটা মুক্তিবিবর্জিত হয় তাহলে আমরা দাস হই আর যদি মুক্তি কর্মবিহীন হয়, তাহলে আমরা বিলুপ্ত হই। বস্তুত ত্যাগ জিনিসটা শূন্যতা নয়। তা অধিকারের পূর্ণতা।[৩৬]

এই কথাই কুড়ি বৎসর পরে তিনি *The Religion of Man* গ্রন্থে বলেন—

This renunciation is not in the negation of self, but in the dedication of it.[৩৭]

শান্তিনিকেতন প্রকাশের চার বৎসর পর *Sadhana* গ্রন্থে বলেন—

In the Gita we are advised to work disinterestedly, abandoning all lust for the result. Many outsiders conclude from this teaching that the conception of the world as something unreal lies at the root of the so-called disinterestedness preached in India. But the reverse is the truth.[৩৮]

মোট কথা এই যে রবীন্দ্রনাথ গীতার নিষ্কাম কর্মের যে ব্যাখ্যা শান্তিনিকেতন গ্রন্থে দিয়াছেন তাহা হইতে স্বচ্ছ হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা আর কোনো বাঙালী ভাষ্যকার দেন নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত, জটিল বিষয় সরল করিয়া বুঝাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার গীতাপাঠ গ্রন্থে (১৩২২)[৩৯] এই কর্ম-যোগের যে ব্যাখ্যা পড়ি, তাহা রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যার ন্যায় আসল কথাটি এমন সুন্দরভাবে বুদ্ধিগত ও হৃদয়গত করিতে পারে না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আমাদের ভাষায় শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গদ্যকার। কিন্তু তাঁহার জিজ্ঞাসা গ্রন্থের 'মুক্তি' প্রবন্ধে[৪০] মুক্ত পুরুষের কর্ম সম্বন্ধে যে প্রাঞ্জল বিচার লিখিত হইয়াছে বোধ হয় নিজেই এক মহৎ শাস্ত্র হইয়া ওঠে নাই। শান্তিনিকেতন গ্রন্থ মহৎ শাস্ত্রগ্রন্থ। উহা দেব-ভাষায় লিখিত না হইলেও দৈব সামগ্রী।

---

৩৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩, পৃ ৪৬২

৩৭ পৃ ১৮২

৩৮ পৃ ১৯

৩৯ পৃ ২৬৪-২৬৬

৪০ রামেন্দ্র-রচনাবলী ১খ, পৃ ৪২৩

বস্তুতঃ ভক্তিশাস্ত্রের সারকথা এই শান্তিনিকেতন গ্রন্থে বিধৃত। আমরা যাহারা প্রতিবৎসর পূজা-উৎসবে প্রবল ভক্তির বশে মাতামাতি করি, আমার বোধ হয় এই তত্ত্বের বড় গোঁড়া হইতে পারিব না। শান্তিনিকেতন দ্বিতীয় ভাগের 'বিকারশঙ্কা' প্রবন্ধের কয়েকটি কথা জ্ঞান ও ভক্তি ও কর্ম এই তিনের একাত্মতা সম্বন্ধে শেষ কথা—

প্রেম যদি সত্য থেকে জ্ঞান থেকে চুরি করে মত্ত হয়ে বেড়ায়, তার সংযম ও ধৈর্য নষ্ট হয়, তার কল্পনাবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে তবে সে নিজের প্রতিষ্ঠাকে নিজের হাতে নষ্ট করে নিজেকে লক্ষ্মীছাড়া করে তোলে,…এ সাধনা কঠিন সাধনা, এ পুণ্যের সাধনা, কর্মের সাধনা।[৪১]

এই কথার ভাবটি আট বৎসর পূর্বে প্রকাশিত নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের অপ্রমত্ত কবিতায় ব্যক্ত—

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীত গানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞান হারায়
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল ফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি, নাথ॥

এখন প্রশ্ন উঠিবে এই— আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ ঋষি ছিলেন মানিলাম, কিন্তু ঋষি হইয়া নূতন কথা তিনি কি বলিলেন? তিনি দার্শনিক মানিলাম, কিন্তু তাঁহার দার্শনিকতায় মৌলিকতা কোথায়? অনেকে বলিবেন, লোকটি অনেক কথা বলিয়াছেন এবং বেশ সুন্দর ভাবেই বলিয়াছেন, কিন্তু নূতন কথা একটিও বলেন নাই। আমি বলিব রবীন্দ্রনাথের সব কথাই নূতন, সব কথাই মৌলিক। কিন্তু তৎপূর্বে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি। পৃথিবীর চিন্তার ইতিহাসে বা কার্যের ইতিহাসে যত মহাপুরুষের মহৎ কীর্তির প্রভাব লক্ষিত হয় তাহার মধ্যে কয়টি কীর্তি প্রকৃত অর্থে মৌলিক? যাহা আদৌ মৌলিক তাহা কিম্ভূতকিমাকার বস্তু। যে কর্ম বা চিন্তা মানবমনের স্বাভাবিক গতি হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন, যাহা সভ্যতার বিবর্তনের ধারা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র বলিয়া নূতন সৃষ্টি-রূপে দেখা দেয় তাহা আসলে অনাসৃষ্টি। আধুনিক কাব্যে বা আধুনিক চিন্তায় যাহা বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য তাহা মূলতঃ বিকৃত। আর যাহা স্বাভাবিক অবিকৃত তাহা মানবমনের অন্তঃস্থল হইতে উঠে বলিয়া যেমন নূতন তেমনই পুরাতন। যে নবত্বের বংশমর্যাদা নাই, যাহার কুলমান নাই, তাহা সভ্যতার ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।

গান্ধীজির অহিংসার নূতনত্ব কোথায়? অহিংসার কথা বুদ্ধ বলিয়াছেন, যীশু বলিয়াছেন, চৈতন্য বলিয়াছেন। গান্ধীর মহৎ কীর্তি তিনি মানুষের একটি পরিচিত আদর্শকে এক বিশেষ কর্মে প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার তত্ত্বের ইতিহাসে দেখ, গীতার কথা উপনিষদে পাইবে আবার উপনিষদের অন্ততঃ কয়েকটি কথা ঋগ্‌বেদে পাইবে। মধ্যযুগের ভক্তিদর্শনে উপনিষদ্ ও গীতার প্রভাব লক্ষ্য করিবে। চিন্তা ও ভাবের এই পরম্পরার মধ্যেই যুগ বা ব্যক্তির প্রতিভার বিকাশ।

৪১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪৭৮-৪৮১

যাহা অভিনব তাহা যদি সম্পূর্ণভাবে আভিজাত্যবর্জিত হয় তাহা হইলে সেই অভিনবত্ব ইতিহাস গ্রহণ করে না।

সত্যের এই বিশ্বরূপ ও বিশিষ্ট রূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা স্পষ্ট। ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিকের সবুজ পত্রে 'আমার ধর্ম' নামে এক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

মানুষের প্রত্যেকের মধ্যে সত্যের একটি বিশ্বরূপ আছে, আবার সেই সঙ্গে তার একটি বিশেষ রূপ আছে। সেইটেই হচ্ছে তার বিশেষ ধর্ম।[৪২]

রবীন্দ্রনাথ কোনো নূতন মতবাদ প্রচার করিবার কথা ভাবেন নাই। কোনো নূতন কথা তাঁহার বলিবার আছে এমন আভাসও তিনি কোথাও দেন নাই। কিন্তু সমস্ত জীবনের সাধনার মধ্যে যে সত্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষের চিন্তার ইতিহাসের এক নূতন সামগ্রী। সত্য যখন ব্যক্তির জীবনে সার্থক হইয়া ওঠে তখন তাহা একটি বিশেষ মূর্তি পরিগ্রহ করে। এই বিশিষ্টতার মধ্যেই নূতন সৃষ্টি পাইলাম। এই 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

অবশ্য এ কথা মানতে হবে যে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যা-কিছু প্রকাশ সে হচ্ছে পথ-চলতি পথিকের নোট-বইয়ের টোকা কথার মতো। নিজের গম্যস্থানে পৌঁছে যাঁরা কোনো কথা বলেছেন তাঁদের কথা একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁরা নিজের কথাকে নিজের বাইরে ধরে রেখে দেখতে পান। আমি আমার তত্ত্বকে তেমন করে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখি নি। সেই তত্ত্বটি গড়ে উঠতে উঠতে বেড়ে চলতে চলতে নানা রচনায় নিজের যে-সমস্ত চিহ্ন রেখে গেছে সেইগুলিই হচ্ছে তার পরিচয়ের উপকরণ।[৪৩]

এই তত্ত্বই আধ্যাত্মিক জীবনের আসল তত্ত্ব—ইহা সাধনার পথে অগ্রসর হইবার তত্ত্ব। যে তত্ত্ব একে একে দুইএর মত বুঝিলাম বা বুঝাইলাম তাহা সাধনের তত্ত্ব হইতে পারে না।

এই কথাই আবার তিনি বলিয়াছেন তাঁহার *The Religion of an Artist* পুস্তিকায়—

My religion is essentially a poet's religion. Its touch comes to me through the same unseen and trackless channels as does the inspiration of my music, My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetical life.[৪৪]

এই পুস্তিকায় তিনি 'রিলিজন'কে 'ডগ্‌মা' হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বলিয়াছেন—

Gladness is the one criterion of truth as we know when we have touched Truth by the music it gives, by the joy of the greeting it sends forth to the truth in us. That is the true foundation of all religions, it is not in dogma.[৪৫]

---

৪২ আত্মপরিচয়, পৃ ৩৯

৪৩ আত্মপরিচয়, পৃ ৪৩

৪৪ পৃ ১০

৪৫ পৃ ১২

রবীন্দ্রনাথের দর্শন বুঝিতে হইলে তাঁহার কাব্য বুঝিতে হইবে, আবার তাঁহার কাব্য বুঝিতে হইলে তাঁহার দর্শনের সন্ধান লইতে হইবে। দর্শন ও কাব্যের এই একাত্মতা তিনি বড় সুন্দর বুঝাইয়াছিলেন কলিকাতায় প্রদত্ত তাঁহার এক বক্তৃতায়। এখানে মনে রাখিতে হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যে দর্শন পড়াই অথবা দর্শন সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তি যে সব গ্রন্থ বা থীসিস্ লেখেন সেই সব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বড় উৎসাহ ছিল না। মোহিতচন্দ্র সেনের প্রণীত *Elements of Moral Philosophy* নামে গ্রন্থখানি পাইয়া তিনি গ্রন্থকারকে এক পত্রে লেখেন—

আমি দার্শনিক বই প্রায় পড়ি নাই— ভয় হয় পাছে যাহাকে সহজ বলিয়া জানি তাহার কঠিন স্বরূপ দেখিয়া আতঙ্ক জন্মে। সমস্ত প্রকৃতি দিয়া যাহাকে অনুভব করা যায় তাহাকে কেবল মাথা দিয়া দেখিতে গেলে অনেকটা অংশ হাঁ হাঁ করে— তাহার সকল স্থানে সমান আলোকপাত হয় না— ধর্ম, ধর্মনীতির মূলে যে বিশ্বব্যাপী স্বয়ম্ভু আনন্দ আছে তাহাকে প্রমাণের মধ্যে কেমন করিয়া আনা যায় এবং তাহাকে বাদ দিয়া ধর্মকে দেখিতে গেলে শাস্ত্রবিরোধের মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়।··· ফিলজফির সিস্টেমগুলি দেখিলে আমার ভয় হয়। এই আতঙ্ক আমার প্রকৃতিগত মূল জ্ঞানকে মাতৃস্তন্যের মত শোষণ করিয়া লইবার জন্য আমার আশঙ্কা— তাহাকে চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া রন্ধন করিয়া লইতে আমার রুচি হয় না। বোধহয় এ সম্বন্ধে আমার আবদার বেশি বলিয়া আমি একেবারে পেতে চাই পরশরতন।[৪৬]

ইহার প্রায় পঁচিশ বৎসর পর ১৯২৬ সালে ভারতীয় দর্শনমহাসভার প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। ১৯শে ডিসেম্বর সভাপতি হিসাবে সেনেট হলে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা ক্যালকাটা রিভিউতে প্রকাশিত হয়।[৪৭] ধর্ম, দর্শন ও কাব্যের একাত্মতা সম্বন্ধে তিনি এই বক্তৃতায় যে কয়টি কথা বলেন, তাহা বোধ হয় আজ আমরা একরকম বিস্মৃত হইয়াছি। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে কবির এই উক্তিসমূহের মূল্য নিরূপণ করিবার সময় আসিয়াছে। ইহাতে তিনি দর্শন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে

দর্শনের চরম লক্ষ্য সাধারণের জীবনকে অধিকার করা, বিদগ্ধমণ্ডলীর রুদ্ধদ্বার খাস কামরা আশ্রয় করা নয়।[৪৮] ভারতে কাব্য ও দর্শন হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। জীবনে পূর্ণতালাভের সহজ ও সম্ভব পথটি মানুষকে ধরাইয়া দিবার দায়িত্ব দর্শন গ্রহণ করিয়াছে এটি ভারতবর্ষে সম্ভব হইয়াছে।[৪৯]

রবীন্দ্রনাথ এই অর্থেই দার্শনিক। নিছক তর্কের মধ্যে যে উন্মাদনা আছে তাহা তিনি সারা জীবন বর্জন করিয়া চলিয়াছেন। বিদ্যাবত্তার অহমিকা তাঁহাকে কোনোদিন স্পর্শ করে নাই। অপরের মত খণ্ডন করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোনোদিন ব্যস্ত হন নাই। গভীর ঈশ্বরবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশ ও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিজের সকল কর্ম ও চিন্তা

৪৬ পত্র, ১২ জানুয়ারি ১৯০২, রবীন্দ্রজীবনী ২, পৃ ৮৯

৪৭ বক্তৃতাটির বাংলা অনুবাদ বঙ্গবাণী ও প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়, মাঘ ১৩৩২

৪৮ বঙ্গবাণী, পৃ ৭৫৮

৪৯ বঙ্গবাণী, পৃ ৭৬২

নিযুক্ত করিয়া যাহা সুন্দর পবিত্র ও শাশ্বত তাহার সাধনার পথে যে সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন তাহাই সাধ্যমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এমন মানুষের ভাব ও চিন্তার মহিমা বুঝিতে হইলে আমাদের তাঁহার সমস্ত রচনা এক মহাশাস্ত্র এই জ্ঞানে সযত্নে তাহা পাঠ করিতে হইবে। হিন্দু কবিকে হিন্দু দর্শন দিয়া চিনিয়া লইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের *Sadhana* (১৯১৩) *Personality* (১৯১৭) *Creative Unity* (১৯২২) এবং *The Religion of Man* (১৯৩১) এই ইংরাজি গ্রন্থ চারখানির আজকাল বড় সমাদর দেখি না। পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলিবেন যে ইহার মধ্যে কতগুলি পুরানো কথা একটু ফেনাইয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থ চারিখানিতে হিন্দুর ভাব, আদর্শ, তাহার ধর্ম, নীতি, দর্শন যে ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, এ যুগের কোনো দার্শনিকের কোনো গ্রন্থে তেমন পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া জানি না। কবি যদি নিজের সাধনায় যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা সরল ভাষায় না লিখিয়া বেদ বেদান্ত গীতা ও তাহার নানা ভাষ্য হইতে রাশি রাশি উদাহরণ তুলিতেন, তাহার উপর প্লেটো কাণ্ট হেগেল হইতেও কঠিন কঠিন বাক্য চয়ন করিতেন তাহা হইলে হয়ত অন্ততপক্ষে পণ্ডিতমহলে এই সব গ্রন্থের নাম উচ্চারিত হইত। কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ হিন্দুর ধর্মসাধনার মূলে সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা এই চারিখানি গ্রন্থে সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম, শান্তিনিকেতন উপদেশমালা ও চারিখানি ইংরাজি গ্রন্থ হইতে রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শনের যে পরিচয় পাই তাহা এক দিকে যেমন দ্বৈতাদ্বৈত্বাদের তত্ত্ব তেমন আবার অন্যদিকে ব্রহ্ম জীব ও বিশ্বচরাচর সম্বন্ধে এক নূতন তত্ত্ব। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথে উপনিষদের তত্ত্ব এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

জীবনপ্রবাহের মধ্যে যে অনন্ত রহস্য, মানবসভ্যতার বিবর্তনের মধ্যে যে ঈশ্বরের লীলা এবং স্রষ্টা যে তাঁহার সৃষ্টি ব্যতীত অসম্পূর্ণ, অর্থাৎ জীব যেমন ঈশ্বর খোঁজেন, ঈশ্বরও তেমন জীবকে খোঁজেন এ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ হইতে সৃজন করিয়াছেন—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম ?[৫০]

ইহা দ্বৈতাদ্বৈতবাদের নূতন ব্যাখ্যা।

ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে।[৫১]

৫০ চিত্রা

৫১ চিত্রা

অথবা—

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।[৫২]

ইহা নূতন উপনিষদের নূতন মন্ত্র। 'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি' ইহা এখন যেন বড় সাধারণ কথা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও দর্শনের প্রাণবস্তু। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ নূতন মন্ত্রের দ্রষ্টা।

তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন্,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্র কান্ত। ওগো বিশ্বভূপ
দেহে মনে প্রাণে আমি এক অপরূপ॥

Personality গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন—

By following the poet of Isha-Upanishat we have come to the meaning of all reality, where the infinite is giving himself out through finitude. Reality is the expression of personality, like a poem, like a work of Art. The Supreme Being is giving himself in his world and I am making it mine, like a poem which I realize by finding myself in it. If my own personality leaves the centre of my world, then in a moment it loses all its attributes. From I know that my world exists in relation to me, and I know that it has been given to the personal *me* by a personal being. The process of the giving can be classified and generalized by Science, but not the gift. For the gift is the Soul unto the Soul, therefore it can only be realized by the Soul in joy, not analysed by the reason in logic.[৫৩]

উপনিষদের কথা এই যে এক বহু হইলেন এবং এই বহুর মুক্তি যিনি অদ্বৈত তাঁহার জ্ঞানে। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর এই বহুর মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিয়া যে মহৎ ও আনন্দময় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তিনি জীবের সহিত একত্রে ভোগ করিতেছেন। রামপ্রসাদের কথা ছিল—

নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
(ওরে) চিনি হওয়া ভালো নয় মন, চিনি খেতে ভালোবাসি।

রবীন্দ্রনাথ আরও অগ্রসর হইলেন। এই ভক্তিতত্ত্বের সঙ্গে এক নূতন জ্ঞান মিশাইলেন, তিনি বলিলেন ঈশ্বরও আস্বাদের আকাঙ্ক্ষা রাখেন, এবং সেই আকাঙ্ক্ষাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতি ও বৈচিত্র্যের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। পরম বৈদান্তিক বলিলেন দ্বৈতভাব ভক্তের খাতিরে। রবীন্দ্রনাথ বলিবেন অদ্বৈত দ্বৈতের মুখাপেক্ষী। ঈশ্বর যদি সৃষ্টিনিরপেক্ষ হন, তাহা হইলে সৃষ্টি অর্থহীন হয়, আর ঈশ্বরও সৃষ্টিছাড়া বস্তু হইয়া পড়েন। মোক্ষলাভ করিয়া ব্রহ্মে লীন

৫২ নৈবেদ্য, ৩০
৫৩ পৃ ৬৯

হইলাম, এমন-কি ব্রহ্মজ্ঞানও লোপ পাইল এমন অন্ধকারময় বিষম অদ্বৈতবাদ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই। শংকরাচার্য বলেন—

অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাস্যাৎ বিনির্মলম্।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং পশ্যেৎ জলং কতকরেণুবৎ॥

কতক-রেণু যেমন জলের ময়লা নাশ করিয়া নিজেও নাশ পায়, জ্ঞান তেমনি অজ্ঞানতা নাশ করিয়া নিজেও নাশ পায়।

এমন সর্বনাশা মুক্তি রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন চান নাই। বলিতে পারি রবীন্দ্রনাথের মুক্তি গীতার মুক্তি। সে মুক্তি সাংখ্যের কৈবল্য হইতে পৃথক। বৈষ্ণব ভক্তের সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য এই মুক্তির সামিল বলিয়া মনে করি না। তবে গীতার মুক্তিতে ব্যক্তির নাশ নাই, আর আনন্দের আস্বাদ আছে, এমন-কি কর্মও আছে। গীতাকার (৫।২৫) মোক্ষ বা মুক্তি বলিতে বুঝেন ব্রহ্মনির্বাণ—

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণং ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥

ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন কাহারা—যে সকল ঋষি-প্রকৃতির লোক ক্ষীণপাপ, সংশয়শূন্য, সংযতাত্মা এবং সর্বভূতেহিতে রত।

দেখিতেছি গীতার মুক্তপুরুষ জ্ঞানী গুণী পরহিতব্রতী কর্মী। এই মুক্তির মধ্যে কিছু না থাকার বা কিছু না হওয়ার ভয় নাই অর্থাৎ ইহা কর্মযোগীর মুক্তি।

এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দিরমাঝে।

তি ন পু রু ষ

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

দ্বারকানাথ ঠাকুর

রা ম মো হ নে র যু গ থেকে একাদিক্রমে তিনপুরুষ ধরে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ইতিহাসে অধ্যায়ের পর উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার। সেই কাহিনীর শুরু দ্বারকানাথ (১৭৯৪-১৮৪৬) থেকে।

দ্বারকানাথের জন্ম হয় রামমোহনের জন্মের বাইশ বছর পরে। কয়েক পুরুষ ধরে তাঁর পূর্বপুরুষেরা কলকাতায় বাস করছিলেন। ক্রমে এই ঠাকুর-বংশ দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাঁদের বাসস্থান অনুসারে তাঁরা পরিচিত হন পাথুরিয়াঘাটা বা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার হিসেবে।

ইংরেজি শিক্ষায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের হাতেখড়ি হয় চিৎপুর রোডের শেরবোর্ন সাহেবের ইস্কুলে ও এই শিক্ষা পাকা হয় রেভারেণ্ড উইলিয়ম অ্যাডাম্‌স্‌ সাহেবের কাছে। তা ছাড়া তখনকার গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ইংরেজদের সঙ্গে কিশোর বয়স থেকেই দ্বারকানাথের যে অন্তরঙ্গ যোগাযোগের সূত্রপাত হয় তার ফলে তিনি রীতিমত একজন ইংরেজিনবিশ হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রভাব ছিল রামমোহনের। তাঁর চরিত্রের সহজাত ঔদার্য রামমোহনের সংস্পর্শে এসে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

যে সামান্য সম্পত্তি তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে তাঁর উপর অতি অল্পবয়স থেকেই। এই সূত্রে নানা আদালতে ঘোরাফেরা তাঁকে করতে হত। তার ফলে তিনি কিছুদিন পরে দস্তুরমত আইনজ্ঞ হয়ে পড়েন ও স্বাধীনভাবে আইনব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে দেখতে দেখতে তাঁর পসার জমে উঠল। কিন্তু তাঁর মেধা ছিল এমন তীক্ষ্ণ ও কর্মশক্তি এমন বিচিত্র যে বিস্তৃত আইনব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়েও প্রভূত সার্থকতা অর্জন করেন।

দ্বারকানাথ যখন এইভাবে দিনে দিনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছেন তখন চব্বিশ পরগনার সল্ট এজেন্ট ও কালেক্টারের দেওয়ানের পদ খালি হয় ও দ্বারকানাথ সেই পদে নিযুক্ত হন— বেতনের লোভে নয়, কেননা ব্যবসায় থেকে তিনি যে উপার্জন করতেন, তার তুলনায় বেতন ছিল অতি নগণ্য, কিন্তু এই সরকারি পদটির উচ্চ মর্যাদা তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি।

এই পদে দ্বারকানাথ তাঁর উর্ধ্বতন কর্মচারীদের আস্থা যে কি পরিমাণে অর্জন করেছিলেন

তার প্রমাণ যে ছয় বৎসর পরে কাস্টম্স্ সল্ট ও রেভেনিউ বোর্ডের দেওয়ানের পদে তাঁকে উন্নীত করা হয়।

দ্বারকানাথের অপরিসীম কর্মশক্তি চাকুরির সংকীর্ণ পরিসরে বেশিদিন আবদ্ধ থাকতে পারে নি। ১৮৩৪ সালে দ্বারকানাথ প্রবৃত্ত হলেন স্বাধীন ব্যবসায়ে এবং এর অল্পদিন পরেই উইলিয়ম কার ও উইলিয়ম প্রিন্সেপ এই দুই সাহেবের সহযোগিতায় স্থাপিত করলেন কার-ঠাকুর কোম্পানি। ব্রিটিশ-ভারতীয় ব্যবসার ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এর জন্যে তখনকার বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক দ্বারকানাথকে চিঠিতে অভিনন্দন জানান। পরে দ্বারকানাথের দুই পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ এই কোম্পানির অংশীদার হয়েছিলেম। প্রসন্নকুমার ঠাকুরও এখানে কিছুকাল চাকুরি করেন।

ইতিপূর্বেই, গর্ডন, কলডার, পামার ও কর্নেল ইয়ং-এর সহযোগিতায় দ্বারকানাথ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নামে বিখ্যাত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— যার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন রমানাথ ঠাকুর। তখনকার দিনের পক্ষে বিরাট ব্যাঙ্ক ছিল ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক হল তার প্রতিদ্বন্দ্বী— এই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন স্বয়ং দ্বারকানাথ ঠাকুর। একাধিকবার নিজের তহবিল থেকে টাকা দিয়ে দ্বারকানাথ এই ব্যাঙ্কটির ইজ্জত রক্ষা করেছিলেন।

দ্বারকানাথ-প্রতিষ্ঠিত এই দুটি প্রতিষ্ঠানের পশার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকানাথ অধিকার করলেন এই দেশের শ্রেষ্ঠীদের মধ্যে শীর্ষস্থান। কিন্তু দ্বারকানাথ শুধু পয়সা রোজগার করে ক্ষান্ত হন নি— পয়সা খরচও তিনি করতেন দু হাতে। তাঁর দানের অন্ত ছিল না। দ্বারকানাথের সমসাময়িক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এমন একটিও ছিল কিনা সন্দেহ তাঁর দানে যা সমৃদ্ধ হয় নি। তা ছাড়া দ্বারকানাথের অতিথি-আপ্যায়নও ছিল রীতিমত রাজকীয় ব্যাপার। দ্বারকানাথ ছিলেন যেমন বিলাসী তেমনি উন্নতরুচিসম্পন্ন। উত্তরকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার যে বিশেষ রুচির জন্য খ্যাতিলাভ করে তার উৎস দ্বারকানাথ ঠাকুর।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, দ্বারকানাথ তাঁদের অন্যতম। রামমোহনের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, এই শিক্ষার যোগ্যতম বাহন ইংরেজি। সে সময় সরকারী মহলে এ বিশ্বাস ছিল যে একসঙ্গে বহুলোককে শিক্ষা না দিয়ে অল্পসংখ্যক লোককে ভালো করে শিক্ষা দিলে তা উচ্চশ্রেণীর থেকে নিম্নতর শ্রেণীগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। এই মতবাদ যা downward filtration theory of education বলে খ্যাত, দ্বারকানাথ ছিলেন তার একজন প্রধান সমর্থক। বিখ্যাত হিন্দুকলেজের পরিচালক-সমিতির সভ্য হিসাবে এই কলেজটি যাতে সার্থকতা লাভ করে তার জন্য দ্বারকানাথ বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

১৮৩৫ খৃস্টাব্দে ১লা জুন কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। দ্বারকানাথ এই কলেজের মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক দু হাজার টাকা দান করেন। শুধু

দ্বারকানাথ ঠাকুর

কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের অভিপ্রায়ক্রমে এফ. আর. সে অঙ্কিত চিত্র হইতে জি. আর. ওঅর্ড কৃত এনগ্রেভিং
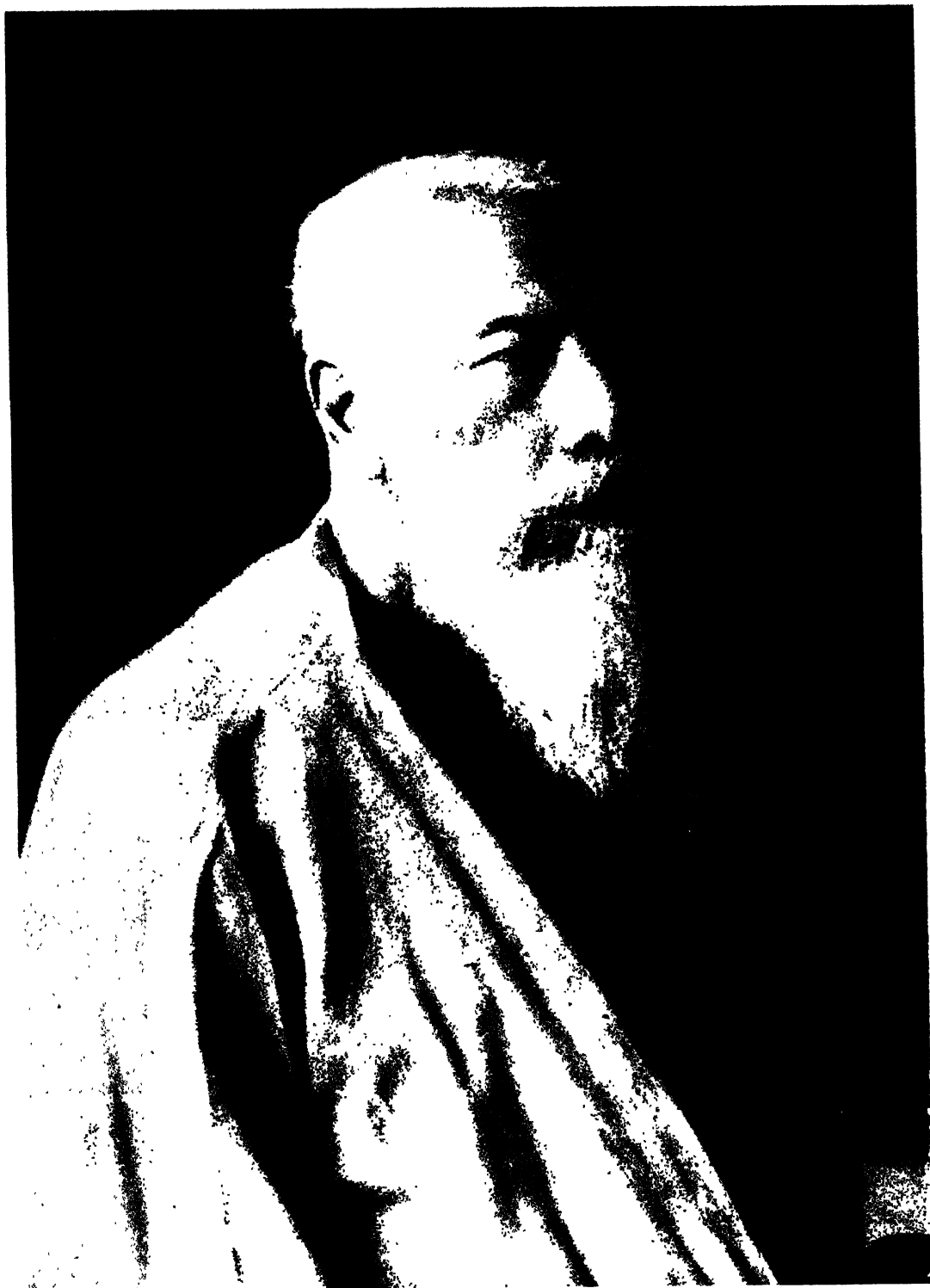
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

তাই নয়, এই কলেজে শিক্ষার পথে তখন প্রধান অন্তরায় ছিল প্রচলিত হিন্দুসংস্কার। দ্বারকানাথ তাই স্বয়ং উপস্থিত থেকে ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন শবব্যবচ্ছেদে। ঐরকম প্রভাবশালী লোকের সমর্থন না পেলে হয়তো কলেজটির উদ্দেশ্য একেবারে গোড়াতেই বানচাল হয়ে যেত।

সতীদাহ নিবারণের আন্দোলনে দ্বারকানাথ ছিলেন রামমোহনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি (জমিদারদের সমিতি) স্থাপনে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন দ্বারকানাথ তাঁদের অন্যতম। এই সমিতি তখনকার দিনের একটি প্রধান প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হয়েছিল। ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডের মধ্যে স্টীমার চলাচলের ব্যবস্থার জন্য যে আন্দোলন হয় দ্বারকানাথ ছিলেন তার পুরোধা।

১৮২৪ সালে কুখ্যাত প্রেস অ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়। এর ফলে এই দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যথেষ্ট সংকুচিত হয়েছিল।

তখন এই আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে যে আবেদন পেশ করা হয় তারা সমর্থন করেছিলেন মাত্র চারজন, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও দ্বারকানাথের দুইজন আত্মীয় ; তাঁদের আবেদন গ্রাহ্য হয় নি। এগারো বৎসর পরে ১৮৩৫ সালে এক বিরাট জনসভায় এই আইন রহিত করার অনুরোধ জানিয়ে তখনকার গভর্নর জেনারেল উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের কাছে এক আর্জি পেশ করা হয়। এই সভারও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দ্বারকানাথ। এই আইন যদিও তখন রহিত হয় নি তবু লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বিশ্বাস করতেন উদার শাসননীতিতে। তাই কোনো দেশীয় সংবাদ-পত্রের বিরুদ্ধে তিনি কোনো কড়া ব্যবস্থা প্রয়োগ করেন নি। এর পর সার চার্লস মেটকাফের আমলে ভারতীয় সংবাদপত্র তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরে পায়। তখনকার নেতৃবৃন্দ এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন যে দ্বারকানাথের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ছাড়া এ সাফল্য অর্জন করা যেত না।

মফস্বলে পুলিস ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যপ্রসঙ্গে দ্বারকানাথ প্রস্তাব করেন যে দেশের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে দেশীয় লোকদের যোগ থাকা প্রয়োজন। এই প্রস্তাব অনুসারে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদের সৃষ্টি হয়। এই পদে তখন নিয়োগ করা হত উচ্চবংশের সন্তানদের ও হিন্দুকলেজের মেধাবী ছাত্রদের। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম স্মরণীয়।

দ্বারকানাথ সরকারী ও বেসরকারী উভয় মহল থেকেই তাঁর যোগ্য সম্মান লাভ করেছিলেন। সমসাময়িক আর কোনো ভারতবাসী তাঁর মত প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পেরেছিলেন কি না সন্দেহ। গভর্নর-জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড প্রায়ই তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। দ্বারকানাথ ঘন ঘন নিমন্ত্রণ পেতেন লর্ড অকল্যাণ্ডের ব্যারাকপুরের বাগানবাড়িতে।

ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম জাস্টিস অব দি পিস্ নিযুক্ত হন দ্বারকানাথ। সে সময় এই পদ বিশেষ সম্মানার্হ ছিল।

১৮৪১ সালের শেষের দিকে দ্বারকানাথের মনে বিদেশযাত্রার সংকল্প উদয় হয়। এই

সংকল্প প্রচার হবার পর স্থির হয় টাউন হলে এক সভায় তাঁকে বিদায়সংবর্ধনা জানানো হবে। এই-জাতীয় সভা এর আগে কখনো হয় নি। এই সভায় দ্বারকানাথ বলেন—

আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য স্বদেশের উন্নতিসাধন। ইংলণ্ডের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক রীতিনীতি এই উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ সহায়তা করতে পারে আমার এই স্থির বিশ্বাস। আরও অনেকে, বিশেষভাবে আমার পরলোকগত বন্ধু রামমোহন রায় ইতিপূর্বেই এ কাজে অগ্রণী হয়েছেন। আমি তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।

কলকাতা শহর থেকে দ্বারকানাথ বিলেত রওনা হলেন 'ইণ্ডিয়া' জাহাজে, ১৮৪২ খৃস্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি। দ্বারকানাথের সঙ্গ নিলেন তাঁর চিকিৎসক ডক্টর ম্যাক্‌গাওয়ান, ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, পরমানন্দ মৈত্র ও চারজন ভৃত্য।

তখন সুয়েজের খাল ছিল না। সুতরাং সুয়েজে পৌঁছে দ্বারকানাথ জলপথ ছেড়ে ধরলেন স্থলপথ। মিশর দেশে কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া শহর ঘুরে আবার ভূমধ্যসাগর পাড়ি। তার পর ইটালি ফ্রান্স জর্মানি ভ্রমণ করে (জর্মানিতে প্রাশিয়ার প্রিন্স ফ্রেডারিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়) দ্বারকানাথ ১৮৪২ সালের ১০ই জুন লণ্ডনে পৌঁছান। সেখানে বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিৎ উইলিয়ম প্রিন্সেপের মায়ের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে দ্বারকানাথ প্রভূত সংবর্ধনা লাভ করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্‌টর্স ও মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়া দ্বারকানাথকে তিনটি স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন। ঐ তিনটি মুদ্রাই সেইদিনই টাঁকশাল থেকে বের হয়েছে।

প্যারিসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টারবর্গ স্বদেশের হিতার্থে নানা সৎকাজের জন্য তাঁকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেন। এই উপলক্ষ্যে দ্বারকানাথকে একখানি লিখিত চিঠিতে তাঁরা বলেন— তাঁরা এই আশা পোষণ করেন তাঁদের যে ঐকান্তিক বাসনা, ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজের মৈত্রীবন্ধন, দ্বারকানাথের প্রয়াসের ফলে তা সফল হবে।

১৮৪২ খৃস্টাব্দের শেষাশেষি দ্বারকানাথ দেশে ফিরলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুরা উচ্চৈঃস্বরে ধুয়ো তুললেন যে, দ্বারকানাথ কালাপানি পার হয়েছেন, তদুপরি বিজাতীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে পানাহার করেছেন, অতএব তিনি জাতিচ্যুত— তাঁর প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন, নতুবা তাঁকে একঘরে করা হবে। দ্বারকানাথ অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত করেন নি। আর তাঁকে একঘরে করে এমন সাহস কার ছিল। কিছুদিন চলে সেই আন্দোলন আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

এর পর দ্বারকানাথ আবার মন দিলেন জনহিতকর কাজে। তাঁর বিশেষ চেষ্টা ছিল হিন্দু মেয়েরা যাতে মেমসাহেবদের কাছে শিক্ষা পায় এইজন্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সে ইচ্ছা সফল হয় নি। ডাক্তারি শিক্ষার প্রসারের চেষ্টার কথা আগেই বলা হয়েছে। বিলেত থেকে ফিরে দ্বারকানাথ প্রস্তাব করলেন যে দুইজন বাঙালির ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়ে সেখানে ডাক্তারি পড়ানোর সমস্ত ব্যয় তিনি বহন করবেন। তখনকার সরকার এই প্রস্তাবে সায় দিয়ে

নিজেরাও অনুরূপ একটি প্রস্তাব করেন। ফলে চারজন বাঙালিসন্তান বিলেতে গিয়ে ড. গুডইভ-এর কাছে শিক্ষাসমাপন করে বিলিতি খেতাব নিয়ে দেশে ফিরলেন। এঁদেরই একজন পরে গুডিভ চক্রবর্তী নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

দ্বারকানাথ ১৮৪৫ সালে আবার বিলেতে যান। দেশ থেকে ৮ই মার্চ রওনা হয়ে প্যারিস শহরে একাধিকবার ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপের নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত থেকে তিনি লণ্ডনে পৌঁছান ২৪-এ জুন।

দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার বিলেতে গিয়ে মৃত্যুর আগে একমাসকাল যে হোটেলে ছিলেন তার মালিকের সঙ্গে দেখা করে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারকানাথ সম্বন্ধে অনেক খবর সংগ্রহ করে 'আমার বাল্যকথা'য় লিখে গিয়েছেন। এই বিবরণ থেকে জানা যায়—

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সর্ব্বশুদ্ধ ১৭জন অনুচর ছিল, তার মধ্যে দুইজন এদেশীয় ভৃত্য। তা ছাড়া একজন সেক্রেটারি, একজন Interpreter, সংগীত-ওস্তাদ জর্মান একজন, চিকিৎসক, Dr. Martin এবং অপর একজন মিলে এই পঞ্চ সহচর সর্ব্বদা কাছে থেকে তাঁর আবশ্যকমত কাজকর্ম তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল। আমার ছোটকাকা নগেন্দ্রনাথ আর দূরসম্পর্কীয় পিতৃব্য নবীনবাবু তাঁকে মাঝে মাঝে দেখতে আসতেন। ছোটকাকার গায়ে এক বহুমূল্য সবুজ রং-এর শাল ছিল আর তাঁর জলজলে কালো চোখের প্রশংসা সর্ব্বত্র শোনা যেত। তাঁর কথা আর বেশী কিছু জানতে পারলাম না। আমার পিতামহের শরীর শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়ল। রোগের জ্বালায় বড়ই অশান্তি ছটফটানি হয়েছিল। ৬টার সময় উঠে গাড়ী করে বেড়িয়ে ফিরে এসে অল্প নিদ্রা যেতেন— তারপর আহার। তাঁর ভৃত্য হলির তয়েরি কারি-ভাত আর একটু কমলানেবুর জেলী, এইমাত্র আহার। পরিচ্ছদের মধ্যে একটি সুন্দর কাশ্মীরি শাল তাঁর গায়ে থাকত। তাঁকে দেখবার জন্যে মহিলারা দলে দলে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। Duchess of Cleveland প্রত্যহ তাঁকে দেখতে আসতেন— Duchess of Inverness রোজ পত্রদ্বারা তাঁর সংবাদ নিতেন। তিনি তাঁর অমায়িক সৌজন্যে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেছিলেন। এত পীড়ার প্রকোপেও তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নি। কখনও কোন বিষয়ে ত্রুটি জানিয়ে কারও প্রতি দোষারোপ করতেন না, সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্তে, হাসিমুখে থাকতেন। অতি অকর্ম্মা ভৃত্যও তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতা হ'তে বঞ্চিত ছিল না। স্বদেশী আচার ব্যবহারের তিনি অনুরক্ত ছিলেন। দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। আলবোলার নল সর্ব্বদাই তাঁর হাতে থাকত, তাঁর ভৃত্য হলি তামাক সেজে দিত। তাঁরা একটি (tortoise shell) কাঁচকড়া মসলার ডিবে ছিল। গরম তাঁর আদবে সহ্য হ'ত না, জানালা খুলে শুতেন। প্রত্যহ সকালে স্নান করতেন, আর বরফজল ভাল বাসতেন। দিনরাত তাঁর সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত প্রিয় ভৃত্য হলি তাঁর শোবার ঘরের বাহিরে শুয়ে থাকত। অনেক সময় তাঁর বিছানার পাশে মাদুরের উপর বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিত। তাঁর শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে পড়ল, তিনি আপনার আসন্ন মৃত্যু আপনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। কেমন আছেন কেহ জিজ্ঞাসা করলে মধুর গম্ভীরস্বরে বলতেন, "I am content" আমি শান্তিতে আছি। ক্রমে তাঁর শরীর আরো অবসন্ন হ'তে লাগল— তাঁকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হ'য়ে পড়ল। অবসর বুঝে সেই স্থান হ'তে জুলাই মাসের ২৭ তারিখে ডক্টর মার্টিন তাঁকে সঙ্গে করে লণ্ডনে নিয়ে যান এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্টে তিনি পরলোক গমন করেন।

বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মূলারের সঙ্গে প্যারিস শহরে দ্বারকানাথের পরিচয় হয়েছিল। এই বিষয় অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মূলার সত্যেন্দ্রনাথকে যা বলেছিলেন 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' থেকে তা উদ্ধৃত হল—

৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসীরা এমন অবাধে ভ্রমণ করত না। কালাপানি পার হওয়ার বিভীষিকা তখন খুব প্রবল ছিল; সুতরাং ১৮৪৪ সালে যখন একদিন সহরময় রাষ্ট্র হইল যে ভারতের একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু প্যারিসে এসেছেন এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোটেলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহে বাস করেছেন, তখন প্যারিসে হুলস্থূল পড়ে গেল এবং আমারও তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি তখন কলেজ-ডি-ফ্রান্সে প্রোফেসার বারনুফের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করতাম, এবং যখন দেখলাম যে নবাগত ভদ্রলোকটি আমারই এই প্রোফেসারের কাছে পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'তে বড় বেশী বিলম্ব হ'ল না। প্রোফেসার বারনুফ একদিন আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হ'ল। তিনি হচ্ছেন তোমার পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর।

দ্বারকানাথ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত না হ'লেও সংস্কৃত সাহিত্য-জ্ঞান তাঁর বেশ ছিল। প্রথম যখন তাঁকে আমি দেখি তখন তিনি ইনষ্টিটুটে-ডি-ফ্রান্সে প্রোফেসার বারনুফের সঙ্গে কথা কইছিলেন। প্রোফেসার তাঁকে নিজের ভাগবতপুরাণের উৎকৃষ্ট ফরাসী তর্জ্জমার বইখানি উপহার দিলেন। একদিকে সংস্কৃত শ্লোকগুলি, অপরদিকে ফরাসী তর্জ্জমাগুলি ছাপান ছিল। দ্বারকানাথ তাঁর সুগঠিত শ্যামল অঙ্গুলীগুলি ফরাসী তর্জ্জমার পাতার উপর রেখে নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন, 'আহা! এইগুলি যদি আমি পড়তে পারতাম!' তাঁর স্বদেশের প্রাচীন ভাষা জানবার জন্য তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না, যত ফরাসী ভাষার জন্য ছিল।

যখন তিনি শুনলেন যে আমি সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্য কিরূপ আগ্রহান্বিত, তখন আমার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ হ'ল। তিনি প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন এবং আমিও গিয়ে সারা সকালটা তাঁর কাছে প্রায়ই কাটিয়ে আসতাম। ভারতের নীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা হ'ত। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং ইটালীয় ও ফরাসী সঙ্গীত খুব পছন্দ করতেন। তিনি গান করতেন আর আমি সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতাম—এইভাবে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটে যেত। তিনি বেশ সুকণ্ঠ ছিলেন। একদিন আমি তাঁকে বল্লাম একটি খাঁটি ভারত-সঙ্গীত গাইতে, তাতে তিনি যে গানটি প্রথমে গাইলেন, সেটা ঠিক ভারতীয় নয়, পারসিক গজল, এবং আমিও তাতে বিশেষ কোন মাধুর্য্য পেলাম না। খাঁটি ভারত-সঙ্গীত গাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি মৃদু হেসে বল্লেন, 'তুমি তা উপভোগ করতে পারবে না।' তারপর আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য একটি গান নিজে বাজিয়ে গাইলেন। সত্য বলতে কি, আমি বাস্তবিকই কিছু উপভোগ করতে পারলাম না। আমার মনে হ'ল যে, গানে না আছে সুর, না আছে ঝঙ্কার, না আছে সামঞ্জস্য। দ্বারকানাথকে এই কথা বলায় তিনি বল্লেন, 'তোমরা সকলেই এক রকমের। যদি কোন জিনিস তোমাদের কাছে নতুন ঠেকে বা প্রথমেই তোমাদের মনোরঞ্জন করতে না পারে, তোমরা অমনি তার প্রতি বিমুখ। প্রথম যখন আমি ইটালীয় গীতবাদ্য শুনি, তখন আমিও তাতে কোন রস পাই নি, কিন্তু তবু আমি ক্ষান্ত হই নি; আমি ক্রমাগত চর্চ্চা করতে লাগলাম যতক্ষণে না আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলাম। সকল বিষয়েই এইরূপ। তোমরা বল আমাদের ধর্ম ধর্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, আমাদের দর্শন দর্শনই নয়। ইয়োরোপ যাহা প্রকাশ করে আমরা চেষ্টা করি তাহা বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে, কিন্তু তাই বলে

ভারতবর্ষ যাহা প্রকাশ করে তাকে অবহেলা করি না। আমরা যেমন তোমাদের সঙ্গীতবিদ্যা, কাব্য দর্শন আলোচনা করি, তোমরাও যদি তাই করতে তাহলে তোমরাও আমাদের দেশের বিদ্যাগুলির মর্ম্ম বুঝতে পারতে এবং আমাদের যে অজ্ঞ ও ভণ্ড মনে কর, বাস্তবিক আমরা তা নই, বরং অজ্ঞাত বিষয়ে তোমরা যা জান, আমরা হয়তো তারো অধিক জান্‌তে পেরেছি দেখতে।' বাস্তবিক তিনি নিতান্ত ভুল বলেন নি।···

তোমার পিতামহ দ্বারকানাথ খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। কেন জানি না, তিনি ব্রাহ্মণকুলকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন না এবং একদিন যখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, দেশে ফিরে গিয়ে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কি না, তিনি হেসে বল্লেন, 'আমি তো চিরকাল বহুতর ব্রাহ্মণকে পোষণ করে আসছি, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত!' কিন্তু তিনি যে কেবল দেশীয় ব্রাহ্মণদেরই হীন চক্ষে দেখতেন তা নয়— তিনি যাদের নামকরণ করেছিলেন 'কালো কোট পরা বিলাতী ব্রাহ্মণ',— তাদেরও সমান নীচ চক্ষে দেখতেন। যদিও তিনি ইংরাজদের সকল বিষয়েই প্রশংসা করিতেন, কিন্তু পাদ্রিকুলের কোন নিন্দাবাদ বা লজ্জাজনক ব্যবহারের কথা জানতে পারলে তিনি ভারি আমোদ বোধ করতেন। তিনি অনেকগুলি রাজনৈতিক ও পারমার্থিক সংবাদপত্র পড়তেন। তাঁর একখানি খাতা ছিল যার মধ্যে তিনি অতি যত্নসহকারে পাদ্রিদের নিন্দাজনক নানা কথা লিখে রাখতেন। সে এক অদ্ভুত সংগ্রহ— অনেক সময় আমি ভাবি যে সে খাতাখানির কি দশা হ'ল। তোমার ঋষিপ্রতিম পিতা কখনই সে খাতা লয়ে রহস্য করেন নি নিশ্চয়ই। কিন্তু যখনই খৃষ্টধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা নিয়ে কারো সঙ্গে তর্ক বাধতো, দ্বারকানাথ তখনই সেই খাতাখানি প্রমাণস্বরূপ বের করতেন। অবশ্য আমি বলতাম যে, কোন দেশেরই ধর্ম্মযাজকদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করে ধর্ম্মের বিচার করা চলে না।

দ্বারকানাথ প্যারিসে খুব জাঁকজমক সহকারে বাস করতেন। তখনকার রাজা লুই ফিলিপ কর্ত্তৃক তিনি সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। শুধু তা নয়— দ্বারকানাথ একদিন খুব সমারোহে সান্ধ্য-সম্মিলনের আয়োজন করেন, তাতে রাজা লুই ফিলিপ ও বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। দ্বারকানাথ সমস্ত ঘরখানি মূল্যবান কাশ্মীরি শাল দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন! তখন কাশ্মীরের শাল ছিল ফরাসী স্ত্রীলোকদের একটা আকাঙ্ক্ষার বস্তু, সুতরাং কল্পনা কর যে তাদের কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হ'ল, যখন এই ভারতের রাজপুত্রটি বিদায়কালীন প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অঙ্গে একখানি শাল জড়িয়ে দিলেন!···

আমি যখন বেদের সংস্করণ প্রকাশ করবার জন্য প্যারিস, বার্লিন ও লণ্ডনের পুস্তকালয়ে বেদের যত খস্‌ড়া আছে, নীরবে সব সংগ্রহ করে, তা থেকে নকল করে ধারাবাহিকরূপে গোছ করিতেছিলাম, তখন দ্বারকানাথ খুব আগ্রহ সহকারে আমার কার্য্যাবলী দর্শন করতেন। ঠিক সেই সময়েই তোমার পিতা দেবেন্দ্রনাথ চারজন ব্রাহ্মণ-কুমারকে চতুর্ব্বেদ শিক্ষা করবার জন্য কাশীতে পণ্ডিতদের কাছে পাঠান। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম যে, বুঝি দ্বারকানাথ আমার বেদ প্রকাশ সম্বন্ধে পুত্রকে কিছু লিখে থাকবেন, এবং তাই থেকে কাশীতে ছাত্র পাঠাবার কল্পনা তাঁর মাথায় আসে, কিন্তু পরে তাঁর কাছ থেকে যে চিঠি পাই, তাতে জানলাম যে আমার ভ্রম হয়েছিল; দেবেন্দ্রনাথের বহুদিন থেকেই এরূপ মানস ছিল।···

বিদায়কালীন পূর্ব্বকথা স্মরণ করে তিনি বল্লেন, "Oh! I have smoked many a Hookah with your grandfather in Paris!"

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর সময় দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫) বয়স উনত্রিশ বৎসর। স্ত্রী সারদা দেবী ও তিনটি শিশুপুত্র দ্বিজেন্দ্র, হেমেন্দ্র ও সত্যেন্দ্রকে নিয়ে তিনি তখন ছিলেন কালনার কাছাকাছি গঙ্গাবক্ষে নৌকায়। এমন সময়

আমাদের · · স্বরূপ খানসামা · · আমাকে একখানা চিঠি দিল। · · বোধ হইল ইহাতে আমার পিতার মৃত্যু-সংবাদ আছে।···এ সংবাদ হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় আমার মস্তকে পড়িল।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার বাল্যকথা'য় লিখেছেন—

দ্বারিকানাথ ঠাকুর বিলাত যাবার সময় তাঁর অগাধ জমিদারী বিষয় সম্পত্তি সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করে যান তা তাঁর মনের মতন হয় নি। যে সকল কর্ম্মচারীর উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল তাঁদের কার্য্যে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। কর্ত্তা নিজে তত্ত্বাবধান না করলে 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক হয়' এ এক প্রকার ধরা কথা। আমার পিতা যদি তেমন মনোযোগ করে বিষয় কর্ম্ম দেখতেন তাহলে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁর মন ছিল অন্য দিকে, নিতান্ত দায়ে পড়ে যতটুকু করতে হ'ত তাই করতেন। কর্ত্তাদাদা তাঁকে লণ্ডন থেকে এই বিষয়ে এক পত্র লিখেছিলেন তার এই উদ্ধৃতাংশ [অনুবাদ] থেকে দাদামশায়ের মনোভাব কতকটা জানা যায় :—

"আমার সকল বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় নাই ইহাই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। তুমি পাদ্রিদের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে ও সংবাদপত্রে লিখিতেই ব্যস্ত, গুরুতর বিষয় রক্ষা ও পরিদর্শন কার্য্যে তুমি স্বয়ং যথোচিত মনোনিবেশ না করিয়া তাহা তোমার প্রিয়পাত্র আমলাদের হস্তে ফেলিয়া রাখ। ভারতবর্ষের উত্তাপ ও আবহাওয়া সহ্য করিবার আমার শক্তি নাই, যদি থাকিত আমি অবিলম্বে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া তাহা নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতাম।"

দ্বারকানাথ অবশ্য ঠিক কথাই লিখেছিলেন— তাঁর দিক থেকে। বিষয়কর্মে দেবেন্দ্রনাথের অবশ্যই মন ছিল না। তিনি লেখাপড়া শেখেন প্রথমে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো হিন্দু ইস্কুলে ও কিছুদিন হিন্দু কলেজে। এই দুই জায়গাতেই তাঁর সতীর্থ ছিলেন রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়।

হিন্দু কলেজে দেবেন্দ্রনাথের অধ্যয়নকালের অব্যবহিত পূর্বে বিখ্যাত অধ্যাপক ডিরোজিও পদচ্যুত হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সমসাময়িক অনেকেই হয়েছিলেন, ডিরোজিওর প্রভাবে আচ্ছন্ন যেমন রাজনারায়ণ বসু। বসুমহাশয় লিখে গিয়েছেন যে গোলদিঘিতে তাঁদের আড্ডা বসত আর এই আড্ডা থেকে গোলদিঘির রেলিং পেরিয়ে ওপারের রাস্তার ধারে (যেখানে পরে সেনেট হাউস স্থাপিত হয়) মুসলমান দোকানের নিষিদ্ধ মাংসের সিককাবাব খাওয়া তাঁরা খুব বাহাদুরি মনে করতেন। এই জাতীয় বাহাদুরিতে দেবেন্দ্রনাথের কোনোদিনই মন ছিল না। ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতি খুব অল্প বয়স থেকেই তাঁর মজ্জাগত হয়েছিল।

হিন্দু কলেজ ছাড়বার পর দ্বারকানাথ-প্রতিষ্ঠিত কার-ঠাকুর অ্যাণ্ড কোম্পানি ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশি করবার সময় দেবেন্দ্রনাথ উৎসাহের সঙ্গে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন

সংস্কৃতভাষার ও সংগীতের চর্চায়। কিছুকাল পরে সংগীতশিক্ষা ছেড়ে পুরোপুরি মন দেন সংস্কৃত শিক্ষায়, বাংলা ভাষায় একটি সংস্কৃত ব্যাকরণও রচনা করেন।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনে বৈরাগ্যভাবের সূচনার মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর আত্ম-জীবনীতে। দেবেন্দ্রনাথের বয়স যখন আঠারো বছর তখন তাঁর মুমূর্ষু দিদিমাকে নিয়ে যাওয়া হয় গঙ্গাতীরে। দিদিমার মৃত্যুর ঠিক আগের দিন রাত্রে নিমতলা ঘাটে বসে ছিলেন একটা চাটাইয়ের উপরে। পূর্ণিমার রাত, আকাশ ভেসে গিয়েছিল জ্যোৎস্নায়। দেবেন্দ্রনাথের কানে আসছিল নামকীর্তন—

এমন দিন কি হবে,
হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে।

এমন সময়ে তাঁর মনে এল এক আশ্চর্য উদার ভাব। যেন তিনি আর আগেকার মানুষ নন। ঐশ্বর্যের উপর বিরাগ জন্মাল। মনে হল, ঐ চাটাই তাঁর একমাত্র যোগ্য আসন আর গালিচা-দুলিচা সবই হেয়। মনে এল এক অভূতপূর্ব আনন্দ। দেবেন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় বলি—

আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব? তাহা স্বাভাবিক আনন্দ; তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া, সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন। কে বলে ঈশ্বর নাই? এই তো তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি তো প্রস্তুত ছিলাম না, তবে কোথা হইতে এ আনন্দ পাইলাম?

এই ঔদাস্য ও আনন্দ লইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে আমি বাড়ীতে আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। এ অনিদ্রার কারণ, আনন্দ। সারা রাত্রি যেন একটা আনন্দ-জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল।

দেবেন্দ্রনাথের মন পৌত্তলিকতাবিরোধী হয়েছিল অতি অল্পবয়স থেকেই। একবার দুর্গোৎসবে তিনি যখন রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করতে যান, রামমোহন বলেছিলেন, 'বিরাদার, আমাকে নিমন্ত্রণ! দুর্গোৎসবে!' দেবেন্দ্রনাথেরও সংকল্প হল তিনি প্রতিমাপূজায় যোগদান করবেন না। ভাইদের নিয়ে ছোটোখাটো এক বিদ্রোহীদল তিনি তৈরি করলেন। সন্ধ্যাবেলায় আরতির সময় যখন দ্বারকানাথ পূজার দালানে যেতেন, এই বিদ্রোহীদলটিকেও বাধ্য হয়ে সঙ্গে যেতে হত। কিন্তু তাঁরা একটু পিছিয়েই থাকতেন যাতে প্রণাম করতে না হয়।

এর পর তাঁর জীবনে যুগান্তর এল যখন তিনি আবিষ্কার করলেন একটি উড়ে যাওয়া ছেঁড়া পাতায় ঈশোপনিষদের শ্লোক—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ এই ঘটনাটি সম্পর্কে লিখেছেন—

আমি মানুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্ম্মের মধ্যে সায় দিল, আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল। আমি ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিতে চাই; উপনিষদে কি পাইলাম?

পাইলাম যে, 'ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন কর।'...আমি যাহা চাই তাহাই পাইলাম। এমন আমার মনের কথা আর কোথাও হইতে শুনিতে পাই নাই।...আহা! কি কথাই শুনিলাম, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর। তিনি কি দান করিয়াছেন? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই পরম ধনকে উপভোগ কর। ... এ আমার নিজের দুর্ব্বল বুদ্ধির কথা নহে, এ সেই ঈশ্বরের উপদেশ!...আহা, সে দিন আমার পক্ষে কি শুভ দিন— কি পবিত্র আনন্দের দিন! উপনিষদের প্রতি কথা আমার জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিতে লাগিল। উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া আমি দিন দিন আমার গম্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থে লিখেছেন—

দেবেন্দ্রনাথের মনে যখন অধ্যাত্ম সত্য প্রকাশ পাইল, তখন তিনি যাহাকে হাতের কাছে পাইলেন— তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও ভাই— সবাইকে সেই সত্য দেওয়ার জন্য তাঁহার "প্রবল ইচ্ছা" হইল। দুর্গোৎসবের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে বাড়ীর পুকুরের ধারে একটা ছোট কুঠরীতে দেবেন্দ্রনাথ এক সভা স্থাপন করিলেন। সকলে শুদ্ধ স্নাত হইয়া সেখানে গিয়া বসিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া কঠোপনিষদের এক শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন। "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশ-মাপদ্যতে মে।" অর্থাৎ "প্রমাদী ও ধনমদে মূঢ় নির্ব্বোধের নিকটে পরলোক সাধনের উপায় প্রকাশ পায় না। এই লোকই আছে পরলোক নাই— যাহারা এ প্রকার মনে করে, তাহারা পুনঃপুনঃ আমার বশে অর্থাৎ মৃত্যুর বশে আসে।" সেই তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যান। ব্যাখ্যানের পর, দেবেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে ও সকলের সম্মতিক্রমে সভার নাম রাখা হইল "তত্ত্বরঞ্জিনী সভা।" সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ডাকা হইল, তিনি ইহার নাম বদল করিয়া নাম রাখিলেন, তত্ত্ববোধিনী সভা। তিনি এই সভার আচার্য্য হইলেন। এইরূপে, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে (১৭৬১ শক, ২১এ আশ্বিন) রবিবারে এই তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য "সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।" প্রথমে দশজন মাত্র সভ্যকে লইয়া এই সভার আরম্ভ হয় এবং দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীর এক-তলার ঘরেই ইহার অধিবেশন হইত। তখন প্রাচীনকালের মত নিয়ম ছিল যে, প্রতি সভ্য আপন লাভের চৌষট্টি অংশের এক অংশ সভায় দান করিবেন। ইহার পরের বছরে ১০৫ জন সভ্য-সংখ্যা হয় এবং মাসিক দানের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই সভায় আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিতেন এবং উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যার দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। সভ্যেরা বক্তৃতা করিতেন। যে সভ্য সকলের আগে বক্তৃতা লিখিয়া সম্পাদকের হাতে দিতেন, তিনিই বক্তৃতা পাঠ করিতে পাইতেন, এই নিয়ম ছিল। সেই জন্য কেহ কেহ সম্পাদকের বিছানার বালিসের নীচে বক্তৃতা রাখিয়া আসিতেন।

১৮৩৯ খৃস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপনের চার বৎসর পরে ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায়। ঐ বৎসর ৭ই পৌষে দেবেন্দ্রনাথ আরও কুড়িজনের সঙ্গে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে বেদান্তধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখনও তাঁর পিতা জীবিত।

দেবেন্দ্রনাথ এই যে পথ ধরলেন রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার পর আর ফিরে তাকান নি। দ্বারকানাথ যে তাঁকে তিরস্কার করে লিখেছিলেন 'তুমি পাদ্রিদের সহিত বাদপ্রতিবাদ

করিতে ও সংবাদপত্রে লিখিতেই ব্যস্ত' তার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু তাই বলে দেবেন্দ্রনাথ যে পৈতৃক বিষয়ে ও ব্যবসায় সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলেন তা বলা চলে না। যদি তাই হত তা হলে দ্বারকানাথ কখনোই দ্বিতীয় বার বিদেশযাত্রার সময় কার-ঠাকুর কোম্পানিতে তাঁর যে আট-আনা অংশ ছিল তা উইল করে পুরোপুরি দেবেন্দ্রনাথকে দিয়ে যেতেন না।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ কার-ঠাকুর কোম্পানিতে তাঁর যে অংশ ছিল, ভাইদের সঙ্গে সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিদিন তা তাঁদের ভোগে আসে নি। দেড় বছরের মধ্যে এই কোম্পানি ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অচল হয়ে পড়ল। দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ দুই ভাইয়ের কাঁধে পড়ল বিপুল দেনার দায়। দেবেন্দ্রনাথ পাওনাদারদের দেয় টাকা মিটিয়ে দিলেন কড়ায় গণ্ডায়, এমন-কি যে ট্রাস্ট সম্পত্তির উপর পাওনাদারদের কোনো হাতই ছিল না তাও তাদের হাতে সমর্পণ করলেন। আত্মজীবনীতে মহর্ষি সেই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

আমি যা চাই তাই হইল। বিষয় সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই, তেমনি বিষয়ও নাই; বেশ মিলে গেল!

এর পর—

সে শ্মশানের সেই এক দিন, আর অদ্যকার এই আর এক দিন! আমি আর এক সোপানে উঠিলাম। চাকরের ভিড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ী ঘোড়া সব নিলামে দিলাম, খাওয়া পরা খুব পরিমিত করিলাম; ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম। কল্য কি খাইব, কি পরিব, তাহার আর ভাবনা নাই। কাল এ বাড়ীতে থাকিব, কি, এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে, তাহার ভাবনা নাই। একেবারে নিষ্কাম হইলাম। নিষ্কাম পুরুষের যে সুখ ও শান্তি, তাহা উপনিষদে পড়িয়াছিলাম; এখন তাহা জীবনে ভোগ করিলাম। চন্দ্র যেমন রাহু হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা তেমনি বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোককে অনুভব করিল। "হে ঈশ্বর, অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে না পাইয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল; এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইয়াছি।"

কারবার ফেল পড়লেও গিরীন্দ্রনাথের বিশেষ চেষ্টায় দ্বারকানাথের ভূসম্পত্তি রক্ষা পেল। তাই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ঐশ্বর্য অনেক পরিমাণে হ্রস্ব হলেও একেবারে লোপ পেল না। দেবেন্দ্রনাথ আবার কাজের স্রোতে গা ভাসালেন।

তত্ত্ববোধিনী সভায় ও পত্রিকা পরিচালনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দত্ত আধ্যাত্মিকতার চেয়ে নৈতিকতার উপরই জোর দিয়েছিলেন বেশি। তাই অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে আক্ষেপ করে দেবেন্দ্রনাথ লিখলেন—

আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ!

অক্ষয়কুমার এই সময় একটি 'ফরমুলা' উদ্ভাবন করেছিলেন—

পরিশ্রম = শস্য
পরিশ্রম ও প্রার্থনা = শস্য
অতএব, প্রার্থনা = ০

এই কারণে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন—

কতকগুলান নাস্তিক [তত্ত্ববোধিনী সভার] গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা নাই।

বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথের জীবনে চরম ব্রত ছিল ব্রাহ্মধর্মপ্রচার। দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের বন্ধু ও অনেক বিষয়ে তাঁর সহযোগী হলেও রামমোহনের যথার্থ শিষ্য ও উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর এই বালক 'বিরাদার' দেবেন্দ্রনাথ— যদিও রামমোহনের অদ্বৈতবাদ তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই রামমোহন তাঁর ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতিতে মহানির্বাণতন্ত্রের যে স্তবটি (নমস্তে সতে · · সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় ইত্যাদি) অবিকৃত গ্রহণ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ তার এমনভাবে সংশোধন করে নিয়েছিলেন যাতে অদ্বৈতবাদের আভাসমাত্র তাতে না থাকে।

১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হবার পর দেবেন্দ্রনাথের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। শুধু দেবেন্দ্রনাথের জীবনে নয়, সমগ্র বাংলাদেশে, কেননা রামমোহন যে ধারা প্রবর্তন করেছিলেন এই ধারাকে প্রশস্ততর করবার প্রয়াসে সে যুগে অগ্রণী ছিলেন তত্ত্ববোধিনী সভা ও পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এই ধারা হল প্রচলিত সংস্কারকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে বিতর্ক ও বিশ্লেষণ করে সকল বিষয়ের বিচার।

দ্বারকানাথের ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি তখন চরমে। দেশীয় বিদেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তিনি প্রায়ই নিমন্ত্রণ করে এনে খাওয়াতেন তাঁর বিখ্যাত বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে। এই রকম এক-একটি ভোজ উপলক্ষে এই বাগানবাড়ি পরিণত হত ইন্দ্রপুরীতে— সাজেসজ্জায় ও আলোর জৌলুসে। দ্বারকানাথ বিশ্বাস করতেন যে এই ভাবে শুধু ব্যবসায়ের সুবিধা হবে তা নয়— সাহেব-বিবিদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের পথও সুগম হবে। অল্প বয়সেই দেবেন্দ্রনাথ প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ভারতীয় শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় দর্শনের চর্চায়, ভোজের ও নাচের মজলিসে তাঁর একেবারে মন ছিল না। একবার দ্বারকানাথ তাঁর উপর ভার দেন বেলগাছিয়ার বাগানে ঐ রকম একটি ভোজের ব্যাপার তত্ত্বাবধানের। কিন্তু সেদিন ছিল তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনের দিন। পিতার আদেশ লঙ্ঘন করবার মত সাহস দেবেন্দ্রনাথের ছিল না, তাই কোনোরকমে নমো নমো করে বেলগাছিয়ার বাগানের কাজ সেরে দেবেন্দ্রনাথ যথাসময়ে উপস্থিত হলেন তত্ত্ববোধিনী সভায়।

এই সব নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বেশ মেতে উঠেছিলেন। দ্বারকানাথ বিদেশে গেলে বাধ্য হয়ে তাঁকে বিষয়কর্ম দেখতে হয়েছে। তাতে বিরক্ত হয়ে তিনি গেলেন নির্জনে গঙ্গায় নৌকাভ্রমণে।

এই সময়ে তিনি দ্বারকানাথের মৃত্যুসংবাদ পান। এই দুর্ঘটনার ফলে কলকাতা তো তোলপাড় হল তার চেয়ে বেশি তোলপাড় হল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা। এই ঝড় ও ঝঞ্ঝার মাঝখানে অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি অনুসরণ করে চললেন তাঁর আদর্শ।

১৮৪৯ খৃস্টাব্দ দেবেন্দ্রনাথের জীবনে আর একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর তাঁর বিখ্যাত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। একসময় তিনি বিশ্বাস করতেন বেদ অপৌরুষেয় অভ্রান্ত। কিন্তু এই বিষয়ে ক্রমাগত আলাপ আলোচনাক্রমে বিশেষ করে অক্ষয়কুমার দত্তের প্রভাবে তাঁর এই বিশ্বাস দূরীভূত হয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথ যে একেশ্বরবাদ ও পরব্রহ্মের উপাসনায় ব্রতী হয়েছিলেন তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি প্রস্তুত হয়েছিল তিন ঘণ্টার মধ্যে। অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখে গেছেন—

তিনি যখন অনুভব করিলেন যে, উপনিষদের নিত্য অংশ, যাহা তাঁহার আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথার্থ শাস্ত্র ও তাহাই ব্রাহ্মদের অবলম্বনীয়, তখন অক্ষয়কুমার দত্তকে বলিলেন, তুমি কাগজ কলম লইয়া ব'সো এবং আমি যাহা বলি তাহা লিখিতে থাক। তখনও তিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের দিকে হৃদয় পাতিয়া দিলেন। উপনিষদের যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলি তাঁহার হৃদয়ে দেখা দিতে লাগিল, 'নদীর স্রোতের' মত সতেজে তাহা তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন – আর অক্ষয়কুমার লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। নিঃসন্দেহে, এখানেও উপনিষদের এই নিত্যবাণীগুলি তাঁহার বহুকালের অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার দ্বারা চিহ্নিত হইয়া তাঁহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনে প্রকৃতির আকর্ষণ ছিল অত্যন্ত প্রবল। একটু সুবিধে পেলেই তিনি শহরের কোলাহল ছেড়ে হয় কাছাকাছি নয় দূরে গিয়ে নির্জনবাস করতেন। কখনও একাকী কখনও বন্ধুবান্ধব সহ। আবার মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াতেন এক জায়গা থেকে আর-একজায়গায়। এই ভাবেই তিনি দিনে দিনে অগ্রসর হয়েছিলেন অধ্যাত্মসাধনায়।

১৮৫৬ খৃস্টাব্দের বর্ষাকাল। দেবেন্দ্রনাথ বাস করছেন বরানগরের এক বাগানবাড়িতে। এই সময়কার কথা আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন—

সন্ধ্যার সময়ে আমি এই বাগানে গঙ্গাতীরে বন্ধুদিগের সঙ্গে বসিতাম। বর্ষার ঘন মেঘ আমার মাথার উপরে আকাশ দিয়া উড়িয়া উড়িয়া চলিয়া যাইত। সেই নীল নীরদ আমাকে তখন বড়ই সুখ দিত, বড়ই শান্তি দিত। মনে করিতাম, ইহারা কেমন কামচার, কেমন মুক্ত ভাবে যেখানে সেখানে ইচ্ছামত চলিয়া যাইতেছে। আমি যদি ইহাদের মত কামচার হইতে পারি, ইচ্ছামত যেখানে সেখানে চলিয়া যাইতে পারি, তবে আমার বড়ই আনন্দ হয়।...তখন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, কখন্ আশ্বিন মাস আসিবে, আমি এখান হইতে পলাইব, সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইব, আর ফিরিব না।

এর পর শুরু হল দেবেন্দ্রনাথের 'কামচার' জীবন। তখন তাঁহার বয়স ৩৯ বৎসর। জলপথে কাশী যেতে মুঙ্গের ও পাটনার মাঝখানে প্রবল ঝড়ের মধ্যে তিনি অনুভব করলেন পরমেশ্বরের

মহিমা 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।' কাশী হয়ে আগ্রায় পৌঁছে তাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি লিখলেন—

শুভ্র স্বচ্ছ তাজ, সৌন্দর্য্যের ছটা লইয়া যেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে।

আগ্রা থেকে দিল্লীর পথে তিনি তাঁর বজরার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই হেঁটে চলতেন যমুনার ধারে ধারে ক্ষেত খামার ও গ্রামের মধ্য দিয়ে আর স্নান করতেন পৌষের যমুনার হিমশীতল জলে। এর পর অমৃতসরের গুরুদরবারে গিয়ে শুনলেন অলখ নিরঞ্জনের স্তবগান—

গগন মৈ থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারকামণ্ডল জনক মোতী।

মুগ্ধ হয়ে তিনি এই গানটি ব্রহ্মসংগীতের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

তার পর সিমলাশিখর। সেখানে পৌঁছে তিনি অবিরত ঘুরে বেড়াতেন পাহাড়ে ও বনে। এই সময়ে তিনি তন্ময় হয়ে থাকতেন হাফেজের কবিতায়; বিনিদ্র রাতে গলা ছেড়ে গান গাইতেন—

গো, শম্অ. ম-য়ারেদ্ দরীঁ জম্অ, কে ইমশব্
দর্ মজ্লিসে-মা মাহে রুখে. দোস্ত্ তমাম্ অস্ত্।

আজ আমার এ সভাতে দীপ আনিয়ো না। আজিকার রাত্রিতে সেই পূর্ণচন্দ্র আমার বন্ধু এখানে বিরাজমান।

দেবেন্দ্রনাথের চরম অধ্যাত্ম অনুভূতি হয়েছিল এই হিমালয় পর্বতে। তিনি লিখেছেন—

এই ব্রহ্ম-যজ্ঞ-ভূমি হিমালয় পর্ব্বত হইতে আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলাম; চর্ম্মচক্ষুতে নয়, কিন্তু জ্ঞানচক্ষুতে।

তার পর আবার হাফেজের কবিতা—

এখন অবধি জ্যোতি আমার হৃদয় হইতে পৃথিবীতে ছড়াইব, যেহেতু আমি সূর্য্যেতে পঁহুছিয়াছি, ও অন্ধকার বিনাশ হইয়াছে!

দেবেন্দ্রনাথের জীবনে হাফেজের কাব্য সার্থক হয়ে উঠল। বরানগর বাগানে 'আর ফিরিব না' সংকল্প বিসর্জন দিতে হইল হিমালয়ে। দুই বছর আগের এক আশ্বিনে তিনি বিবাগী হয়ে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন জলপথে— দুই বছর পরে আর-এক আশ্বিনে তিনি হিমালয়ে এক দুরন্ত জলস্রোত দেখতে দেখতে শুনলেন অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশবাণী—

তুমি এ উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও, পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।

দেবেন্দ্রনাথ এই আদেশ পালন করলেন কালবিলম্ব না করে। সিপাহিবিদ্রোহের ডামাডোলে তখন উত্তরভারত আকুল। এরই মধ্যে ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে নভেম্বরের মাঝামাঝি তিনি নির্ব্বিঘ্নে কলকাতায় ফিরে এলেন। এর পর শুরু হল দেবেন্দ্রনাথের জীবনে নতুন এক পালা।

সিপাহিবিদ্রোহের আগুন নিবল বাইরে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার তাপ সঞ্চারিত হল সর্বত্র। বাঙালি মধ্যবিত্ত সিপাহিযুদ্ধে যোগ দেয় নি, কিন্তু এর তাপে বাংলার স্নিগ্ধ মাটিও তেতে উঠেছিল আর সেই তপ্ত মাটি থেকে জন্মাল যে রাজনৈতিক আন্দোলন— উত্তরকালে তারই পরিণতি হয়েছিল কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতাসংগ্রাম।

কয় বছর আগে (১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫১) দেবেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ছিলেন ও একেবারে গোড়া থেকে এর সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৫৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই দুই বছরের মধ্যে তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করলেন।

১৮৫৬ খৃস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনীর পাতায় বিধবাবিবাহ আন্দোলনের জন্ম। বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলন যাঁরা সমর্থন করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। সমাজসংস্কারের সর্ববিধ প্রচেষ্টার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনের তিনি ছিলেন একজন অগ্রণী। কিন্তু অজিতকুমার চক্রবর্তীর মতে টুকরো টুকরো সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না, অপরপক্ষে একেবারে নতুন করে সমাজকে তৈরি করবার দিকেও তাঁর ঝোঁক ছিল না।

তিনি সমাজ ও ধর্মের উপর যে সকল জীর্ণতা, মৃত আচার, মিথ্যা সংস্কার জমা হইয়াছে সেগুলিকে সরাইয়া সমাজের প্রাচীনকে আধুনিকের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পরিণত করিয়া সেই আধুনিককে ভবিষ্যতের দিকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কার মানে ছিল অভিব্যক্তি।...সেই জন্য এক নবযুগ দেশে আবির্ভূত হইয়াছে ইহা অনুভব করিয়াই তিনি ব্রাহ্মসমাজকে এই যুগশক্তির উদ্বোধক ও চালক করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

হিমালয় থেকে ফেরার পর এই কাজে দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্ত হলেন কেশবচন্দ্র সেন। এই হল ব্রাহ্মসমাজের স্বর্ণযুগের সূচনা। প্রাচীন ও নবীনদলের সংঘাতের ফলে এই যুগের অবসান হয় মাত্র পাঁচ বৎসর পরে। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন ৪৭, কেশবচন্দ্রের ২৬। কিন্তু এই ছাব্বিশ বৎসরের যুবক নব্য বাংলাকে আচ্ছন্ন করেছিলেন তাঁর প্রতিভায় এবং প্রভাবে।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদের ইতিহাস বাংলাদেশের উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসেরই অঙ্গ সুতরাং বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এই প্রবন্ধে নেই। কেবল এই কথা বলা যেতে পারে যে এই বিচ্ছেদ না ঘটলে রামমোহনের উত্তরাধিকারের যে সূত্রটি দেবেন্দ্রনাথ অতি যত্নে বহন ও ধারণ করেছিলেন তা আরও ব্যাপক ও আরও দৃঢ় ভাবে বাঙালির মনকে বাঁধতে পারত। সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজ ছিল বাংলার প্রগতির পুরোধা। সুতরাং আভ্যন্তরীণ মতান্তরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তিক্ষয় না হলে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মিলনে যে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়েছিল তা আরও অনেক দিন স্থায়ী হতে পারত।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ সত্ত্বেও তাঁদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্নেহ ১৮৮৪ সালে কেশবচন্দ্রের মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ প্রথম মহর্ষি নামে অভিহিত হন ১৮৬৭ সালে কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের এক অভিনন্দনপত্রে। এর পর থেকেই দেবেন্দ্রনাথ সর্বত্র পরিচিত হলেন মহর্ষি নামে। এই অভিনন্দনের উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ যে পত্র লেখেন তার শেষ কথা—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষের এক কোণ হইতে সম্প্রতি উঠিতেছে, পরে হয়ত ইহা নামানুযায়ী কার্য্য করিবে, হয়ত এতকাল যাহা হয় নাই, ইহা দ্বারা তাহা হইবে— এক ঈশ্বরের উপাসনা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবে; সকলে একবাক্য হইয়া পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবে; এই দুইটি আমার কামনা।

বলা বাহুল্য এই কামনায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে রামমোহনেরই আদর্শ। মহর্ষির জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল এই আদর্শের প্রতিষ্ঠাদ্বারা রামমোহনের অধিকারকে ভাবীকালে প্রসারিত করা।

কিন্তু রামমোহনের সমগ্র ভাবনাকে কি দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন? অজিতকুমার চক্রবর্তীর ভাষায়—

দেবেন্দ্রনাথের চিত্তের প্রসার কখনই রামমোহন রায়ের মত অমন ব্যাপক ছিল না। রামমোহন রায়ের মত বিশ্বমানবপ্রেম তাঁহার অধ্যাত্মবোধের উৎসও ছিল না। কিন্তু ঐ ব্রহ্মের সহিত নিবিড় মুখোমুখি যোগ তাঁহার চিরজীবনের সাধনার বিষয় ছিল। উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে ব্রহ্ম ছিলেন তাঁহার এক লক্ষ্য এবং তাঁহার আত্মা শরবৎ সেই ব্রহ্মেই প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতেই তন্ময় হইয়াছিল। ভিতরের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে তাঁহার সমস্ত জীবনের ইতিহাস এই ব্রহ্মের সহিত যোগের ইতিহাস। কিন্তু বাহিরের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বিশ্বমানবপ্রেম তাঁহার সকল কর্মের উৎস ছিল না বলিয়া তিনি ধর্মে, সমাজে, নীতিতে, সকল দিকে মানুষের সমস্যাকে বড় জায়গায় দেখিতেও পান নাই, বিচার করিতেও পারেন নাই। ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ধারার বাঁকে বাঁকে বিশ্বমানবের তটস্থ রূপ যেমন করিয়া রামমোহন রায় দেখিয়াছিলেন, তেমন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ দেখেন নাই।

যা ছিল মহর্ষির উপলব্ধির অতীত তা ফুটল রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'— রবীন্দ্রনাথের এই কথায় যুগ থেকে যুগান্তরে সঞ্চারিত হল রামমোহনের উত্তরাধিকার। বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই উত্তরাধিকার।

তৃতীয় পর্ব

১৮৬১ সালে যখন রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় তখন মহর্ষির বয়স ছিল চুয়াল্লিশ। এর পর আরও চুয়াল্লিশ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিচ্ছেদ দেখা দেবার পর তিনি কর্মজীবন থেকে একরকম অবসর গ্রহণ করেছিলেন। যত দিন সক্ষম ছিলেন তিনি প্রায় নিরন্তর ভ্রমণ করতেন। বালক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর পাহাড়ে বেড়াতে যাবার মনোগ্রাহী বর্ণনা আছে 'জীবনস্মৃতি'তে। কিন্তু প্রব্রজ্যার জীবনে সংসার থেকে নির্লিপ্ত হয়েও তিনি একেবারে সংসারবিমুখ হন নি; যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন এমন কোনো জনহিতকর প্রচেষ্টা বা প্রতিষ্ঠান

বড় একটা ছিল না যা তাঁর অকুণ্ঠ আশীর্বাদ ও তাঁর অবারিত দান থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। সমগ্র জীবনে তাঁর দানের পরিমাণ ছিল বিশ লক্ষ টাকারও উপর।

১৮৬৫ সালে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা কেশবচন্দ্র সেনের হস্তগত হলে তার পরিবর্তে নবগোপাল মিত্রের সম্পাদনায় যে 'ন্যাশন্যাল পেপার' প্রকাশিত হয় তার পিছনে ছিল দেবেন্দ্রনাথের সমর্থন। ১৮৭২ সালে বিবাহ আইন সংস্কারের জন্যে যে আন্দোলন হয় দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তাতে যোগ দেন। ইতিমধ্যে ১৮৬৭ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল বিখ্যাত হিন্দুমেলা বা ন্যাশন্যাল মেলা। এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নবগোপাল মিত্র ও মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ। বালক রবীন্দ্রনাথ এই মেলায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করে যাঁদের মুগ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নবীনচন্দ্র সেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সে সময়ে নিত্য সভা জমাচ্ছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজেরা—।

'জীবনস্মৃতি'তে এই সভার বেশ জ্বলজ্বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। জোড়াসাঁকোর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় বসে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রচনা করতেন বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬) আর তার পাণ্ডু-লিপির টুকরো পাতা মাঝে মাঝে বাতাসে এদিক সেদিক উড়ে যেত। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' ছাপা হয়ে বেরোয় ১৮৭৫ সালে। এই রূপককাব্যটির তুলনা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে মেলা ভার। যেমন কাব্য তেমনি ছন্দ— রবীন্দ্রনাথ বলতেন, বড়দার মতন ছন্দের উপর দখল তাঁর কোনোদিন হয় নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ আরও অনেক রচনা রেখে গিয়েছেন। তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধগুলিও উল্লেখযোগ্য, ঐ-জাতীয় রচনায় তিনিই পথিকৃৎ। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন 'ভারতী' (জন্ম ইং ১৮৭৭) পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। ১৮৮৪ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদন করেন। 'হিতবাদী' পত্রিকারও তিনিই 'এক হিসাবে জন্মদাতা'। ১৮৮১ সালের মে মাসে এই সাপ্তাহিক কাগজটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মসংগীত ও স্বদেশী সংগীত রচনাতেও দ্বিজেন্দ্রনাথের নৈপুণ্য স্মরণীয়। তাঁর রচিত 'মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি' গানটি একসময়ে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ১৮৬৭ সালে বিখ্যাত হিন্দু বা স্বদেশী মেলার প্রতিষ্ঠা হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও নবগোপাল মিত্রের যুক্ত উদ্যমের ফলে। মহর্ষির ছোট ভাই গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গণেন্দ্রনাথও এই মেলার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩) সেই যুগে খ্যাত হয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান হিসেবে। কিন্তু অন্যান্য ভাইদের মতন তাঁরও সাহিত্যিক বা সাংগীতিক দান উপেক্ষণীয় নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের মতন তিনিও মেঘদূতের অনুবাদ করেছিলেন বাংলা পদ্যে। তাঁর রচিত বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান' রচিত হয়েছিল হিন্দুমেলা উপলক্ষে। বঙ্কিমচন্দ্র এই গানটি সম্বন্ধে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লিখে-ছিলেন : 'এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক।...এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।' মহর্ষি তাঁর আত্মজীবনী শেষ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথের একটি ব্রহ্মসংগীতের

প্রথম পংক্তি উদ্ধার করে: 'কত যে তোমার করুণা ভুলিব না জীবনে।' বালক রবীন্দ্রনাথ অমৃতসরে মহর্ষিকে যে গানটি শুনিয়েছিলেন, 'তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে' তা সত্যেন্দ্রনাথের রচনা। সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে স্মরণীয় স্ত্রীস্বাধীনতার পথিকৃৎ হিসেবে। তিনিই প্রথম ভারতবাসী যিনি স্ত্রীকে নিয়ে গবর্নমেণ্ট হাউসে নিমন্ত্রণরক্ষা করেছিলেন। তাঁর আত্মীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই ব্যাপারে এতই বিরক্ত হয়েছিলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ নিমন্ত্রণসভা থেকে চলে যান।

রবীন্দ্রনাথের সেজদা হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-১৮৮৪) দীর্ঘজীবী হন নি তবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির শিক্ষাবিধায়ক হিসেবে তিনি স্মরণীয়। সংগীতরচনাতেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল।

অগ্রজদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতম যোগ হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (১৮৪৯-১৯২৫) সঙ্গে। হেমেন্দ্রনাথের পরবর্তী বীরেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁরই পরবর্তী। এই 'জ্যোতিদাদা'র সাহচর্য সংগীতরচনায় রবীন্দ্রনাথকে কি পরিমাণ সাহায্য করেছিল 'জীবনস্মৃতি'তে তার মনোগ্রাহী বর্ণনা আছে। সেযুগের ব্রহ্মসংগীতের বেশির ভাগেরই স্বরলিপি জ্যোতিরিন্দ্র-কৃত। এইগুলি না থাকলে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের সুর হারিয়ে যেত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিশেষভাবে স্মরণীয় বাংলা নাট্যসাহিত্যে তাঁর দানের জন্যে। তাঁর প্রথম নাটক 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা আকর্ষণ করেছিল। সংস্কৃত নাটকও অনেকগুলি তিনি অনুবাদ করেছিলেন। তাছাড়া প্রভূত যত্নে তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করে একাধিক ফরাসী বই বাংলায় অনুবাদ করে গেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অল্প বয়সে ছিলেন অত্যন্ত সংরক্ষণশীল— স্ত্রীস্বাধীনতায় তাঁর একেবারে সায় ছিল না। কিন্তু ক্রমে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবে ও আদর্শে তিনি স্ত্রীস্বাধীনতার এত বড় সমর্থক হয়ে উঠলেন যে তিনি ও তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবী পাশাপাশি ছুটো ঘোড়ায় চড়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে বেড়াতে যেতেন গড়ের মাঠে।

মহর্ষির সন্তানদের মধ্যে আর-একজনের নাম না করলে এই নিবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২)। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে লেখিকাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর ব্যবসায়ের বহরে ও আতিথেয়তার সমারোহে তখনকার বাঙালী সমাজকে চমৎকৃত করেছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল ভারতবাসী ও ইংরেজকে নানা অনুষ্ঠানে একত্র জড়ো করে তাদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন পিতার বদান্যতা কিন্তু দ্বারকানাথের মতন ইংরেজ-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে তিনি একেবারেই ব্যগ্র ছিলেন না। তাই কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ লব্ সাহেব লিখেছিলেন, "The proud old man does not condescend to accept the praise of Europeans." পুরোপুরি ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী সমাজ ও সংস্কৃতির গঠন ছিল

মহর্ষির আদর্শ। এই আদর্শ সর্বতোভাবে পালন করলেন তাঁর পুত্রেরা। সাহিত্যে সংগীতে নাটকাভিনয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ি বাংলাদেশকে আর-একবার চমক লাগাল। এক সংস্কৃতির সঙ্গে আর-এক সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ যোগসূত্র রচনা করলেন বাংলাদেশের সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের এই হল তৃতীয় ও সব চেয়ে গৌরবময় পর্ব।

এর পরও ঠাকুরবাড়ির গৌরব যে ম্লান হয় নি তার প্রমাণ দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ যিনি সাধনা পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন, বীরেন্দ্রনাথের পুত্র বলেন্দ্রনাথ যিনি বাংলা গদ্যে এনেছিলেন বিস্ময়কর নতুন রীতি আর মহর্ষির ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র গগনেন্দ্র সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্র। কিন্তু সে আর-এক কাহিনী— জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির আর-এক পর্ব।

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয়রে মানব অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

নববর্ষ
১৩৪৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্ম র ণ

র বী ন্দ্রা য় ণে র পরিকল্পনাকালে সংকলনকর্তা যাঁদের কাছ থেকে উৎসাহলাভ করেছিলেন গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বেই তাঁদের মধ্যে তিনজন প্রধানের পরলোকগমন কেবল আমাদের পক্ষেই যে ব্যক্তিগত কারণে বেদনাদায়ক তা নয়, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি-উৎসবের প্রাক্‌কালে বা সূচনায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিমলচন্দ্র সিংহের মৃত্যু বাংলাদেশের অনেকের মনে এই উৎসবের দীপ্তিকে ম্লান করে দিয়েছে। লোকসমাজে তাঁদের প্রতিষ্ঠা বা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কই তার কারণ নয়। রবীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্তিতে যাঁদের জীবন ভাস্বর হয়েছিল সেই প্রবীণ মনীষীসমাজের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বিচিত্রগামী রবীন্দ্রপ্রতিভার সত্য পরিচয় উৎসবের দিনে দেশের লোকের কাছে প্রকাশবান্ করবার, শতাব্দী-অনুষ্ঠানের পথনির্দেশ করবার সর্বোত্তম অধিকারী; লোকলোচনের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথের কর্মসাধনার সুদীর্ঘকাল ধারক ও বাহক ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্রমনীষার ব্যাখ্যানে, দেশচর্যার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-আদর্শের প্রতিফলন-চিন্তায় অতন্দ্র ছিলেন তরুণবয়স্কদের মধ্যে বিমলচন্দ্র সিংহ। বহুব্যবহৃত 'অপূরণীয়' আখ্যাতেই এই তিনজনের মৃত্যুর ক্ষতিকে অভিহিত করতে হয়।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

আধিব্যাধিতে দেহ ক্ষীণ হলেও শতবর্ষ-উৎসবের প্রস্তাবনায় অতুলচন্দ্রের উৎসাহের স্রোত ক্ষীণ হয় নি। রবীন্দ্রশতবার্ষিক উৎসবের আয়োজনে যে প্রতিষ্ঠানই তাঁকে আহ্বান করেছে প্রত্যেককেই তিনি পথনির্দেশ করে তাদের কর্মব্যবস্থায় যোগ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, অনবসরবশতঃ এ যাবৎ যা বলবার সুযোগ হয় নি, এই সময়ে বিশেষভাবে তা লিপিবদ্ধ করবার তাঁর একান্ত বাসনা ছিল; কিন্তু কাল তাঁকে সে সুযোগ দেয় নি। সংস্কৃত সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য পূর্বাপেক্ষা বিস্তারিতভাবে সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিতব্য গ্রন্থের জন্য ইংরেজি ভাষায় লিখেছিলেন, এ ছাড়া আর দুটি-একটি ছোট প্রবন্ধই রচনার অবসর পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রায়ণ প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত অসম্পূর্ণ রচনাটি যে ঠিক কোন্ সময়ে লেখা তা আমাদের অপরিজ্ঞাত, ইদানীন্তন কালেই কোনো সময়ে আরম্ভ করে শেষ করতে পারেন নি এইরূপ অনুমান করি। উৎসবের প্রস্তুতিবর্ষের সূচনায় তিনি যে একটি ছোট প্রবন্ধ লেখেন তাতে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা-প্রসঙ্গে যে মন্তব্য আছে তা সংক্ষিপ্ত হলেও স্মরণযোগ্য—

'স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালীর মনে ঔৎসুক্য জন্মেছে পৃথিবীর নানা ভাষায় প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যসাহিত্যের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির বিচার করতে। অল্প কয়েকজন বাঙালী রসজ্ঞ ও সমালোচক এ কাজ আরম্ভ করেছেন। এবং আশা করা যায় নানা ভাষায় কাব্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যত নিবিড় হবে, সে আলোচনা তত গভীরতর হতে থাকবে। নানা দেশের কাব্যের বিচার ও মূল্যায়ন আমরা নিজের বোধ ও রসজ্ঞতা দিয়ে করব, ভিন্নদেশী সমালোচকের বাক্য ও বিচার চরম বলে মেনে কাজ সারব না। পৃথিবীর যেগুলি কালজয়ী কাব্যসৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের কাব্যকৃতির বিচার তাদের তুলনায়। কোনও কিছু একটু নূতনের স্বাদ পেলেই নবীন কাব্য ও তার কবিকে শ্রেষ্ঠ কাব্য ও কবি বলে প্রচারের 'টপিক্যাল' মননশীলতা ও রসজ্ঞতার ফ্যাশন মারাত্মক। বড়-ছোট, সাময়িক ও চিরকালীনের ভেদজ্ঞান সেখানে লোপ পায়। কাব্য ও সাহিত্যের

সৃষ্টি যেন নূতন নূতন কলের সৃষ্টি। পরবর্তী কল তার কর্মদক্ষতায় পূর্ববর্তী কলকে বাতিল করে, তার শুধু ঐতিহাসিক মূল্য অবশিষ্ট রাখে।

'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কাব্যসৃষ্টির বিচারে আমাদের আর-এক বাধা, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উপর বাঙালীর অন্তহীন ও অসম্ভব দাবি। আমাদের কোনও কোনও পণ্ডিত-সমালোচক আড়ম্বরের সঙ্গে প্রমাণ করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ 'ম্যাকবেথে'র মত নাটক লিখতে পারতেন না, যেন সেক্সপীয়র 'চিত্রাঙ্গদা'র মত কাব্য রচনা করতে পারতেন। পৃথিবীর সমস্ত মহাকবির কাব্যের সমস্ত গুণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নেই। যেন থাকা উচিত ছিল, কিন্তু যখন নেই সেটা তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের লাঘব। রবীন্দ্রনাথ যে এক কবিতায় বলেছেন, তিনি জানেন তাঁর কবিতা নানা বিচিত্র পথে গেলেও সর্বত্রগামী নয়, সেটা যেন মহাকবির মনের এক বিচিত্র অভাব-বোধের প্রকাশ নয়, নিজের কাব্যসৃষ্টির বিরূপ ও সত্য সমালোচনা।'

পরিশেষে, বাঙালীর জীবনে রবীন্দ্রনাথের আসন কোথায়, সে বিষয়ে লিখেছেন—

'বাঙালীর কাছে রবীন্দ্রনাথ কেবল তাদের ভাষার মহাকবি ও মহাসাহিত্যিক নন। বিগত এক শ বছরে বাঙালীর মন ও চিন্তা যে আকার নিয়ে গড়ে উঠেছে তার এক অতি বড় অংশ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রভাবে ঘটেছে। আমাদের বাংলা ভাষা ও তার গড়নের চিন্তা, কাব্য ও তার ছন্দ ও রীতির চিন্তা, আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষার লক্ষ্য ও তার পদ্ধতি ও উপায়ের চিন্তা, পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের চিন্তা— সব কিছু রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখী বিরাট প্রতিভার স্পর্শে মূর্তি ও প্রাণ পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আমরা মুখে যা বলি, লেখায় যা লিখি, তার কতভাগ পদ ও উপকরণ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য থেকে এসেছে ভেবে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। আমাদের দেশের আকাশ, তাতে রৌদ্রমেঘের খেলা, দেশের তরু-লতা-শস্যের শ্যামলতা, তার ঋতুবৈচিত্র্য, এ কি আজ আমরা কেবল নিজের চোখে দেখছি? মহাকবির দৃষ্টি ও কল্পনা সে দেখায় কতখানি জুড়ে আছে?

'রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ও বিরাট প্রতিভা নিয়ে পৃথিবীতে অতি অল্প প্রতিভাধরের জন্ম হয়েছে। এ প্রতিভার মহাভার তিনি অতি সহজেই বহন করেছেন। প্রতিভা তাঁর জীবনের কোনও দিকে শুষ্কতা ও অপূর্ণতা আনে নি। প্রতিভা এক বিশেষ দিকে মনের প্রবণতা ও সৃষ্টির ক্ষমতা। তার দাবি মেটাতে মনের অন্য বহু দিকের উপর টান পড়ে, এবং জীবনে অসামঞ্জস্য আনে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিরাট ভাণ্ডার থেকে এক দিকের প্রয়োজনে যতই ব্যয় হোক, অন্য বহু দিকের প্রয়োজনের জন্য সে ভাণ্ডার পূর্ণই থাকে। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাধরের অসামঞ্জস্যহীন পরিপূর্ণ জীবন ইতিহাসের এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

'রবীন্দ্রনাথের কাছে বাঙালীর ঋণ ও কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।…অতি ব্যাপক অর্থে তিনি আমাদের সকলের গুরু। চোখে জ্ঞানের অঞ্জন দিয়ে তিনি আমাদের বোধি ও অনুভূতিকে মোহ থেকে মুক্ত করেছেন। রসের অঞ্জন দিয়ে আমাদের আনন্দকে কলুষহীন মহানন্দে উত্তীর্ণ করেছেন।'

এই প্রবন্ধটি ১৩৬৭ বৈশাখ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে মুদ্রিত হয়েছিল।— আজ থেকে ষাট বৎসর পূর্বে বাঙালী যুবকের মনে রবীন্দ্রনাথ কি স্থান অধিকার করে ছিলেন তার একটি প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া যায় কুড়ি বৎসর পূর্বে, রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষপূর্তিকালে ১৩৪৮ আষাঢ় সংখ্যা 'কবিতা' পত্রে প্রকাশিত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের অন্য একটি প্রবন্ধে, সেটিও কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি; প্রবন্ধটি এখানে সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হল।

আমাদের ছাত্রাবস্থা ও রবীন্দ্রনাথ

চল্লিশ বছর পূর্বে যখন প্রবেশিকার দরোজা পার হয়ে কলিকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হয়েছি তখন ছাত্রমহলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি মনোভাবের মধ্যে কৌতূহল সব চেয়ে প্রবল। 'কণিকা' পর্যন্ত প্রকাশ হয়েছে। নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনে 'চোখের বালি' চলছে। ভারতীতে 'চিরকুমার সভা' বেরিয়েছে। ছোটগল্পের অনেকগুলি বিখ্যাত গল্পই লেখা হয়েছে। প্রদীপে 'কাদম্বরী-চিত্র' ও ভারতীতে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' বের হয়েছে। কালিদাসের কাব্য-সমালোচনার প্রবন্ধগুলি প্রকাশ্য সভায় পড়া হয়ে বঙ্গদর্শনে ছাপা হচ্ছে। বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের আলোচনা শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান বাঙ্গালীর কণ্ঠ একচেটে করবার উদ্যোগ করছে। এ কবি ও লেখক যে নূতন ধরণের, এবং সম্ভব জীবিতদের মধ্যে সব চেয়ে বড় এ ধারণা দেশে, সুতরাং ছাত্রদের মধ্যে, এসেছে। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে যে এই বাঙ্গালা দেশে এক আশ্চর্য উৎকর্ষের বহুমুখী প্রতিভা এমন সৃষ্টি ক'রে চলেছে যার তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে কদাচিৎ মেলে সে জ্ঞান জন্মে নি, এবং সে কথা ভাবার সাহসও মনে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে অস্পষ্ট, ওর মধ্যে যে শক্ত কিছুকে আঁকড়ে ধরে পেয়েছিবলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না (যে অভিযোগ আমাদের ছাত্রজীবনের শেষ সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এনেছিলেন), সে নালিশ আমাদের মধ্যে একদলের মনে ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টি ত একরকমের নয়। অল্পদিন পূর্বে প্রকাশিত 'কথা' ও 'কাহিনী'র কবিতাগুলি আমাদের সকলের মন লুট ক'রে নিয়েছিল, "সন্ন্যাসী উপগুপ্ত" কি "পঞ্চ নদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে" আমাদের অনেকেরই মুখস্থ ছিল। পুরানো University Institute-এর হলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বন্দী বীর' যেমন আবৃত্তি করেছিলেন ঠিক তেমনি গলায় সেই রকম আবৃত্তির চেষ্টা তখন অনেকেই করেছি। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠত রবীন্দ্রনাথকে দেখার আগ্রহ ও তাঁর গান শোনার লোভ। এ কবির আকৃতি ও প্রকৃতি, স্বর ও সুর যে আর পাঁচজনার মত নয়, অভিনব জিনিষ, এ ছিল প্রকাণ্ড আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ যে সভায় কোন প্রবন্ধ পড়তেন সেখানে ছাত্রদের ভিড় হ'ত অসম্ভব রকম। কিন্তু সে ভিড় কেবল তাঁর প্রবন্ধ শুনতে নয়, তাঁকে দেখতে ও তাঁর পড়া শুনতে। এবং সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ-পাঠকই থাকুন, আর সভাপতিই থাকুন সভার শেষে তাঁর গান শোনার দাবি ঐকতান চীৎকারে আমরা বরাবর জানিয়েছি; আর এ কাজে, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত লোককেও মাঝে মাঝে abettor পাওয়া যেত। তাঁর সাহিত্যে ও তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের পরম বিস্ময়ের বস্তু।

এর পর যখন কলেজের উঁচু শ্রেণীতে উঠেছি তখন এলো বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন। যে আবেগ ও উত্তেজনা বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ে, বিশেষ আমাদের ছাত্র সম্প্রদায়ে জেগে উঠল তার অনুরূপ কিছু এ সম্প্রদায়ের জীবনে পূর্বে কখনও ঘটে নি, এবং পরেও আজ পর্যন্ত ঘটে নি। এই দেশব্যাপী উন্মাদনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তার দূরত্ব ঘুচিয়ে আমাদের মধ্যে এলেন, হয়ে উঠলেন ছাত্রদের অন্তরঙ্গ। প্রথম রাখীবন্ধনের দিনের গান চাই। "বাংলার মাটি বাংলার জল" প্রস্তুত। টাউন হলের বিরাট জনসভায় গাওয়ার জন্য গান দরকার। এলো "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" তার সুরের সঙ্গে আমাদের বেসুর মিশিয়ে সে গান আমরা সে সভায় গেয়েছি। দিনের পর দিন তাঁর প্রবন্ধে, কবিতায়, গানে আমাদের অনুভূতির তন্ত্রী ঝন্ ঝন্ ক'রে কেঁপে উঠতে লাগল।

"মোদের যাত্রা হ'লো শুরু এখন ওগো কর্ণধার।"
"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান।"
"ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি।"
"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।"
"যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না
ভয় থাকে ত করি মানা।"

সেদিনকার কতক গান কাব্য-ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে থাকবে। কিন্তু সেদিনের তরুণ যুবকদের পক্ষে বৃদ্ধ বয়সেও বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বোধ দিয়ে এসব গান যাচাই করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের গান কণ্ঠে নিয়ে নির্ভয়ে ফাঁসি-কাঠে উঠতে পারে তার সংখ্যা আমাদের মধ্যে কম ছিল না। সে মোহের অবশেষ মনের মধ্যে আজও আছে।

এই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সঙ্গে, এবং তারই ফলে, যখন শিক্ষার আন্দোলন এসে মিশল তখন দেশের ছাত্র-সমাজ এলো রবীন্দ্রনাথের মনের আরও কাছে। আর আমরা তাঁর মন জয় ক'রে নিলুম দেশের দরিদ্র ও অসহায়দের সেবাতে সংঘবদ্ধ কর্মকুশল নিষ্ঠায়। সুরাটে কংগ্রেসি 'যজ্ঞভঙ্গে'র পর দেশের নরমপন্থী ও চরমপন্থী politics-এর ফাটল ঢাকার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকে করা হ'ল 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী'র সভাপতি। এর অল্পদিন পূর্বে বাংলার তরুণ সম্প্রদায় এই নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতার একটা বড় পরিচয় দিয়ে দেশকে চমৎকৃত করেছিল অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষে। তাঁর অভিভাষণের শেষদিকে এই তরুণদের সম্বোধন ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরূপ কণ্ঠে পড়লেন— "রক্তবর্ণ প্রত্যুষে তোমরাই সর্বাগ্রে জাগিয়া উঠিয়া অনেক দ্বন্দ্বসংঘাত এবং অনেক দুঃখ সহ্য করিলে, তোমাদের সেই পৌরুষের উদ্বোধন কেবলমাত্র বজ্রঝংকারে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ করুণাবর্ষণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে। সকলে যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহারা অভ্যস্ত, যাহাদের সুবিধার জন্য কেহ কোনোদিন এতটুকু স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে যাহারা কাহারো কাছে কোনো সহায় প্রত্যাশা করিতেও জানে না তোমাদের কল্যাণে আজ তাহারা দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে শিখিল। তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ; ইহার প্রবল পুণ্যস্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত, ভারতবিধাতার প্রেমের দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া এই নিবেদন করিতেছি যে, দেশে অর্ধোদয় যোগ কেবল এক দিনের নহে।"

আমরা তখন সবেমাত্র কলেজের পাঠ শেষ করেছি। অনেক ছাত্র ও আমাদের মত অনতিপূর্ব-ছাত্র এ সম্মিলনে উপস্থিত ছিল। মনে হ'ল আমাদের চেষ্টা ও শ্রমের পুরস্কার পেয়ে গেলাম।

আমাদের ছাত্রজীবনে রবীন্দ্রনাথের এ প্রভাব অবশ্য 'বাহ্য'। মনে তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের যে স্পর্শ সেই স্পর্শই অন্তরতম, আর তার যা ফল সেই ফলই চরম ফল। নিশ্চয় আমাদের সকলে সে স্পর্শ পায় নি। যারা পেয়েছিল তাদের অনেকের মনে যে ফল ফলেছিল তার স্বরূপ বলছি।

আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন বাংলা দেশের উচ্চশিক্ষায় চলছে dark age। ইংরেজী সাহিত্যের যে রস আমাদের পূর্বতনদের চিত্ত সরস করেছিল, ইউরোপের যে নব বিদ্যা ও চিন্তা তাঁদের মনকে মোহমুক্তির

নাড়া দিয়েছিল— তাকে প্রসন্ন ঔদার্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে আমাদের মনে এসেছিল সংকোচ। ও-বিদ্যা ও-চিন্তায় যে আমাদের দেশের কোনও দান নেই, অথচ তাকে আয়ত্ত করাই উচ্চশিক্ষা ; আমাদের অধ্যাপকেরা যে তাকে যাচাই করেন না, কেবল ওর ভার নিজের মন থেকে আমাদের মনে নামিয়ে দেন,— তার পীড়ায় আমাদের মনের গ্রহণের শক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল না। এ বিদ্যার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় দেশ থেকে কেটে গিয়েছিল, কিন্তু মনের মাটিতে শিকড় চালিয়ে তার অঙ্কুরোদ্গম আরম্ভ হয় নি। সুতরাং আমাদের কাছে এ বিদ্যা ছিল পরীক্ষা পাশের উপায় মাত্র, অর্থাৎ বোঝা। আচার্য জগদীশচন্দ্রের অভ্যর্থনার গানে—

"জয় তব হোক জয়
স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে
যশোমালা অক্ষয়।···
দুঃখ দৈন্য যা আছে মোদের
তোমারে না বাঁধি রয়।"

যে মনঃপীড়া প্রচ্ছন্ন আছে আমরা ছাত্রদের অনেকে তার গ্লানি থেকে মুক্ত ছিলাম না। আজ এ দুঃস্থতা কতকটা দূর হয়েছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি ও কর্মশক্তির কল্যাণে।

আমাদের মন্দ ভাগ্যে আমাদের সাহিত্যের পাঠও যথোচিত আনন্দের ছিল না। ওর মধ্যেও ছিল একটা বড় রকম বোঝার ভার। সাহিত্য বলতে অবশ্য বোঝাত ইংরেজী সাহিত্য। সংস্কৃত কাব্য যা দু-একখানা পড়ান হ'ত তা সাহিত্য হিসাবে নয়, কি হিসাবে বলা কঠিন। কাব্যকে তার কবিত্ব থেকে বিমুক্ত ক'রে তার anatomyর উদ্ঘাটন ছিল সংস্কৃত অধ্যাপকের কাজ। এবং সে anatomyর বেশির ভাগ osteology, অস্থিবিদ্যা। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের ঐশ্বর্যও আমাদের কেবল আকর্ষণ করে নি, তার মধ্যে একটা স্পর্ধা যেন আমাদের আঘাত করত। পাঠ্য নির্বাচনে বড় ছোট লেখকের ভেদ ছিল না। ইংলণ্ডে কিঞ্চিৎ সুনাম থাকলেই তিনি ছিলেন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট শ্রেষ্ঠ লেখক, যদিও সম্ভব বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের বাইরে তাঁর লেখা ইউরোপে আর কেউ পড়ে নি। বৃটিশ শাসন যেমন নির্বিবাদে মানার জিনিস, বৃটিশ কবি ও লেখকের শ্রেষ্ঠত্বও ছিল তেমনি নির্বিচারে স্বীকারের বস্তু। এবং এ শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের বুঝিয়ে দিতে অধ্যাপকদের ত্রুটি ছিল না, অবশ্য ইংরেজ সমালোচকের বই থেকে টুকে এনে। আমাদের সময় English Men of Letters পর্যায়ের অনেক বই অবশ্য পাঠ্য ছিল। তাতে আমরা দেখতুম যে ইংরেজ লেখক মাত্রই অতি শ্রেষ্ঠ লেখক। যে কবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যায় না তিনিও নাকি failure of a great poet। নিজের বোধ ও রুচি দিয়ে ইংরেজী সাহিত্যের ভালমন্দ বিচার অধ্যাপকেরা কখনও করতেন না। সেটা হ'ত ধৃষ্টতা। ইংরেজী সাহিত্য আমাদের কাছে অনেকটা ছিল কার্জনী আমলের বৃটিশ ঔদ্ধত্যের একটা দিক।

কলেজের শিক্ষার এই inferiority complex আমাদের চিন্তাকে করেছিল ভীরু ও পঙ্গু, রসবোধকে করেছিল অস্বাভাবিক ও অনুদার। মনের এই দুরবস্থা থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ে। তাঁর কাব্যে আমরা সেই রস পেলাম মন যাকে গ্রহণ করল দ্বিধাহীন আনন্দে। তাঁর নাম আমাদের অধ্যাপকদের কেউ কখনও উচ্চারণ করেন নি, কিন্তু আমরা মনে জানলুম যে সব সাহিত্যের তাঁরা 'নোট' লেখান এ সাহিত্য তার থেকে খাটো নয়। এবং এ সাহিত্য যে লেখা হচ্ছে আমাদেরই মুখের ভাষায়, আর যিনি লিখছেন তাঁকে আমরা আমাদের মধ্যেই মাঝে মাঝে পাই— এ হয়েছিল আমাদের মনের

বিশল্যকরণী। রবীন্দ্রনাথের কাব্যই যে প্রথম-যৌবনে যথার্থ সাহিত্যিক রসে আমাদের মনকে সরস করেছিল কেবল তা নয়, তাঁর সাহিত্যই আমাদের মনের দীনতা ঘুচিয়ে ইংরেজী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে আমাদের মনকে অনুকূল করেছিল। তাঁর সাহিত্যের আলোচনায় আমাদের মনে হয়েছিল যে আমরা নিজের মনে সাহিত্য-বিচারের একটি কষ্টিপাথর পেয়েছি যা ইংরেজী পুঁথি থেকে ধার-করা নয়, যাতে সোনাকে সোনা এবং পিতলকে পিতল বলেই চেনা যায়।

আমাদের কলেজে পড়ার সময়েই 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রবন্ধগুলি প্রায় লেখা হয়। আমাদের সাহিত্যিক রুচি ও অনুভূতির গড়নে সেগুলি ছিল অমূল্য। তাতেই আমরা উপলব্ধি করেছিলাম যে কালিদাসের কাব্য মল্লিনাথের টীকা নয়, বাল্মীকির রামায়ণ-ধর্মসংহিতা থেকে ভিন্ন।

আমাদের কলেজের শিক্ষার পাথরের চাপ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যই বিদীর্ণ করেছিল—

"ওরে চারিদিকে মোর,
এ কী কারাগার ঘোর,
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখী,
এসেছে রবির কর।"

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যৌবনকালে জমিদারি তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করা অবধি রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পল্লীসংস্কারকর্মের যে উদ্যোগে ব্রতী হয়েছিলেন তার বিস্তারিত ইতিহাস সর্বজনবিদিত না হলেও, তিনি যে স্বদেশী যুগে পল্লীর উন্নতির প্রতি বিশেষভাবে দেশকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন এ কথা অনেকেই জানেন। অন্যত্র তেমন উৎসাহ লাভ না করে নিজের জমিদারিতেই তাঁর ধ্যানধারণাকে যথাসাধ্য রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন— পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রপ্রতিম সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও এই ব্রতে নিবিষ্ট করবার উদ্দেশ্যে তাঁদের কৃষি গোপালন প্রভৃতি বিষয়ে আধুনিক শিক্ষালাভ করতে আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে জমিদারিতে পল্লীমণ্ডলী গঠন, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-কল্পনার কিছু পরিচয় দিয়েছেন— পিতার ইচ্ছা কার্যে পরিণত করবার বাসনায় রথীন্দ্রনাথ প্রথম-যৌবনেই কি ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তরুণবয়সে তাঁর জন্মদিনে লেখা একখানি চিঠিতে— চিঠিখানি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত, শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর দিনলিপি থেকে তাঁর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত—

পদ্মার উপর
সোমবার
১৩ অগ্রহায়ণ

ভাই নগেন,

কালিগ্রাম থেকে আমরা বোটে করেই আবার ফিরে এলুম। বাবাকে কাল গোয়ালন্দে নামিয়ে রেখে এলুম; তিনি সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় চলে গেলেন কেননা পরশু দিন তাঁকে সেখানে একটা বক্তৃতা দিতে হবে। আমি এখন একলা পদ্মার উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছি।

'আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো ; সুমন্দ বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর।......
ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে ; অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি ; যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে ; ভাঙা উচ্চতীর ;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু ; প্রচ্ছন্ন কুটির ;...
গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠমগন
করিছে কৌতুকালাপ ;...
তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার ;
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্মল বিস্তার ;'

কথাগুলো আমার না হলেও আজ দিনটা সত্যিই এমনি প্রসন্ন নির্মল, অগ্রহায়ণের সুন্দর বাতাস সত্যিই মুখে চোখে এসে লেগে সব শীতল করে দিচ্ছে, আজ আবার আমার জন্মদিন, তাই বসে বসে অনেক কথা মনে হতে লাগল। এই কুড়ি বৎসরের সুখদুঃখের কথা ঠেকিয়ে রাখা গেল না। এই মাসটা এলেই সেই সব কথা মনে পড়তে থাকে। সাত বৎসর হল এই সময়েতেই মা আমাদের ছেড়ে যান। আবার শমীরও এই মাসেতে জন্ম ও মৃত্যু দিন। ভগবান আমাদের অদৃষ্টে আরও কি লিখেছেন কে জানে? বাবাকে যত দেখছি, ততই কষ্ট হচ্ছে— তিনি অবিশ্যি কিছু বলেন না— কিন্তু স্পষ্টই দেখছি তাঁর মনে আর কোনও সুখ নেই। আমার কষ্ট আরও বেশি হয় এই জন্যে যে, আমি তাঁকে সুখী করতে পারব এ বিশ্বাস আমার নেই। এখন থেকে নিজেকে যদি একটু কাজের মানুষ গড়ে তুলতে পারি তা হলেই যা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারব একটু। আশা করি তুমিও এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবে। বৈষয়িক বিষয়ে পরামর্শ দেবার ঢের লোক আছে— কিন্তু ভিতরের কথায় সায় দেয়, ভাল কাজে সত্যিকার উৎসাহ দেয় এমন লোক খুব অল্পই। এবার শিলাইদহ পৌঁছলেই তো আমার যথার্থ কাজ আরম্ভ হবে। প্রথম কিছু মাস কাজ বুঝতেই যাবে। তার পরে আস্তে আস্তে চাষাদের উন্নতি করবার পথে অগ্রসর হতে পারব। শিলাইদহে থাকতে আমার খুব ভাল লাগে— তবে একলা থাকবার একটিমাত্র অসুবিধা যে, কেউ নেই যাঁর সঙ্গে সমান ভাবে কথা বলতে পারি, সেইজন্য আমাকে একটা library করতেই হবে। মনে করছি আমার মাসিক বৃত্তি থেকে, কিছু কিছু দিয়ে standard authorদের works বছর দুইয়ের মধ্যে কিনে ফেলব। Living Age কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলুম, একটা দু ডলার মাসিক subscriptionএ একটা masterpiece series দিচ্ছে— সস্তা বলে বোধ হল।...এক মাসের টাকা পাঠানো হয়ে গেছে— তুমি একখানা বই নমুনা আনিয়ে দেখে, তাদের আমার নামে পাঠিয়ে দিতে লিখে দিও। আর যদি অন্য কোথাও কারও Complete Works বা কোনও series সস্তায় বিক্রী হচ্ছে দেখ তো খোঁজ নিয়ে আমাকে জানিও।

Agricultural Libraryও আস্তে আস্তে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি। আমি ভরসা করছি— তুমি bulletins সমস্ত সংগ্রহ করছ—যেগুলো পাও তার মধ্যে বিশেষ interesting কিছু যদি থাকে তো আলাদা করে পাঠিয়ে দিও। আমার কাছে যা আসবে আমি যত্ন করে রাখব। Magazine পাঠাবার দরকার নেই। বিদ্যালয়ে কিছু আসে না— কিন্তু প্রবাসীর সঙ্কলন অংশের ভার বাবার হাতে পড়ায় যত exchange magazines আসে রামানন্দবাবু সব বাবাকে দেন— সঙ্কলন হয়ে গেলে সেগুলো বাবা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। বোধ হয় দেখেছ এখন প্রবাসীর খুব উন্নতি হয়েছে, ১০০ পাতা reading matter— দামও খুব কম রাখা হয়েছে। subscription আর কিছু বাড়াতে পারলেই বাইরের get-up ভাল করতে পারবেন ও লেখকদের উপযুক্ত বেতন দিতে পারবেন।…

আমি আপাততঃ চাষীদের মধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট industry স্থাপন করবার চেষ্টা করব মনে করছি। মুরগী ও হাঁসের ব্যবসাটা খুব সহজ হবে— সকলেই যদি দশটা বিশটা করে পাখি পোষে তা হলে ডিম ও পাখি সংগ্রহ করে আমি কলকাতায় পাঠাতে পারব; বেশ যখন চলতে থাকবে তখন নিজে ছেড়ে দিয়ে চাষারাই যাতে co-operation করে সেটা চালায় তার চেষ্টা করব। প্রথমে তারা co-operation বুঝবে না, ক্রমশ একদিকে co-operative dairying, beekeeping প্রভৃতি ও অন্যদিকে ডালা ঝুড়ি ছাতা প্রভৃতি তৈরি করার ব্যবসা introduce করতে হবে। ছোট ছোট cottage industry বিনা আমাদের দেশের চাষাদের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। যা জমি আছে তা থেকে খোরাক পোষাক চলে না। এসব জায়গায় খুব কম চাষা আছে যার মহাজনের কাছে কিছু দেনা নেই। সবসুদ্ধ দেনা শোধ দেওয়া তাদের কোনও জন্মে সম্ভব হবে না। ধান ভানার জন্য thrashing machineও একটা কিনতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু তাহলে আবার একজন expert আনতে হয়। তোমার পক্ষে কি এটা শেখা সম্ভব হবে? সর্বদা দৃষ্টি রাখবে কোনও রকম ছোটখাট simple devices বা machineএর খোঁজ পাও কিনা। আর একটা কথা মনে রেখো যদি ইতিমধ্যে কেউ ভারতবর্ষে ফিরে আসছেন খবর পাও তো তাঁর সঙ্গে Californiaর seedless orangeএর কিছু চারা পাঠাতে চেষ্টা কোরো। Sylhetএ ব্রজেন্দ্রকিশোরবাবুর মস্ত নেবুর বাগান আছে— সেখানে seedless নেবুর গাছ করা যায় কিনা দেখা কর্তব্য। আর আমাকে অল্প কিছু Sunn hemp, California fig, musk melon ও water-melonএর বীজ পাঠিও। আরও কি কি পাঠালে ভাল হয় পরে লিখব।…রথী

পিতাকে সুখী করবার জন্য নিজেকে 'একটু কাজের মানুষ গড়ে তুলতে', পিতার আরব্ধ কর্মের প্রতিষ্ঠানগত রূপ দিতে রথীন্দ্রনাথ যে যৌবনকাল থেকে জীবনের প্রায় প্রত্যন্তভাগ পর্যন্ত আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেজন্য লোকলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ না করলেও পিতার আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন যার চেয়ে কাম্য পুরস্কার তাঁর পক্ষে আর কিছু ছিল না। রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূর্তিতে রচিত সে কবিতা তেমনভাবে লোকসমাজে প্রচারিত হয় নি, সেটি উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি—

মধ্যপথে জীবনের মধ্যদিনে
উত্তরিলে আজি; এই পথ নিয়েছিলে চিনে,
সাড়া পেয়েছিলে তব প্রাণে
দূরগামী দুর্গমের স্পর্ধিত আহ্বানে,
ছিল যবে প্রথম যৌবন।
সেদিন ভোজের পাত্রে রাখ নি ভোজের আয়োজন,

ধনের প্রশ্রয় হতে আপনারে করেছ বঞ্চিত।
অন্তরেতে দিনে দিনে হয়েছে সঞ্চিত
পূজার নৈবেদ্য অবশেষ,
যে পূজায় তব দেশ
তোমারে দিয়েছে দেখা দরিদ্র দেবতারূপে
আসীন ধূলির স্তূপে
অসম্মানে অবজ্ঞায়।
সঁপেছ জীবন তব অর্ঘ্য তাঁর পায়ের তলায়।
তপস্যার ফল তব প্রতিদিন ছিলে সমর্পিতে
আমারি খ্যাতিতে।
তোমার সকল চিত্তে
সব বিত্তে
ভবিষ্যের অভিমুখে পথ দিতেছিলে মেলে
তার লাগি যশ নাই পেলে।

কর্মের যেখানে উচ্চ দাম
সেখানে কর্মীর নাম
নেপথ্যেই থাকে একপাশে।
মানবের ইতিহাসে
যে সকল খ্যাত নাম বহিতেছে উজ্জ্বল অক্ষর
তাদের অজানা লিপিকর
আপনার অকীর্তিত জীবনের হোমাগ্নিশিখায়
লাগায় রঙের দীপ্তি সে নাম লিখায়।
প্রগল্‌ভ জনতা যত দেয় পুরস্কার
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান নিভৃতে নীরব বিধাতার।

মন্দগতি গেছে কত দিন
মন্থর দৈন্যের ভারে ক্লচ্ছ্রশীর্ণ বিশ্রামবিহীন।
ভাগ্যের করুণা কাজ করে
নির্মম ঔদাস্যবেশে আকাঙ্ক্ষার দূর অগোচরে,
বিধাতার প্রত্যাশিত বর
প্রতিক্ষণে সেথা চাহে দেয় শুধু সন্দিগ্ধ উত্তর।

সফল ভাবীর জাগরণ
ভূমিগর্ভে গুপ্ত থাকে, বাহিরের আকাশে যখন
আশা আর নৈরাশ্যের উদ্বিগ্ন পর্যায়
খর রৌদ্রে কভু শাপ দেয়,
আশা দেয় মেঘের সঙ্কেতে।
অবশেষে অঙ্কুরের দেখা মেলে কৃষিদীর্ণ ক্ষেতে,
প্রসন্ন অঘ্রানে
সোনার আশ্বাস লাগে ধানে।
প্রৌঢ় সেই শরতের সফল দিনের জয়ধ্বনি
অন্তর আকাশ তব ভরুক আপনি
ঊর্ধ্ব হোতে
আনন্দের স্রোতে।
সম্পূর্ণ করিবে তারে বন্ধুদের বাহিরের দান
স্নেহের সম্মান।
বিদায়প্রহরে রবি দিনান্তের অস্তনত করে
রেখে যাবে আশীর্বাদ তোমার ত্যাগের ক্ষেত্র 'পরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিমলচন্দ্র সিংহ

প্রথম-যৌবনে, আঠারো বৎসর আগে, বিমলচন্দ্র সিংহ 'সমাজ ও সাহিত্য' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রমনীষার সঙ্গে গভীর পরিচয়ের প্রমাণে তা তরুণসমাজের গুণানুসন্ধানী বিনয়কুমার সরকারের অভিনন্দন লাভ করেছিল— 'বইয়ের ভেতর রবিকে গুলে খাওয়া হ'য়েছে বলা চলে। যেখানেই কামড়াবি পাবি রবীন্দ্র-সাহিত্য। বইটার অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে বিমল সিংহ'র মাখামাখি।' বস্তুতঃ 'এইখানেই আবার খানিকটা অসম্পূর্ণতাও ধরা প'ড়েছে। অনেক জায়গায়ই রবীন্দ্রনাথের "কালান্তর" বইটা (১৯৩৭) লেখককে পেয়ে ব'সেছে। একমাত্র বা প্রধানতঃ রবিকে সাক্ষী ডেকে শ' দেড়েক বছরের বাঙালী জাত্‌কে চুমড়ে নেবার চেষ্টা দেখা যায়।··· অরৈবিক চোখেও বঙ্গ-সংস্কৃতি আর বিশ্বশক্তিকে দেখতে পারা চাই।'

গত কুড়ি বৎসরের চর্চায় বিমলচন্দ্র সমগ্রতর দৃষ্টিতে সমাজ ও সাহিত্যকে দেখেছিলেন, তাঁর বহু রচনায় তার নিদর্শন রেখে গিয়েছেন, কিন্তু চিরদিনই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে ধ্রুবতারার স্থান অধিকার করে ছিলেন।

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি-উৎসবের উদ্যোগপর্ব আরম্ভ হবার অনেক পূর্বেই রবীন্দ্রভারতীর সম্পাদকরূপে বিমলচন্দ্র এ বিষয়ে সম্যক্ প্রস্তুত হবার প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন, সাময়িক ও স্থায়ী কর্মের একটি সুবৃহৎ অনুষ্ঠানসূচী প্রস্তুত করে প্রচার করেছিলেন, গুরুতর অস্বাস্থ্যের ফলে যদিও নিজে তিনি তেমন করে কর্মে প্রবৃত্ত

হতে পারেন নি। দেশময় এই উৎসবে যে আগ্রহ অবশ্যম্ভাবী তা স্থায়ীরূপে ফলবান করে তুলবার উদ্যোগ তেমন কোথাও লক্ষ্য না করে তিনি এই উৎসবের সূচনাপর্বে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'রবীন্দ্রশতবার্ষিকী প্রসঙ্গে জনসাধারণের কর্তব্য' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। স্বয়ং মন্ত্রী হয়েও এ কথা লিখতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি যে, সরকারী দপ্তরের প্রযোজনায় এই ধরণের উৎসব পূর্ণ সার্থকতার পথে পরিচালিত হতে পারে না, তাই জনসাধারণকে তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রশতবর্ষের অধিক অংশ এখনও সম্মুখে; তা ছাড়া, বিদেশী রবীন্দ্রভক্তও যদি এ কথা বলেন যে, শতবর্ষপূর্তি-উৎসব রবীন্দ্রমনীষা-অনুশীলনের সূচনাপর্ব মাত্র, তবে রবীন্দ্রনাথের দেশের লোকের পক্ষে এ কথা আরও কত যথার্থ; রচনাটির যা মূল বক্তব্য তার প্রাসঙ্গিকতা উৎসবের প্রথম পর্বের সমাপ্তিতেও ম্লান হয় নি, এটির অধিকাংশ আমরা উদ্ধৃত করছি।

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী প্রসঙ্গে জনসাধারণের কর্তব্য

রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই জানা আছে, রবীন্দ্রনাথ নিজে স্মৃতিসভা পছন্দ করতেন না, স্মৃতিসভা শোকসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল আপত্তি জানিয়ে গিয়েছেন। কবিকৃত নিষেধ সত্ত্বেও যদি উৎসব করতেই হয় তা হলে তা অত্যন্ত সাবধানে করতে হবে, যাতে তা সুরুচির সঙ্গে সম্পন্ন হয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পন্ন হয় এবং প্রকৃত তাৎপর্যের বাহক হয়। যেন সত্যি-সত্যিই আমরা রবীন্দ্রপ্রতিভাকে চিত্তে গ্রহণ করতে পারি।

এখনই প্রশ্ন হবে, এসব কথা বলা সহজ, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে এইসব কথা ঠিক কি রূপ নেবে? বস্তুত সেই সম্বন্ধে কিছুটা স্পষ্ট ধারণা না করতে পারলে এইসব কথা কার্যক্ষেত্রে নিরর্থক হয়ে ওঠে। আজ কাজের ক্ষেত্রে এইসব কথা ভাল করে চিন্তা করতে হবে, কেননা তা না হলে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী আর-পাঁচটা উৎসবের মতই মামুলি নাচ-গান-হল্লোড়, বক্তাদের আত্মপ্রচার অথবা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ বা ডাকটিকিট ছাপাতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। যেমন খড়ের আগুন জ্বলে গেলে ছাইটুকুও অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি উৎসবের কাল পেরিয়ে গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। যেমন বুদ্ধজয়ন্তী বা সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকীর সময় আমরা লক্ষ্য করেছি। রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও যদি তাই হয়, তাহলে তার চেয়ে শোকাবহ ঘটনা আর কিছুই হতে পারে না।

কেন হতে পারে না, সেই কথাটার ভালো বিচার করা দরকার। এ সম্বন্ধে প্রথম কথা হচ্ছে, এ যুগে রবীন্দ্রনাথের মত আর কোনও প্রতিভার আবির্ভাব হয় নি। কথাটা সকলেরই এত জানা যে কথাটা বলা প্রায় নিরর্থক। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, কথাটা অত্যন্ত সাধারণ হলেও এর গভীরতম ইঙ্গিত আমরা সব সময়ে উপলব্ধি করি না। তার অন্যতম প্রধান কারণ হল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান আমাদের মনকে এমনভাবে মাতিয়ে রেখেছে, শোকে-আনন্দে মিলনে-বিরহে— বস্তুত জীবনের প্রতিটি অবস্থায় — রবীন্দ্রনাথের গানে বা কবিতায় আমরা মনের ছবি এমনভাবে দেখতে পাই, তাও আবার কখনও মৃদু কোমল হয়ে বেজে ওঠে, কখনও বর্ণালির সাত রঙে রাঙিয়ে ওঠে— যে আমরা তাতেই এমন দিশেহারা হয়ে যাই যে আমাদের অন্য কথা মনেই থাকে না। বস্তুত যে কোনও মানসিক অবস্থাতেই থাকি না কেন, রবীন্দ্রনাথের কোনও-না-কোনও পংক্তি মনের মধ্যে ঝংকার দিয়ে উঠতে পারে, যে ঝংকারে আমাদের মনের বীণা বিচিত্র সুরে বাজতে থাকবে। কাব্যের জগৎ মায়াময়, সেই জগতে পরন্তু ন পরন্তেতি মন্যেতি চ মন্যেতি ন, — এটা আমারই কথা না অপরের কথা সে ভেদ লুপ্ত হয়ে যায়, আমরাই কবির হাতে বীণা হয়ে বাজতে

থাকি— এই হল শ্রেষ্ঠ কাব্যের চরম লক্ষণ, এবং বলা বাহুল্য রবীন্দ্রকাব্য একালের যুগে তার চরমতম উদাহরণ। কাজেই এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের নাম হলেই তাঁর কবিতা ও গানই সবপ্রথম এবং সবচেয়ে বেশি আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করবে, সে কথা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়, বস্তুত সবচেয়ে বড় কথাও নয়। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সবচেয়ে বিশিষ্ট, সে হল তাঁর প্রতিভার সামগ্রিকতায়— এবং এই কথাটি কবি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে গিয়ে আমরা প্রায় অনিবার্যভাবেই ভুলে বসে থাকি। কালিদাসও মহৎ কবি, শেক্‌স্‌পীয়রও মহৎ কবি, কিন্তু কবিই। অথচ রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ এবং একান্তভাবে কবি হয়েও মানবমনের এমন দিক্ নেই যেদিকে শেষ কথা বলে যান নি। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে চর্চা করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, এ একা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। এই আলোচনার বিস্তৃত ক্ষেত্র এ নয়—এ নিয়ে আলাদা বৃহদাকার গবেষণা নিশ্চয়ই চলতে পারে এবং চলা উচিতও— কিন্তু সংক্ষেপেও দু-একটি কারণের উল্লেখ করা যায়। দণ্ডী কাব্য-সম্পদের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন—

অলৌকিকী চ প্রতিভা শ্রুতঞ্চ বহুনির্মলম্।
অমন্দশ্চাভিযোগশ্চ কারণং কাব্যসম্পদঃ॥

প্রথম কারণ তো অবশ্যই অলৌকিকী প্রতিভা। কিন্তু তার সঙ্গে চাই বহুনির্মল শ্রুত অর্থাৎ জ্ঞান। আর চাই অমন্দ অভিযোগ, অর্থাৎ বরাবর লেগে থাকা। এই তিনটিরই পরাকাষ্ঠা রবীন্দ্রনাথে। কিন্তু তা ছাড়াও আরও কারণ ছিল। গত শতাব্দীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের ঢেউএ নবজাগ্রত বাঙালীর চিত্ত যখন নাড়া খাচ্ছিল, নতুন নতুন পথে তার চিত্তের বিকাশ ঘটছিল, নতুন সামাজিক স্তরবিন্যাস ঘটছিল, সেই যুগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এবং এই পরিবর্তনের পরম দীপ্তিময় প্রকাশ রবীন্দ্রনাথে। সমগ্র সমাজ, সমগ্র সমাজচিন্তা, সমগ্র যুগসমস্যা রবীন্দ্রমানসে বিধৃত, রবীন্দ্র-মানসের স্পর্শে তার সমস্ত অন্ধকার কোণ উজ্জ্বল, সেই মানসের দীপ্তিতে তার অতীত আলোকিত, তার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিগোচর। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, এই কবি নিজেকে অতীতে আবদ্ধ রাখেন নি, অতীতকে তিনি যেমন নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঠিক তেমনই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি যেসব গভীর উক্তি করে গিয়েছেন তার সত্যতা আমরা আগে উপলব্ধি না করলেও আজ করতে পারছি। 'সত্যের আহ্বান', 'স্বরাজসাধন', 'সমস্যা', 'সমাধান' ইত্যাদি কয়েকটি প্রবন্ধ পড়লেও তা প্রমাণিত হয়।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। প্রতিভার মহত্ত্ব শুধু নয়, এমনতর আশ্চর্য সামগ্রিকতা নিয়ে আর কোনও কবি জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোনও কবির মধ্যে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

সেইজন্য এই শতবার্ষিকী প্রসঙ্গে আমাদের দুটি সুমহৎ কর্তব্য আছে বলে আমি মনে করি। সশ্রদ্ধচিত্তে নিষ্ঠার সঙ্গে রুচির সঙ্গে আমরা যেমন কবিকে স্মরণ ও কীর্তন করব, তেমনি আমাদের সর্বপ্রধান কাজ হওয়া উচিত এই মহৎ প্রতিভার সামগ্রিকতাকে সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করা। আর সেইসঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হচ্ছে, ভাবালুতার সঙ্গে নয়, চিন্তাবিহীন ভক্তিবাদের মধ্যে দিয়ে নয়, কিন্তু গভীর মননশীলতার সঙ্গে সেগুলিকে জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা— কেননা রবীন্দ্রনাথের রচনার যদি কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে তাহলে সে হল এই যে, তিনি সমাজ ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে গভীর বিশ্লেষণ করে গিয়েছেন সেগুলির সত্যতা এখন দিন দিন পরিস্ফুট হচ্ছে এবং সে হিসেবে জোর করেই বলা যায় এখন আমরা যেসব বাধার সম্মুখীন হই সেগুলি অতিক্রমণের পথ রবীন্দ্রনির্দিষ্ট পথ।

আমাদের সমাজের প্রকৃত চেহারা কিরকম, তার আসল দুর্বলতা কোন্‌খানে, কোন্‌ দিক্‌ হতে মার আসতে পারে এবং আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের মধ্যে কোথায় কোথায় দুর্বলতা ছিল, এসব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এত লিখেছেন এবং তাঁর বিশ্লেষণ এত সফল হয়েছে যে তা একটি আলাদা বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে— এই প্রবন্ধের পরিসরে তা বলা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে খুব সংক্ষেপে গুটিকয়েক কথা বলতে গেলে বলা চলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কথা হল আমাদের দেশে রাষ্ট্রতন্ত্র বড় কথা নয়, আমাদের মূল সমাজে। সুতরাং পশ্চিমী দেশগুলির মত রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে ভাল করে চালাতে পারলেই যে আমাদের সব সমস্যা মিটে যাবে, আমাদের দেশের পক্ষে তা সত্য নয়। সেইজন্য আমাদের সমস্যার মূল হল সমাজে, সেই মূল উচ্ছেদ না করতে পারলে আমাদের সমস্যা মিটবে না। উদাহরণস্বরূপ তিনি বারবার দেখিয়েছেন, আমাদের সমাজে নানা অশিক্ষা নানা অবুদ্ধি — আমাদের সমাজের অংশে অংশে জোড় নেই। প্রদেশে প্রদেশে অনৈক্য, হিন্দু-মুসলমানে অনৈক্য। তিনি খুব তীক্ষ্ণ ভাষায় বলেছিলেন, এই যে হিন্দু-মুসলমানে অনৈক্য, একে খেলাফতের বাঁধন বেঁধে জোড় মেলানো যাবে না। তাঁর নিজের ভাষা হল—

'আজ অসহকার আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে, তার কারণ রুম-সাম্রাজ্যের অঙ্গকে ব্যঙ্গীকরণের দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব। এমনতরো মিলনের উপলক্ষ্যটা কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা সত্যতঃ মিলি নি; আমরা একদল পুবমুখ হয়ে, অন্যদল পশ্চিমমুখ হয়ে কিছুক্ষণ পাশাপাশি পাখা ঝাপটেছি। আজ সেই পাখার ঝাপট বন্ধ হল, এখন উভয়পক্ষের চঞ্চু এক মাটি কামড়ে না থেকে পরস্পরের অভিমুখে সবেগে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রনৈতিক অধিনেতারা চিন্তা করছেন, আবার কী দিয়ে এদের চঞ্চু দুটোকে ভুলিয়ে রাখা যায়। আসল ভুলটা রয়েছে অস্থিতে মজ্জাতে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে ভাঙা যাবে না।'

ভাঙা যে যায় নি, খিলাফৎ প্রভৃতি যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে তার তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাকিস্তান। রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ বলেছেন—

'আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারবার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপর অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করি নে। আপন পক্ষের কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে আছি বলেই অপরপক্ষের কথা নিয়ে এত অত্যন্ত অধিক করে আমরা আলোচনা করে থাকি। তাতে শক্তিহ্রাস হয়। স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই।...যে মানুষ বলে "আগে ফাউন্টেন পেন পাব তারপরে মহাকাব্য লিখব", বুঝতে হবে তার লোভ ফাউন্টেন পেনের প্রতিই, মহাকাব্যের প্রতি নয়। যে দেশাত্মবোধী বলে "আগে স্বরাজ পেলে তারপর স্বদেশের কাজ করব", তার লোভ পতাকা-ওড়ানো উর্দি-পরা স্বরাজের রঙ-করা কাঠামোটার 'পরেই।'

এসব কথা আজ মর্মান্তিক সত্য হয়ে ফুটে উঠছে। এইসব কথার মর্ম এখন ভাল করে বিবেচনা করা দরকার, কেননা রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিসত্তম ছিলেন না— যাঁর কাব্য সুখে দুঃখে বিরহে মিলনে আমাদের সঙ্গী— তিনি সেই সঙ্গে যে সমাজচিন্তা করে গিয়েছেন তার সত্যতাও আজ অভ্রান্ত। এইখানেই রবীন্দ্রপ্রতিভার অনন্ত গভীরতা ও সামগ্রিকতা এবং এইটির উপলব্ধি ও আচরণ না করতে পারলে আমরা শুধু উৎসবে সাময়িক কালহরণ করে আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত হল মনে করব, কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভাকে প্রকৃত সম্মান দেখাতে পারব না। শত-

বার্ষিকী উপলক্ষে এইটেই আমাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আর আমাদের অনুধাবন মানে সত্যিই আমাদের অনুধাবন, অর্থাৎ দু-চারজনের অনুধাবন নয়, দেশসুদ্ধ লোকের অনুধাবন। এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় : এ কাজ করবে কে?

বলা বাহুল্য, আজও এদেশের জড়তা কাটে নি। পূর্বেও যেমন, এখনও তেমনি, কোন কিছুর অভাববোধ হলেই আমরা পার্চমেণ্টে লিখিত দরখাস্ত নিয়ে সরকারের দরবারে হাজির হই, এবারও হয়েছি, এমন-কি এইরকম একটা উপলক্ষ্যেও হয়েছি। এই শতবার্ষিক উৎসবে সেইজন্য বড় শরিক হয়ে দেখা দিয়েছেন নামান্তরে সরকার, তাঁদেরই কর্তৃত্বাধীনে জেলায় জেলায় জেলাশাসকদের সভাপতি করে কমিটি গঠিত হয়েছে।

দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে, জনসাধারণের সরকার নির্বাচিত হয়েছে, তাঁরা এখন এ বিষয়ে অগ্রণী হবেন বই কি— তা না হলে তাঁদের প্রত্যবায় হবে। তাঁদেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট কর্তব্য আছে, সে কর্তব্য তাঁরা পালন করুন। পশ্চিমবাংলা সরকার বলেছেন, নিছক সরকারের তরফ হতে জাতীয় রঙ্গালয় ইত্যাদি চার-পাঁচটি কাজ তাঁরা করবেন। সে কাজ যদি তাঁরা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন, দেশের লোক কৃতজ্ঞ হবে।

কিন্তু এই কথাটা ভুললে চলবে না যে, কতকগুলি কাজ আছে, যেগুলি সরকারের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়, বিশেষ করে আমাদের দেশের সরকারের দ্বারা হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তার প্রধান কারণ হল এই যে, যেখানে জনসাধারণের আত্মিক উদ্বোধনের দরকার সেখানে তার জন্য দরকার আসল গুরুর, যাঁর আহ্বানে মনের বীণা আপনিই বেজে উঠবে। সেখানে সরকারী ঢাকঢোল গড়ের বাদ্য জৌলুস সৃষ্টি করতে হয়তো পারে, কিন্তু তাতে কাজ হবে না।

বিশেষত আমাদের দেশে। তার প্রথম কারণ, আমাদের দেশে আমরা জিনিস গড়বার কাজে যত মন দিয়েছি, মন গড়বার কাজে তত মন দিই নি। সরকারী বিবরণী বা বক্তৃতা মাত্রেই দেখা যাবে প্রায় শুধু জিনিসের হিসেব— এতগুলি রাস্তা হয়েছে, এতগুলি নলকূপ, এতগুলি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এগুলি চাই বই কি, কিন্তু এতেই দেশ গড়ে না। রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন—

'আমাদের দেশ আছে, এই আস্তিকতার একটি সাধনা আছে।...যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে, এইজন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ।'

এমন করে নিজের দেশকে স্বদেশ গড়ে তোলার প্রয়াস আমরা এখনও বেশি দেখি নে। ঝোঁকটা সেদিকে বেশি নেই। তার উপর দ্বিতীয় কথা হল, আমাদের দেশে মন গড়বার সর্বাত্মক নিগড় আমরা গড়ে তুলবার চেষ্টা করি নি, করলে হয়তো সর্বাধিনায়ক একটা বোতাম টিপে দেশের মনকে একটা দিকে নিয়ে যেতে পারতেন; তিনি যদি বলতেন, রবীন্দ্রনাথ জনগণের কবি, তোমরা সবাই তাঁর রচনা পড়ো, তাহলে তাই হত, আর তিনি যদি বলতেন, রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি অতএব অস্পৃশ্য, তা হলে সাহস করে তা কেউ পড়ত না। আমরা যে সেদিকে যাই নি তা খুব ভাল করেছি কেননা আসল স্বারাজ্য মনের স্বারাজ্য, তা না হলে অন্য সবই বৃথা। সুতরাং রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে দেশময় রবীন্দ্রনাথের যে গভীর পঠন-পাঠন ও নিদিধ্যাসন আমরা আশা করি তা সরকারী চেষ্টার মারফত কখনোই হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষত সরকার চলে সিভিল সার্ভিসের হাতে। তাঁরা অন্য বিষয়ে কর্মদক্ষ, কিন্তু তাঁদের অশ্রদ্ধা না জানিয়েও বলা যায় এটা তাঁদের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। এমন-কি রাশিয়া— যেখানে সবই সরকারী শৃঙ্খলে বাঁধা এবং সরকারী কর্মচারীদের ক্ষমতা সত্যি-সত্যিই অসীম কার্যকরী, কবির কথাতেই যেখানে 'জবরদস্তির সীমা নেই' সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা

সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'রাশিয়ার চিঠি'তে লিখেছিলেন— সেখানে তারা 'সিভিল সার্ভিসের আমলাদের দিয়ে এরা মোটা মাইনের আপিস চালাবার কাজ করছে না— যারা যোগ্য লোক যারা বৈজ্ঞানিক তারা সবাই লেগে গেছে।'

রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু দু-চারটি ভাল কবিতা বা গান লিখে যেতেন তাহলে তাঁর জয়ন্তী নিয়ে এত চিন্তার প্রয়োজন হত না। ঐ ডাকটিকিটে ছবি ছাপা, পার্কে প্রতিমূর্তি স্থাপন, কিছু ভাব-গদ্গদ বক্তৃতা— এইসব হলেই হয়ে যেত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হলেন সেই কবি যাঁর বাণীর মধ্যে আমাদের সমস্ত জাতির মর্মবেদনা ও মর্মকথা উদ্গীথ হয়েছে, যাঁর ভাষায় আমাদের সামগ্রিক চেতনা ওংকারিত হয়ে উঠেছে, অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের গভীরতম ইঙ্গিত তাঁর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এই কবির স্মরণোৎসব যথোচিত হতে হলে এই কবির বাণীকে জনগণের অন্তরে প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে হবে, সারা জাতি তাঁর সেই বাণী আলোচনা করবে, কদর্থ ভাবালুতায় নয়, গভীর মননশীলতার সঙ্গে, সশ্রদ্ধ বিচারের সঙ্গে। তা না হলে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর প্রকৃত সার্থকতা কোথায়?

এই কাজ, পূর্বেই বলেছি, আমাদের দেশে সরকারী উদ্যোগে সম্ভব নয়— এ কাজের ভার দেশের প্রত্যেক জ্ঞানী গুণী যোগ্য ব্যক্তিকে নিতে হবে। দেশ তাঁদের আহ্বান জানাচ্ছে এগিয়ে আসবার জন্য। ওধারে চাঁদা উঠল কি না উঠল, মর্মরমূর্তি স্থাপিত হল কি হল না, ডাকটিকিটে ছবি ছাপা হল কি হল না,— এসব বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করবার দরকার নেই। আমার দেশ আছে, আমার কবি আছেন, আমার কর্তব্য আছে এই আস্তিক্যবুদ্ধির নিরলস সাধনাই তাঁদের একমাত্র সম্বল হোক। তা হলেই দেখতে পাওয়া যাবে, দেশময় আবার একটি প্রবল ভাবপ্রবাহ প্রবাহিত হচ্ছে, যা প্রাণদ, যা বলদান করে।

এই আস্তিক্যবুদ্ধির সাধনা কি কি রূপ গ্রহণ করবে তার তালিকা করবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন, কারণ ধারা যখন বইতে থাকে, তখন সে নিজেই তার পথ কেটে নেয়। তবু এখানে আমি সামান্য দু-একটি প্রস্তাব করতে চাই।

॥ প্রথম, শিক্ষাসত্র ॥ 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'একালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মত। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।'

আজও সেই অবস্থা সত্য। সেন্সাস রিপোর্ট খুললে দেখা যায় সারা দেশের জ্ঞানীগুণীদের ঘনবসতি কলকাতা শহরে, মফস্বলে খুব কম। আর বাংলাদেশের প্রান্তে প্রত্যন্তে অশিক্ষিতের সংখ্যা এখনও বোধ হয় শতকরা নব্বুই ভাগ, তারা সমস্ত জ্ঞানের আলো হতে বঞ্চিত। এ অবস্থায় আমাদের প্রধানতম কর্তব্য বলে আমি মনে করি, গ্রামে গ্রামে শিক্ষাসত্র স্থাপন।...এর জন্য বৃহৎ ইমারতের দরকার নেই, বিদেশাগত গুণভিত্তির দরকার নেই, এমন-কি সরকারী সাহায্যেরও বোধ হয় দরকার নেই। চাই অত্যন্ত ছোট একটুকরো জমি, তার উপর একটি ছোট আটচালা, আর চাই রবীন্দ্রনাথের কিছু বই। গ্রামে গ্রামে আজ বিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে, না হলেও গ্রামে অন্তত দুটি-একটি শিক্ষিত যুবকের অভাব হবে না। সেই যুবকেরা এই বিষয়ে পঠন-পাঠনের ভার গ্রহণ করুন, আম-নারিকেলের সুনিবিড় ছায়ায় স্নিগ্ধ এক প্রাঙ্গণে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা আলোচনা-সভা বসুক।...

"আমি পথিক,
পথ আমারি সাথি—"
কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ সকলের অলক্ষ্যে
একটা পুরানো পরিত্যক্ত পাল্‌কির ভিতরে
ঢুকে চোখ দু'টি বুজে বসতেন
আর কল্পনার অলস পাখায় ভর দিয়ে চলে
যেতেন মায়ায় ঘেরা কোন অচিন
দেশে। উত্তরকালে 'সুদূরের পিয়াসী'
রবীন্দ্রনাথ দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ
করেছেন—ঘরছাড়া বাতাসের মতো
'উদ্দাম-উধাও' হওয়ার কথা
ভেবেছেন। 'পথের প্রেমে' মেতে
উঠে কবিগুরু লিখেছেন:
"আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।
দিন সে কাটায় গণি গণি
বিশ্বলোকের চরণধ্বনি,
তারার আলোয় গায় সে সারারাতি।
... ...
বাহির হলেম কবে সে নাহি মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।..."
ডানলপ কর্তৃক প্রচারিত
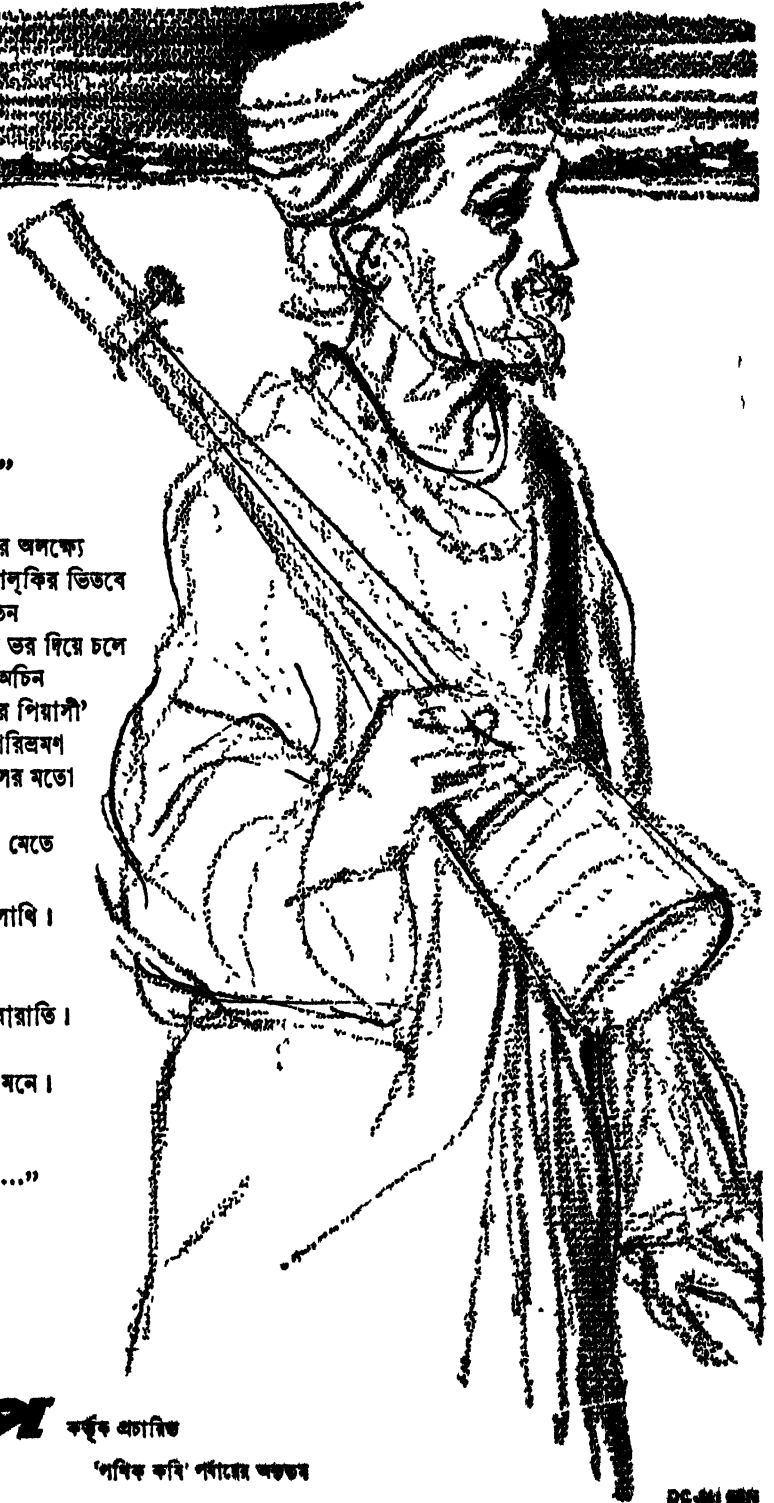
আশা করব, বাংলাদেশের মনস্বীরা সেই ডাক দেবেন, যে ডাকে সারা বাংলাদেশের হৃদয়ের দুয়ার খুলে যাবে, গ্রামে গ্রামে শিক্ষাসত্র স্থাপিত হবে, দেশের মনের চেহারা যাবে বদলিয়ে, দেশের লোক দেশের আত্মাকেও খুঁজে পাবে, রবীন্দ্রনাথের বাণীময় আত্মাকেও।

॥ দ্বিতীয়, বিদ্যাসত্র ॥ প্রতি গ্রামে গ্রামে শিক্ষাসত্র প্রতিষ্ঠিত হোক এই হল আমার প্রথম প্রস্তাব। আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব হল: যেখানে ভাল বিদ্যালয় আছে সেখানে রবীন্দ্ররচনাবলী একখণ্ড করে সংগ্রহ করা এবং ছাত্রদের মধ্যে তাই নিয়ে যথাসম্ভব আলোচনা। তা ছাড়া আরও একটি কাজ সহজেই করা যেতে পারে এই ২৫শে বৈশাখ হতে আগামী ২৫শে বৈশাখ পর্যন্ত প্রতি মাসে রবীন্দ্ররচনার এক-একটি দিক্ নিয়ে কেউ আলোচনা করতে পারেন, তাহলে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ব্যাপকতা লাভ করতে পারে। আজকাল দেখা যাচ্ছে যাঁরা সেকালের রবীন্দ্রানুরাগী তাঁরা প্রায়ই 'গীতাঞ্জলি'-'বলাকা'র পর থেমে গিয়েছেন, আর একালের পাঠকেরা 'জন্মদিনে'-'শেষ লেখা'র ওদিকে বড় পৌছন না। আর রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্য, তার বিচিত্রানুগামিতা নিয়ে, সম্যক্‌ভাবে আলোচনা করেছেন এমন লোক বাংলাদেশে খুব কমই আছেন। এই উপলক্ষ্যে সমগ্র রবীন্দ্রচিন্তাধারার গভীর বিচার হওয়া দরকার এবং সেই কাজের ভার বিদ্যাসত্রগুলিরই নেওয়া উচিত।

॥ তৃতীয়, বিবিধ ॥ এ ছাড়া বহুবিধ কাজের মাধ্যমে রবীন্দ্রস্মরণ হতে পারে, তার তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে প্রাণবায়ু যখন মহাবায়ুতে মিলে যায়, শরীর ভস্মে অন্ত হয়ে যায়, তখন সেই গতাসু মহাপুরুষ সারাজীবন ধরে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন তাকেই স্মরণ এবং অনুকরণ করতে হয়। এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র যে রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না, বহু বিষয়ে তিনি পথপ্রদর্শক কর্মী ছিলেন। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—

'আমি একদিন দীর্ঘকাল ছিলুম বাংলাদেশের গ্রামের নিকট-সংস্রবে। গরমের সময় একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েছে নেমে, তীরের মাটি গিয়েছে ফেটে, বেরিয়ে পড়েছে পাড়ার পুকুরের পঙ্কস্তর, ধূ ধূ করছে তপ্তবালু। মেয়েরা বহুদূর পথ থেকে ঘড়ায় করে নদীর জল বয়ে আনছে, সেই জল বাংলাদেশের অশ্রুজলমিশ্রিত।'

সেই অশ্রুজল নিবারণের কাজে কি আমরা নিজেদের উৎসাহেই লাগতে পারি না? বস্তুত রবীন্দ্রনাথের অতিবিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজের' উপলক্ষ্যই এই। বাংলাদেশে একবার জলকষ্ট হয়েছিল, তার নিবারণ সম্বন্ধে সরকারী মন্তব্য প্রকাশিত হলে সেই প্রবন্ধ লিখিত হয়। সেই উপলক্ষ্যেই তিনি বলেন, 'আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া আমরা যে আক্ষেপ করিতেছি সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে, তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।' সেই শোকের কারণ আজও বিদ্যমান, তাকে কি আমরা দূরীভূত করতে পারি না? রবীন্দ্রনাথ আবার লিখেছেন—

'শুধু যন্ত্রে কোনও কাজ হয় না যন্ত্রী যদি মানুষ না হয়ে ওঠে। এদের [রাশিয়ার] ক্ষেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে......যখন বোলপুরের কো-অপারেটিভের ব্যবস্থা বিশ্বভারতীর হাতে এল তখন আবার একদিন আশা হয়েছিল, এইবার বুঝি সুযোগ হাতে আসবে। যাদের হাতে আপিসের ভার তাদের বয়স অল্প, আমার চেয়ে তাদের হিসেবী বুদ্ধি এবং শিক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু আমাদের যুবকেরা ইস্কুলে-পড়া ছেলে, তাদের বই মুখস্থ করার মন। যে-শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে করে আমাদের চিন্তা করার সাহস, কর্ম করার দক্ষতা থাকে না, পুঁথির বুলি পুনরাবৃত্তি করার 'পরেই ছাত্রদের পরিত্রাণ নির্ভর করে।'

এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি —
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

চালায় যে নাম নাহি কয়।
কেউ বলে যন্ত্র সে, আর-কিছু নয়।
মানেহীন বলে তারে, তবু অন্ধের মতো
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে সে অনিশ্চিত, তবু জানে অতি
নিশ্চিত তার গতি।
নামহীন যে অচেনা বারবার পার হয়ে যায়,
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়
তারি যেন বহে নিশ্বাস —
সন্দেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে।

- রবীন্দ্রনাথ

পূর্ব রেলওয়ে
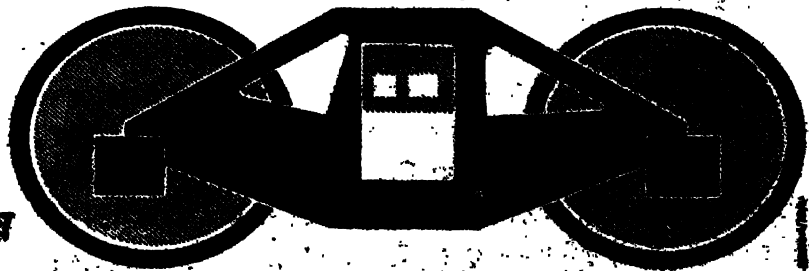
এখন আমরা স্বাধীন, কিন্তু নব নব পথে নতুন নতুন অভিযানের সাহস ও উত্তম জনচিত্তে জাগ্রত হয়েছে কি? দেশের মনের উদ্বোধনের চেষ্টা হচ্ছে, সে কিন্তু ব্লক ডেভেলপমেন্টের ম্যানুয়াল অনুসারে বাঁধা পথে। কিন্তু যে পথে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের জীপের ধুলো ওড়ে না, যে পথের রেখা কলমের কালি দিয়ে খাতার পাতায় লেখা যায় না, খন্তা দিয়ে চিরে চিরে পৃথিবীর বুকে লিখতে হয়, বেহিসেবী মনের উড়নচণ্ডী তাগিদে নতুন নতুন পথ আবিষ্কৃত হয় সে পথ কই? অথচ আজ সেই ভার জনসাধারণকে নিতে হবে, তবেই রবীন্দ্রচিন্তাধারা সার্থক হবে।

আসল কথা হল যেভাবে রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর আয়োজন চলছে, তা অত্যন্তই মামুলি, তা দেখলে বিদগ্ধজনমাত্রেই ক্ষুব্ধ হবেন এবং বলবেন, থাক্, সভাসমিতিতে কাজ নেই, চলো নিভৃত শালবনে গিয়ে কবিকে স্মরণ করি। আমি বারবার বলেছি, গোটাকয়েক স্মৃতিস্তম্ভ আর গোটাকয়েক নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান, এই সস্তা জিনিস দিয়েই যেন রবীন্দ্রনাথের মহৎ স্মৃতিকে অপমান না করা হয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ তার চেয়ে বড়ো, অনেক বড়ো, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এতবড় মহৎ প্রতিভা জন্মায় নি। স্থতরাং সেই প্রতিভার প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখাতে হলে শুধু নৃত্যনাট্য নয়, শুধু স্তুতি নয়, রবীন্দ্রলেখনী হতে যে ভাবধারা কখনও স্থশীতল ঝরনার মত ঝরে পড়েছে, কখনও অগ্নিজ্বালার মত আমাদের অন্যায় আবর্জনাকে ভস্মীভূত করতে চেয়েছে, কখনও দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারকে তীক্ষ্ণ ভাষায় নিন্দিত করেছে, আমাদের মৌলিক সমস্যাগুলিকে সামনে এনে দিয়েছে, কোনও প্রচলিত ঢেউএ ভেসে যায় নি— আবার সেই সঙ্গে স্থরে গানে কবিতায় আমাদের মনকে মাতিয়ে রেখেছে— সেই ভাবধারার সম্পূর্ণ স্বাঙ্গীকরণ ও কাজে প্রতিফলনই হল রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর মহত্তম উদ্‌যাপন। অপেক্ষা করে আছি সেই শক্তিমান পুরুষের জন্য, যাঁর কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, যিনি ডাক দেবেন জাতিকে এই উদার ক্ষেত্রে, দেশময় জনচিত্ত তরঙ্গিত হয়ে উঠবে, জনসাধারণ প্রত্যেকে ভার নেবে রবীন্দ্রজয়ন্তীর। তা নইলে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বিত্তবানের কাছ থেকে কিছু চাঁদা তুলে একটি কুশ্রী প্রতিমূর্তি স্থাপনের অর্থ কি?

মৃত্যুশয্যা থেকে কোনো স্থহৃদকে বিমলচন্দ্র যে একখানি চিঠি লিখেছিলেন, রবীন্দ্রবাণী তাঁর জীবনের মূলে কি ভাবে স্থান নিয়েছিল তার নিদর্শনরূপে সর্বজনসমক্ষে সেটি প্রকাশ করা কর্তব্য জ্ঞান করি—

কলিকাতা

৩১।৩।৬১

প্রীতিভাজনেষু,

আপনি আজীবন রবীন্দ্রচর্চা করেছেন, আমিও কম দিন করছি না, রবীন্দ্ররচনা সম্বন্ধে কত প্রবন্ধই লিখেছি, কিন্তু আজ হঠাৎ রবীন্দ্রনাথকে যে ভাবে অনুভব করলুম সে অতি আশ্চর্য। আমার বর্তমান অবস্থা আপনি জানেন। সন্ধ্যাবেলা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড বাজানো আরম্ভ হল, হঠাৎ আমার ইতিপূর্বে না-শোনা একটি গান বাজতে শুরু করল, আমি শুনলাম (যদিচ পরে বুঝছি একটু ভুল শুনেছিলাম, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না)— আমি শুনতে লাগলাম "আমায় যেথা যেতে হবে সে তো আমি জানি— আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী"... দ্বিতীয় লাইন অবধি পৌঁছতে হল না, সুবার প্রথম লাইন গাওয়া হবা মাত্র মনে হল সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মুছে গেল, সমাজ সংসার কোথায় উড়ে গেল, আমার স্থূল অস্তিত্বও যেন লোপ পেয়ে গেল, আমি চোখ

বুজে অনুভব করতে লাগলাম, আমার স্রষ্টার সামনে আমি একা হাতজোড় করে গান গাইছি— "আমায় যেথা যেতে হবে সে তো আমি জানি।" নেই নেই কেউ কোথায়ও নেই, কোন এক নিভৃতে স্রষ্টা বসে আছেন, আর আমি তাঁর সামনে চোখ বুজে হাত জোড় করে গান গাইছি— আমায় যেথা যেতে হবে সে তো আমি জানি। আমার হৃদয়ে কি যে হল তা আমি জানি না, আমার চোখ দিয়ে জলের ধারা বইতে লাগল, আমার মনে হতে লাগল আমার সমস্ত অস্তিত্ব আমি স্রষ্টার হাতে সমর্পণ করছি—

আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা—
সব দিতে হবে।

সবই দিতে হবে যে, সেই তো চরম মুহূর্ত।

এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তার বাঁধা
বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা
সব দিতে হবে।

নাও, নাও, প্রভু নাও।

তোমারি আনন্দ আমার দুঃখ সুখে ভরে
আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও গো তোমার ক'রে
সব দিতে হবে।

সে এক আশ্চর্য অনুভূতি! আমার হৃদয় উত্তাল তরঙ্গে আন্দোলিত হতে লাগল, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সামলাতে পারলুম না, পাশে মা বসেছিলেন, তা সত্ত্বেও দু চোখ বেয়ে জলধারা বইতে লাগল, আমি চোখ বুজে গান শুনতে লাগলুম, না, শোনা তো নয় মনে হচ্ছে আমার সারা অন্তর থেকে ধ্বনি উঠছে "আমায় যেথা যেতে হবে সে তো আমি জানি— সবই দিতে হবে।"

গান শেষ হয়ে গেল, কিন্তু চোখের জল আর থামে না। আপনাকে কি বলব, অন্ততঃ দশ মিনিটের জন্য আমার কি যে হল তা আমি জানি না, শুধু এইটুকু জানি যে পরম নিভৃতে স্রষ্টার সামনে আমি চোখ বুজে গান গাইছি— ঠিক গাইছি না, আমার সমস্ত অস্তিত্ব যেন একটি অপূর্ব সুরে বাজছে "আমায় যেথা যেতে হবে সে তো আমি জানি— সবই দিতে হবে!"

রবীন্দ্ররচনা বাল্যাবধি পড়ে আসছি, আনন্দও পেয়েছি, কিন্তু একটা মানুষের লেখা পড়ে বা গান শুনে এরকম কাণ্ড হতে পারে এ চিন্তার বাইরে ছিল। একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে ইত্যাদি গান শুনলে হৃদয় শান্ত হয়, এই পর্যন্ত : কিন্তু এ কি ব্যাপার! এ যুগের ঘোর অবিশ্বাসী একটা মানুষ বুদ্ধি নিয়েই যাদের বড়াই, অনুভূতি যাদের বুদ্ধিতর্কের বেড়াজালে চাপা পড়া, সে রকম একটা লোক এক মিনিটের মধ্যে কোথায় চলে গেল, সারা বহির্জগৎ ধুয়ে মুছে গেল, চোখ বুজে আমি অনুভব করছি, স্রষ্টা আর তাঁর সামনে আমি ব্যাকুল নিবেদন করছি—

আমায় যেথা যেতে হবে সে তো আমি জানি
সবই দিতে হবে

সমৃদ্ধির পথে ত্রিপুরা
শতকরা ৬৫ জন ছেলেমেয়েকে লেখা-পড়া শিখানো ত্রিপুরাবাসীর নিকট এখন আর অসম্ভব নয়। উন্নততর জীবন-যাত্রার পথে ত্রিপুরাবাসী আরও কয়েকটি সুবিধা লাভ করিয়াছেন। রোগে আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা হাসপাতাল বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়া গিয়া চিকিৎসা-সংক্রান্ত সর্বরকম সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন। আনন্দের বিষয়, হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। রোগ-প্রতিষেধক টীকাদি গ্রহণে জনসাধারণ যথেষ্ট আগ্রহশীল। এই সমস্ত ব্যাপারে পূর্বের মত কুসংস্কার এখন আর কাহারো নাই বলিলেই চলে। বর্তমানে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, ডাক্তার ও নার্স সারাক্ষণই কর্মব্যস্ত। ইঞ্জিনীয়ারদের পক্ষেও এই কথা প্রযোজ্য। রাস্তা ও পুল তৈয়ারি করিয়া তাঁহারা ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলগুলিতেও সংযোগ স্থাপন করিতেছেন। ত্রিপুরার ঐতিহ্যমণ্ডিত কুটীরশিল্পসমূহ ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হইতেছে। এই ধরণের শিল্প-সংস্থাগুলির তৈয়ারী হাতের কাজ অতীব সুন্দর। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিও ত্রিপুরায় চালু করা হইতেছে। উন্নতশ্রেণীর কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করায় ফসলের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলিয়াছে। পশু-চিকিৎসালয় ও লোকাল কার্যগুলিতে নিযুক্ত চিকিৎসকগণ জনসাধারণকে উন্নতপদ্ধতিতে পশুপক্ষী প্রতিপালনসম্পর্কে উপদেশ ও সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। যাযাবর-শ্রেণীর জুমিয়া আদিবাসীগণ সুপরিকল্পিত কলোনীগুলিতে পুনর্বাসন লাভ করিয়া ক্রমশঃ স্থায়ী চাষকার্যে অভ্যস্ত হইতেছেন। জনসাধারণ সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায় সমবায় সমিতির সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এইভাবে নূতন আশার আলোকে উদ্দীপিত ত্রিপুরাবাসী পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে ব্যস্ত রহিয়াছেন।
উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্য
পরিকল্পনাকে সফল করতে ত্রিপুরা বদ্ধপরিকর
ত্রিপুরা প্রশাসন কর্তৃক প্রচারিত

এখন সে যে আমার বীণা হয়েছে তার বাঁধা
বাজবে যখন তোমার হবে তোমার স্থরে সাধা
সবই দিতে হবে !

এই আশ্চর্য অনুভূতির কথা কি লিখব। রবীন্দ্রনাথ যে এইরকম কবি সে কথা এ রকমভাবে কখনও অনুভব করি নি। হয়তো দশ মিনিটের জন্তও এই গান আমাকে এমন একটা অনুভূতি দিলে যা বুদ্ধিতে হয় না, বিদ্যেতে হয় না, চেষ্টায় হয় না। এ কি কাণ্ড!

প্রীতিবদ্ধ
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

রবীন্দ্রায়ণের পরিকল্পনাকালে বিমলচন্দ্র সংকলয়িতাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন; রবীন্দ্রমনীষা সম্বন্ধে একখানি বিশদ গ্রন্থ রচনা করে শতবার্ষিক উৎসবে তাঁর কৃত্য সম্পন্ন করবেন এই তাঁর একান্ত বাসনা ছিল, তার প্রধান অংশ রবীন্দ্রায়ণে প্রকাশ করতে তিনি ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। কাল তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হতে দিল না; আমরা তাঁর একটি পূর্বতন রচনা বিশ্বভারতী পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত করে 'সেই সত্যসংকল্প মহদাশয়কে···ঋণমুক্ত করিলাম।' আর, তাঁর কাছে সংকলয়িতার যে স্নেহ-ঋণ, বাক্য বা রচনার দ্বারা তা অপরিশোধনীয়, সেই ঋণ-স্মৃতি সংকলয়িতার একান্তই ব্যক্তিগত সম্পদ হয়ে রইল।

স্বীকৃতি

রবীন্দ্রায়ণ দুই খণ্ডে যে-সকল লেখক ও শিল্পী প্রবন্ধ বা ছবি দিয়ে বা অন্যান্যভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রায় সকলের কাছেই সংকলনকর্তা দীর্ঘকাল ধরে স্নেহপ্রীতির ঋণে আবদ্ধ, বর্তমান প্রয়াসে তাঁদের আনুকূল্য সেই প্রীতিরই অন্যতম নিদর্শনমাত্র। নূতন করে সে ঋণের স্বীকার বাহুল্য, এখানে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করি।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের যে-চিত্রটির এনগ্রেভিং-প্রতিলিপি রবীন্দ্রায়ণে মুদ্রিত হয়েছে তার মূল চিত্রখানি কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লে রক্ষিত আছে। ১৮৪৩ সালে সে ছবিটি অঙ্কিত হয়। ঐ চিত্র অবলম্বনে কৃত এনগ্রেভিং-এর একটি কপি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্ট্‌সে রক্ষিত আছে, অ্যাকাডেমি-কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহপূর্বক সেটি আমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্রখানি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীঅবন্তী দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত— একদা মহর্ষি শাস্ত্রীমহাশয়কে ছবিখানি উপহার দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের যে ছবিখানি প্রথম খণ্ডের আরম্ভে মুদ্রিত হয়েছে সেখানি অনুগ্রহপূর্বক ব্যবহার করতে দিয়েছেন কবি-সুহৃৎ প্রিয়নাথ সেনের পুত্র শ্রীপ্রমোদনাথ সেন; পিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্যের বহু নিদর্শন তথা রবীন্দ্রজীবনীর অমূল্য উপকরণ চিঠিপত্র ছবি তিনি দীর্ঘকাল রক্ষা করে আসছেন।

'জাহাজে "সাবিত্রী"-রচনানিরত' রবীন্দ্রনাথের ছবিখানি শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য-কর্তৃক গৃহীত।— রবীন্দ্রায়ণের পাঠক সকলেই জানেন পূরবীর অনেকগুলি কবিতা ১৯২৪ সালে দক্ষিণ-আমেরিকাযাত্রাকালে জাহাজে রচিত, "সাবিত্রী"ও তার অন্যতম। ২৪ সেপ্টেম্বর যাত্রারম্ভ থেকেই ঝড়বৃষ্টির কথা 'যাত্রী'তে উল্লিখিত আছে— 'আকাশে ঘন মেঘ, দিগন্ত বৃষ্টিতে ঝাপসা।' 'একখানা ভিজে অন্ধকারে আকাশ ঢাকা। এবার আলোকের অভিনন্দন পেলুম না।' ২৬ সেপ্টেম্বর, 'আজ ক্ষণে ক্ষণে রৌদ্র উঁকি মারছে'— 'আমি তোমার দিকে বাহু তুলে বলছি, হে পূষন্, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ খোলো।'

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য মহাশয় লিখছেন— এই দিন সকালবেলা 'কবিগুরুর কেবিনে এসে ধ্যানমগ্ন যোগীর মূর্তি দেখে ছবি তোলার লোভ হল। নিঃশব্দে ফিরে নিজের কেবিন থেকে ক্যামেরা স্ট্যাণ্ড নিয়ে এলাম। সামনের ছোট একটি জানালা দিয়ে কবির কেশে মুখে এক ঝলক রোদ্দুর এসে পড়েছিল। হিসাব করে প্রায় বারো-চোদ্দ মিনিট শাটারে এক্সপোজার দিলাম কবির সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কবির পদপ্রান্তে সকলে সমবেত হলে "সাবিত্রী" কবিতা পড়ে শোনালেন, যা ঐদিন সকালে রচনা করেছিলেন।'—

> ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
> ফেলো, ফেলো টুটি।
> হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি
> দেখা দিক্ ফুটি।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিভিন্ন পর্বে যেসব বাড়িতে বাস করে গিয়েছেন তার কয়েকটির ছবি দ্বিতীয় খণ্ডে

মুদ্রিত হয়েছে, ছবিগুলির অধিকাংশই 'গ্রাহকমহার্ণব' শ্রীঅমল হোমের সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত ; 'শ্যামলী'র ছবিটি শ্রীহিরণকুমার সান্যাল কর্তৃক, 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির ছবিটি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী কর্তৃক গৃহীত। এই সকল বাড়ির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কর্ম -সাধনার ইতিহাস বিশেষভাবে জড়িত সে কথা সকলেই জানেন— রবীন্দ্র-রচনা থেকেই চিত্রবর্ণনায় তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

'ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি, আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকি নে— দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে।' কিন্তু 'রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই, যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন তাঁরা অনাম্নীকে নিজেই নাম দান করুন,— নামাশ্রয়হীনাকে নামের আশ্রয় দিন।' প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রদর্শনী থেকে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন রবীন্দ্রনাথের একখানি ছবি সংগ্রহ করেন তখন এই উপদেশ তিনি স্বীকার করেন নি, অবশেষে তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ছবিটিতে যে 'ছায়াবৃতা' নাম যোগ করেন তাই চিত্রে মুদ্রিত হয়েছে।

প্রবাসীতে ও অন্যত্র প্রকাশিত অনেক রবীন্দ্র-রচনার মূল পাণ্ডুলিপি একান্ত অনুরাগে রক্ষা করেছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পুত্র শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এখন সেগুলি রক্ষিত আছে— এগুলি এখন তাঁদের ও দেশের সম্পদ— 'পায়ে চলার পথ' কথিকার পাণ্ডুলিপিচিত্র তাঁর সৌজন্যে রবীন্দ্রায়ণে প্রকাশিত হল।

রবীন্দ্রজীবনের সর্বশেষ নববর্ষে 'মানবের জয়গান' (দ্র. শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থ) 'ঐ মহামানব আসে'র পাণ্ডুলিপি শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের স্বাক্ষরসংগ্রহপুস্তক থেকে মুদ্রিত হল। এই খাতাটিতে তিনি কয়েক বৎসর ধরে বিভিন্ন শুভদিন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে তাঁর লিখন বা আশীর্বাণী লাভ করেন—

বরষে বরষে শিউলিতলায়
ব'স' অঞ্জলি পাতি
ঝরা ফুল দিয়ে মালাখানি লহ গাঁথি।
এ কথাটি মনে জানো
দিনে দিনে তার ফুলগুলি হবে ম্লান—
মালার রূপটি বুঝি
মনের মধ্যে রবে কোনোখানে
যদি দেখ তারে খুঁজি।
সিন্ধুকে রহে বন্ধ
হঠাৎ খুলিলে আভাসেতে পাও
পুরানো কালের গন্ধ।

অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও তার ব্লক যাঁরা ব্যবহার করতে দিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।—

রবীন্দ্রভারতী 'অন্ধ বাউলের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ' ও 'ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে' এই দুইখানি ছবি অনুগ্রহপূর্বক ব্যবহার করতে দিয়েছেন। প্রথম খণ্ডের প্রচ্ছাদনে যে-চিত্রটি মুদ্রিত হয়েছে সেটি শ্রীঅমল হোমের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 'শিশু ভোলানাথ', 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি', 'মানুষ ও প্রকৃতি অসীম শূন্যতাকে

আদর ছাড়িয়া দিয়াছে' ও 'কবি-কর্তৃক বিচিত্রিত পূরবীর পাণ্ডুলিপি'-চিত্রের ব্লক প্রবাসী-কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 'প্রাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ-খেলা' ও রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপ্রতিকৃতি'র ব্লক সাহিত্য আকাদেমির আনুকূল্যে ব্যবহৃত— দ্বিতীয় চিত্রটি শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালানীর সংগ্রহভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রণীত 'অন্ দি এজেস্ অব টাইম' গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র 'কোথায় বোটের মধ্যে আমি' ছবির ব্লক ব্যবহার করতে দিয়েছেন ঐ গ্রন্থের প্রকাশক ওরিয়েন্ট লংম্যানস কোম্পানি। 'রবীন্দ্রনাথ ১৯১৪', 'আমাদের পাকবে না চুল', 'রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯' চিত্রগুলির ব্লক অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস তাঁদের প্রকাশিত 'টুয়েল্‌ভ্ পোর্ট্রেট্‌স অব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' চিত্রসংগ্রহগ্রন্থ থেকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন— প্রথমোক্ত ছবি দুটি শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আছে। অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র-প্রসঙ্গে শ্রীঅলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যও স্মরণীয়।

এই স্বীকৃতিতে কোথাও ত্রুটি হয়ে থাকলে সেজন্য সংকলয়িতা মার্জনাপ্রার্থী।

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে শ্রীনন্দলাল বসুর বক্তব্য বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি পত্রে মুদ্রিত একটি ইংরেজি প্রবন্ধ থেকে আচার্যপ্রবরের অনুমতিক্রমে শ্রীকানাই সামন্ত অনুবাদ করে দিয়েছেন। শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগীর রচনাটিও মূলতঃ ইংরেজিতে লিখিত, বাংলা অনুবাদ শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত -কৃত।

রবীন্দ্রায়ণে প্রকাশিত কোনো-কোনো প্রবন্ধ সম্পাদনে সহযোগিতা করে শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীভবতোষ দত্ত ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সংকলয়িতার সহায়স্থল হয়েছেন। শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায়ের নানা সহৃদয় পরামর্শে বিশেষ উপকৃত হয়েছি।

পরিশেষে স্মরণ করি এই সংকলন প্রকাশে শ্রীবিনয় ঘোষের উৎসাহ ও উদ্‌যোগ— এই গ্রন্থের প্রস্তাবনাকাল থেকে প্রকাশকাল পর্যন্ত নানাভাবে তিনি আনুকূল্য করেছেন— বস্তুতঃ তাঁর উৎসাহের সঙ্গে প্রকাশকের উদ্যোগিতা যুক্ত হওয়াতেই এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হয়েছে— আর স্মরণ করি লেখক শিল্পী চিত্রাধিকারী মুদ্রক গ্রন্থক মুদ্রণসহযোগী সকলেরই সানন্দ সহকারিতা।

Sketch specially prepared by Asu Banerjee

সে যুগে মানুষ তার
লাঙল ও তাঁত,
তার তীর ও
ধনুক এবং
রথের ব্যবহার
করত তার
জীবনের বিকাশের
উদ্দেশ্যে; ঠিক তেমনি
আজকের দিনেও
আধুনিক যন্ত্রপাতিকে
মানুষের কল্যাণের জন্যই
নিয়োজিত করতে হবে।
কবিগুরুর 'নগর ও গ্রাম' ইংরেজী
প্রবন্ধের অংশবিশেষের বাংলা অনুবাদ।
বিশ্বভারতী বুলেটিনের ১৯৪৭ সালের
১০ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।
মার্টিন বার্ন লিমিটেড, দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড, বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড,
দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোং লিঃ এবং দি হুগলি ডকিং অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত।
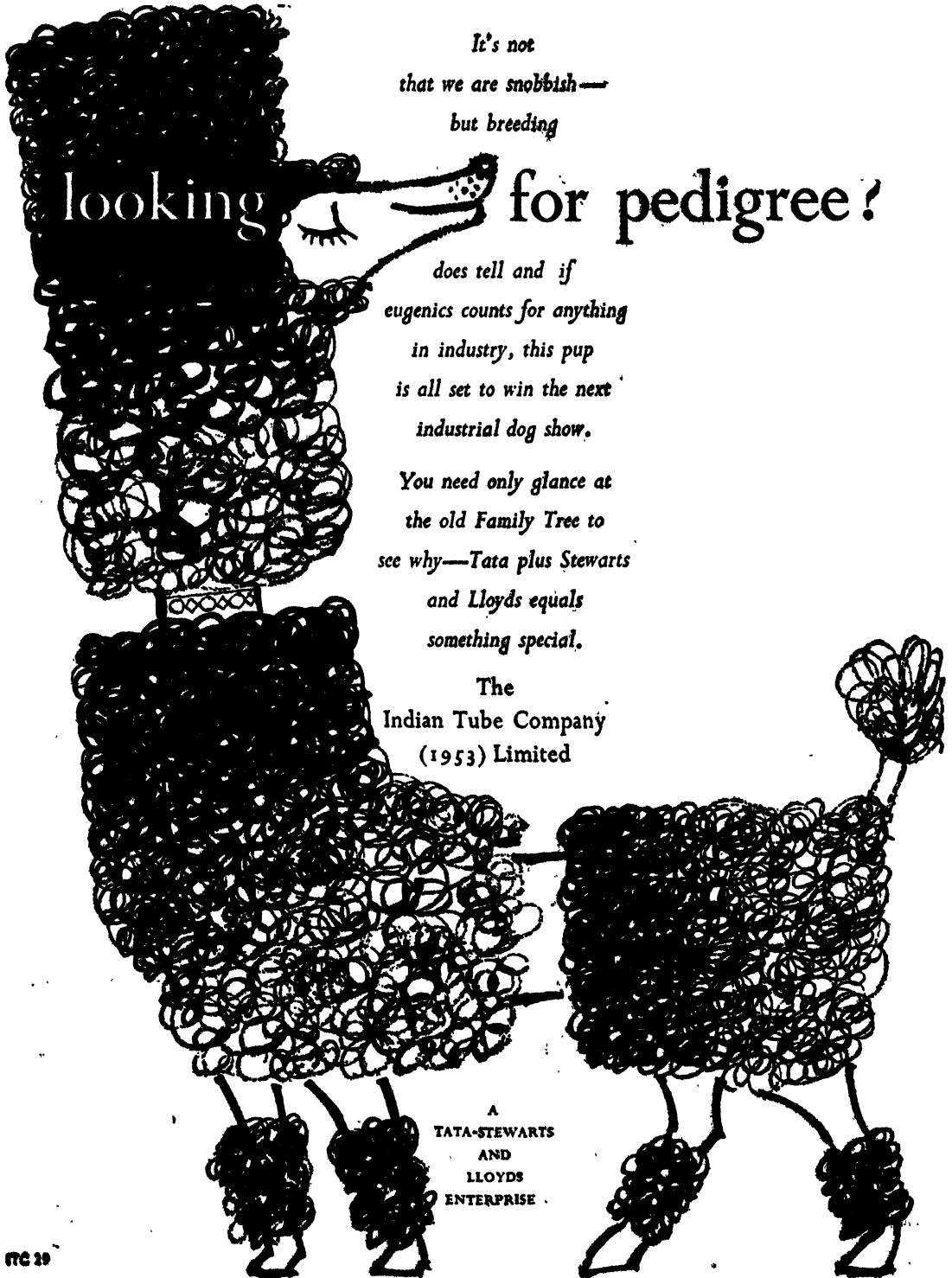
It's not
that we are snobbish—
but breeding
looking for pedigree?
does tell and if
eugenics counts for anything
in industry, this pup
is all set to win the next
industrial dog show.
You need only glance at
the old Family Tree to
see why—Tata plus Stewarts
and Lloyds equals
something special.
The
Indian Tube Company
(1953) Limited
A
TATA-STEWARTS
AND
LLOYDS
ENTERPRISE
ITC 29

This design is based on the cover-leaf of Indian Oxygen Limited's 1961 calendar which has been produced to commemorate the centenary of Rabindranath Tagore and Motilal Nehru.

INDIAN HANDICRAFTS
centuries of craftsmanship
perfect expression of joyous fancy
things of beauty and utility
ALL INDIA
HANDICRAFTS
BOARD
GOVT. OF INDIA
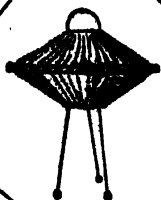
ডাবর-এর
আয়ুর্বেদীয়
ঔষধ

অলকাহি তাঁতল তহি অতিশোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা॥
—বিদ্যাপতি
ভ্রমর-কালো কেশে রমণীর সৌন্দর্য রমণীয় ক'রে তোলে। যুগ যুগ ধ'রে বিশ্বের নারীরা কেশ বিন্যাসের জন্য অলিভ অয়েল মেখে আসছেন। ক্যাল-কেমিকোর ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল ক্যান্থারল-এ আছে কেশের পক্ষে হিতকারী বিশুদ্ধ সেই অলিভ অয়েল। তাই আজও আধুনিকারা পরম আগ্রহে এই কেশতৈল ব্যবহার করেন।
ক্যান্থারল
সুরভিসম্পন্ন ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯
Kantharol

রূপার বই

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী

[১৯২১—১৯২৯]

গুণিশিল্পী, রসতাত্ত্বিক এবং অসামান্য সাহিত্যস্রষ্টার মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছিল অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে। তারই অপরূপ নিদর্শন বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী বাংলা ভাষায় নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এই প্রবন্ধাবলী প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৪১ সালে। দীর্ঘ দিন পরে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত এই সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

সা ম্প্র তি ক প্র কা শ না

চীনা মাটি

[চীনা ছোটগল্প সংকলন]

অনুবাদ : মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চীনদেশের আধুনিক কালের বিখ্যাত রচয়িতাদের লিখিত গল্প ও রম্যরচনার একটি সংগ্রহ আজকের দিনে বাঙালী পাঠকমণ্ডলীর কাছে পৌছে দেবার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমাদের মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে চীনা মানুষকে চেনবার ও তার সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকে জানবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে চীনাভবন স্থাপন করেন। সংকলন-অন্তর্গত রচনাগুলি অনুধাবন করে পাঠক চীনা আধুনিক সাহিত্যের গতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হবেন। গল্প-সাহিত্য ও রম্যরচনার জগতে প্রবেশ করা মাত্র চীনা লেখকেরা কি অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্বের দরবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন তা দেখে চমৎকৃত এবং তাঁদের সৃষ্ট রসে পূর্ণ পাত্র আকণ্ঠ পান করে পাঠক পরিতৃপ্ত হবেন। দাম ৬·০০

অপমানিত ও লাঞ্ছিত | ডস্টয়েভস্কি

অনুবাদ : সমরেশ খাসনবিশ

সম্পাদনা : গোপাল হালদার

নায়ক আইভান। লেখক। নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে নাতাশাকে। এদিকে নাতাশা বিয়ে করল এক ধনীর পুত্রকে। দুই পুরুষ ও এক নারীর ত্রিকোণ প্রেমের দ্বন্দ্ব আর নাটকীয় সংঘাতে আবেগবিধুর এর আখ্যান-ভাগ। ডস্টয়েভস্কির অধিকাংশ রচনার মত এই উপন্যাসটিতেও তাঁর ব্যক্তিজীবন অন্তরঙ্গময়তায় চিহ্নিত। সাইবেরিয়া নির্বাসনের শেষ পর্যায়ে তিনি ছিলেন সেমিপালতিনস্কে। সেখানে পরিচয় হয় মারিয়ার সঙ্গে। ডস্টয়েভস্কি, মারিয়া আর স্থানীয় পাঠশালার তরুণ শিক্ষক—এই তিনের কাহিনী পরবর্তী কালে রূপ পরিগ্রহ করে অপমানিত ও লাঞ্ছিত-র মধ্যে। দাম ৮·০০

[অন্যান্য পুস্তকের তালিকা পত্রোত্তরে জ্ঞাতব্য]

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২